বাংলা

اللغة البنغالية

শাইখ ড. হাইসাম সারহানের জ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থাগার

المكتبة العلمية للشيخ د. هيثم سرحان

তাঁর রচিত বিভিন্ন জ্ঞানমূলক গ্রন্থ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থের একটি সংকলন। এর মধ্যে রয়েছে:



- নবী ﷺ-এর জীবনী
- গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসমূহ
- ইসলাম কী?
- তাওহীদের কিতাব
- ছয়টি মূলনীতি

তিনি পূর্বে আল-মসজিদ আন-নববী ও কুবা মসজিদে শিক্ষকতা করেছেন এবং বর্তমানে অনলাইন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান Mahad Sunnah – معهد السنة এর তত্ত্বাবধায়ক।

معهد السنة
MAHAD SUNNAH

প্রিয়নবী (সাঃ) এর জীবন-বৃত্তান্ত ও চারিত্রিক গুনাবলী সমৃদ্ধ। সুহিত-সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ

মূল

শাইখ হাইছাম বিন জামীল সারহান (حفظه الله)

শিক্ষক: মা'হাদুল হারাম, মাসজিদ নাববী- সৌদী আরব।

http://www.alsarhaan.com

অনুবাদক: ড. কাওসার এরশাদ মুহাম্মাদ

পি.এইচ.ডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয়নবী (সাঃ) এর জীবন-বৃত্তান্ত ও চারিত্রিক গুনাবলী সমৃদ্ধ সুহিত-সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ

মূলঃ

রবের ক্ষমার মুখাপেক্ষী

হায়ছাম বিন মুহাম্মদ জামিল সারহান

প্রাক্তন শিক্ষকঃ মসজিদে নববীস্থ হারাম ইন্সটিটিউট

তত্ত্বাবধায়কঃ আত-তাসীল আল-ইলমী ওয়েবসাইট

অনুবাদঃ

ড. কাওছার এরশাদ মহাম্মদ

মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

মহান আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত লেখক, লেখকের পিতা মহোদয় ও এই গ্রন্থ প্রকাশনায় সার্বিক সহায়তাকারী সকলকে মার্জনার বারিধারা বর্ষণ করুন। আমীন।

মূল গ্রন্থের অবতরণিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, তার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি এরং সকল প্রকার আত্মিক অনিষ্টসমূহ ও মন্দ কর্মসমূহ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না এবং তিনি যাকে বিপথগামী করেন, কেউ তাকে হিদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশিদার নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করো। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না (সূরা আল ইমরান:১০২)।

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট হক দাবী করে থাক এবং আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক (সূরা আন-নিসা:১)।

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে (সূরা আহযাব:৭০-৭১)।

অতঃপর, যে ব্যক্তির অন্তঃকরণে নবী (সা:), তাঁর জীবনবৃত্তান্ত ও পথনির্দেশনা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়ার ন্যুনতম অভিপ্রায় বদ্ধমূল, সে এ-ই সামান্য লিখনি অবগত হওয়া থেকে কখনো অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। ইবনুল কায়্যিম (রহ:) বলেছেন : উভয় জগতে বান্দার সুখ-সমৃদ্ধি যখন নবী (সা:) এর জীবনাদর্শের উপর নির্ভরশীল, ঠিক তখনি যে ব্যক্তি স্বীয়াত্মার হিতোপদেষ্টা, নাজাত ও সুখ-সমৃদ্ধকামী, তাঁর উপর নবী করিম (সাঃ) এর জীবনাদর্শ, জীবন-চরিত ও তাঁর শান-মর্যাদা সমন্ধে জানা অপরিহার্য। যা জানার মাধ্যমে সে অজ্ঞদের কাতার থেকে বের হয়ে তাঁর অনুসারীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ ও তাঁর সংগঠনের কাতারে গণনাভুক্ত হবে। সাধারণতঃ মান নবী (সাঃ) কে জানার ক্ষেত্রে তিন শ্রেনীর হয়ে থাকে :-

১। মুস্তাক্বিল (যথেষ্ট পরিমাণ জানার মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি)

২। মুস্তাকসির (অধিক জানার ইচ্ছুক ব্যক্তি)

৩। মাহরুম (একেবারে না জেনে বঞ্চিত ব্যক্তি)

আর অনুগ্রহ আল্লাহর হাতেই রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই তা দান করেন। আর আল্লাহ তো মহান অনুগ্রহের অধিকারী। আমি কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে এ-ই কামনা করি, তিনি যেন আমাকে এবং তোমাদিগকেও তাঁর নাবীর প্রেম-ভালোবাসা, তাঁর নির্দেশনার আনুগত্য এবং পরিহার্য ও বারিত বিষয়গুলো পরিহার করার শক্তি প্রদান করেন।

"হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম ('আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর (সাঃ) বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম ('আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী। আর প্রশংসা কেবলমাত্র



প্রথম পরিচ্ছেদ :

রাসুল (সাঃ) এর মহৎ গুনাবলি ও নীতিমালা



রাসূল (সাঃ) এর

মহৎ গুনাবলি

বংশ পরিচয়

তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (শায়বাহ) বিন হাশিম ('আমর) বিন আবদে মানাফ (মুগীরাহ) বিন কুসাই (যায়দ) বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কা'ব লুওয়াই বিন গালিব বিন ফিহর (তাঁর উপাধি ছিল কুরাইশ এবং এ সূত্রেই কুরাইশ বংশের উদ্ভব) বিন মালিক বিন নাযর (ক্বায়স) বিন কিনানাহ বিন খুযায়মাহ বিন মুদরিকাহ (আমির) বিন ইলিয়াস বিন মুযার বিন নিযার বিন মা'আদ্দ বিন আদনান। আর আদনান হচ্ছেন (আল্লাহর কোরবানকৃত নবী) উপাধিতে ভূষিত ইসমাঈল বিন (আল্লাহর বন্ধু) উপাধিতে ভূষিত ইবরাহীম আলাইহিমাস সালাম এর বংশধর।

আর তিনিই ছিলেন পৃথিবীবাসীর মধ্যে কৌলিন্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেষ্ঠতর মানব। হাদীসে বর্ণিত আবু সুফয়ানকে লক্ষ্য করে হিরাকিলিয়াস এর উক্তি: আমি তোমাকে তাঁর (রাসূলের) বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। **তুমি তার উত্তরে উল্লেখ করেছ যে, তিনি (রাসূল সাঃ) তোমাদের মধ্যে সম্ভান্ত্র বংশের। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণকে তার সম্প্রদায়ের মহত্তর বংশে পাঠানো হয়ে থাকে।**

মনোনয়ন

রাসূল (সাঃ) বলেন : **মহান আল্লাহ ইসমা'ঈল ('আঃ)-এর সন্তানদের থেকে 'কিনানাহ্'-কে মনোনীত করেছেন, আর কিনানাহ্ ('র বংশ) হতে, 'কুরায়শ'-কে বাছাই করে নিয়েছেন আর কুরায়শ (বংশ) হতে বানূ হাশিমকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং বানূ হাশিম হতে আমাকে চয়ন করে নিয়েছেন।**

নামসমূহ

নবী (সাঃ) এর প্রতিটি নামই গুনবাচক নাম। আবার শুধু এমন নামবাচক নাম নয়, যা তাঁর শুধু পরিচায়ক মাত্র। বরং তাঁর নামসমূহ এমন সব উৎকৃষ্ট গুনাবলি থেকে নিস্পন্ন যা তাঁর স্তুতি ও পূর্ণ উৎকর্ষতার আবশ্যিক দাবী রাখে।

মুহাম্মাদ

রাসূল (সাঃ) এর প্রসিদ্ধ নামসমূহের অন্যতম একটি নাম। যার দ্বারা তাঁকে তাওরাত গ্রন্থে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থ: অত্যধিক বৈশিষ্টের অধিকারী প্রশংসিত।

আহমাদ

অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রশংসিত। তাঁর অত্যাধিক প্রশংসিত স্বভাব-প্রকৃতির কারণে আসমান-জমীন ও ইহকাল-পরকালবাসী সবাই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একই নামে (মাসীহ) ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা নামকরণ করেছিলেন।

আল মুতাওয়াক্কিল

অর্থাৎ, ভরসাকারী। দ্বীন প্রতিষ্ঠাকরণে তিনি আল্লাহর উপর অটল ভরসা করতঃ অন্য কারো সাথে শিরক স্থাপন না করায় উক্ত নামে অভিহিত হয়েছেন ।

নামসমূহ		
	আল মাহি	অর্থাৎ, নিশ্চিহ্নকারী : যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কুফরি নিশ্চিহ্ন করেন। তিনি ব্যতিত অন্য কারো দ্বারা তাঁর মত কুফুরী নিশ্চিহ্ন হয়নি।
	আল হাশের	অর্থাৎ, সমবেতকারী: যার পদধুলিতে মানবজাতিকে সমবেত করা হবে। যেন তিনি সকল মানবজাতীকে সমবেত করার জন্য প্রেরিত।
	আল আকেব	অর্থাৎ, পরাগত : যার পর আর কোন নবী নেই। তিনিই সর্বশেষ নাবীর মর্যাদায় অধিষ্টিত।
	আল মুকাফ্ফি	অর্থাৎ, পশ্চাদ্‌গামী : তিনি পূর্ববর্তী সকল নবীর পশ্চাদ্‌গামী। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলগনের অনুগামী করেছেন।
	নাবিয়্যুত তাওবাহ	অর্থাৎ, তওবার নবী : আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর উপর তওবার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। তদনুসারে তিনি পূর্ববর্তী জাতিদের তুলনায় তাদের তওবা উপমাহীনভাবে কবুল করেছেন। রাসূল (সা:) অধিক ক্ষমা প্রার্থনাকারী ও তওবাকারী ছিলেন।
	নাবিয়্যুল মালহামাহ	অর্থাৎ, বীরদর্প নবী: যিনি আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। অন্য কোন নবী বা তাঁর জাতি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মাতের ন্যায় আদৌ জিহাদ করেনি। এবং নবী (সাঃ) এর যুগে সংঘটিত বড় বড় যুদ্ধের সাথে তৎপূর্বে কারো ধারণা ছিলনা।
	নাবিয়্যুর রহমাহ	অর্থাৎ, দয়ার নবী : আল্লাহ তায়ালা তাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরুপ প্রেরন করেছেন। যার দ্বারা তিনি পুরো পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করেন। আর মুমিনগণ তো অনুকম্পার বৃহত্তর অংশ প্রাপ্ত হয়েছেন। অন্যদিকে কাফেররা বিশেষতঃ তাদের মধ্যে আহলে কিতাবরা তাঁর অনুগ্রহের ছায়াতলে আশ্রিত , অনুগৃহীত ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে জীবনযাপন করেছে ।
	আল ফাতেহ	অর্থাৎ, উন্মোচনকারী: আল্লাহ তায়ালা আন্দোলিত হেদায়াতের দ্বারকে তাঁর দ্বারা উন্মুক্ত করেছেন। এবং অন্ধ চক্ষু, শ্রবণশক্তিহীন কর্ণ ও আচ্ছাদিত আত্মাগুলোর তালাও খুলে দিয়েছেন। তাঁরই মাধ্যমে অসংখ্য কাফেরদের অঞ্চলের বিজয় এনে দিয়েছেন ও জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছেন। এবং তাঁরই মাধ্যমে উপকারসমৃদ্ধ জ্ঞান ও সৎ আমলের পদ্ধতিসমূহ উন্মোচন করেছেন।

নামসমূহ

আল আমিন	অর্থাৎ, বিশ্বস্ত : সমস্ত ধরণীবাসীর মধ্যে রাসূল (সাঃ) এই নামে আখ্যায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্যতর। তিনি ওহী ও দ্বীনের ক্ষেত্রে আল্লাহর একজন বিশ্বস্ত নবী এবং আসমান ও জমিনবাসী সকলের বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব। পরন্ত রাসূল হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পূর্বেই কুরাইশরা তাঁকে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেন ।
আল বাশির	অর্থাৎ, সুসংবাদদাতা : আনুগত্যকারীর জন্য পুরস্কারের সুসংবাদদাতা এবং অবাধ্যের জন্য শাস্তির ভীতিপ্রদর্শনকর্তা।
সাইয়িদু ওলাদে আদাম	অর্থাৎ, আদম-সন্তানদের সর্দার : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: **ক্বিয়ামাতের দিন আমি আদম-সন্তানদের নেতা হব, এবং এতে কোনো অহংকার নেই।**
তাস সিরাজুল মুনির	অর্থাৎ, উজ্জ্বল প্রদীপ : যিনি দাহন ছাড়া আলো বিচ্ছুরণ করেন। প্রদীপ্ত প্রদীপ এর বিপরীতধর্মী, কেননা তাতে ধরণের দাহন রয়েছে।

আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহর একজন বিশেষ বান্দা। তাঁর মাঝে ইবাদাতের বিশেষ থেকে বিশেষত্বর অসাধারণত্ব বিদ্যমান ছিল । কেননা তিনি ইবাদাতের সমস্ত স্তরকে পূর্ণাঙ্গতায় রুপান্তরিত করেছিলেন ।

সামগ্রিকভাবে গুনাবলি

রাসূল (সাঃ) এর সামগ্রিক গুনাবলির বিবরণ যা তিনি স্বয়ং নিজেকে বিশেষায়িত করেছেন। যেমনভাবে তিনি বলেছেন : **আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি পছন্দ করি না যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে মর্যাদার স্থানে রেখেছেন, তা অপেক্ষা তোমরা আমাকে উঁচু মর্যাদার আসনে আসীন করাবে।**

রাসূল (সাঃ) শ্রেষ্ঠতর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন : **আপনি নিশ্চয়ই মহান চরিত্রের অধিকারী (সূরা ক্বলাম-৪)**। আয়েশা (রাঃ) বলেন : **কুরআনই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট**। কুরআনের দ্বারা জীবন পরিচালনা করতেন এবং এর বিধিমালা পর্যন্তই ক্ষান্ত থাকতেন। এবং কুরআনই ছিল কারো প্রতি তাঁর সন্তুষ্ট ও অসন্তোষ হওয়ার মানদণ্ড।

খলিলুল্লাহ	অর্থাৎ, আল্লাহর বন্ধু : **রাসূল (সাঃ) বলেন: আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম (আঃ) কে যেমন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, ঠিক সে রকমভাবে আমাকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।**

শারীরিক বৈশিষ্ট্য

দৈহিক গঠন	আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণের**। অর্থাৎ : (সাদা গোলাকৃতির ন্যায়) **তাঁর ঘাম যেন মুক্তার মতো। তিনি চলার সময় সামনে দিকে ঝুঁকে চলতেন। আমি রেশমি কাপড় বা রেশমকেও তাঁর হাতের তালুর মতো নরম পাইনি এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শরীরের চেয়ে মিশ্‌ক ও আম্বারের মাঝেও অধিক সুগন্ধ পাইনি।**

শারীরিক বৈশিষ্ট্য

দৈহিক অবকাঠামো

বারাহ বিন আযিব (রাঃ) বলেন: **নবী (সাঃ) মাঝারি গড়নের ছিলেন**। অর্থাৎ : মাঝারি গঠন আকৃতিসম্পন্ন। **তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড় চাদর পরা অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে বেশি সুন্দর আমি কখনো কাউকে দেখিনি।**

মুখমণ্ডল

কা'ব বিন মালিক (রাঃ) বলেন: **আমি নবী (সাঃ) -কে সালাম দিলাম, খুশী ও আনন্দে তাঁর চেহারা ঝলমল করে উঠলো। তাঁর চেহারা এমনি-ই খুশি ও আনন্দে ঝলমল করত। মনে হত যেন চাঁদের একটি টুকরা। তাঁর চেহারা মুবারাকের এ অবস্থা হতে আমরা তা বুঝতে পারতাম**। বারাআ (রহঃ) -কে জিজ্ঞাসা করা হল, নবী (সাঃ) -এর মুখমন্ডল কি তরবারির মত ছিল? তিনি বললেন, **না বরং চন্দ্রের মত ছিল।**

কেশগুচ্ছ

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর মুবারক হাত গোশতে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর পরে আমি কোন লোককে এমন দেখিনি। আর নবী (সাঃ) -এর চুল ছিল মধ্যম ধরণের, বেশী কোঁকড়ানোও না,** (অর্থাৎ : বক্রতাসম্পন্ন ও কুচকানো ছিল না।) **অধিক সোজাও না।** (অর্থাৎ: আলগা ছিল না।)

নয়নযুগল

জাবির বিন সামুরাহ্ (রাঃ) বলেন: **নবী (সাঃ) এর মুখ ছিল বেশ দীর্ঘ** (অর্থাৎ : চওড়া।) **চোখ দুটি ছিল লাল** (অর্থাৎ : চক্ষুদ্বয়ের সাদা অংশে রক্তিম বর্ণ ছিল)। **এবং পায়ের জঙ্ঘা ছিল শীর্ণকায়।** (অর্থাৎ : অল্প গোশতবিশিষ্ট গোড়ালি।)

ঘাম

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন: **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের ঘরে আসলেন এবং বিশ্রাম নিলেন।** (অর্থাৎ : দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।) **তিনি ঘামছিলেন, আর আমার মা একটি শিশি (ছোট বোতল) নিয়ে মুছে মুছে তাতে ভরতে লাগলেন। নবী (সাঃ) জেগে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে উম্মু সুলায়ম! একি করছ? আমার মা বললেন, এ আপনার ঘাম, যা আমরা সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করি, আর এ তো সব সুগন্ধির সেরা সুগন্ধি।**

মোহরে নবুওত

তাঁর উভয় কাঁধের মাঝে নবুয়াতের মোহর ছিল। যা তাঁর শরীরে তিলকের ন্যায় স্পষ্ট দৃশ্যমান ছিল।

জাবির বিন সামুরা (রাঃ) বলেন: **আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পিঠের উপরিভাগে (দুই কাধের মাঝে) কবুতরের ডিম সদৃশ নবুয়াতের মোহর দেখেছি। এটির রং ছিল তার গায়ের রংয়ের মতো।**

চারিত্রিক গুণাবলী

রাসূলের শানে সাহাবিদের মর্যাদা প্রদান

আমর বিন আস (রাঃ) বলেন : **আমার অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অপেক্ষা বেশি প্রিয় আর কেউ ছিল না। আমার চোখে তিনি অপেক্ষা মহান আর কেউ নেই। অপরিসীম শ্রদ্ধার কারণে আমি তাঁর প্রতি চোখভরে তাকাতেও পারতাম না। আজ যদি আমাকে তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা করতে বলা হয় তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। কারণ চোখ ভরে আমি কখনই তাঁর প্রতি তাকাতে পারিনি।**

উরয়া বিন মাসউদ আস-সাক্বাফী হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে কুরাইশদের নিকট রাসূল (সাঃ) কে সাহাবীগণের সম্মান প্রদর্শনীর ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেন : **আল্লাহর কসম, কোন রাজাকে দেখিনি, তার প্রজারা তাকে তেমন সমীহ করে, যেমন সমীহ করে মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীরা মুহাম্মদ (সাঃ) এর । আল্লাহর কসম, রাসূল (সাঃ) যদি কফ ফেলেন, আর তা কোন সাহাবীর হাতে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা তা তাদের চেহারা ও চামড়ায় মেখে ফেলেন। তিনি কোন আদেশ দিলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তা পালনে তৎপর ছিলেন; তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো ; তিনি কথা বললে, সাহাবীগণ নিশ্চুপ হয়ে শুনতেন। এমনকি সমীহতে তারা তাঁর চেহারার দিকেও একদৃষ্টে তাকাতেন না।**

আল্লাহর সাথে শিষ্টাচারিতা

আব্দুল্লাহ বিন শিখখির (রাঃ) বলেন: **একদা আমরা বললাম, আপনি আমাদের নেতা। তিনি বললেন, সায়্যেদ বা নেতা তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালা । আমরা বললাম, আপনি তো আমাদের মাঝে সব চাইতে উত্তম ব্যক্তি এবং দানের বিশালতায় আপনি মহান। তিনি বললেন, তোমাদের এ কথা তোমরা বলতে পারো, অথবা তোমাদের এরূপ কিছু বলায় কোন সমস্যা নেই। তবে শয়তান যেন তোমাদেরকে তার প্রতিনিধি না বানায়।**

বীরত্ব

আলী (রাঃ) বলেন : **যুদ্ধ যখন তীব্র হয়ে উঠত এবং উভয় পক্ষ লড়াইয়ে লিপ্ত হত, আমরা তখন রাসূল (সাঃ) এর আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করতাম। ফলে তিনি ছাড়া আমাদের মাঝে কেউ শত্রুর অধিক নিকটবর্তী থাকত না।**

আল্লাহ ভীরুতা

রাসূল (সাঃ) বলেছেন : **আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি, এবং তোমাদের চেয়ে তার প্রতি বেশি অনুগত ।**

স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার

রাসূল (সাঃ) বলেছেন: **তোমাদের মাঝে সে-ই ভাল যে তার পরিবারের কাছে ভাল। আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চেয়ে অধিক উত্তম।**

লাজুকতা

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন: **রাসূল (সাঃ) নিজ গৃহে অবস্থানকারী কুমারী মেয়ের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি তাঁর কাছে অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন,তখন আমরা তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে পারতাম ।**

চারিত্রিক গুণাবলী

সহজলভ্যতা	আয়েশা (রাঃ) বলেন: নবী (সাঃ) কে যখনই (আল্লাহ্‌রপক্ষ থেকে) দুটো কাজের মধ্যে ইখতিয়ার (একটিকে বেছে নেয়ার সুযোগ) দেয়া হত, তখন তিনি তন্মধ্যে সহজতরটিকে বেছে নিতেন, যতক্ষণ না সেটা গুনাহ্‌র কাজ হত। যদি তা গুনাহ্‌র কাজ হত তবে তিনি তাথেকে অনেক দূরে থাকতেন।
স্ব প্রতিশোধ অগ্রহণকারী	আয়েশা (রাঃ) বলেন: আল্লাহর কসম, রাসূল (সাঃ) কখনও তাঁর ব্যক্তিগত কারণে কোন কিছুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র হারামসমূহকে ছিন্ন করা হত। সেক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিশোধ নিতেন।
খাদ্যদ্রব্যের অনিন্দুক	আয়েশা (রাঃ) বলেন : রাসূল (সাঃ) কোন সময় কোন খাদ্যকে মন্দ বলতেন না। রুচি হলে খেতেন না হলে বাদ দিতেন।
হাদিয়াহ গ্রহণকারী	আয়েশা (রাঃ) বলেন : রাসূল (সাঃ) হাদিয়া (উপহার) কবুল গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন।
সাদকাহ ভক্ষনকারী	রাসূল (সাঃ) বলেছেন : তুমি কি জান না যে, মুহাম্মাদের বংশধর (বনূ হাশিম) সদকা ভক্ষণ করে না।
নম্রতা	উক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন : এক ব্যক্তি নবী (সাঃ) এর নিকট এসে কথা বলতে গিয়ে ভয়ে কাঁপতে শুরু করল । তিনি তাকে সাহস দিয়ে বলেন: তুমি শান্ত হও, প্রকৃতিস্থ হও। কারন আমি তো কোন বাদশা নই, বরং আমি এমন মায়ের পুত্র, যে (মক্কার বাতহাতে) রোদে শুকনো গোশত খেতো।
পারিবারিক সেবা	আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ (রাঃ) বলেন: আমি 'আয়িশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী (সাঃ) ঘরে থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি বললেন, সংসারের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিজনের সহায়তা করতেন। আর সালাতের সময় হলে সালাতে চলে যেতেন।
জাহেলদের ব্যাপারে অভ্রুক্ষেপী	রাসূল (সাঃ) বলেছেন : তোমরা কি অবাক হও না? আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে আমার উপর আরোপিত কুরাইশদের গালি ও অভিশাপকে দূরীভূত করছেন? তারা আমাকে নিন্দিত ভেবে গালি দিচ্ছে, অভিশাপ করছে অথচ আমি মুহাম্মাদ চির প্রশংসিত।

চারিত্রিক গুণাবলী

সততা

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : সত্যবাদী- বিশ্বস্ত হিসাবে স্বীকৃত রাসূল (সাঃ) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

পরিচারকের সাথে আচরণ

আনাস (রাঃ) বলেন : **আমি ১০ বছর রাসূল (সাঃ) এর খিদমাত করেছি। আল্লাহর শপথ, কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তিনি কখনো আমার কোনো কাজে 'উহ্' শব্দটি পর্যন্ত করেননি এবং আমি করেছি এমন কোন কাজের ব্যাপারে তিনি কখনো বলেননি 'এটা কেন করেছো? আর না করার ব্যাপারেও তিনি কখনো বলেননি 'ওটা কেন করনি'?** ।

সাহাবীদের থেকে কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য বর্জনকারী এবং প্রশস্ত ও উদারচিত্তের অধিকারী

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন : একদা আমরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় ঢুকল। মসজিদে (প্রাঙ্গণে) সে তার উটটি বসিয়ে বেঁধে দিল। অতঃপর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ (সাঃ) কে? আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তখন তাদের সামনেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা বললাম, 'এই হেলান দিয়ে বসা ফর্সা রঙের ব্যক্তিটিই হলেন তিনি। অতঃপর লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র! নবী (সাঃ) তাকে বললেন: **'আমি তোমার জওয়াব দিচ্ছি।** লোকটি বলল, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোর হব, এতে আপনি রাগান্বিত হবেন না। তিনি বললেন **'তোমার যেমন ইচ্ছা প্রশ্ন কর।** সে বলল, 'আমি আপনাকে আপনার রব এবং আপনার পূর্ববর্তীদের রবের কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহই কি আপনাকে সকল মানুষের রাসূলরুপে পাঠিয়েছেন?' তিনি বললেন: **'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।'** সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেন: **'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।'** সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রমযান) সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেনঃ **'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।'** সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব সদাক্বাহ (যাকাত) আদায় করে গরীবদের মাঝে ভাগ করে দিতে?' নবী (সাঃ) বললেন: **'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।'** অতঃপর লোকটি বলল, 'আমি ঈমান আনলাম আপনি যা (যে শরী'য়াত) এনেছেন তার উপর। আর আমি আমার কওমের রেখে আসা লোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি, আমার নাম যিমাম ইব্নু সা'লাবা, বানী সা'আদ ইব্নু বক্র গোত্রের একজন।

খাদ্য গ্রহণীয় রুচি

আয়েশা (রাঃ) বলেন: **ধারাবাহিক দুই দিন মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পরিবারবর্গ যবের রুটি তৃপ্ত হয়ে আহার করেননি। এই অবস্থায়ই রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকাল হয়ে যায়।**

চারিত্রিক গুণাবলী

দুনিয়া অপ্রিয়তা

নবী (সাঃ) বলেন: **আমার নিকট এ উহুদ পরিমান সোনা হাক, আর তা ঋণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে রেখে দেয়া ব্যতিত একটি দীনারও তা থেকে আমার কাছে জমা থাকুক আর এ অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হোক তা আমাকে আনন্দিত করবেনা । বরং আমি তা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এভাবে এভাবে এভাবে বিতরণ করে দিব।**

কোমলভাষী

আয়েশা (রাঃ) বলেন : **রাসূল (সাঃ) অশ্লীল ও কটুভাষী ছিলেন না, ভান করেও তিনি অশ্লীল কথা বলেননি। তিনি কখনো বাজারে গিয়ে শোরগোল করতেন না এবং অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের বদলা নিতেন না। বরং তিনি উদার মন নিয়ে ক্ষমা করে দিতেন।**

কোন অপরিচিতা নারীর হাত স্পর্শ করতেন না

আয়েশা (রাঃ) বলেন : **রাসূল (সাঃ) এর হাত কোন দিন কোন (অপরিচিতা) মহিলার হাত স্পর্শ করেনি।**

আবাসস্থল ও জীবনযাত্রা

উমার (রাঃ) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি তখন খেজুর পত্র নির্মিত একটি চাটাইয়ের উপর কাত হয়ে শোয়া ছিলেন। আমি সেখানে বসে পড়লাম। তিনি তাঁর চাদরখানি তাঁর শরীরের উপরে টেনে দিলেন। তখন এটি ছাড়া তাঁর পরনে অন্য কোন বস্ত্র ছিল না আর তার পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। এরপর আমি স্বচক্ষে রসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সামানাদির দিকে তাকালাম। আমি সেখানে একটি পাত্রে এক সা' (আড়াই কেজি পরিমাণ) এর কাছাকাছি কয়েক মুঠো যব দেখতে পেলাম। অনুরূপ বাবলা জাতীয় গাছের কিছু পাতা (যা দিয়ে চামড়ায় রং করা হয়।) কামরার এক কোণায় পড়ে আছে দেখলাম। আরও দেখতে পেলাম ঝুলন্ত একখানি চামড়া যা পাকানো ছিল না। তখন তিনি বলেন, এই সব দেখে আমার দু' চোখে অশ্রু প্রবাহিত হলো। তিনি (সাঃ) বললেন, **হে খাত্তাবের পূত্র! তুমি কাঁদছো কেন?** আমি বললাম, হে আল্লাহর নাবী! আমি কেন কাঁদবো না। এই যে চাটাই আপনার পাঁজরে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। আর এই হচ্ছে আপনার ধনভান্ডার। এখানে সামান্য কিছু যা দেখলাম তা ছাড়া তো আর কিছুই নেই। পক্ষান্তরে ঐ যে রোমক বাদশাহ ও পারস্য সম্রাট, কত বিলাস ব্যসনে ফলমূল ও ঝরণায় পরিবেষ্টিত হয়ে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করছে। আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর মনোনীত প্রিয় বান্দা। আর আপনার ধনভান্ডার হচ্ছে এই। তখন তিনি বললেন, **হে খাত্তাবের পূত্র! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাতের স্থায়ী সুখ-শান্তি আর ওদের জন্য রয়েছে পার্থিব ভোগ বিলাস।** আমি বললাম, নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট।

প্রথম প্রশ্নপত্র

প্রশ্ন	সত্য	মিথ্যা
১। বান্দার উভয় জগতের সুখ-সমৃদ্ধি নবী (সাঃ) এর জীবনাদর্শের উপর নির্ভরশীল ।	☐	☐
২। রাসূলগণ সম্ভ্রান্ত বংশে প্রেরিত হন।	☐	☐
৩। রাসূল (সাঃ) এর পূর্ণাঙ্গ গুনাবলির বিবরণ যা দ্বারা তিনি স্বয়ং নিজেকে বিশেষিত করেছেন "আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল" ।	☐	☐
৪। নরম কাপড় কিংবা রেশমির কাপড় নবী (সাঃ) এর হাতের তালু অপেক্ষা অধিকতর নরম	☐	☐
৫। আল্লাহ তাঁর নাবীর (সাঃ) মাঝে চারিত্রিক গুনাবলির পূর্ণতা ও উত্তম মেজাজের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এবং তাঁকে জ্ঞান, অনুকম্পা, এবং দুনিয়া ও আখিরাতী জীবনে যার মাঝে মুক্তি, সফলতা ও সুখ-সমৃদ্ধি রয়েছে তাও তাঁকে প্রদান করেছেন। যা বিশ্বজগতের কাউকে দেন নি।	☐	☐
৬। নবী (সাঃ) উম্মী (নিরক্ষর) ছিলেন, পড়তে ও লেখতে জানতেন না। কোন মানব তাঁর শিক্ষক ছিল না ।	☐	☐

১। সামগ্রীকভাবে কে ছিলেন জমনিবাসীদের মধ্যে বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব?

১. ইউনুস বিন মাত্তা ☐ ২. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ☐

৮। নবী (সা:) এর নামসমূহ : ১। নবী (সাঃ) এর প্রত্যেকটি নামই গুনবাচক নাম ☐ ২। আবার শুধু এমন নামবাচক নাম নয়, যা তাঁর শুধু পরিচায়ক ☐ ৩। নামগুলো এমন সব গুনাবলি থেকে উৎপন্ন যা তাঁর প্রশংসা ও অনুপম পূর্ণত্বের জোরালো দাবী রাখে ☐ ৪। উপরের সবকটি ☐ ৫। প্রথম ও তৃতীয়টি ☐

৯। নবী (সাঃ) এর চরিত্রই ছিল কুরআন, এর ব্যাখ্যা ১। কুরআনিই ছিল তাঁর সন্তুষ্ট হওয়ার মানদণ্ড ☐ ২। কুরআনিই ছিল তাঁর অসন্তুষ্ট হওয়ার মানদণ্ড ☐ ৩। উপরোক্ত উভয়টিই ☐

১০। আল্লাহুর পরম বন্ধু কে? ১। ইবরাহীম (আঃ) ☐ ২। মুহাম্মাদ (সাঃ) ☐ ৩। উভয়ই ☐

১১। রাসূল (সাঃ) ছিলেন শ্রভ্র উজ্জ্বল বর্ণের, এর ব্যাখ্যাঃ ১। গোধূমবর্ণ ☐ ২। শুভ্রজ্জ্বল ☐ ৩। অত্যন্ত শুভ্রজ্জ্বল ☐

১২। সুগন্ধির সেরা সুগন্ধি কোনটি? ১। কুস্তরী সুগন্ধি ☐ ২। রাসূল (সাঃ) এর ঘাম ☐

১৩। রাসূল (সাঃ) এর দৈহিক গঠন মাঝারি গড়নের ছিল, এর ব্যাখ্যা কি? ১। মাঝারি গঠন আকৃতিসম্পন্ন ☐

২। লম্বা গঠন আকৃতিসম্পন্ন ☐

১৪। মোহরে নবুয়ত? ১। উভয় কাধের মাঝখানে ☐ ২। গায়ের রং সদৃশ ☐ ৩। কবুতরের ডিম সদৃশ ☐ ৪। উপরের সবকটিই ☐

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা বাছাই করেছেন :	কিনানা	বনু হাশেম	ইসমাঈল	কুরাইশ বংশ থেকে
১। কিনানাকে যে বংশধর থেকে	☐	☐	☐	☐
২। কুরাইশকে যে বংশধর থেকে	☐	☐	☐	☐
৩। বনু হাশেমকে যে বংশধর থেকে	☐	☐	☐	☐
৪। নবী (সাঃ) কে যে বংশধর থেকে	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) এর বংশধারা :	নবীর নাম	পিতা	দাদা	দাদামহ	পূর্ব ঊর্ধ্বতন দাদা	ঊর্ধ্বতন দাদা
১. হাশেম	☐	☐	☐	☐	☐	☐
২. আ: মুত্তালিব	☐	☐	☐	☐	☐	☐
৩. আব্দুল্লাহ	☐	☐	☐	☐	☐	☐
৪. মুহাম্মাদ	☐	☐	☐	☐	☐	☐
৫. ইসমাইল	☐	☐	☐	☐	☐	☐
৬. ইবরাহীম	☐	☐	☐	☐	☐	☐

প্রতিটি বিশেষ্যকে উল্লিখিত উপযুক্ত বিশ্লেষণের সাথে সংযুক্ত করো।	মুহাম্মাদ	আহমাদ	আল আকেব	আস সিরাজ
১। আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রশংসিত	☐	☐	☐	☐
২। দাহন ছাড়া আলো বিচ্ছুরণকারী	☐	☐	☐	☐
৩। অত্যধিক বৈশিষ্টের অধিকারী প্রশংসিত	☐	☐	☐	☐
৪। যার পরে আর কোন নবী নেই, তিনি সর্বশেষ নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত	☐	☐	☐	☐

নবী (সাঃ) মানুষদের মধ্যে ছিলেন:	হাতের তালু	সুঘ্রানের দিক দিয়ে	অন্তরঙ্গতায়	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও শারিরীক সৌন্দর্য	পরহেজগার
১। অধিকতর সুষমাময়ী	☐	☐	☐	☐	☐
২। অত্যাধিক নরম	☐	☐	☐	☐	☐
৩। অধিক সুবাসিত	☐	☐	☐	☐	☐
৪। সর্বোত্তম ছিলেন	☐	☐	☐	☐	☐
৫। দৃঢ়পদ ছিলেন	☐	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) :	আল্লাহর জন্য	খাদ্য-দ্রব্যকে	নিজের জন্য	দান	হাদিয়া
১।প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না	☐	☐	☐	☐	☐
২।প্রতিশোধ নিতেন	☐	☐	☐	☐	☐
৩। মন্দ বলতেন না	☐	☐	☐	☐	☐
৪।গ্রহণ করতেন এবং প্রতিদান দিতেন	☐	☐	☐	☐	☐
৫।গ্রহণ করতেন না	☐	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) এর

দিক-নির্দেশনা

পোশাক-পরিচ্ছেদ, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়দ্রব্য প্রসঙ্গে

পছন্দের বর্ণ বা রং	রাসূল (সাঃ) এর প্রিয় রঙ ছিল সাদা । তিনি বলেছেন : **তোমাদের জন্য উত্তম পোষাক হচ্ছে সাদা রংয়ের পোষাক। অতএব তোমরা সাদা রংয়ের পোশাক পরিধান করো এবং তা দিয়ে মৃতদের কাফন দাও।**
পরিধেয় পোশাক	সহজলভ্য যে কোন পোষাক পরিধান করতেন। কখনো পশমের, সুতি আবার কখনো লিলেনের। তিনি সবসময়ই ডান দিক হতে পোষাক পরা আরম্ভ করতেন।
মাঝারী মানের বস্ত্র পরিধান	কতিপয় সালাফ বলেন : তাঁরা খুব উন্নতমানের আবার খুব নিম্নমানের জামা প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্য পরিধান করা অপছন্দ করতেন। ইবনু উমার (রাঃ) এর হাদীসে এসেছে : **যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যতি লাভের জন্য পোশাক পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দিবেন**। কেননা সে অহমিকা ও অহংকারের সহিত কাপড় পরিধান করে থাকে। যার ফলে আল্লাহ তায়ালা সাজা প্রদান করবেন। তদ্রূপ ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : **যে ব্যক্তি অহংকারের সহিত পরিহিত কাপড় টাখনুর নিম্নভাগে ঝুলিয়ে পরবে, আল্লাহ্ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না ক্বিয়ামাতের দিন** ।
খাদ্যদ্রব্য	উপস্থিত যে কোন খাবার, ফিরিয়ে দিতেন না এবং অনুপস্থিত যে কোন খাবারের জন্য কষ্ট পেতেন না। যে কোন পবিত্র খাবার তাঁর সামনে পেশ করা হলে, তা ভক্ষন করে নিতেন। তবে খাবার তার অভিরুচিসম্পন্ন না হলে হারামের হুকুমদান ব্যতীত পরিহার করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন : **রাসূল (সাঃ) কখনো কোন খাদ্যকে মন্দ বলতেন না। রুচি হলে খেতেন না হলে বাদ দিতেন**। যেমন গুইসাপ আহারে অভ্যস্ত না থাকায় তা পরিহার করেছিলেন।
খাদ্যগ্রহন পদ্ধতি	১. অধিকাংশ সময় মাটির উপর বিছানো দস্তরখানায় তাঁর খাবার রাখা হতো। ২. তিন আঙুল দিয়ে আহার করতেন। ৩. হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহন করতেন না। ৪. খাদ্য গ্রহণের শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলতেন। ৫. খাদ্য গ্রহন শেষে আঙুলগুলো ভাল করে চেটে নিতেন।
পানীয় পান	১. তিনি অধিকাংশ সময় বসে পান করতেন। বরং দাড়িয়ে পান করা থেকে নিষেধ করেছেন। বসে পান করার প্রতিবন্ধক কোন ওজর থাকলে দাঁড়িয়ে পান করা বৈধ আছে। ২. তিনি পান করার পর অবশিষ্টাংশ তাঁর ডান পাশের ব্যক্তিকে দিতেন। যদিও বাম পাশের ব্যক্তি ডান পাশের ব্যক্তির চেয়ে বয়সে বড় হয়।

বিবাহ-শাদী ও অন্তরঙ্গতা

১. রাসূল (সাঃ) বলেন : **তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধীকে আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে এবং সালাতকে করা হয়েছে আমার চক্ষুশীতলতা।**

২. তিনি স্ত্রীদের মাঝে রাত্রীযাপন, থাকার জায়গা ব্যবস্থাকরণ ও ভরণপোষণের ব্যাপারে বন্টন করে নিতেন।

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন : **রাসূল (সাঃ) সফরের ইচ্ছা করলে স্ত্রীদের মধ্যে কুর'আর মাধ্যমে সিধান্ত গ্রহন করতেন। এবং এতে যার নাম আসত তিনি তাঁকেই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বাকীদের জন্য কিছুই নির্ধারণ করতেন না।**

৪. স্ত্রীদের সাথে তাঁর পুরো জীবন ছিল চমৎকার অন্তরঙ্গতা ও নৈতিকতা সমৃদ্ধ।

৫. তিনি আয়েশা (রাঃ) কে আনসার কন্যাদের নিকট খেলা করার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তিনি যখন অনিষিদ্ধ কিছুর আবদার করতেন, তিনি তাঁর আবদার রক্ষা করতেন।

৬. তিনি আয়েশা (রাঃ) এর কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কখনো তিনি ঋতুবতি অবস্থায় থাকতেন।

৭. ঋতুবতী হলে রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশের ফলে তিনি ইযার পরিধান করতেন। অতঃপর রাসূল (সাঃ) তাঁর সাথে মিলনবিহীন সম্ভোগ করতেন।

৮. সিয়ামরত তাঁকে চুম্বন করতেন।

৯. তাঁকে খেলার ব্যবস্থা করে দিতেন এটি তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহৃদয়তা ও চারিত্রিক উন্নত বৈশিষ্টের অন্যতম উদাহরন। এবং সফরে থাকাকালীন সময়ে নবী (সাঃ) তাঁর সাথে দু'বার দৌড় প্রতিযোগিতা করেন। তাঁরা দুজন একবার একজনের পিছনে আরেকজন চলে গৃহ থেকে বের হয়ে ছিলেন।

১০. তিনি যখন সফর থেকে বাড়ী ফিরতেন তখন রাত্রি বেলায় চুপিসারে পরিবারের নিকট আসতেন না। এবং তিনি রাতের বেলা পরিবারের কাছে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

শয়ন ও জাগরণের নির্দেশিকা

১. তিনি যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতেন তখন এই দুআ পড়তেন : **"বিসমিকা আল্লাহুম্মা আহইয়া ও আমুতু" (অর্থঃ হে আল্লাহ আমি আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করি, এবং আপনার নামেই জীবিত হই)। এবং প্রতি রাতে রাসূল (সাঃ) শয্যা গ্রহনকালে সূরা ইখ্লাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে দু'হাত একত্রিত করে হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে শুরু করে তাঁর দেহের সম্মুখ ভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার এরূপ করতেন। তিনি যখন শোয়ার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাঁর ডান হাত গালের নীচে রেখে নীচের দুআটি তিনবার পড়তেন : "আল্লাহুম্মা ক্বিনী 'আযাবাকা ইয়াওমা তাব'আসু ইবাদাকা" (অর্থঃ হে আল্লাহ যেদিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন, সেদিন আপনার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করবেন)।** তিনি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন বলতেন, **"আল্হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্ইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা-ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর" অর্থাৎ- "যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদানের পর আবার আমাদের পুনর্জীবিত করছেন। আর প্রত্যাবর্তন তার পানেই ।** অতঃপর তিনি মেসওয়াক করতেন।

শয়ন ও জাগরণের নির্দেশিকা

২. তিনি রাত্রির প্রথমাংশে ঘুমাতেন এবং শেষাংশে শয্যা ত্যাগ করতেন। কখনো রাতের প্রথমাংশ মুসলমানদের কল্যানসাধনে বিনিদ্র থাকনে।

৩. ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর আঁখিদ্বয় ঘুমাতো, কিন্তু অন্তর সজাগ থাকত।

৪. তিনি স্বেচ্ছায় জাগ্রত না করা পর্যন্ত কেউ তাঁকে জাগ্রত করতেন না।

৫. তিনি যাথার্থ ঘুম ঘুমাতেন এবং যেটি ছিল সবচেয়ে ফলোদপাদক।

পারস্পরিক আচরণ

১. রাসূল (সাঃ) মানুষদের সাথে রসিকতা করতেন। এবং রসিকতার মধ্য দিয়ে সত্যেটাকে উপস্থাপন করতেন।

২. কৃত্রিম আচরণ (ভান) করতেন, কিন্তু ভান করার মধ্যে অসত্য বলতেন না।

৩. তিনি পরামর্শ দিতেন এবং গ্রহনও করতেন।

৪. অসুস্থদেরকে দেখতে যেতেন, জানাযায় উপস্থিত হতেন, দাওয়াত কবুল করতেন এবং বিধবা, মিসকিন ও অপারগদের পাশে দাড়াতেন।

৫. কবির কাছ থেকে স্তুতি কাব্য শ্রবণ করতেন এবং তার জন্য উপহার দিতেন। তাঁর ভূয়সী তারিফের কিয়দংশই গাওয়া হতো। তিনি ছাড়া অন্যদের প্রশংসা অধিকাংশই অসত্য।

৬. নিজ হাতে পায়ের জুতা সেলাই করেছেন এবং কাপড়ে তালিও লাগিয়েছেন। স্বহস্তে বালতি মেরামত করেছেন, বকরীর দুধ দোহন করেছেন এবং কাপড় ধৌত করেছেন। নিজ ও পরিবার-পরিজনের পরিচর্যা করেছেন। মসজিদ নির্মানে সাহাবা কেরামের সাথে ইট বহন করেছেন।

৭. কখনো ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেধেছেন। আবার কখনো পরিতৃপ্ত হয়েছেন।

৮. মেযবান হয়েছেন, মেহমানও হয়েছেন।

৯. মাথার মধ্যভাগে, পায়ের পশ্চাদ্ভাগে, ঘাড়ের দুটি রগে এবং স্কন্ধমূলে শিঙা লাগিয়েছেন।

১০. চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন, অন্যকে আগুনের দ্বারা দাগ দিয়েছেন, তবে নিজে দাগ দেননি। অন্যকে ঝাড়ফুঁক করেছেন, তবে অন্যের কাছে থেকে ঝাড়ফুঁক গ্রহন করেননি। রোগীকে কষ্টদায়ক বস্তু থেকে সুরক্ষিত করেছেন।

১১. তিনি পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। এবং তিনি যখন কোন কিছু ঋন নিতেন, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছু দ্বারা ঋন পরিশোধ করতেন।

চলনপদ্ধতি

১. সকল মানুষের মাঝে তিনি ছিলেন সর্বাধিক দ্রুততর, শ্রেষ্ঠতর ও শান্তশিষ্ট পদব্রাজক।

২. তিনি সাহাবিদের অপেক্ষা দ্রুততর পদব্রাজক ছিলেন। তাঁর সাথে পথ চলা তাদের বেশ কষ্টসাধ্য হত।

৩. কখনো খালি পায়ে আবার কখনো জুতা পরিহিত অবস্থায় পদব্রজে চলতেন।

৪. সাহাবীরা (রাঃ) সামনে চলতেন আর তিনি তাদের পিছনে পিছনে চলতেন।

৫. তিনি সাহাবীদের সঙ্গে হাঁটার সময় একজন করে কিংবা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে হাঁটতেন।

জিকির আজকার

সকল মানুষের মাঝে তিনি ছিলেন আল্লাহর পূর্ণাঙ্গতর জিকিরকারী। অধিকন্তু, তাঁর সকল কথা-বার্তা ছিল আল্লাহর স্মরণে এবং আল্লাহকে খুশী করে এমন পূণ্যকর্মে নিবেদিত।

ঘুম থেকে জাগ্রত হলে, সালাত সূচনাকালে, বাড়ী প্রস্থানকালে, মাসজিদে প্রবেশকালে, সকাল-সন্ধ্যায়, পোষাক পরিধানকালে, পৃহে প্রবেশ ও প্রস্থানক্ষণে, টয়লেটে প্রবেশকালে, ওযুর আগে ও পরে, আযান শ্রবণকালে, নতুন চাঁদ দর্শনকালে, খাওয়ার আগে ও পরে এবং হাঁচির সময়েও তিনি আল্লাহর জিকির করতেন।

স্বভাবগত নিয়মরীতি সংক্রান্ত

স্বভাবগত নিয়মরীতি এর সংখ্যা

রাসূল (সাঃ) বলেছেন : **দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভূক্ত : ১. গোঁফ খাটো করা, ২. দাড়ি লম্বা করা, .৩ মিসওয়াক করা, ৪. নাকে পানি দিয়া ঝাড়া, ৫. নখ কাটা, ৬. আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোয়া, ৭. বগলের পশম উপড়ে ফেলা, ৮. নাভীর নীচের পশম মুন্ডন করা এবং ৯. পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা। রাবী দশম কাজটি ভুলে গেছেন।**

ডান পার্শ্ব থেকে শুরু করা

রাসূল (সাঃ) জুতা পরা, চুল আচঁড়ানো, পবিত্রতা অর্জন করা এবং কোন বস্তু আদান-প্রদান করা এমনকি সকল কাজই ডান দিক হতে শুরু করা পছন্দ করতেন। খাদ্য ভক্ষন , পানীয় পান ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য ডান হাত এবং শৌচকার্য এবং আবর্জনা পরিষ্কার করতে বাম হাত ব্যবহার করতেন।

মাথা মুণ্ডন করা

মাথা মুণ্ডনের ব্যাপারে তাঁর সুন্নাত হচ্ছে, পূর্নাঙ্গ কেটে ফেলা নতুবা সবটুকু রেখে দেওয়া।

মিসওয়াক করা

রাসূল (সাঃ) মিসওয়াক করতে খুব পছন্দ করতেন। সিয়াম রাখা ও না রাখা উভয় অবস্থাতেই মিসওয়াক করতেন। ঘুম থেকে জাগ্রতকালে, ওজুর সময়, সালাত আদায়ের পূর্বে এবং বাড়ীতে প্রবেশকালে তিনি মিসওয়াক করতেন। আরাক নামক গাছের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করতেন।

সুগন্ধি ব্যবহার

তিনি বেশি বেশি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করাকে খুব পছন্দ করতেন।

দাড়ি ও গোঁফ

রাসূল (সাঃ) বলেন : **তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করবেঃ দাড়ি লম্বা রাখবে, গোঁফ ছোট করবে।**

সময় নির্ধারণ

আনাস (রাঃ) বলেন : **নবী (সাঃ) আমাদের জন্য নখ কাটা ও গোফ ছাঁটার সময়সীমা অন্তত চল্লিশ দিনে একবার নির্ধারণ করে দিয়েছেন ।**

কথা-বার্তা, হাসি-কান্না ও ভাষণের পদ্ধতি

কথা-বার্তা

১. আয়েশা (রাঃ) বলেন : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের ন্যায় চটপটে তথা অস্পষ্টভাবে তারাতারি কথা বলতেন না, বরং তাঁর প্রতিটি কথা ছিল সুস্পষ্ট। আর শ্রোতারা খুব সহজেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারত।**

২. অধিকাংশ সময় কথা বোধগম্য হওয়ার জন্য তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন এবং সালাম দেওয়ার সময় তিনবার সালাম দিতেন।

৩. তিনি কখনো অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না এবং সংক্ষিপ্ত-সমৃদ্ধ কথা বলতেন।

৪. তিনি কখনো নিরর্থক কথা বলতেন না। কেবলমাত্র নেকীর প্রত্যাশায় কথা বলতেন।

৫. রাসূল (সাঃ) কখনো অশ্লীল, অসাদাচারী এবং শোরগোলকারী ছিলেন না।

হাসি

তাঁর হাসি ছিল মুচকি হাসি। শেষ বয়সে হাসার সময় তাঁর পেষণদন্ত (মাড়ীর দাঁত) পরিলক্ষিত হতো।

কান্না

১. কখনো তিনি চিৎকার করে এবং দারাজ গলায় কান্না করেন নি। অথচ তাঁর অশ্রু সিক্ত হয়ে ভেসে যেত। তাঁর বুকে কান্নার মৃদু শব্দ শোনা যেত।

২.তাঁর কান্না কখনো মৃত্যু ব্যক্তির উপর রহমতের জন্য এবং কখনো উম্মতের উপর ভয় ও করুনার জন্য। আবার কখনো আল্লাহর ভয়ে এবং কোরআন শ্রবণকালে ক্রন্দন করতেন।

বক্তৃতা

১. তিনি ভূখন্ড, মসজিদের মিম্বার, উট ও উষ্ট্রীর উপরে আরোহন করে বক্তৃতা দিতেন।

২. জাবের (রাঃ) বলেন : **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খুত্‌বা দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ হত, স্বর উঁচু হত এবং কঠোর রাগ প্রকাশ পেত। মনে হত তিনি যেন আক্রমনকারী বাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন।**

৩. খুতবার প্রাক্কালে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করার মাধ্যমে খুতবা শুরু করতেন।

৪. রাসূল (সাঃ) শ্রোতাদের প্রয়োজনমুখী ও সংশোধনমূলক বক্তৃতা প্রদান করতেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র

প্রশ্ন	সত্য	মিথ্যা
১। তিনি যখন পোশাক পরতেন, তখন ডান দিক হতে পরা শুরু করতেন।	☐	☐
২। অধিকাংশ সময় তাঁর আহার মাটির উপর বিছানো দস্তরখানায় রাখা হতো এটাই ছিল তাঁর খাবার টেবিল।	☐	☐
৩। তিনি যখন সফর থেকে বাড়ী ফিরতেন, তখন রাত্রি বেলায় চুপিসারে পরিবারের নিকট প্রবেশ করতেন না। এবং তিনি রাত্রি বেলা পরিবারের কাছে অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন্	☐	☐
৪। কখনো ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। আবার কখনো পরিতৃপ্ত হয়েছেন।	☐	☐
৫। চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন, অন্যকে আগুনের দ্বারা দাগ দিয়েছেন, তবে নিজেকে দাগ দেননি।	☐	☐
৬। শয়তানী কুমন্ত্রণায় বিদ'আতীরা প্রস্রাব করার পর যে নিন্দনীয় কার্য-কর্ম করে থাকে, তেমন নবী (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় কখনো করেন নি। যেমন পুরুষাঙ্গ টানাটানি করা, পীড়াপীড়ি করা, ঝাপাঝাপি করা, দড়ি দিয়ে বেধে রাখা, উপর দিকে হয়ে ধাপে ধাপে ওপরে ওঠা, মূত্রনালীতে তুলা ভরে রাখা, একটু পরপর দেখাদেখি করা ও পানি গড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি কুমন্ত্রকদের বিদআতি শরিয়তবিরোধি কার্যক্রম।	☐	☐
৭। নবী (সাঃ) একনিষ্ঠতা ও উদারতায় প্রেরিত, দু'টি বিষয়ে ছিলেন বিরোধী : ১। শিরক, ২। হালালবস্তুকে হারামকরণ।	☐	☐
৮। তাঁর সন্তান-সন্ততি ছিল সাতজন। তিন ছেলে, চার মেয়ে।	☐	☐
৯। রাসূল (সাঃ) এর সকল সন্তান বিবি খাদিজার গর্ভজাত। এছাড়া অন্য কোন বিবির গর্ভজাত সন্তান হয়নি।	☐	☐
১০।রাসূল (সাঃ) এর সকল সন্তান তাঁর পূর্বেই শৈশবে ইন্তেকাল করেন।	☐	☐
১১। রাসূল (সাঃ) তাঁর ৯ জন স্ত্রী জীবিত থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, এতে কোন মতাবিরোধ নেই। তারা হচ্ছেন যথাক্রমে : ১। আয়েশা, ২। হাফসা, ৩। যয়নব বিন জাহশ, ৪। উম্মে সালামা, ৫। সফিয়্যা, ৬। উম্মে হাবীবা, ৭। মায়মুনা, ৮। সাওদা, ৯। জুয়াইরিয়া।	☐	☐
১২। আল্লাহ তায়ালা তাঁর পক্ষ থেকে জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে খাদিজা (রাঃ) এর নিকট সালামে পাঠিয়েছেন। এটি এমন এক বিশিষ্টতা, যা তিনি ব্যতীত অন্য কোন নারীর ক্ষেত্রে জানা যায় না।	☐	☐

১। রাসূল (সাঃ) এর প্রিয় রঙ ছিল: ১.সাদা ☐ ২. কালো ☐ ৩.হাতের লাগানে পাওয়া যে কোন রঙ ☐

১৪। রাসূল (সাঃ) এর পোশাক-পরিচ্ছেদের নীতিমালা হচ্ছে : ১.পশমের তৈরি পোষাক পরতেন না ☐ ২.সুতি এবং শনের তৈরি কাপড় পরতেন ☐ ৩.হাতের নাগালে পাওয়া যে কোন কাপড় পরতেন ☐ ৩. ১ম ও ২য় টি ☐

১৫। রাসূল (সাঃ) এর পোশাক-পরিচ্ছেদের নীতিমালা হচ্ছে : ১. দামী কাপড় পরিধান করা ☐ ২. তপশ্যার কারণে জরাজীর্ণ কাপড় পরা ☐ ৩. মাঝারিমানের কাপড় পরিধান ☐

১৬। রাসূল (সাঃ) কখন বিসমিল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ বলতেন? ১.খাবারের শুরুতে ☐ ২. শেষে ☐ ৩. শুরুতে এবং শেষে ☐

১৭। রাসূল (সাঃ) এর অধিকাংশ সময় পানের ধরণ ছিল : ১.বসে ☐ ২.দাড়িয়ে ☐ ৩. উভয়ই অবস্থায় ☐

১৮। রাসূল (সাঃ) বলেন : দুনিয়াবী বস্তুর মধ্যে আমার নিকট পছন্দনীয় করা হয়েছে: ১. স্ত্রী ☐ ২. সুগন্ধী ☐ ৩. উপরের উভয়টিই ☐

১৯। রাসূল (সাঃ) বলেন : আমার আঁখির প্রশান্তি রাখা হয়েছে: ১. জান্নাতে ☐ ২.সালাতে ☐ ৩. উভয়টিই ☐

২০। রাসূল (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে পুর্ণ জীবন কাটিয়েছেন: ১.সৌহার্দ্যপুর্ণভাবে ☐ ২.উত্তম চরিত্রে ☐ ৩. উপরের উভয়টিই ☐

২১। আনাস রাঃ বলেন : নবী (সাঃ) আমাদের জন্য নখ কাটা ও গোফ ছাঁটার সময়সীমা অন্তত..... একবার নির্ধারণ করে দিয়েছেন ।: ১.৩০ দিন ☐ ২. ৪০ দিন ☐ ৩. ৫০ দিন ☐

২২। মাথা মুণ্ডনের ব্যাপারে তাঁর সুন্নাত ছিল, ১.মাথার কিছু অংশ কাটা আর কিছু অংশ রেখে দেওয়া ☐ ২. হয় সম্পূর্ন কামিয়ে ফেলা নয়তবা সবটুকু রেখে দেওয়া ☐

২৩। রাসূল (সাঃ) মেসওয়াক করা পছন্দ করতেন, তিনি মেসওয়াক করতেন : ১.রোযা না রাখা অবস্থায় ☐ ২.রোযা রাখা অবস্থায় ☐ ৩. উভয় অবস্থায় ☐

২৪। রাসূল (সাঃ) হাসি : ১.সম্পূর্ণ মুচকি ☐ ২.অধিকাংশ মুচকি ☐

২৫। রাসূল (সাঃ) প্রেরিত হয়েছেন : ১.সকল মানুষের জন্য ☐ ২. সাকালাইন জ্বিন ও মানুষের জন্য ☐

২৬। সামগ্রীকভাবে রাসূল (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠ কন্যা ছিলনে: ১.সকলেই ☐ ২.ফাতেমা (রাঃ) ☐ ৩. যয়নব (রাঃ) ☐

২৭। রাসূল (সাঃ) এর উপর কোন স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো শয্যায় শায়িত থাকাবস্থায় ওহী অবতীর্ণ হয়নি?

১. হাফসা (রাঃ) ☐ ২. উম্ম সালামাহ (রাঃ) ☐ ৩. আয়েশা (রাঃ) ☐

রাসূল (সাঃ):	জানাযায়	দাওয়াত	বিধবা, মিসকিন ও অপারগদের পাশে	অসুস্থ
১. সেবা-শুশ্রুষা করতেন	☐	☐	☐	☐
২. উপস্থিত হতেন	☐	☐	☐	☐
৩. গ্রহণ করতেন	☐	☐	☐	☐
৪. দাড়াতেন	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) এর কার্যাদি :	বকরীর	মসজিদ নির্মানে ইট	স্বহস্তে কাপড়ে	স্বহস্তে জুতা	নিজের ও পরিবারের
১. মেরামত করেছেন	☐	☐	☐	☐	☐
২. তালি লাগিয়েছেন	☐	☐	☐	☐	☐
৩. দুধ দোহন করেছেন	☐	☐	☐	☐	☐
৪. পরিচর্যা করেছেন	☐	☐	☐	☐	☐
৫. বহন করেছেন	☐	☐	☐	☐	☐

স্বভাবগত ফিতরাত: ১. কাটা ২. লম্বা করা ৩. কাটা ৪. উপড়িয়ে ফেলা ৫. কামিয়ে ফেলা	নখ	বগলের পশম	নাভীর নিচের চুল	দাড়ি	গোঁফ
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐

খাবারদ্রব্যে রাসূল (সাঃ) এর রীতিনীতি : ১। ফিরিয়ে দিতেন না ২। কষ্ট পেতেন না ৩। যে কোন পবিত্র খাবার তাঁর সামনে পেশ করা হলে ৪। তবে খাবারের সাথে অভিরুচি না মিললে	অনুপস্থিত খাবার	তৎক্ষনাৎ আহার করে নিতেন	হারামের হুকুম না লাগিয়ে পরিহার করতেন	উপস্থিত খাবার
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) : ১। কয়টি আঙ্গুল দ্বারা খেতেন ২। আঙুল চেটে খেতেন ৩। সবথেকে ভদ্রোচিত ৪। কেননা অহংকারী ব্যক্তি আহার করে ৫। এবং লালসীত লোভী ব্যক্তি আহার করে	খাবার শেষে	খাদ্য গ্রহণ	এক আঙ্গুল দিয়ে	পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে আত্মতৃপ্তি দূর করে	তিন
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐

বৈশিষ্ট্যসমূহ

বৈশিষ্ট্যসমূহ

একনিষ্ঠ ও বদান্যচিত্তে প্রেরিত

ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাঝে একনিষ্ঠতা ও উদারতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তিনি তাওহীদের ব্যাপারে ছিলেন একনিষ্ঠ, ঠিক তেমনি চারিত্রিকভাবে ছিলেন উদার ।

দুটি বিষয়ে ছিলেন প্রতিদ্বন্দী : ১। শিরক, ২। হালালকে হারামকরণ।

জ্বিন ও মানুষের নিকট প্রেরিত

রাসূল (সাঃ) বলেন : **প্রত্যেক নবী নির্দিষ্ট কওম বা গোত্রের জন্য প্রেরিত হয়েলিন ,আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সকল মানুষের জন্য।**

নাযিলকৃত গ্রন্থ ও দাওয়াতি-কর্মপন্থা

আল্লাহ তায়ালা বলেন : **আলিফ-লাম-রা, এটি একটি কিতাব, আমরা এটা আপনার প্রতি নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষদেরকে তার রবের অনুমতিক্রমে বের করে আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, পরাক্রমশালী, সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে** (সূরা ইব্রাহীম-১)।

নিদর্শনসমূহ

তাঁর সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে 'আল-কুরআন'। পূর্ববর্তী নবী এবং রাসূলদেরকে প্রদত্ত যে কোন নিদর্শনের বিরাট একটি অংশ তাকেও প্রদান করা হয়েছিল।

তাকে ভালোবাসা দ্বীনের একটি অঙ্গ

রাসূল (সাঃ) বলেন : **তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।**

তাকে অপছন্দকারীর বিধান

তাঁর প্রতি বিদ্বেশ পোষণকারী জঘন্যতম কুফুরকারী একজন কাফের। আল্লাহ তায়ালা বলেন : **নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেশ পোষণকারীরাই তো নির্বংশ** (সূরা কাওসার-৩)।

আল্লাহর পরম বন্ধু

রাসূল (সাঃ) বলেন : **আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর খলীল বা বন্ধুরুপে গ্রহণ করেছেন যেমনিভাবে খলীল বা বন্ধুরুপে গ্রহণ করেছিলেন ইব্রাহীমকে (আঃ)।**

উলুল আজম নবীদের একজন

আল্লাহ তায়ালা বলেন : **আর স্মরণ করুন, যখন আমরা নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহন করেছিলাম এবং আপনার কাছ থেকেও আর নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মারইয়াম পূত্র ঈসার কাছ থেকেও** (সূরা আল আহযাব-৭)।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

জ্ঞান

রাসূল (সাঃ) বলেন : **শুনে রাখো! আমি তোমাদের থেকে আল্লাহর ব্যাপারে অধিক বেশি জ্ঞাত।**

আল্লাহ তায়ালা বলেন : **আপনি বলুন : আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে, আর আমি আমি গায়েবও জানিনা। এবং তোমাদেরকে এও বলি না যে, আমি ফেরেশতা** (সূরা আল আন-আম-৫০)।

তার আনুগত্যকারী ও বিরুদ্ধাচারণকারীর বিধান

আল্লাহ তায়ালা বলেন : **বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন** (সূরা আল ইমরান-৩১)। অন্যেত্রে আরো বলেন : **আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও** (সূরা আল ইমরান-১৩৯)।

রাসূল (সাঃ) বলেন : **তোমাদের প্রত্যেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে। তারা বললেনঃ কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেন : যারা আমার অনুসরণ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করল।**

তিনি আরো বলেন : **অপমান ও লাঞ্চনা রাখা হয়েছে আমার আদেশের বিরোধীদের জন্য।**

উম্মাত

আল্লাহ তায়ালা বলেন : **তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্যে যাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে** (সূরা আল ইমরান-১১০)।

রাসূল (সাঃ) বলেন : **শপথ ঐ মহান সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, তোমরা বেহেশতীদের অর্ধেক হবে।**

ভূখণ্ড বা নগরী

রাসূল (সাঃ) এর নগরী হচ্ছে মক্কা। আল্লাহ তায়ালা বলেন : **নিশ্চয় মানবজাতীর জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, বরকতময় ও সৃষ্টিজগতের দিশারী হিসেবে। তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইব্রাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্ব করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর যে কেউ কুফুরী করল সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন** (সূরা আল ইমরান:৯৬-৯৭)

আর মক্কা হচ্ছে সম্মানিত শহর। রাসূল (সাঃ) বলেন : **আল্লাহ তা'আলা এ শহরকে সম্মানীত করেছেন যেদিন তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেন সেদিন থেকে। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত আল্লহ তায়ালা এ শহরের মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখবেন।**

এ নগরী কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য। রাসূল (সাঃ) বলেন : **মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নেই।**

বোর্ডিস্টসমূহ

কিবলা

কা'বা অভিমুখে তাঁর কেবলা । তার পূর্বে বায়তুল মাক্বদিস এর দিকে ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন : **অবশ্যই আমরা আকাশের দিকে আপনার বার বার তাকানো লক্ষ্য করি। সুতরাং, অবশ্যই আমরা আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে চেহারা ফেরান এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের চেহারাসমূহকে এর দিকে ফিরাও** (সূরা আল বাক্বারাহ-১৪৪)।

জমিনে সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ হচ্ছে মাসজিদুল হারাম। আবু যর (রাঃ) বলেন: **আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন মসজিদটি দুনিয়ায় সর্বপ্রথম স্থাপিত? তিনি বললেন, মাসজিদুল হারাম।**

রাসূল (সাঃ) আরো বলেন : **যে ব্যক্তি এ (কাবা) ঘরে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) আসে, এবং অশালীন কথা-বার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকে, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হজ্জ থেকে ফিরে আসবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।**

তিনি আরো বলেন : **মসজিদে হারামে (কাবায়) এক ওয়াক্ত সালাত অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ সালাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) এক ওয়াক্ত সালাত এক হাজার সালাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আর বায়তুল মাক্বদিস মসজিদে এক ওয়াক্ত সালাত পাঁচশত গুণ উত্তম।**

তিনি আরো বলেন : **মসজিদুল হারাম, মসজিদুর রাসূল এবং মসজিদুল আক্সা (বায়তুল মুকাদ্দাস) তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (সালাতের) উদ্দেশে উটের পিঠে হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করা যাবে না)।**

তিনি আরো বলেন : **তোমরা প্রসাব বা পায়খানা করতে গেলে ক্বিবলার দিকে মুখ করে কিংবা কিবলাকে পিছনে রেখে বসবে না, বরং পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরে বসবে।**

নিকটাত্মীয় ও স্ত্রীগণ

তাঁর সন্তান-সন্ততি ছিল সাতজন : তিন ছেলে ও চার মেয়ে

১। ক্বাসেম। তার নামেই রাসূল (সাঃ) কে আবুল ক্বাসেম উপনামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

২। যয়নব (রাঃ)

৩। রুক্বায়য়া (রাঃ)

৪। উম্মে কুলসুম (রাঃ)

৫। ফাতেমা (রাঃ)

৬। আব্দুল্লাহ। তার উপাধি ছিলো তাইয়েব ও তাহের।

৭। ইবরাহীম। তিনি নবী (সাঃ) এর উপপত্নী মারিয়া কিবতিয়া এর সন্তান। বাকী সকল সন্তান ছিলেন বিবি খাদিজার গর্ভ থেকে। এছাড়া অন্য স্ত্রীদের গর্ভ থেকে সন্তান হয়নি।

ফাতেমা (রাঃ) ব্যতীত সকল সন্তান রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন । আর ফাতেমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের ছয় মাস পরই ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ধৈর্য ও ছওয়াবের প্রত্যাশা দেখে সুউচ্চ স্তরে সমুন্নত করেছেন যা বিশ্ব-রমণীদের উপর মর্যাদাপূর্ণ করেছে। আর সাধারণার্থে তিনিই ছিলেন তাঁর কন্যাদের মধ্যে সেরা। অবশ্য কন্যারা সবাই ইসলামের যুগ পেয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহন এবং তাঁর সাথে হিজরত করার গৌরব অর্জন করেন।

তাঁর পিতৃব্যবর্গ ছিলেন এগারজন

১। হামজা (রাঃ) (শহীদগনের নেতা)

২। আব্বাস (রাঃ)

৩। আবু তালেব। (তার নাম আবদে মানাফ)

৪। আবু লাহাব, (তাঁর নাম : আব্দুল উজ্জা)

৫। যুবায়ের

৬। আব্দুল কাবাহ

৭। আল-মুক্বাওয়িম

৮। জিরার

৯। ক্বুসাম

১০। মুগীরা, তার উপাধি নাম হাজাল

১১। গায়দাক্ব, তার নাম: মুসাব

হামজা এবং আব্বাস (রাঃ) ব্যতীত আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেননি।

তাঁর ফুফুবর্গ ছিলেন ছয়জন

১। সফিয়্যা, তিনি যুবায়ের বিন আওয়াম এর মাতা।

২। উম্মু হাকিম আল-বায়জা

৩। আতিকা

৪। বাররাহ

৫। আরওয়া

৬। উমায়মা

স্ত্রীগণের নাম (সাংকেতিক চিহ্ন: حجز. صخر. سمعه)	حجز	الحاء : হাফসা বিনতে উমার বিন খাত্তার (রাঃ) الجيم: জুয়াইরা বিনতে হারিস (রাঃ) الزاي: যয়নব বিনতে জা্হশ+যয়নব বিনতে খুজায়মা (রাঃ)
	صخر	الصاد: সফিয়্যা বিনতে হুয়ায় বিন আখতাব (রাঃ) الخاء: খাদিজা বিনতে খুওয়ালিদ (রাঃ) الراء: উম্ম হাবিবা রুমলা বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ)
	سمعه	السين: সাওদা বিনতে যামআ (রাঃ) الميم: মাইমুনা বিনতে হারিস (রাঃ) العين: আয়েশা বিনতে আবু বকর (রাঃ) الهاء : উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে উমায়য়া (রাঃ)
খাদিজা (রাঃ)		খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ আল-কুরাশি আল-আসাদি রাসূল (সাঃ) এর সর্বপ্রথমা স্ত্রী। রাসূল (সাঃ) তাঁর সাথে নবুয়তের পূর্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন খাদিজা (রাঃ) বিবির বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে রাসূল (সাঃ) অন্য কোন মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। ইবরাহীম ব্যতীত রাসূল (সাঃ) এর সকল সন্তান তাঁর গর্ভজাত ছিল। এবং তিনিই রাসূল (সাঃ) কে নবুয়তপ্রাপ্তিতে শক্তি যুগিয়েছেন এবং তাঁর সাথে চেষ্টা চালিয়েছেন। মন-প্রাণ ও ধন-সম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল (আঃ) মাধ্যমে তাঁকে সালাম পাঠিয়েছেন। এটি এমন এক বিশিষ্টতা, যা তিঁনি ব্যতীত অন্য কোন নারীর ব্যাপারে জানা যায় না। তিঁনি হিজরতের তিন বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন।
সাওদা (রাঃ)		খাদিজা (রাঃ) এর ইন্তেকালের কিছুদিন পরেই রাসূল (সাঃ) সাওদা বিনতে যামআর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিঁনিই তাঁর নির্ধারিত দিন আয়েশা (রাঃ) -কে উপহার দিয়েছিলেন।
আয়েশা (রাঃ)		সাওদা (রাঃ) এর পরে রাসূল (সাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিকের কন্যা আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। যার নিষ্কলুষতার স্বীকৃতি সাত আসমানের উপর থেকে ঘোষিত হয়েছে । তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর প্রিয়তমা। রাসূল (সাঃ) তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে জিবরাইল (আঃ) একখানা সবুজ রেশমী কাপড়ে তাঁর প্রতিচ্ছবি প্রদর্শন করিয়েছিলেন। এবং বলেছিলেন : ইনি আপনার স্ত্রী।

আয়েশা (রাঃ)	(নবুয়তের একাদশ বর্ষের) শাওয়াল মাসে রাসূল (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। রাসূল (সাঃ) তাঁর সাথে হিজরতের প্রথম বছর শাওয়াল মাসে বাসর সম্পন্ন করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল নয় বছর। রাসূল (সাঃ) তাঁকে ব্যতীত আর কোন কুমারী নারী বিবাহ করেননি। আয়েশা (রাঃ) ব্যতিত অন্য কারো শয্যায় শায়িত থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়নি। আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকট সৃষ্টিজগতের সর্বাধিক প্রিয়তমা ছিলেন।তাঁর কৈফিয়তনামা আসমান থেকে নাযিল হয়েছে। তাঁকে দোষারোপকারী কাফের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উম্মতের সমস্ত উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। রাসূল (সাঃ) এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন মাসআলার ব্যাপারে অধিক বিজ্ঞ ও জ্ঞানী। বরঞ্চ সাধারণার্থে উম্মতে মোহাম্মাদীর সকল রমণীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ও বিদ্বান। অধিকন্তু, শীর্ষস্থানীয় সাহাবীরা তাঁর অভিমতের দিকে ফিরে যেত এবং তাঁর নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করতেন।
হাফসা (রাঃ)	এরপর হাফসা বিনতে উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । তিনি তাঁর প্রথম স্বামী খুনাইস ইবনে হোযাফা আস-সাহমীর সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন এবং মদিনায় হিজরত করেন। তাঁর স্বামী উহুদ যুদ্ধের পরে মৃত্যুবরণ করার ফলে রাসূল (সাঃ) তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।
যয়নব বিনতে খুজায়মা	তারপর রাসূল (সাঃ) যয়নব বিনতে বিনতে খুযায়মা বিন হারিস আল-ক্বায়সিয়্যা কে বিবাহ করেন। তিনি বনু হেলাল বিন আমের গোত্রের অন্তর্গত । তিনি রাসূল (সাঃ) এর নিকট বিবাহ বন্ধনের দুইমাস পর ইন্তেকাল করেন। আর তাঁকেই উম্মুল মাসাকিন (মিসকিনদের জননী) উপাধি প্রদান করা হয়।
উম্মে সালামা (রাঃ)	এরপর তিনি উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবু উমায়্যা আল-কুরাশিয়্যা আল-মাখযুমিয়্যা কে বিবাহ করেন। আবু উমায়্যার নাম হচ্ছে : হুজায়ফা ইবনুল মুগীরা। রাসূল (সাঃ) এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী স্ত্রী। তিনি ৬২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
জুয়াইরা (রাঃ)	তারপর রাসূল (সাঃ) জুয়াইরা বিনতে হারিস বিন আবু জিরার আল-মুসত্বালিকিয়্যা (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । জুয়াইরা (রাঃ) বনু মোস্তালেক গোত্রের যুদ্ধবন্দীদের একজন ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ) এর নিকটে এসে দাসমুক্তির নির্ধারিত অর্থ চেয়ে সাহায্য কামনা করেন। অতঃপর রাসূল (সাঃ) তাঁর নির্ধারিত মুক্তিপণ পরিশোধ করে তাঁকে মুক্তির ব্যবস্থা করতঃ তাঁকে বিবাহ করনে।

যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)

এরপর তিনি বনু আসাদ বিন খুযায়মা গোত্রের মহিলা যয়নব বিনতে জাহশকে বিবাহ করেন। তিনি রাসূল (সাঃ) এর ফুফা উমায়মা এর মেয়ে ছিলেন। তাঁর প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলছেন : **অতঃপর যখন যায়েদ তার স্ত্রী যয়নবের সাথে প্রয়োজন শেষ করল, তখন আমরা তাকে আপনার নিকট বিয়ে দিলাম (সূরা আল-আহযাব-৩৭)।**

এ কারনে তিনি (যয়নব (রাঃ) অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে এ বলে গর্ব করতেন যে, **তোমাদেরকে বিয়ে দিয়েছে তোমাদের পরিবার, আমার আমাকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমানের ওপরে বিয়ে দিয়েছেন।** তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ : স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানের ওপরে তাঁর ওলী হয়ে রাসূল (সাঃ) এর সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) এর খেলাফতের শুরুর দিকে ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রথমে রাসূল (সাঃ) এর পালকপুত্র যায়দ ইবনে হারেসার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধিত ছিলেন। অতঃপর যায়েদ (রাঃ) তালাক দেওয়ায় পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা যয়নবকে রাসূল (সাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। যার ফলে উম্মতের লোকেরা পরবর্তীতে পালকপূত্রদের স্ত্রীদের বিবাহ করার বৈধতা গ্রহণে রাসূল (সাঃ) এর স্থাপিত আদর্শ গ্রহন করতে পারে।

উম্মে হাবিবা (রাঃ)

এরপর রাসূল (সাঃ) উম্মে হাবীবা (রাঃ) কে বিয়ে করেন। তাঁর নাম ছিল : রমলা বিনতে আবু সুফিয়ান সাখর বিন হারব আল-কুরাশিয়্যা আল-আমাবিয়্যা। রাসূল (সাঃ) তাঁকে আবিসিনীয়ায় হিজরতরত অবস্থায় বিবাহ করেন। বাদশা নাজ্জাশী তাঁর পক্ষ থেকে রাসূল (সাঃ) এর জন্য চারশত দিনার মোহর নির্ধারণ করেছিলেন। যা তাঁর কাছে সেখান থেকে আনা হয়ে ছিল। উম্মে হাবীবা (রাঃ) তাঁর ভাই মুয়াবিয়া (রাঃ) এর খেলাফতের সময়কালে ইন্তেকাল করেন।

সফিয়্যা (রাঃ)

অতঃপর রাসূল (সাঃ) বনু নাযির গোত্রের সর্দার মুসা (আঃ) এর সহোদর হারুন বিন ইমরান (আঃ) এর বংশভূত সফিয়্যা বিনতে হুয়ায় বিন আখতাব (রাঃ) কে বিবাহ করেন। তিনি একজন নবীর বংশীয় তনয়া পাশাপাশি আরেকজন নবীর পত্নী। তিনি বিশ্বের সর্বাধিক সুন্দরী নারী ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ) এর নিকট যুদ্ধবন্দী হিসেবে ছিলেন। তারপর নবী (সাঃ) তাঁকে নিজের জন্য পছন্দ করেন এবং মুক্ত করে দিয়ে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এবং তাঁর মুক্তিপ্রদানকে মোহররুপে গণ্য করেন। ফলশ্রুতিতে এটি সুন্নাহরুপে পরিণত হয়ে যায়।

মায়মুনা (রাঃ)

এরপর তিনি মায়মুনা বিনতে হারিস আল-হিলালিয়্যা (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। রাসূল (সাঃ) স্ত্রী হিসেবে তাঁকেই সর্বশেষ বিবাহ করেন। মক্কা নগরীতে কাযা ওমরা শেষ করে এহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর নবী (সাঃ) তাঁকে বিয়ে করেন।

এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর সময় স্ত্রীদের ৯ জন জীবিত ছিলেন, । রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর ২০ হিজরিতে যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) সর্বপ্রথম মৃত্যু বরণ করে তাঁর সাথে সঙ্গ দেন। আর সর্বশেষ মৃত্যু বরণ করেন উম্মে সালামা (রাঃ)। তিনি ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া এর খেলাফত এর সময় ৬২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

জীবন-চরিত



প্রথম অধ্যায় :
নবুয়তের পূর্বের জীবন

জন্ম

হিজরতের ৫৩ বছর পূর্বে রবীউল আওয়াল মাসের সোমবার মোতাবেক ৫৭১ খ্রীস্টাব্দে মক্কায় হস্তীবাহিনী ঘটনার বছর রাসূল (সাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য মক্কা থেকে হস্তীবাহিনীকে রোধ করণের মাধ্যমে তাঁকে ও তাঁর বংশকে বিশেষ হাদিয়া প্রদান করেছেন ।

পিতা

পিতা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। রাসূল (সাঃ) তাঁর মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তিনি ইন্তেকাল করেন। ফলে ইয়াতিমাবস্থায় রাসূল (সাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন।

মাতা

মাতা আমেনা বিনতে ওহাব। তিনি বনু জুহারা গোত্রের অন্তর্গত ছিলেন। রাসূল (সাঃ) এর সাত বছর পূর্ণ না হতেই তিনিও ইন্তেকাল করেন।

দায়িত্বভার গ্রহন

তাঁর মাতা আমেনার মৃত্যুর পরে তাঁর দাদা তাঁর দায়িত্বভার গ্রহন করেন। রাসূল (সাঃ) এর আট বছরের মত বয়সে দাদাও ইন্তেকাল করেন। পরিশেষে, তাঁর চাচা আবু তালিব তার ভাতিজার দায়িত্বভার গ্রহন করেন। যার নাম ছিল আবদে মানাফ।

স্তন্যদানকারিনী

সুয়ায়বা

আবু লাহাবের দাসী। তিনি রাসূল (সাঃ) কে সহ আবু সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ আল-মাখযুমীকেও তার কোলশিশু মাসরুহের সাথে দুগ্ধ পান করান। তিনি এই দুজনের সাথে রাসূল (সাঃ) এর চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকেও দুগ্ধপান করিয়েছেন।

হালিমাতুস সাদিয়া

তিনি রাসূল (সাঃ) কে তাঁর কোলশিশু উনাইসা এবং জুযামা -জুযামার উপাধি ছিল শাইমা- এর ভাই আব্দুল্লাহ এর সাথে দুগ্ধপান করিয়েছেন। এরা সবাই হারিস বিন আব্দুল উযযা বিন রিফায়া আস-সাদী এর সন্তান ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ) এর সাথে তাঁর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব কেও দুগ্ধপান করিয়েছেন।

মাতৃকোল

তাঁর মাতা আমেনা	সুওয়ায়বা, আবু লাহাবের দাসী।	হালিমা বিনতে আবু জুআয়িব আস-সাদিয়া

শাইমা

তিনি ছিলেন হালিমাতুস সাদিয়ার কন্যা এবং রাসূল (সাঃ) এর দুধবোন। তিনি হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসেছিলেন। এবং রাসূল (সাঃ) তার হক্ব আদায় করার লক্ষ্যে নিজের চাদর বিছিয়ে তাকে বসতে দেন।

মাতৃকোল

উম্মু আয়মান

তিনি বারাকাত আল-হাবশী (রাঃ)। পিতার দিক থেকে রাসূল (সাঃ) তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ) এর ধাত্রীও ছিলেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে তাঁর সুহৃদ যায়দ বিন হারিসা (রাঃ) এর সাথে বিবাহ দেন। ফলশ্রুতিতে তাঁর গর্ভে উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) জন্ম লাভ করেন।

রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর পর আবু বকর এবং উমার (রাঃ) তাঁর নিকট প্রবেশ করলে তিনি কেঁদেছিলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন : তুমি কাঁদছ কেন? তাল্লাহ তায়ালার কাছে যা আছে তা কি তাঁর রাসূলের জন্য সর্বোত্তম নয়? তিনি বললেন : আমি নিশ্চিত যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট যা আছে তা তাঁর জন্য সর্বোত্তম। এবং আমি এটাও জানি যে, তিনি যে স্থানে ছিলেন তার চেয়ে উত্তম স্থানে গমন করেছেন বরং আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান থেকে আমাদের জন্য ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। এ কথা তাঁদেরকে ব্যথাতুর করে তোলে। এবং তাঁরাও তাঁর সঙ্গে ক্রন্দন শুরু করেন।

পেশা

রাসূল (সাঃ) বকরী লালন পালন করেছেন। এ কাজই তাঁকে ধৈর্যশীল এবং অপারগদের প্রতি যত্নবান এবং দয়ালু বানিয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেন : **আল্লাহ্ তাআলা এমন কোন নবী পাঠাননি , যিনি বকরী চরাননি। তখন তাঁর সাহাবীগণ বলেন, আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ; আমি কয়েক কীরাতের (মুদ্রা) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম।**

ব্যবসা-বানিজ্য ও বিবাহ-শাদী

রাসূল (সাঃ) যখন পঁচিশ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন ব্যবসায়িক কাজে তিনি সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে বসরা পৌছার পর আবার ফিরে আসেন। ফেরার পরপরই তিনি তাঁর সর্বপ্রথমা স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ কে বিবাহ করেন।

কাবাঘর পুণর্নির্মাণ

রাসূল (সাঃ) যখন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন কাবাঘরের জরাজীর্ণতা দৃশ্যিত হয়। তখন কুরায়শরা কাবা ঘর পূনর্নির্মাণ আরম্ভ করে। কুরাইশের প্রত্যেক উপগোত্র কাবাঘর নির্মাণের জন্য আলাদা আলাদা অংশ ভাগ করে নিয়েছিল। নির্মাণ কাজ যখন হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে তখন ঝগড়া বেধে যায়, এ পবিত্র পাথর যথাস্থানে কে স্থাপন করবে? চার থেকে পাচ দিন যাবত এ ঝগড়া অব্যাহত থাকে অতঃপর তারা সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আগামীকাল মসজিদুল হারামের দরজা দিয়ে যিনি সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন, তিনিই তাদের মাঝে এ বিষয়ের সমাধান দিবেন। পরদিন সকালে রাসূল (সাঃ) সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করেন। এবং তিনিই তাদের মাঝে এ সমস্যার সমাধান করে দেন। তখন তিনি একটি চাদর আনান এবং তা মাটিতে বিছিয়ে নিজ হাতে হাজারে আসওয়াদ চাদরের মাঝে রাখেন। তারপর প্রত্যেক গোত্রের নেতাদের সে চাদরের কিনারা ধরে পাথর যথাস্থানে নিয়ে যেতে বলেন।অতঃপর রাসূল (সাঃ) স্বহস্তে যথাস্থানে পাথর স্থাপন করেন।

নিসঙ্গতা

আয়েশা (রাঃ) বলেন : **তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি হেরার গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন।** আর মূর্তি ও মূর্তিপূজক সম্প্রদায়কে তাঁর নিকট ঘৃনিত করা হয়েছিল। তাই তাঁর নিকট এর থেকে অধিক অপছন্দনীয় বিষয় আর কিছুই ছিল না।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

ওহীর সূচনা

রাসূল (সাঃ) এর বয়স যখন ৪০ বছর পূর্ণ হয় তখন তাঁর উপর নবুয়তের জ্যোতি প্রদীপ্ত হয়। আল্লাহ তায়ালা সোমবারের দিন তাঁর রিসালাত প্রদানের মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করেছেন।

নবুওয়াত

আয়েশা (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর নিকট নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি হেরার গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন। তারপর খাদীজা (রাঃ)-এর কাছে ফিরে এসে আবার অনুরুপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এভাবে 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহী এলো। তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, 'পড়ুন'। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : 'আমি পড়তে জানি না। তিনি (সাঃ) বলেন : তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললন, 'পড়ুন' । আমি বললাম: আমি তো পড়তে জানি না'। তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম, 'আমি তো পড়তে জানি না'। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিন্ড থেকে, পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু"- (সূরা আলাক্ব ১-৩)। তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদের কাছে এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও'। তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন । অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রাঃ) এর কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি নিজেকে উপর আশংকা বোধ করছি। খাদীজা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, কক্ষনো না। আল্লাহ আপনাকে কক্ষনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যহার করেন, অসহায় দুর্বলদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্থকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রাঃ) তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকাহ ইব্নু নাওফাল ইব্নু 'আবদুল আসাদ ইব্নু 'আবদুল 'উযযাহ'র কাছে গেলেন, যিনি জাহেলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহন করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে জানতেন এবং আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল হতে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

নবুওয়াত

খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে চাচাত ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা! তুমি কী দেখ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকাহ তাঁকে বললেন, ইনি সেই দূত যাকে আল্লাহ মূসা (আঃ) এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দিবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'তারা কি আমাকে বের করে দেবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অতীতে যিনিই তোমার মত কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকাহ (আঃ) ইন্তিকাল করেন। আর ওহী স্থগিত থাকে।

রাসূল (সাঃ) বলেন : আমি পথ চলতে ছিলাম, এরই মধ্যে আকাশ হতে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি আকাশের দিকে দৃষ্টি তুললাম। দেখতে পেলাম, হেরা গুহায় আমার নিকট যে ফেরেশতা এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসির উপর বসে আছেন। আমি তাতে ভীত হয়ে গেলাম। এমনকি মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম অতঃপর আমি ফিরে এসে বললাম, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর', 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর'। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, "হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, সতর্কবানী প্রচার করুন; আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন; এবং স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখুন; এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন"। (সূরা মুদ্দাসসির: ১-৫) এপর ওহী ধারাবাহিক অবতীর্ণ হতে লাগল।

ওহীর ধরণসমূহ

সত্য স্বপ্ন

রাসূল (সাঃ) এর উপর ওহী নাযিলের সূচনা হয় সত্য স্বপ্ন দ্বারা।

আয়েশা (রাঃ) বলেন : তিনি যে স্বপনই দেখতেন, তা সকালের আলোর মতই সুস্পষ্ট হতো।

অন্তরে প্রক্ষেপণ

ফেরেশতা তাঁকে না দেখেই তাঁর অন্তরে ওহী প্রক্ষেপণ করতেন। যেমন রাসূল (সাঃ) বলেন : রুহুল আমীন আমার হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত করেছেন যে, কোন আত্মাই তার ভাগ্যে নির্ধারিত সর্বশেষ আয়ূ ও রুযী পূর্ন না করা পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে না।

মানব আকৃতিতে ফেরেশতার আগমন

রাসূল (সাঃ) বলেন : আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্ত করে ফেলি। এ পদ্ধতিতে কখনো কখনো সাহাবারা (রাঃ) ফেরেশতাকে দেখতে পেতেন।

ঘন্টাধ্বনির মত

রাসূল (সাঃ) বলেছেন : কোন সময় তা ঘন্টাধ্বনির ন্যায় আমার নিকট আসে। আর এটি-ই আমার উপর সবচেয়ে কষ্টদায়ক হয় এবং তা সমাপ্ত হতেই ফেরেশতা যা বলেন তা আমি মুখস্ত করে নেই।

আয়েশা (রাঃ) বলেন : আমি তীব্র শীতের সময় ওহী নাযিলরত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। ওহী শেষ হলেই তাঁর ললাট থেকে ঘাম ঝড়ে পড়ত। এমনকি তিনি উটের উপর আরোহিত অবস্থায় থাকলে সেটি মাটিতে বসে পড়তো।

ওহীর স্তরসমূহ

ফেরেশতা স্ব-আকৃতিতে

রাসূল (সাঃ) তাঁকে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দেখতে পেতেন। এবং ফেরেশতা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর উপর ওহী নাযিল করতেন। তাঁর সাথে এমনটি ২ বার হয়েছিলো। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা সূরা নাজমে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী

আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানের উপরে থেকে রাসূল (সাঃ) উপর সরাসরি ওহী নাযিল করেন। যেমন মেরাজ রজনীতে নামায ফরজ এবং অন্যান্য বিষয়ের ওহী নাযিল হওয়া।

আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথন

ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ) এর সাথে কথা বলেছেন। যেমনভাবে মুসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন।

সর্বপ্রথম নাজিলকৃত আয়াত

সর্বপ্রথম সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত তাঁর উপর নাযিল হয়। আয়াতসমূহ নিম্নরুপ:

১। পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। ২। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। ৩। পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমান্বিত। ৪। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। ৫। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

দাওয়াতের স্তরসমূহ

১। নবুয়ত।

২। নিকটাত্মীয়দেকে সতর্কীকরণ।

৩। স্বীয় সম্প্রদায়কে ভীতিপ্রদর্শন।

৪। এমন সম্প্রদায়কে সতর্ককরন, যাদের কাছে ইতিপূর্বে কোন ভর্তিপ্রদর্শনকারী আসেননি। তারা হচ্ছে সমগ্র আরববাসী।

৫। শেষ যুগ পর্যন্ত জ্বিন ও মানুষদের মধ্য থেকে যাদের নিকট তাঁর দাওয়াত পৌছেছে, তাদের সকলকে সতর্ক করা।

দাওয়াতের পর্যায়সমূহ

১। গোপন দাওয়াত : নবুওয়তের প্রথম তিন বছর অব্যাহত থাকে।

২। প্রকাশ্য দাওয়াত : যখন তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে নির্দেশিত হন তখন দাওয়াত প্রদান শুরু করেন । আল্লাহ তায়ালা বলেন : **অতএব আপনি যে বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেনে তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন** (সূরা হিজর-৯৪)।

প্রথম ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তবর্গ

১। পুরুষদের মাঝে : আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)

২। নারীদের মাঝে : খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ)

৩। শিশুদের মাঝে : আলি বিন আবু তালিব (রাঃ)

প্রথম ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তিবর্গ

৪। **আযাদকৃত গোলামদের মাঝে :** যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ)

৫। **দাস-দাসীদের মাঝে :** বেলাল বিন রেবাহ হাবশী (রাঃ)

ইসলামের কতিপয় অগ্রপথিকগণ

রাসূল (সাঃ) এর উপর প্রথম সারির ঈমান আনয়নকারী যাদের নাম আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাদের পরবর্তী ঈমান আনয়নকারীগণ হচ্ছেন :

১। উসমান বিন আফফান (রাঃ) ।

২। ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) ।

৩। যুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ) ।

৪। সাদ বিন আবু ওক্কাস (রাঃ) ।

৫। আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) ।

৬। খব্বাদ বিন আরতি (রাঃ) ।

৭। সুহায়িব রুমি (রাঃ) ।

৮। আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) ।

৯। তাঁর মা সুমাইয়া (রাঃ) ।

১০। আবু উবায়দা আমির বিন জাররাহ(রাঃ) ।

১১। উসমান বিন মাযউন (রাঃ) ।

১২। আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ (রাঃ) ।

১৩। উতবা বিন গাযওয়ান (রাঃ) ।

তৃতীয় অধ্যায় :

মাক্কী যুগ

রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের উপরে মুশরিকদের নির্যাতন

যখন নবী (সাঃ) এর দাওয়াতের সত্যতা ও তাঁর চারপাশে অসংখ্য মানুষের জমায়েত মুশরিকদের নিকট লক্ষনীয় হয়, তখন তারা তাদের উপর অব্যক্ত নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের কয়েকটি চিত্র নিম্নে উল্লেখিত হলো।

১। রাসূল (সাঃ) থেকে মানুষদেরকে বিমুখি করার জন্য এবং তাঁকে দেখে ভীতিসন্ত্রস্ত করার জন্য মানুষদের নিকট জাদুকর হিসেবে মুশরিকদের গুজব রটনা করা।

২। তাঁকে পাগল হিসেবে মানুষদের সামনে উপস্থাপন করা, যাতে মানুষ তাকে নির্বোধ হিসেবে আখ্যা দেয়।

৩। তাঁকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রচার করা। আর এটা এতটাই অমূলক ছিল যে, তিনি সত্যবাদীতা ও আমানতদারিতার কারণে সকলের নিকট আল-আমীন হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

৪। তাঁকে ও তাঁর আনীত বিধানকে উপহাস করা।

৫। রাসূল (সাঃ) যখন মানুষদেরকে দ্বীনের পথে আহবান করতেন, তখন মুশরিকরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আনীত সত্যতাকে এবং ওহী শ্রবণ করা থেকে মানুষদেরকে বাধা প্রদান করার জন্য হৈচৈ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে প্ররোচিত করা।

৬। মক্কার বাহিরে থেকে হজ্জ কিংবা ওমরা পালনের জন্য আগত মানুষদেরকে মুশরিকদের স্বাগত জানানো ও নবী (সাঃ) থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ককরণ।

৭। রাসূল (সাঃ) এর শরীরে আঘাত করা। এ জঘন্যণ্যকর্ম ওকবা ইবনে আবু মুয়িত করেছিল। সে রাসূল (সাঃ) এর গলায় তার চাদর দিয়ে টেনে কণ্ঠরুদ্ধ করে হত্যা করার চেষ্টা চালায়, তখন আবু বকর (রাঃ) তাকে প্রতিহত করেন। এবং এ লোকটিই রাসুল (সাঃ) এর উপর নামাযরত অবস্থায় নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়। তাঁর কন্যা ফাতেমা (রাঃ) এসে সেই নাড়িভুঁড়ি সরিয়ে ফেলেন।

৮। তারা তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে তাঁকে ইমারা বিন ওয়ালিদের বিনিময়ে হত্যার কুপ্রস্তাব পেশ করার মাধ্যমে হত্যার ষড়যন্ত্র চালায়। এমনকি রাসূল (সাঃ) হিজরতের ইচ্ছা পোষণকালে তারা তাঁকে হত্যার কুবাসনা পোষন করে।

৯। তারা দুর্বল মুমিনদেরকে ভীষণ কষ্ট ও অসহনীয় যন্ত্রনা প্রদান করে। যেমনভাবে তারা বেলাল (রাঃ) এর পেটের উপর ভারি পাথর চাপিয়ে দেন। ঠিক অনুরুপ নির্যাতন তারা আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) এর পরিবারসহ অন্যান্যদের সাথেও করেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

মুসলমানদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেতে লাগল, কাফেররা তা দেখে আশঙ্কিত হয়ে তাদের উপর নির্যাতনের প্রখরতা এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরো বাড়িয়ে দেয়। ফলে রাসূল (সাঃ) তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দেন। এবং তিনি বলেন : **নিশ্চয় এ শহরের মালিকের কাছে মানুষেরা অত্যাচারিত নয়।**

প্রথম পর্যায়

প্রথম পর্যায়ে ১২ জন পুরুষ এবং ৪ জন মহিলা হিজরত করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, উসমান বিন আফফান (রাঃ)। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর স্ত্রী রাসূল (সাঃ) এর কন্যা রোকায়া (রাঃ) কে সফরসঙ্গী করে যাত্রা করেন। এবং তাঁরা আবিসিনিয়ায় অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে ও প্রতিবেশিত্বে বসবাস শুরু করেন। কিছুদিন পরে মুসলমানদের নিকট কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পৌছায়, যা ছিল ডাহা মিথ্যা। অতঃপর তাঁরা মক্কায় ফিরে আসেন। তারা ফিরে এসে যখন দেখেন যে, অবস্থা অত্যন্ত নাযুক ও কঠিনতর তখন তাদের মাঝে থেকে কেউ কেউ আবার আবিসিনিয়ায় ফিরে যায়। অপরদিকে একটি দল মক্কায় প্রবেশ করেন। ফলে তারা কুরাইশদের কর্তৃক চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হন। মক্কায় প্রবেশকারীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন মহিলা হিজরত করেন। তাঁরা বাদশা নাজ্জাশীর নিকট অত্যন্ত ভাল অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন। এ খবর কুরাইশদের নিকট পৌছালে তারা বাদশা নাজ্জাশীর নিকট হিজরতকারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য আমর ইবনে আস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রাবিয়াকে আবসিনিয়ায় পাঠায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের ষড়যন্ত্রকে অঙ্কুরেই প্রতিহত করেন।

হামযা ও ওমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ

নবুওয়তের ৬ষ্ঠ বছরে হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁকে কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যুবক হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করেছেন। অতঃপর নবী (সাঃ) এর দুআর বরকতে ওমার বিন খাত্তাবও (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। মুমিনরা উভয়ের মাধ্যমে শক্তিশালী হন এবং কুরাইশদের অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি পান।

শিয়াবে আবু তালিব

কুরাইশরা তাদের অত্যাচার ও নির্যাতন আরো বাড়িয়ে দেয়। এমনকি রাসূল (সাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে ৩ বছর আবু তালেবের গিরিপথে অবরুদ্ধ করে রাখে। সেই গিরিপথে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং কাফেররা রাসূল (সাঃ) এর পক্ষ থেকে ভীষণ কষ্ট পায়। আর এ অবরুদ্ধ থেকে বের হওয়ার সময় রাসূল (সাঃ) এর বয়স ছিল উনপঞ্চাশ বছর।

আবু তালেব ও খাদিজা (রাঃ) এর মৃত্যু	এর কয়েক মাস পর রাসূল (সাঃ) এর চাচা আবু তালিব ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। অনুরুপভাবে এর কিছু দিন পরেই খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। ফলে কাফেরদের নির্যাতন আরো কঠিন আকার ধারণ করে।
তায়েফ গমণ	আল্লাহর পথে দাওয়াত দানের লক্ষ্যে রাসূল (সাঃ) এবং যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ) তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। কিন্তু কেউ তাঁর দাওয়াত কবুল করেনি। বরং তাঁকে কষ্ট দেয় এবং তায়েফ থেকে বের করে দেয়। এমনকি তারা তাঁকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে দুই পায়ের গোড়ালি রক্তাক্ত করে দেয়। তারপর তিনি তাদের থেকে প্রস্থান করে মক্কার উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর মুতয়িম বিন আদির আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন।
আদ্দাসের ইসলাম গ্রহণ	তায়েফ থেকে ফেরার পথে রাসূল (সাঃ) আদ্দাস নাসরানীর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি রাসূল (সাঃ) প্রতি ঈমান আনয়ন এবং তাঁকে সত্যায়ন করেন।
জ্বিনদের ঈমান আনয়ন	তায়েফ থেকে ফেরার সময় পথিমধ্যে নাখলা নামক স্থানে নসিবায়িন বাসীদের ৭ জন জ্বিনের একটি দলকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করা হয়। অতঃপর তারা কুরআন শ্রবণ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।
নৈশভ্রমন ও উর্ধ্বগমণ	অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে স্বশরীর ও রুহ সহকারে বায়তুল মাক্বদিস পর্যন্ত নৈশ ভ্রমণ করানো হয়। এরপর সাত আসমানের উপর দিয়ে স্বশরীরে এবং রুহ সহকারে আল্লাহর নিকট আরোহন করানো হয়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সম্মোধন করেন ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেন।
বিভিন্ন গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত	নবী (সাঃ) মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে মক্কার বিভিন্ন গোত্রের নিকটে গিয়ে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক মৌসুমে আশ্রয় চেয়ে নিজেকে তাদের সামনে উপস্থাপন করতেন, যাতে করে তিনি তাঁর রবের রিসালাতের প্রচার প্রসার করতে পারেন। এবং যারা সেই দাওয়াত গ্রহণ করবে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। কিন্তু কোন গোত্রই তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেন নি। এবং আল্লাহ তায়ালা সেই (দাওয়াত কবুল) সম্মাননা আনসারদের জন্য সংরক্ষন করে রাখেন। অতঃপর তিনি ছয়সদস্য বিশিষ্ট একটি দলের নিকটে গমনের মাধ্যমে মাক্কী জীবনের দাওয়াতের পরিসমাপ্তি টানেন। এবং তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেন ও মদীনায় ফিরে যান। পরবর্তীতে তাঁরাও তাদের গোত্রকে ইসলামের পথে দাওয়াত দেন। এমনকি ইসলাম তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং আনসারদের প্রতিটি ঘরে ঘরে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর আলোচনা আলেচিত হতে বাকী থাকে না।

আনসারগণ ও বাইয়াতে আক্বাবা

আক্বাবার প্রথম শপথ

অতঃপর পরবর্তী বছর আনাসারদের ১২ জন লোক মক্কায় আগমন করেন। তন্মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন পূর্বের বছরে ইসলাম গ্রহণ করা ছয়জন যুবক। তাঁরা আক্বাবার সময় সুরা মুমতাহিনায় বর্ণিত মহিলাদের অঙ্গীকারনামার উপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর তারা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

আক্বাবার দ্বিতীয় শপথ

পরবর্তী বছর তাদের মধ্য থেকে ৩৭ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা রাসূল (সাঃ) এর নিকটে আসেন। তারাই সর্বশেষ আক্বাবার শপথ গ্রহণকারী। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিকট এ কথার উপর শপথ গ্রহণ করেন যে, তারা তাঁকে ঐ সকল জিনিস থেকে সংরক্ষন করবেন যে সকল জিনিস থেকে তারা তাদের নিজেদেরকে, নিজ সন্তানদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে সংরক্ষন করে থাকেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের মধ্য থেকে ১২ জনকে মুখপাত্র নির্বাচন করেন। এবং তিনি ও তাঁর সাহাবীরা উক্ত স্থান থেকে প্রস্থান করেন।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

মাদানী যুগ

হিজরতের অনুমতি

রাসূল (সা:) তাঁর সাহাবীদেরকে মদিনায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন। ফলে তাঁরা দলে দলে গোপনে মদিনায় প্রবেশ করলেন। কথিত আছে, সর্বপ্রথম প্রবেশকারী ছিলেন : আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমী। এটাও কথিত আছে, সর্বপ্রথম প্রবেশকারী ছিলেন : মুসআব বিন উমায়ির। অতঃপর তারা সকলই আনসারদের বাড়িতে বাড়িতে প্রবেশ করেন, ফলে তাঁরা তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এতে করে মদীনার চতুর্দিকে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে।

অতঃপর রাসূল (সাঃ) কে হিজরতের অনুমতি প্রদান করা হয়। তিনি রবিউল আওয়াল মাসের রোজ সোমবার মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৬ বছর। সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং তাঁর আযাদকৃত গোলাম আমের বিন ফুহায়রা। তাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন আরীকাত লাইসী। সে এবং আবু বকর (রাঃ) গারে সওর পৌঁছানোর পর তাঁরা সেখানে তিন দিন অবস্থান করেন। অতঃপর তারা (লোহিত সাগরের) উপকূলীয় পথ অনুসরণ করে যাত্রা করেন।

রাসূল সাঃ এর মদিনায় আগমন

১২ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার রাসূল (সা:) এবং তাঁর সহচররা মদীনায় পৌঁছান। তিনি মদিনার সর্বাধিক উঁচু ভূমি কুবা নামক স্থানে বনু আমর বিন আওফ গোত্রের নিকট অবতরণ করেন। তিনি তাদের নিকট ১৪ দিন দিনাতিপাত করেন।

ইসলামের প্রথম মসজিদ

রাসূল (সাঃ) মসজিদে কুবা নির্মাণ করেন । ইবনু ওমার (রাঃ) বলেছেন : **নবী (সাঃ) প্রতি শনিবার কুবা মসজিদে আসতেন, কখনো পদব্রজে, কখনো সওয়ারীতে**। 'নবী (সাঃ) বলেন: **কুবা মাসজিদে এক ওয়াক্ত সালাত পড়া একটি উমরার সমতুল্য।**

মসজিদে নববী নির্মাণ

অতঃপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহন করেন এবং পথ চলা শুরু করেন। বনু নাজ্জার গোত্রের লোকেরা তাদের গৃহে তাঁর অবতরণ কামনা করতঃ উষ্ট্রীর লাগাম ধরে নিতে শুরু করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন যে, **'উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও, কেননা সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত"**। এরপরে উটনী গমন অব্যাহত রাখে এবং বর্তমান মসজিদে নববীর স্থানে এসে বসে পড়ে । আর স্থানটি ছিল বনু নাজ্জার গোত্রের দু'জন বালক সাহাল এবং সুহাইলের উট বেধে রাখার স্থান। অতঃপর তিনি আবূ আইউব আনসারীর বাড়ির সামনে তাঁর উষ্ট্রী থেকে অবরতণ করেন। এরপর তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ উট বাধার স্থানটিতে স্বহস্তে খেজুর গাছের ডাল ও ইট-পাথর দ্বারা মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন।

মসজিদে নববী নির্মাণ

তারপর মাসজিদে নববীর পার্শ্বে তাঁর নিজের এবং স্ত্রীদের জন্য বাসস্থান তৈরী করেন। আয়েশা (রাঃ) এর গৃহ মসজিদের সর্বাধিক নিকটতর ছিল। অতঃপর এর সাত মাস পরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ আইউব আনসারী (রাঃ)-এর বাড়ী থেকে নিজ বাসস্থানে স্থানান্তরিত হন।

ভ্রাতৃবন্ধন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাসজিদে নববী নির্মাণের পর নব্বই জন মুসলিমের উপস্থিতিতে মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। পারস্পরিক সমবেদনা এবং পারস্পরিক উত্তরাধিকার বানানো মূলনীতিতে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত হয়। উত্তরাধিকারের এ ব্যবস্থা বদর যুদ্ধ পর্যন্ত চালু ছিল।

ইয়াহুদ

নবী (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, ইয়াহুদিরা নাবী (সাঃ) কে দেখে চিনতে পারে যে, ইনিই হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত সত্য রাসূল (সাঃ) এবং ইনিই সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তারা তাদের কাছে সংরক্ষিত তাওরাত কিতাবে লেখা দেখতে পায়। তারপরেও তাদের মধ্যে থেকে স্বল্প সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্য থেকে ধর্মীয় পন্ডিত ও ধর্মযাজক আব্দুল্লাহ বিন সালাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর নবী (সাঃ) বানু ক্বায়নুক্বা, বানু নাযির এবং বানু কুরায়জা ইয়াহুদী গোত্রসমূহের সাথে সন্ধি করেছিলেন।

কিবলা পরিবর্তন

মেরাজে সালাতের বিধান ফরয হওয়ার পর নবী (সাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ক্বিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করতেন। আর তিনি কামনা করতেন, তাঁর কেবলা যেন কাবা ঘরের দিকে পরিবর্তিত করা হয়। আর এ লক্ষ্যেই তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে তা আকাংক্ষা করতেন। তখন আল্লাহ তায়াল এ আয়াত নাযিল করেন : **"অবশ্যই আমরা আকাশের দিকে আপনাকে বার বার তাকানো লক্ষ্য করি। সুতরাং, অবশ্যই আমরা আপনাকে এমন কেবলার দিকেই ফিরিয়ে দেব যা আপনি পছন্দ করেন (সূরা বাকারা-১৪৪)** । অতঃপর রাসূল (সাঃ) ২য় হিজরীতে ক্বাবা গৃহকে ক্বিবলাহ হিসাবে রূপান্তরিত হওয়ার ঘোষনা দেন।

জিহাদের অনুমতি

নবী (সাঃ) মদিনা নববীতে স্থায়ীভাবে বসবাস এবং আনসার সাহাবীগণ কর্তৃক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করার পর আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় : **যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে আমাদের রব আল্লাহ** (সূরা হাজ্জ:৩৯-৪০)। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করলেন।

রাসূল (সাঃ) এর প্রারম্ভিক যুদ্ধাভিযানসমূহ ছিল : আবওয়া যুদ্ধ, বুওয়াত, যিল উশায়রা এবং কিছু সংখ্যক সারিয়্যা সমূহ।

বদর যুদ্ধ

২য় হিজরীর রমযান মাসে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তিন শতাধিক মুমিনদেরকে নিয়ে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী কোরাইশ কাফেলা খোঁজের উদ্দ্যেশ্যে যাত্রা করেন। অতঃপর আবু সুফিয়ান পুরো কাফেলাসহ ভিন্নপথ অবলম্বন করে এবং শয়তান কোরাইশকে প্ররোচিত করে। ফলে তারা মুমিনদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়। উভয় দল বদর প্রান্তরে মিলিত হয়। এটাই ছিল হক্ব-বাতিলের নির্ণয়কারী যুদ্ধ নামে আখ্যায়িত বদর যুদ্ধ।

দুইদলের সৈন্যরা যখন যুদ্ধের জন্য মিলিত হলো , রাসুল (সাঃ) তখন স্বীয় রবের কাছে মিনতি করে দুআ করতে লাগলেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের ময়দানে মুসলিমদের সাথে অংশগ্রহণ করার জন্য ফেরেশতা প্রেরণের মাধ্যমে সুদৃঢ় করেন। এবং আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী এবং তাঁর কালিমাকে সমুন্নত করেন। এ যুদ্ধে বদর প্রান্তরে ৭০ জন মুশরিক নিহত হয়। এবং ১৪ জন মুসলিম শাহাদাত বরণ করেন।

কায়নুকা যুদ্ধ

৩য় হিজরীতে বনু ক্বায়নুক্বা গোত্রের লোকেরা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে রাসূল (সাঃ) তাদেরকে ১৫ দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখেন। অতঃপর তারা রাসূল (সাঃ) এর হুকুম মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি দেয়। তখন রাসূল (সাঃ) তাদের উপর থেকে অররুদ্ধ নির্দেশনা উঠিয়ে নেন। এবং তারা ৭০০ জন ছিল।

উহুদ যুদ্ধ

শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদরের যুদ্ধে কোরাইশরা তাদের পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে না পেরে প্রায় ৩০০০ সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। রাসূল (সাঃ) তাঁর ৭০০ জন সাহাবীদেরকে নিয়ে উহুদ প্রান্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। সে সময় মুনাফিকরা তাঁর থেকে পশ্চাৎপদতা অবলম্বন করেন ।

উহুদ যুদ্ধ

দিনের প্রথমভাগে আক্রমণের নিয়ন্ত্রন ছিল মুসলমানদের হাতে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে পরীক্ষার মুখামুখি করেন। ফলে মুসলমানরা দিশেহারা হয়ে যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ মুশরিকদের হাতে চলে যায়। এমনকি তারা রাসূল (রাঃ) এর নিকটে এসে তাঁর উপর আঘাত হানেন এবং দাঁত মুবারক ভেঙ্গে ফেলেন। রাসূল (সাঃ) এর সাথে সেদিন ফেরেশতারাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। তন্মধ্যে হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব, মুসআব বিন উমাইর, আনাস বিন নযর এবং হানযালা আল-গাসিল প্রমুখ সাহাবীগন।

এবং এ যুদ্ধে ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ উত্তম আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এমনকি তাঁর ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বলেন : ত্বালহাহ (জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে। রাসূল (সাঃ) ও মুসলমানরা পাহাড়ে জোটবদ্ধ হলেন। এবং আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের করাল থাবা থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করেন।

উহুদের দিনটি ছিল বালা-মুসিবত ও পরিশোধনের দিন । আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে পরীক্ষার সম্মুখিন করেছিলেন । এবং তিনি মুনাফেকদের মুখোশ উন্মোচন করেন। এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী মুমিনদেরকে শাহাদাত এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।

এ যুদ্ধের পর মুসলমানদেরকে সমূলে নিঃশেষ করার নিমিত্তে কোরাইশরা আরেক দফা বের হওয়ার সংবাদ রাসূল (সাঃ) শুনতে পান। অতঃপর সেদিন মুমিনরা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বের হয়ে যায়। আর যখন মুসলমানদের হামরাউল আসাদে পৌঁছার সংবাদ কুরাইশরা শুনতে পায়, তখন তারা নিরাশ হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে।

হিজরী চতুর্থ বর্ষ

৪র্থ হিজরীতে বীরে মাউনার ঘটনাটি সংঘটিত হয়। যেখানে কুরআনের ৭০ জন ক্বারী হাফেজ সাহাবীকে হত্যা করা হয়। আর এ বর্ষেই বানী নাযির যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে নবী (সাঃ) ইয়াহুদিদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে রাসূল (সাঃ) এর ভীতি উৎক্ষেপণ করেন। এবং নবী (সাঃ) তাদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করেন। তাদের ব্যাপারে সূরা হাশর নাযিল হয়।

মুরাইসি যুদ্ধ

৫ম হিজরীতে নবী (সাঃ) বনু মোসত্বালাক গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন। এবং বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। ফেরার সময় পথিমধ্যে তায়াম্মুমের বিধান প্রবর্তিত হয়। এবং আয়েশা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে ইফক (মিথ্যা অপবাদ) এর ঘটনাটি সংঘটিত হয়। মুনাফিক্বরা উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রাঃ) এর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেন। অথচ তিনি ছিলেন পূত-পবিত্রা । এ বিষয়টি রাসূল (সাঃ) ও তাঁর উপর অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্দোষিতার কথা সূরা নুরে নাযিল করেন। এবং অপবাদ রটনাকারীদের বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করা হয়।

আহযাব যুদ্ধ

৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে পরিখা খননের (আহযাব) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইয়াহুদিরা নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জন্য কোরাইশ ও তাদের বন্ধুদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হন। এবং কোরাইশ, বনু সুলাইম, বনু আসাদ, ফাযারা এবং আশজাহ প্রভৃতি গোত্র থেকে ১০ হাজার সৈন্যবাহিনী একত্রিত হয়ে মদিনার মদিনার পানে যাত্রা করেন।

এদিকে সালমান ফারসী (রাঃ) নবী (সাঃ) কে আত্মরক্ষামূলক পরিখা খননের পরামর্শ দেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন হাজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং সালা পর্বতকে পিছনে ও খন্দককে সামনে রেখে রেখে শিবির স্থাপন করেন। তিনি মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ বনু কুরায়যা গোত্রের নিকট নিরাপত্তার অনুরোধ করেন। পক্ষান্তরে তারা পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এমনকি শত্রুবাহিনীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে । তখন রাসূল (সাঃ) তাদের এবং শত্রুবাহিনীদের কাছে নুয়াইম বিন মাসউদ (রাঃ) কে পাঠান। তিনি তাদের সাথে কূটকৌশল অবলম্বন করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন । অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর উত্তপ্ত বায়ু প্রেরণ করেন। যা তাদের তাঁবুসমূহকে চূর্ণ করে দেয়, পাত্রসমূহকে উলটিয়ে দেয়। অতঃপর বায়ূ তাদেরকে কম্পিত করে ফেলে এবং অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে। ফলে তারা কোন গত্যন্তর ছাড়াই সেখান থেকে প্রস্থান করে। ষড়যন্ত্রের কোন প্রকার সাফল্য লাভ ছাড়াই তারা স্থানচ্যুত হয়।

রাসূল (সাঃ) বানু কুরাযায় গিয়ে সাদ বিন মুয়ায (রাঃ) কে গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত করেন।

এ যুদ্ধে সূরা আহযাব অবতীর্ণ হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

৬ষ্ঠ হিজরীতে নবী (সাঃ) ১৪০০ সাহাবাবৃন্দকে নিয়ে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। অতঃপর যখন নবী (সাঃ) যখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছান, তখন মক্কার কুরাইশরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয়। এবং তিনি তাদের সাথে এ সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, আগামী ১০ বছর উভয়ের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। বস্তুত, এ সন্ধিচুক্তি ছিল মুমিনদের জন্য স্পষ্ট বিজয়ের চাবি কাঠি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন : নিশ্চয় আমরা আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয় (সূরা ফাতহ-১)।

হুদায়বিয়া সন্ধিচুক্তির সারমর্ম হচ্ছে: আগামী বছর মুমিনদেরকে ওমরা পালন করার জন্য মক্কায় প্রবেশকালে কুরাইশরা সহৃদয়তা প্রদর্শন করবে। ফলে, ৭ম হিজরীতে যুল কাদাহ মাসে "ওমরাতুল ক্বাযা" পালিত হয়।

খায়বার যুদ্ধ

রাসূল (সাঃ) হুদায়বিয়া নামক স্থান থেকে প্রত্যাবর্তনের ২০ দিন পর মদিনার উত্তর দিকে অবস্থিত খায়বার এর উদ্দেশ্যে বের হন। সেখানে ইয়াহুদিদেরকে প্রায় ২০ দিন যাবৎ অবরুদ্ধ করে রাখেন। মুসলমানরা সেখানে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন । অতঃপর যখন ইয়াহুদিদের মনে নিশ্চিত ধ্বংসে নিপতিত হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস জাগরিত হয়, রাসূল (সাঃ) এর নিকট যুদ্ধবিরতির আবেদন করেন। এতে রাসূল (সাঃ) তাদের সাথে এ শর্তে সম্মতি জ্ঞাপন করেন যে, তাদের জীবন রক্ষা করা হবে এবং শুধুমাত্র গায়ে পরিহিত পোষাকসহ খায়বার থেকে বের হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি ইয়াহুদিদেরকে ফসল উৎপাদন করার জন্য জমি এ শর্তে দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে কৃষি কাজ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তারা গ্রহণ করবে।

জাফরের আগমন

নবী (সাঃ) খায়বারে থাকাকালীন আবু হুরায়রা (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মদিনায় আগমণ করেন। অনুরুপভাবে রাসূল (সাঃ) এর চাচা জাফর বিন আবু তালিব ও তাঁর সঙ্গীগণও যারা হাবশাতে অবস্থানরত ছিলেন তারা খায়বারে আসেন ও রাসূল (সাঃ) এর খিদমতে সমাগত হন । আশয়ারী মুসলিমগণ অর্থাৎ আবূ মুসা (রাঃ) এবং তাঁর বন্ধুগণ (রাঃ) সেদিনও উপস্থিত হয়েছিলেন।

মুতার যুদ্ধ

৮ম হিজরীতে মূতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের কারন ছিল, শুরাহবিল বিন আমর আল-গাসসানি রাসূল (সাঃ) কর্তৃক রোম সম্রাটের নিকট প্রেরিত দূতকে হত্যা করে। যার ফলে রাসূল (সাঃ) তাঁর পরম বন্ধু যায়দ বিন হারিসা (রাঃ) কে আমির বানিয়ে ৩০০০ সাহাবীর একটি বাহিনী গঠন করে রোম অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং বলেন : **যায়দ (রাঃ) শাহাদাত বরণ করলে জাফর (রাঃ) লোকদের আমির হবে। জাফর (রাঃ) শাহাদাতের লাভ করলে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা লোকদের আমির হবে।** অন্যদিকে হিরাক্বল ও তাঁর আরবীয় মিত্রবর্গ ২,০০০০০ সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হয়। অতঃপর উভয় দল মুতা নামক স্থানে মুখোমুখি হয় এবং উভয়ের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূল (সাঃ) এর সকল আমিরগণ শাহাদাত বরণ করেন । অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) পতাকা ধারণ করেন। এবং তিনি সুন্দরভাবে সৈন্যদল পরিচালনা করেন ফলে মুসলিমদেরকে পশ্চাদপদ করাতে সক্ষম হন। আল্লাহ ও তাদের শত্রুদের কবল থেকে তিনি মুসলমানদেরকে আল্লাহর সাহায্যে নিষ্কৃতি দান করতে সমর্থ হন।

বহুত্তর মক্কা বিজয়

উক্ত বছরে তথা ৮ম হিজরীতে, কুরাইশদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ বনু বাকর গোত্রের লোকেরা নবী (সাঃ) এর সাথে মৈত্রীবদ্ধ বানু খুযায়া গোত্রের লোকদের উপর আকস্মিক আক্রমণ করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করে এবং কোরাইশরাও বনু বাকর গোত্রের লোকদেরকে গোপনীয়ভাবে সহায়তা করে। অতঃপর যখন এ সংবাদটি রাসূল (সাঃ) কাছে পৌঁছায় তখন তিনি মক্কা বিজয়ের দৃঢ় সংকল্প করেন। এদিকে আবু সুফিয়ান রাসূল (সাঃ) এর সাথে কথা বলার জন্য মদীনায় আসেন কিন্তু রাসূল তাঁর কোন কথায় কর্ণপাত করেন নি। পরিশেষে তিনি আবু বকর, ওমার ও আলী (রাঃ) এর নিকট অনুরোধ করে যাতে রাসূল (সাঃ) তার সাথে কথা বলে, এ বিষয়ে সে অনুরোধ করলেও তাঁরা তাকে অস্বীকৃতি জানিয়ে দেয়। এবং রাসূল (সাঃ) এর মক্কা অভিমুখে যাত্রার বিষয়টি কুরাইশদের নিকটে গোপন ও দৃষ্টিহীন রাখার জন্য নবী (সাঃ) আল্লাহর নিকট দুয়া করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দুয়া কবুল করেন। সুতরাং রাসূল (সাঃ) ১০,০০০ সাহাবীদেরকে নিয়ে যাত্রা করে মক্কায় প্রবেশ করেন।

রাসূল (সাঃ) এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব মক্কা বিজয়ের সামান্য কিছুক্ষন পূর্বেই ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন।

মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সাঃ) বলেন : **যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ এবং যে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ এবং যে নিজ ঘরের দরজা ভিতর হতে বন্ধ করে নেবে সে নিরাপদ।** সেদিন রাসূল (সাঃ) যুদ্ধ করেন নি, তবে তিনি তাঁকে এবং মুসলিমদেরকে অল্পসংখ্যক কষ্টদানকারী এবং যুদ্ধের জন্য উদ্যোগগ্রহনকারীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন।

রাসূল (সা:) মক্কায় প্রবেশ করে ইহরামহীন অবস্থায় কাবা ঘর তওয়াফ করেন। অতঃপর উসমান বিন ত্বালহাহ (রাঃ)-কে ডেকে তাঁর কাছ থেকে কাবা ঘরের চাবি গ্রহণ করেন এবং তিনি কাবা ঘরের ভিতরে এবং তাঁর চতুর্দিকে অবস্থিত মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চূরমার করেন। অতঃপর উসমান বিন ত্বালহাকে চাবি ফিরিয়ে দেন।

মক্কা বিজয়ের পরে অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। এমনকি বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট প্রতিনিধত্বি গ্রহন করেন।

মূর্তি বিনাশকরণ

আল্লাহ তায়ালা নবী (সাঃ) কে মক্কা বিজয় দান করার পর নবী (সাঃ) মক্কার চতুর্দিকে অবস্থিত মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চূরমার করার জন্য তাঁর সাহাবীদেরকে প্রেরণ করেন। আমর বিন আস (রাঃ) কে "সুয়া", সাদ বিন যায়েদ (রাঃ) কে "মানাত", খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) কে "উজ্জা", তুফাইল (রাঃ) কে "যিল কাফফাইন", এবং আলী (রাঃ) "তায় মূতি", বিনাশ করার জন্য প্রেরণ করেন।

হুনায়েন যুদ্ধ

যখন হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা মুলমানদের মক্কা বিজয়ের সংবাদ শুনতে পায় তখন তারা রাসূল (সাঃ) এর উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্য সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করে। তারা সম্পদ, স্ত্রী ও শিশু সন্তানদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেন। এদিকে নবী (সাঃ) ১২,০০০ সৈন্যেবাহিনী নিয়ে তাদের উদ্দেশ্য রওনা হন। মুসলিমদেরকে তাদের সংখ্যাধিক্যতা আনন্দিত করে তোলে। এভাবে তারা হুনায়েন উপত্যকায় এসে পৌছান। হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের উপর তীব্র আক্রমণ করে। এ আক্রমণের প্রচন্ডতা নিয়ন্ত্রন করতে না পেরে হতভম্ব হয়ে মুসলিম বাহিনী নবী (সাঃ) থেকে দৌঁড়াদৌঁড়ি করতে থাকে। কিন্তু এক দল মুহাজির ও তাঁর পরিবার পরিজনেরা নবী (সাঃ) এর সাথে দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে স্থির করেন ফলে তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা শত্রুদের উপর মুসলিমদেরকে বিজয়ী করেন এবং হাওয়াযেন গোত্র ত্বায়িফ অভিমুখে পালিয়ে যায়।

অতঃপর হাওয়াযেন গোত্রের ১৪ জন পুরুষ ইসলাম গ্রহণান্তে নবী (সাঃ) এর নিকট আসেন। তারা রাসূল (সাঃ) কে বন্দীদের উপর অনুগ্রহ কামনা করেন, ফলে তিনি তাদের প্রতি হলেন দয়ালু এবং তারাও তাঁর প্রতি হলো দয়াদ্র।

ত্বায়েফ যুদ্ধ

হাওয়াযেন গোত্রের কার্যাদি সম্পন্ন করার পর নবী (সাঃ) ত্বায়িফ যুদ্ধের সংকল্প করেন। ফলে তিনি ত্বায়িফে আসেন এবং ১৮ দিন যাবৎ ত্বায়িফ দূর্গ অবরোধ করে রাখেন। অতঃপর তিনি কোন যুদ্ধের সম্মুখিন না হয়েই ফিরে আসেন।

তাবুক যুদ্ধ

৯ম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধ (অসচ্ছলতার যুদ্ধ) সংঘটিত হয়। সময়টা ছিল প্রচন্ড গরম এবং ফলমূল সংগ্রহ ও ছায়ার জন্য বাগ-বাগিচায় অবস্থান করার মৌসুম। ফলে যুদ্ধের জন্য বের হওয়াটা লোকদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। নবী (সাঃ) যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণকালে লোকদেরকে দান করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। ফলে ওসমান (রাঃ) জিনপোশ ও গদিসহ তিনশত উট ও সাথে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করেন।এমতাবস্থায় রাসূল (সাঃ) বলেন : **(আজকের পর উসমান যা কিছু করবে তাতে তার কোনই ক্ষতি হবে না।)** এবং অন্যান্য সাহাবীরা সাধ্যানুযায়ী দান করেন।

সেদিন সাধারন মোনাফেকরাও দান করতে পশ্চাৎপদতা অবলম্বন করেছিল। এ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) এর শীর্ষস্থানীয় তিনজন সাহাবী কোন প্রকার ওজর ছাড়াই পশ্চাদ্মুখী হয়েছিলেন। তারা হলেন যথাক্রমে :

১। কাব বিন মালেক (রাঃ) ।

২। হেলাল বিন উমায়্যা (রাঃ) ।

৩। মুরারা বিন রাবি (রাঃ) ।

তাবুক যুদ্ধ

নবী (সাঃ) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁরা ওযর পেশ করত: তাদের ব্যাপারে সূরা তওবার আয়াত নাযিল হয়। **অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল** (সূরা তাওবা:১১৮)। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের সত্যবাদিতা অবগত হয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এবং তিনি উক্ত সূরাতে মুনাফিকদেরকে চরমভাবে তিরস্কার করেন। এবং তিনি তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। ফলে এ সূরাটিকে 'ফাজেহা' (গোমর ফাসকারী) সূরা নামে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা এ সূরাটি তাদের প্রকৃত মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছিল।

এ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) আয়লার আমিরের সাথে ভূমিকর গ্রহণের শর্তে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অনুরুপভাবে জারবা এবং আজরুহর অধিবাসীগণের সাথেও কর গ্রহণের ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদন করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে লিখিত প্রমাণ প্রত্র প্রদান করেন। নবী (সাঃ) দুমাতুল জান্দালের শাসক উকায়দেরের সাথেও সন্ধিচুক্তি স্থাপন করেন। রাসূল (সাঃ) তাবুক প্রান্তরে প্রায় ১০ দিন এর অধিক সময় অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি কোন যুদ্ধের মুখোমুখি না হয়ে মদিনায় ফিরে আসেন।

নবী (সাঃ) যখন মদিনায় ফিরে আসেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মোনাফিকদের নির্মিত মাসজিদে জিরারকে ধ্বংস করার নির্দেশ প্রদান করেন। আল্লাহ তায়ালার বাণী : **(আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ, জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃস্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাটি স্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে)**। সুতরাং তিনি "মাসজিদে জিরার" সমূলে বিনাশ করেন। এবং এই অভিযান ছিল তাঁর স্বশরীরে অংশগ্রহণের সর্বশেষ যুদ্ধাভিযান।

প্রতিনিধি দলসমূহ

তাবুক যুদ্ধের পর সাক্বীফ গোত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এবং ৯ম বর্ষকে "প্রতিনিধি দলসমূহ আগমনের" বর্ষ অভিধায় অভিহিত করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা প্রতিনিধির আকারে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করার জন্য রাসূল (সাঃ) এর নিকট আগমন করে। তন্মধ্যে বনু তামিম গোত্রের প্রতিনিধি দল ও তাদের দলপতি আতারিদ বিন হাজেব আত-তামিমি, ত্বায় গোত্রের প্রতিনিধি দল ও তাদের নেতা যায়েদ আল-খায়েল, আবদুল ক্বায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল ও তাদের সর্দার আল-জারুদ আল-আবদী। বনু হানীফার গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং তাদের মধ্যে মুসায়লামাতুল কাজ্জাব ছিল। যে পরবর্তী সময়ে নবুওয়াতের দাবী করে।

আবু বক্কর (রাঃ) এর হজ্জ পালন

৯ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) কে আমিরুল হজ্জ (হজ্জযাত্রী দলের সর্দার) হিসেবে প্রেরণ করেন। ফলে তিনি মানুষদেরকে হজ্জের বিধিবিধান শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে হজ্জ পালন করেন। রাসূল (সাঃ) আলী (রাঃ) কে মানুষদের মাঝে সূরা তাওবার প্রথমাংশ পাঠ করার জন্য এবং মুশরিকদের সাথে সকল অঙ্গীকার প্রত্যাখান করার জন্য পাঠান। আবূ বাকর (রাঃ) মানুষদের মাঝে ঘোষণা করেন যে, এই বছরের পরে কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং জাহেলীদের ন্যায় কোন উলঙ্গ ব্যক্তি কাবা ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না।

বিদায় হজ্জ

রাসূল (সাঃ) ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জ পালন করেন। রাসূল (সাঃ) এর সাথে বিভিন্ন গোত্র ও বিবিন্ন দেশের মুসলিমরা হজ্জ পালনের উদ্দ্যেশ্যে বের হন। যাদের সংখ্যা লক্ষাধিক পর্যন্ত পৌছেছিল। রাসূল (সাঃ) তাঁদেরকে মানাসিকে হজ্জ (হজ্জের বিধি বিধান) শিক্ষা দেন। তিনি আরাফার দিন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং আল্লাহ তায়ালা এ-ই আয়াতটি পাঠ করেন : **আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম** (সূরা মায়েদা-৩)। এবং তিনি তাদেরকে সংবাদ দেন যে, দ্বীন পূর্ণ হয়ে গেছে। এবং কুরআন এবং সুন্নাহর আনীত জীবনব্যবস্থাকে দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরার ওসিয়ত করেন। আরো বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জান, মাল ও তাদের ইয্যত-আবরুকে তাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত করে দিয়েছেন। এবং এটিই রাসূল (সাঃ) এর বিদায়ী ভাষণে পরিণত হয়।

উসামা (রাঃ) কে সামরিক অভিযানে প্রেরণ

১১ হিজরীর সফর মাসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রুমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং উসামা বিন যায়দকে (রাঃ) সে দলের আমির হিসেবে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি যাত্রা করেন এবং জুর্ফ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। পরিশেষে, তাদের নিকট রাসূল (সাঃ) এর অসুস্থতার সংবাদ পৌছায়।

রাসূল (সাঃ) এর

যুদ্ধ-বিগ্রহের সার-সংক্ষেপ

রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধ, সামরিক অভিযান ও সারিয়্যাহসমূহ এর সংক্ষিপ্তরূপ

রাসূল (সাঃ) এর সকল যুদ্ধ, সামরিক অভিযান ও সারিয়্যা হিজরতের পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যেই সংঘটিত হয়। আর সারিয়্যা ও সামরিক অভিযানসমূহের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ টি। পক্ষান্তরে, ২৭ টি যুদ্ধাভিযান। তন্মধ্যে ৯টি যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেন। সেগুলো হলো : ১। বদর যুদ্ধ। ২। উহুদ যুদ্ধ। ৩। খানদাক্ব। ৪। কুরায়যা। ৫। মুসত্বালিক। ৬। খায়বার ৭। মক্কা বিজয় ৮। হুনাইন। ৯। ত্বায়িফ। আর পবিত্র কুরআনে উপরোল্লিখিত কতক যুদ্ধসমূহের আলোচনা অবতীর্ণ হয়েছে। যা নিম্নে আলাচিত হলো।

কুরআনে কারীমে অবতীর্ণ রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধবিগ্রহ

বদর যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরাহ আনফাল অবতীর্ণ হয়। এ সূরাটিকে সূরা বদর নামে আখ্যায়িত করা হয়।

উহুদ যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সূরা আলে ইমরানের শেষাংশের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এই আয়াত থেকে, **আর স্মরণ করুন যখন আপনি আপনার পরিজনদের কাছ থেকে প্রত্যূষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মুমিনগণকে ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করেছিলেন** (সূরা আল ইমরান-১২১)। সূরার শেষাংশের সামান্য কতক আয়াত পূর্ব-পর্যন্ত।

খানদাক্ব, বনু কুরায়যা ও খায়বার যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আহযাবের প্রারম্ভাংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

বনু নাযির গোত্রের যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরাহ হাশর অবতীর্ণ হয়েছে।

হুদায়বিয়া ও খায়বার যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা ফাতহ অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত সূরায় মক্কা বিজয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এবং সূরা নাসরে বিজয়ের কথা স্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

তাবুক যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা তওবার বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) শুধুমাত্র একটি যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন আর তা হচ্ছে উহুদ যুদ্ধ। ফিরিশতাগণ তাঁর (সাঃ) সাথে থেকে বদর, উহুদ এবং হুনাইন যুদ্ধে একসাথে যুদ্ধ করেছেন। আর খানদাক্ব যুদ্ধে ফিরিশতাগণ অবতরণ করে মুশরিকদেরকে প্রকম্পিত ও পরাজিত করেন। এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মুষ্টি পাথরকুচি নিয়ে মুশকরিকদের মুখমন্ডলে নিক্ষেপ করলে তৎক্ষনাৎ তারা পলায়ন করে।

মুসলমানদের দুটি যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয় ঃ ১। বদর। ২। হুনাইন।

রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধ, সামরিক অভিযান ও সারিয়্যাহসমূহ এর সংক্ষিপ্তরূপ	রাসূলে কারীম (সাঃ) ত্বায়িফের যুদ্ধে মিনজানিক (প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ) যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে যুদ্ধ করেছেন। তিনি পরিখা খনন করে আহযাব যুদ্ধে নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। সালমান ফারেসী (রাঃ) তাঁকে উক্ত পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

রাসূল (সাঃ) এর
অসুস্থতা ও মৃত্যু

অতঃপর,আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়নবী (সাঃ)-কে দুনিয়া এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যমে জান্নাত প্রাপ্তি, এ দুয়ের মাঝে কোন একটিকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেন। তিনি তাঁর সাক্ষাৎপ্রাপ্তির মাধ্যমে জান্নাত লাভকে নিজের জন্য বেছে নেন। ফলে তিনি প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন । সেবাশুশ্রূষা গ্রহণের জন্য স্ত্রীগণের নিকট আয়েশা (রাঃ) এর বাড়িতে অবস্থান করার অনুমতি চাওয়া হয়, ফলশ্রুতিতে সকলই অনুমতি দিয়ে দেন। অতঃপর যখন তিনি অসুস্থতার কারনে মাসজিদে জামাতে নামাজ পড়তে অক্ষম হন,তখন আবু বকর (রাঃ) কে লোকদের ঈমামতি করার আদেশ দেন। এবং এই আদেশ রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর পর খেলাফতগ্রহণে আবু বকর (রাঃ) এর অগ্রাধিকারপ্রাপ্তির ইঙ্গিত বহন করে।

একাদশ হিজরীর ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার আবূ বাকর (রাঃ)-এর ইমামতিতে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যখন ফজরের সালাতরত অবস্থায় ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরের পর্দা সরান এবং দরজা খুলে সালাতরত সাহাবীগণ (রাঃ) কে অবলোকন করেন। (আকস্মিকভাবে রাসূল (সাঃ) এর আগমন অনুভব করায় সাহাবাগণ (সাঃ)-কে তাঁর শারীরিক অবস্থাদি জিজ্ঞাসার জন্য সালাত ভঙ্গ করে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতের ইশারায় সালাত পূর্ণ করে নিতে বলেন। অতঃপর তাদের জন্য মৃদু হাসেন। অতঃপর যখন পূর্বাহ্নের সময় হলো, নাবী (সাঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন । তাঁর মৃত্যু ছিল মুসলমানদের উপর বৃহত্তর বিপদ, যা তাদেরকে কঠিন আকারে বিষন্নিত করে ফেলে। মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কেরাম আবু বকর (রা:) এর নিকট একত্রিত হয়ে হাতে হাত রেখে খেলাফতের বায়াত গ্রহণ করেন। সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রবর্তীতা এবং নবী (সাঃ) এর পর সকল উম্মতের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ জানার ফলে তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করা থেকে কেউ পশ্চাদগামিতা প্রদর্শন করেন নি।

অতঃপর, রাসূল (সাঃ) কে গোসল এবং তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন পরানো হয়। অতঃপর তাঁকে আয়েশা (রাঃ) এর গৃহের যে স্থানে তিনি মৃত্যুবরন করেন সেখানেই দাফন করা হয়। নবীদেরকে মৃত্যুস্থলেই দাফন করা আল্লাহ তায়ালার একটি সুন্নাত। জ্বিন ও মানুষ সকলই আমার প্রভুর দরুদ ও সালাম তাঁর উপর বর্ষণ করুন। আমরা তাঁর যথোপযুক্ত আমানত আদায়, উম্মতকে সদুপদেশ প্রদান এবং আল্লাহর পথে যথার্থভাবে সংগ্রামীতার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করছি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উম্মতের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদানস্বরুপ প্রতিদান দান করুন। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগৎ এর প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদিত।

পরিশিষ্ট

রাসূল (সাঃ) এর কবি হাসসান বিন সাবেত (রাঃ) বলেন ঃ

১। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে আমাদের নবীর সাথে হিংসুকদের আঁখি বিদূরিত জান্নাতে একত্রিত করুন।

২। হে মহামহিম, মহান ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী তুমি আমাদেরকে একত্রিত করো জান্নাতুল ফেরদৌসে। আর তা আমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখো।

৩। আল্লাহ তায়ালার, তাঁর আরশের চারপাশে বিরাজমান (ফেরেশতাগণের) এবং পুণ্যশীল (আত্মাদের) দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, বরকতময় অধিক প্রশংসিত সত্ত্বার উপর।

তৃতীয় প্রশ্নপত্র

প্রশ্ন	সত্য	মিথ্যা
১। রাসূল (সাঃ) এর বকরী লালনপালন করা কাজই তাকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল, অপারগদের প্রতি যত্নবান এবং দয়ালু হিসেবে পরিণত করেছে।	☐	☐
২। রাসূল (সাঃ) এর ৪০ বছর পূর্ণকালে তাঁর উপর নবুয়তের আলো প্রদীপ্ত হয়। এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সোমবার দিন তাঁর রিসালাত প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন।	☐	☐
৩। কুরাইশরা রাসূল (সাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে তিন বছর আবু তালেবের গিরিপথে অবরুদ্ধ করে নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। এ অবরুদ্ধ থেকে বের হওয়ার সময় রাসূল (সাঃ) এর বয়স ৪৯ বছর ছিল।	☐	☐

১। রাসূল (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন? ১. মক্কায় ☐ ২. হস্তী যুদ্ধের বছরে ☐ ৩. হিজরতের ৫৩ বছর পূর্বে ☐ ৪. উপরের সবকটিই ☐

২। কিসের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) এর উপর ওহী নাযিল আরম্ভ হয় : ১. তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় করা মাধ্যমে ☐ ২. সত্য স্বপ্ন ☐ ৩. উপরোক্ত সবকটিই ☐

৩। ওহীর স্তর কয়টি : ১. পাঁচটি ☐ ২. সাতটি ☐ ৩. তিনটি ☐

৪। রাসূল (সাঃ) এর দাওয়াত ও তাবলীগের স্তর কয়টি? ১. দু'টি ☐ ২. তিনটি ☐ ৩. পাঁচটি ☐

৫। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বশরীর ও রুহ সহকারে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নৈশভ্রমণ করানো হয়। এবং সাত আসমানের উপর দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ..... আল্লাহর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালে তাঁকে সম্মোধন করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেন।

১. শুধুমাত্র স্বশরীরে ☐ ২. রুহ সহকারে ☐ ৩. স্বশরীর ও রুহ সহকারে ☐

৬। ইসলাম ধর্মের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? ১.মাসজিদুল হারাম ☐ ২. নববী ☐ ৩.আক্বসা ☐ ৪.ক্বুবা ☐

৭। ক্বেবলা পরিবর্তিত হয়েছে : ১. হিজরতের পূর্বে মক্কায় ☐ ২. হিজরীর ২য় বর্ষ ☐ ৩. হিজরীর ৩য় বর্ষ ☐

৮। বদর যুদ্ধ কোন বছরের রমযান মাসে সংঘটিত হয়? ১. হিজরীর ২য় বর্ষে ☐ ২. হিজরীর ৩য় বর্ষে ☐

রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তিবর্গ :	আলি বিন আবু তালিব	বেলাল বিন রেবাহ	যায়েদ বিন হারিসা	আবু বকর সিদ্দিক
১। পুরুষদের মাঝে	☐	☐	☐	☐
২। শিশুদের মাঝে	☐	☐	☐	☐
৩। আযাদকৃত গোলামদের মাঝে	☐	☐	☐	☐
৪। দাস-দাসীদের মাঝে	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) এর ভরণ-পোষণ:	আবু তালিব	আব্দুল মুত্তালিব	প্রায় আট বছর	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব	সাত বছর
১। মা আমেনার পর তাঁর দাদা দায়িত্বভার গ্রহণ করেন:	☐	☐	☐	☐	☐
২। দাদার মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল:	☐	☐	☐	☐	☐
৩। তারপর তাঁর চাচা দায়িত্বভার গ্রহণ করেন	☐	☐	☐	☐	☐
৪। রাসূল (সাঃ) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন কার মৃত্যু হয়:	☐	☐	☐	☐	☐
৫। কত বছর বয়স পূর্ণ না হতেই মা মৃত্যুবরণ করেন:	☐	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সামরিক অভিযানসমুহ:	দশ বছর	ষাট	সাতাইশ	নয়টি	একটি যুদ্ধ
১। রাসূল (সাঃ) এর সকল যুদ্ধ, সামরিক অভিযান ও সারিয়্যা হিজরতের পরবর্তী কত বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়:	☐	☐	☐	☐	☐
২। সারিয়্যা ও সামরিক অভিযানের সংখ্যা প্রায় কতটি:	☐	☐	☐	☐	☐
৩। রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধ-বিগ্রহের সংখ্যা:	☐	☐	☐	☐	☐
৪। রাসূল (সাঃ) স্বশরীরে যুদ্ধ করছেন করেছেন :	☐	☐	☐	☐	☐
৫। রাসূল (সাঃ) আহত হয়েছেন:	☐	☐	☐	☐	☐



المختصر المفيد
السيرة النبي المصطفى شهاله

بقلم الفقير إلى عفوربه:
هيثم بن محمد سرحان

المدرس بمعهد الحرم بالمسجد النبوي سابقا
والمشرف على موقع التأصيل العلمي

http://www.alsarhaan.com

غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب

জনসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়

شرح متن

الدُّروس المهمَّة لعامَّة الأُمَّة

মূল লেখক:

গ্র্যাণ্ড মুফতী শাইখ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহি.)

সংকলন ও রচনায়

শাইখ হাইছাম বিন জামীল সার্‌হান

শিক্ষক, মা'হাদুল হারাম, মাসজিদ নাববী

http://attasseel-alelmi.com

আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর পিতা-মাতা এবং এ বইটি প্রকাশ করতে যারা সহযোগিতা করেছেন সকলকে ক্ষমা করুন- আমীন

شرح متن
الدُّروس المهمَّة لعامَّة الأمَّة

للشَّيخ الإمام: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله وأسكنه فسيح جنَّاته

اعتنى به فضيلة الشَّيخ
هيثم بن محمَّد جميل سرحان
المدرِّس بمعهد الحرم بالمسجد النَّبويِّ -سابقًا- والمشرف على موقع التَّأصيل العلميِّ
http://attasseel-alelmi.com

غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب

সূচীপত্র

ভূমিকা ৬

- আমরা কেন এই ''গুরুত্বপূর্ণ পাঠসমূহ '' বইটি অধ্যয়ন করবো? ৬
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ" গ্রন্থটিতে কি কি বিষয় রয়েছে? ৭
- উলামাগণ তাদের লেখনির সূচনায় বিসমিল্লাহ দিয়ে আরম্ভ করেন? ৭

প্রথম পাঠ : ৮-৯

- একজন ছাত্র তাফসীরের কোন বই সর্বপ্রথম পড়া শুরু করবে? ৮
- এই তাফসীরটি কেন পড়বেন? ৮
- কুরআনের আলোকে মানুষ কত প্রকার? ৯

গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূরার তাফসীর: ১০-৩৯

সূরা ফাতিহার তাফসীর, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। ১০
আয়াতুল কুরসীর ব্যাখ্যা ১৪
সূরা আল যিলযাল এর তাফসীর ১৬
সূরা আল আদিয়াত এর তাফসীর ১৭
সূরা আল ক্বরিয়া এর তাফসীর ১৯
সূরা আত-তাকাছুর এর তাফসীর ২১
সূরা আল আছর এর তাফসীর ২৩
সূরা আল হুমাযাহ এর তাফসীর ২৪
সূরা আল-ফীল এর তাফসীর ২৬
সূরা আল কুরাইশ এর তাফসীর ২৭
সূরা আল মাউন এর তাফসীর ২৮
সূরা আল কাউসার এর তাফসীর ৩০
সূরা আল কাফিরুনের তাফসীর ৩১
সূরা আন-নাছর এর তাফসীর ৩২
সূরা আত-তাব্বাত এর তাফসীর ৩৪
সূরা আল ইখলাস এর তাফসীর ৩৫
সূরা আল-ফালাক্ব এর তাফসীর ৩৭
সূরা আন-নাস এর তাফসীর ৩৮
ভূমিকা ও তাফসীর পর্বের প্রশ্নপত্র ৪০

দ্বিতীয় পাঠ: ৪৩-৫০

- কালিমার রুকুন সমূহ। ৪৪

- কালিমার শর্তসমূহের উপর ব্যাখ্যা ৪৪
- ভালোবাসা এর প্রকারভেদ ৪৬
- দাসত্বের প্রকারভেদ ৪৭
- নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৪৭

তৃতীয় পাঠ : ৫১-৫৬

- ঈমানের রুকণসমূহ ৫১
- ঈমানের শারয়ী সংজ্ঞা ৫১
- ঈমান বৃদ্ধির উপায়সমূহ ৫২
- ঈমান কমতির কারণসমূহ ৫২

চতুর্থ পাঠ : ৫৭-৬১

- ✓ তাওহীদ ও শিরকের প্রকারভেদ ৫৭
- ✓ বড় শির্ক ও ছোট শির্কের পার্থক্য ৬১

পঞ্চম পাঠ: ইহসান: ৬২-৬৭

- ইহসানের পরিচয় ৬২
- তাওহীদ বিষয়ক প্রশ্নমালা ৬৩

ষষ্ঠ পাঠ : সলাতের শর্তসমূহ ৬৮-৭১

সপ্তম পাঠ : সলাতের রুকনসমূহ ৭২-৭৪

অষ্টম পাঠ : সলাতের ওয়াজিবসমূহ ৭৫

নবম পাঠ : তাশাহ্হুদের বর্ণনা ৭৬-৭৭

দশম পাঠ : সলাতের সুন্নাতসমূহ ৭৮-৮০

একাদশ পাঠ : ৮১-১০২

- সলাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ ৮১
- বিশেষ সতর্কীকরণ ৮২
- সাহু সাজদাহ ৮৩
- **সংক্ষিপ্তাকারে ছবিসহ সলাত আদায়ের পদ্ধতি ৮৪**
- বিশেষ সতর্কতা ৯৪
- বিভিন্ন সলাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৯৫
- সাধারণ নফল সলাতের নিষিদ্ধ সময়সমূহ ৯৭
- সলাত সম্পর্কিত প্রশ্নমালা ৯৮

দ্বাদশ পাঠঃ ১০৩-১০৪

○ওযুর শর্তসমূহ ১০৩
○কতিপয় শর্তের ব্যাখ্যা ১০৪
○স্বভাবগত সুন্নাতসমূহ ১০৪

ত্রোয়াদশ পাঠ : ওযুর ফরয ১০৫

চতুর্দশ পাঠ : ১০৬-১১৬

- ওযু ভঙ্গের কারণ ১০৬
- ওযুর পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত রূপ ১০৮
- ইসলামের রুকুনসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সংযোজন ১১১
- তায়াম্মুম ১১১
- ওয়াজিব গোসলের পদ্ধতি ১১২
- সুন্নাত গোসলের পদ্ধতি ১১২
- যে কারণে গোসল ওয়াজিব হয় ১১২

○ মোজার উপর মাস্হের শর্তসমূহ ১১৩
○ মোজার উপর মাসাহ করার পদ্ধতি ১১৩
○ পেশাব পায়খানার আদবসমূহ ১১৪
○ পবিত্রতা বিষয়ক প্রশ্নাবলী ১১৫

দ্বিতীয় পর্বঃ যাকাতঃ ১১৭-১২৬

○ যাকাতের হকদারগণ ১১৮
○ গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ ১১৯
○ যাকাতের পরিমাণ ১২০

✓ যাকাতের পর্বের প্রশ্নসমূহ ১২৩

তৃতীয় পর্বঃ সিয়ামঃ ১২৭-১৩

রোযার রুকনসমূহ ১২৭
সিয়াম বা রোযার প্রকারভেদ ১২৭
সিয়াম ভঙ্গকারী কারণসমূহ ১২৯

- যাকাতুল ফেতরার পরিমাণ ১৩৩
- ঈদের সলাত ১৩৩

✓ সিয়াম পর্বের প্রশ্নপত্র ১৩৪

চতুর্থ পর্ব: হজ্জ : ১৩৭-১৪৮

- হজ্বের প্রকারসমূহ ১৩৭
- হজ্জের ওয়াজিবসমূহ ১৩৮
- হজ্ব-উমরার মীকাতসমূহ ১৩৮
- হজ্বের মুস্তাহাব আমলসমূহ ১৩৯
- ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ ১৪০
- হাজ্জের দিনগুলোর নামসমূহ ১৪১
- হাজ্জে দু'আ করার পাঁচটি স্থান ১৪১
- হাজ্জ ও উমরার পদ্ধতি ১৪২

✓ হজ্জ পর্বের প্রশ্নপত্র ১৪৬

পঞ্চদশ পাঠ : প্রত্যেক মুসলিমকে শারয়ী চরিত্রবান হওয়া ১৪৯

ষষ্ঠদশ পাঠ : ইসলামী শিষ্টাচারে শিষ্ট হওয়া ১৫০

সপ্তদশ পাঠ : শিরক ও পাপসমূহ হতে সতর্ক করা ১৫৩
হারজিত খেলায় প্রতিযোগিতা করার হুকুম ১৫৪

অষ্টদশ পাঠ : ১৫৫-১৬৩

- চতুর্থ: মৃত্যু ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি ১৫৫
- পঞ্চম: মৃত্যু ব্যক্তিকে কাফন পরানো ১৫৫
- সপ্তম: মৃত ব্যক্তির জানাযার সলাতের পদ্ধতি ১৫৬
- অষ্টম: মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পদ্ধতি ১৫৯

➢ কবর যিয়ারতের প্রকারভেদ ১৬১

✓ পূর্বে যা আলোচিত হয়েছে তার প্রশ্নপত্র ১৬২

ভূমিকা

শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রহিমাহুল্লাহ বলেন,

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতি পালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। সুপরিনাম মুত্তাকীনদের (আল্লাহভিরুদের) জন্য। আল্লাহ তা'আলা রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন তাঁর বান্দা-রাসূল ও আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি এবং তাঁর বংশধর ও সকল সাহাবীদের প্রতি।

অতঃপর, দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যে সমস্ত বিষয়গুলোর জ্ঞানার্জন সকলের জান্য ওয়াজিব বা আবশ্যক, তার কতিপয় বিষয়ের বিবরণে এটি একটি সংক্ষিপ্ত বাণী এবং আমি তার নামকরণ করেছি, **"সর্বসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পাঠসমূহ"**।

আর আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন এর দ্বারা মুসলিম জাতিকে উপকৃত করেন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করেন। নিশ্চয় তিনি উদার ও সম্মানিত। - আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহি.)

আমরা কেন এই "গুরুত্বপূর্ণ পাঠসমূহ" বইটি অধ্যয়ন করবো?

কেননা এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমনটি লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তার নাম দিয়েছেন এবং আলেমগণও এর অধ্যয়নের সৎপরামর্শ দিয়েছেন।

কেউ যদি বলে: হ্যাঁ: জনসাধারণের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমি তো একজন ছাত্র!!!

উত্তর: আমরা তাকে এ পুস্তকটির বিষয়বস্তুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব যদি তার উত্তর দিতে না পারে, তাহলে সাধারণ মানুষই তার চেয়ে উত্তম। বিদ্যা ও বিদ্যানদের উপর নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা আমাদের জন্য সমীচিন নয়। আর রব্বানী আলেমদের পথ অনুরসরণ করবে। সহীহ বুখারীতে এসেছে ইমাম মুজাহিদ (র:) বলেন: লজ্জাবোধকারী ও অহংকারকারী ইলম অর্জন করতে পারে না।

“গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ” গ্রন্থটিতে কি কি বিষয় রয়েছে?

১. আল কুরআনুল কারীম পাঠ করা, মুখস্ত করা, গভীরভাবে চিন্তা করা ও আমল করার ক্ষেত্রে সালফে সালেহীন ও তাঁদের পরবর্তী অনুসারীদের পন্থা অনুকরণ করা সম্পর্কীয় আলোচনা।

২. ইসলাম, ঈমান, ইহসান, তাওহীদ ও শিরকের প্রকার সমূহের বিবরণ।

৩. সলাতের বিবরণ।

৪. অযুর বিবরণ।

৫. শারয়ী চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া এবং ইসলামী শিষ্টাচারে শিষ্ট হওয়া।

৬. শিরক ও পাপ হতে সতর্ক করা।

৭. মৃত ব্যক্তির কাফন, জানাযার সলাত ও দাফন।

উলামাগণ তাদের লেখনির সূচনায় বিসমিল্লাহ দিয়ে আরম্ভ করেন?

- সূচনায় আল্লাহর নামের বরকত কামনার প্রত্যাশায়
- পূর্ববর্তী সৎ ও পরহেজগার ব্যক্তিবর্গের অনুসরণের জন্য
- হাদীসের অনুসরণের জন্য কেননা, প্রতিটি কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করতে হয় যদিও হাদীসটি দুর্বল সুত্রে বর্ণিত
- মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম ও নবী-রসূলগণের অনুসরণের জন্য

الدَّرس الأوَّل
প্রথম পাঠ

সূরা ফাতিহা ও ছোট সূরাসমূহ হতে যেমন সূরা আল যিলযাল থেকে সূরা আন-নাস পর্যন্ত বিশুদ্ধভাবে পড়া ও মুখস্ত করার ক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়া এবং যে বিষয় গুলো জানা জরুরী তা ব্যাখ্যা করা। যেমন সালফে সালেহীনগণ প্রত্যেক দিন ১০ টি আয়াত মুখস্ত করা সাথে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও পড়া (যেমন সংক্ষিপ্ত তাফসীর হতে ইবনে সা'দী) এবং তদানুযায়ী আমল করার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।

ব্যাখ্যাঃ

প্রত্যেকের উচিত হবে ইবনে সা'দী এর সংক্ষিপ্ত তাফসীর হতে ব্যাখ্যাসহ সালফে সালেহীনদের ন্যায় প্রতিদিন দশটি আয়াত তেলাওয়াত ও মুখস্ত করা উচিত। আর তদানুযায়ী আমল করার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।

একজন ছাত্র তাফসীরের কোন বই সর্বপ্রথম পড়া শুরু করবে?

শাইখ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস সা'দী কর্তৃক লিখিত **"তাইসীরুল কারীমীর রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান"** বইটি দিয়ে পড়া শুরু করবেন।

এই তাফসীরটি কেন পড়বেন?

কেননা লেখক (রহ.) তাওহীদের বিষয়ে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন।	তা আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত কুরআনের আলোকে আমল করতে সহায়তা করে	কেননা তার ভাষা সহজ ও সুস্পষ্ট যার মাঝে কোন জটিলতা নেই।	এটি সংক্ষিপ্ত তাই প্রাথমিক পাঠকদের জন্য উপযুক্ত	কেননা আলেমগণ এই তাফসীর পড়ার পড়ামর্শ দিয়েছেন।

কুরআনের আলোকে মানুষ কত প্রকার?

- কিছু মানুষ কুরআনকে পরিত্যাগ করেন (এখানে পরিত্যাগ কথাটি কুরআন পাঠ না করা, মুখস্ত না করা, বিশ্লেষণ না করা, আমল না করা এবং তা দ্বারা আরোগ্য লাভের চেষ্টা না করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।
  - কুরআন পাঠ না করা
  - মুখস্ত না করা
  - বিশ্লেষণ না করা
  - আমল না করা
  - আরোগ্য লাভের চেষ্টা না করা
- কিছু মানুষ শুধু কুরআন পাঠ করেন, মুখস্ত করেন আমল ও বিশ্লেষণ ছাড়াই।
- কিছু মানুষ নিয়মিতভাবে কুরআন পড়েন ও মুখস্ত করেন এবং তদানুযায়ী আমল ও গবেষণা করতে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। আর ইহাই সালফে সালেহীন ও যারা তাঁদের অনুসরণ করেন তাদের পথ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾

(রাসূল ﷺ বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে।) আর নাবী ﷺ বলেন, এ ব্যক্তির বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দীন হতে তারা এমনভাবে বেরিয়ে পড়বে যেমনি ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে আর মূর্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা হতে অব্যাহতি দেয়। আমি যদি তাদের পেতাম তাহলে তাদেরকে আদ জাতির মত অবশ্যই হত্যা করতাম। *(সহীহুল বুখারী হা/৩৩৪৪)*

আল্লামা আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দী (রহ.) কর্তৃক রচিত (تيسير الكريم الرَّحمن في تفسير كلام المنَّان) 'তাইসীরুল কারীমির রহমান ফি তাফসীরি কালামিন মান্নান' হতে **চয়নকৃত তাফসীর ও প্রশ্ন**

সূরা ফাতিহার তাফসীর, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ।

(بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝١ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٣ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۝٧)

১. (আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। ২. যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য। ৩. যিনি করুণাময় ও কৃপানিধান। ৪. যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। ৫. আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬. আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর। ৭. তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট।

---

১. অর্থাৎ: আমি আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেক নাম দ্বারা শুরু করছি। কেননা (ইসম) শব্দটি এক বচন ও আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাই সমস্ত আসমা হুসনাকে শামিল করেছে। (ٱللَّهِ) তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ইবাদতের হক্বদার মা'বূদ, কেননা তিনি ইবাদতের গুণে গুণান্বিত। আর তা হলো পূর্নাঙ্গ গুণ। (ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ) এ নাম দু'টি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ এমন মহা প্রশস্ত দয়ার মালিক যা সবকিছুতেই ব্যাপকতা ও বিস্তার হয়েছে, প্রত্যেক জিনিসকে শামিল করেছে এবং নাবী ও রাসূলগণের মুত্তাকী অনুসারীদের জন্য তা অপরিহার্য করেছেন তাই এই ব্যাপক দয়া তাদেরই জন্য, আর অন্যান্যদের জন্য তা হতে অংশ রয়েছে।

আপনি জেনে রাখুন : সালফে সালেহীন ও ইমামদের মধ্যে এই ব্যাকরণের উপর ঐক্যমত পোষণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর নামসমূহ, সিফাত সমূহ ও উহার বিধি-বিধানের উপর ঈমান আনা। তাই তাঁরা ঈমান রাখে যে, নিশ্চয় তিনি রহমান ও রহীম। তিনি এমন দয়াশীল যা দ্বারা তিনি বিশেষিত, সেই দয়া রহমকৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং সমস্ত নিয়ামত তাঁর দয়ার পরিচয় বহন করে। আর অনুরূপভাবে সমস্ত নামসমূহের ক্ষেত্রেও । যেমন তাঁর নাম আল 'আলীম এ বলা হবে: নিশ্চয় তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারী যা দ্বারা সমস্ত কিছু জানেন। তিনি আলক্বাদীর এমন শক্তিধর, সবার উপর শক্তিমান।

২. (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ) তা হলো পূর্ণগুনের মাধ্যমে এবং অনুগ্রহ ও ন্যায়ের মাঝে আল্লাহর চলমান কর্মের দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করা, সুতরাং সর্বদিক থেকে তাঁর পূর্ণ প্রশংসা।

(رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ) : তিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালনকারী, তারা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সমস্ত সৃষ্টি যাদের জন্য আল্লাহ সমস্ত কিছু তৈরি করেছেন, তাদের প্রতি সে সব বড় নিয়ামত দান করেছেন, যদি তারা তা হারিয়ে ফেলতো তাহলে কখনো তারা অবশিষ্ট থাকতো না। সুতরাং তাদের মধ্যে যেকোন নিয়ামত তারই পক্ষ হতে। আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজীবকে দুই পন্থায় প্রতিপালন করে থাকেন: ১. সাধারণ ২. বিশেষ।

১. সর্ব সাধারণ হলো: সবাইকে সৃষ্টি করা রিযিক দান করা এবং দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য যা কিছুতে তাদের মঙ্গল রয়েছে তার পথ নিদের্শনা করা।

২. আর বিশেষ প্রতি পালন হচ্ছে: তাঁর ওলীদের প্রতিপালন করা, তাই তিনি তাদেরকে ঈমান দ্বারা প্রতিপালন করেন ও তাদেরকে তাঁর তাওফীক দান করেন এবং তাদেরকে পরিপূর্ণ করেন, আর তাঁর ও তাদের মাঝের যাবতীয় বাধাসমূহকে দূর করেন। আর তার প্রকৃত রূপ হচ্ছে: প্রত্যেক কল্যাণের তাওফীকের জন্য এবং প্রত্যেক খারাপ হতে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিপালন করা। আর সম্ভবত এই অর্থই হচ্ছে নবীদের অধিকাংশ দু'য়া (আর্ রব্ব) শব্দ দিয়ে হওয়ার গোপন তথ্য। কেননা তাদের সমস্ত প্রার্থনায় তাঁর বিশেষ প্রতিপালনের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং আল্লাহর বাণী: (رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ) প্রমাণ করে যে, তিনি (আল্লাহ) একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক, নিয়ামত দাতা এবং তিনি অমুখাপেক্ষি আর সমস্ত সৃষ্টি সর্ব দিক থেকে তাঁরই মুখাপেক্ষি।

৪. (مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ) আল মালিক: সেই সত্তা যিনি মালিকানার গুণে গুনান্বিত যে তিনি আদেশ ও নিষেধ করেন ও প্রতিদান ও শাস্তি দেন এবং তাঁর মালিকানায় যে ইচ্ছা সে ভাবেই পূর্ণ পরিচালনা ও তাতে হস্তক্ষেপ করেন। আর মালিকানাকে এখানে কিয়ামত দিবসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সে দিবস হলো যে দিন মানুষকে তার ভাল-মন্দ আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। কেননা সেই দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে আল্লাহ এর পূর্ণ মালিকানা, ন্যায় বিচার ও প্রজ্ঞা এবং সৃষ্টিকূলের সমস্ত মালিকানা শেষ হওয়া পূর্ণ প্রকাশ পাবে। এমনকি সেই দিন রাজা-প্রজা, স্বাধীন-পরাধীন সকলেই সমান। সকলেই তারা আল্লাহর বড়ত্বের স্বীকৃতি দিবে, তাঁর সম্মানের প্রতি অবনত হবে এবং তাঁর প্রতিদানের জন্য অপেক্ষা করবে। তাঁর সাওয়াবের প্রত্যাশি হবে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করবে। এজন্য তিনি এই দিনকে খাস করে উল্লেখ করছেন। অন্যথায় তিনি সেই দিন এবং অন্যান্য দিনেরও মালিক।

৫. আল্লাহর বাণী : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) অর্থাৎ : আমরা একমাত্র আপনাকেই ইবাদত ও সাহায্যের জন্য নির্দিষ্ট করছি। কেননা, আরবী ব্যাকরণে যদি (মাফউল) কর্মকৃতকে (ফায়েল) এর প্রথমে আনা হয় তাহলে তা নির্দিষ্ট করনের অর্থ দিবে। আর তা হলো: উল্লেখিত বিধানটি তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করা এবং অন্যদের থেকে দুরিভূত করা। যেন ব্যক্তি একথার স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, আমরা আপনারই ইবাদত করি, অন্য কারো ইবাদত করি না। আর আপনার ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য কামনা করি না। আর এখানে ইবাদতকে সাহায্যের উপর আনা হয়েছে 'আম (ব্যাপক) শব্দকে খাস (নির্দিষ্ট) শব্দের আগে আনার ভিত্তিতে এবং আল্লাহর হক্বকে বান্দার হক্বের আগে আনার গুরুত্ব দেওয়ার ভিত্তিতে।

আর ইবাদত বলা হয় : العبادة: (اسمٌ جامعٌ لما يحبُّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال (الظَّاهرة والباطنة) অর্থাৎ প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন সব ইবাদত যেগুলোর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা অর্জন করা যায় তাকে ইবাদত বলা হয়।

আর ইসতি'আনাহ হলো: الاستعانة هي: (الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضارِّ، مع الثِّقة به في تحصيل ذلك) অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য কামনা করা আর সেটি হচ্ছে কল্যাণকর বস্তু অর্জন করার ক্ষেত্রে এবং অকল্যাণকর বস্তু দূরিভীত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার উপর দৃঢ় আস্থা রাখা।

আল্লাহর ইবাদত করাতে ও তাঁর নিকটেই সাহায্য চাওয়াতেই রয়েছে চিরস্থায়ী সুখ এবং সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্তিদান। সুতরাং এই দুটিকে বাস্তবায়ন করা ছাড়া মুক্তির কোন পথ নাই। আর ইবাদত তখনোই ইবাদত বলে গন্য হবে যদি তা রাসূল ﷺ থেকে গ্রহণ করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এই দুই শর্তের ভিত্তিতে তা ইবাদত বলে গন্য হবে। উক্ত আয়াতে ইবাদত উল্লেখ করার পর সাহায্য শব্দ নিয়ে আসার কারণ হলো যে, বান্দা তার সমস্ত ইবাদতে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষি। কেননা আল্লাহ যদি তাকে সাহায্য না করে তাহলে তার পক্ষে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পালন করা সম্ভব হবে না। অতঃপর আল্লাহ বলেন:

৬. (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) অর্থাৎ : আপনি আমাদেরকে সিরাতুল মুসতাকীম এর পথ দেখান ও তাওফীক দান করুন। আর তা হলো ঐ সমস্ত পথ যা আল্লাহ ও জান্নাতের দিকে পৌছায়। আর তা হলো হক্বকে জানা ও তার প্রতি আমল করা। তাই আপনি আমাদের সিরাতের দিকে ও পানে পথ প্রদর্শন করুন। সুতরাং সিরাতের হেদায়াত পাওয়ার অর্থ হলো: সমস্ত ধর্মকে পরিত্যাগ করে একমাত্র ইসলামকে আঁকড়ে ধরা। আর সিরাতের হেদায়াত দ্বীনের সার্বিক বিষয়সমূহকে জ্ঞানার্জন ও আমল করার ভিত্তিতে অন্তর্ভূক্ত করে। এই দু'আটি বান্দার জন্য সর্বোত্তম দু'আ। তাই বান্দার প্রতি কর্তব্য যে, সে সলাতের প্রতি রাকাআতে এর দ্বারা আল্লাহর নিকট তার নিজ প্রয়োজনে প্রার্থনা করবে। আর এটাই হলো সেই প্রার্থনা যা সিরাতুল মুসতাকীম তথা সঠিক পথের দিশা।

৭. (صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم) তাঁদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন তাঁরা হলেন : নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ। কিন্তু (ٱلمَغضُوبِ عَلَيهِم) দের পথ না। তারা হলো ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা হক্ব জানার পর পরিত্যাগ করলো। যেমন ইয়াহুদীরা ও অনুরুপ যারা এবং (ٱلضَّآلِّينَ) দেরও রাস্তা না , তারা হলো : যারা হক্বকে পরিত্যাগ করেছে মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতায়। যেমন নাসারারা ও তাদের অনুরুপ যারা।

এই সূরাটি ছোট হওয়া সত্তেও এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছে যা কুরআনের অন্য সূরাতে নেই। যেমন- সূরাটি তাওহীদের তিন প্রকারকে অন্তর্ভূক্ত করেছে : তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ উল্লেখিত হয়েছে আল্লাহর এই বাণীতে (رَبِّ ٱلعَٰلَمِينَ) । তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ উল্লেখিত হয়েছে (ٱللَّهِ) শব্দে এবং (إِيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِينُ) আয়াতে। আর তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত হলো আল্লাহর জন্য ঐ সকল পরিপূর্ণ সিফাতগুলো সাব্যস্ত করা যেগুলো আল্লাহর সত্ত্বাকে সাব্যস্ত করে থাকে ও তাঁর রিসালাতকে সাব্যস্ত করেছে কোন ধরণের সাদৃস্য, সমকক্ষ ও পরিবর্তন ছাড়াই। আর এ বিষয়টি পূর্বে উল্লিখিত (আলহামদুলিল্লাহ) দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর আল্লাহর এই (ٱهدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلمُستَقِيمَ) বাণীতে তার নবীর নবুওয়াতের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। কেননা তা রিসালাত ব্যতীত অসম্ভব।

এবং আমলের প্রতিদানের কথা এসেছে আল্লাহর এই (مَٰلِكِ يَومِ ٱلدِّينِ) বাণীতে, আর প্রতিদান ন্যায় বিচারের সঙ্গে হবে। কেননা দ্বীন অর্থ হচ্ছে : ন্যায়ের সঙ্গে প্রতিদান দেওয়া। আর এই আয়াতটি প্রমাণ করে ভাগ্যের প্রতি এবং আরও প্রমাণ করে যে, বান্দা সত্যিকার আমলকারী, কিন্তু ফিরকা কাদারিয়া ও জাবরিয়া তার বিপরীত পোষন করে।

আর আল্লাহর এই বাণীতে (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) সমস্ত বিপথগামী দলের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা তা হলো হক্বকের জ্ঞানার্জন ও তার প্রতি আমল করা। আর প্রত্যেক বিদআতী ও পথভ্রষ্ট সেই সিরাতুল মুসতাকীমের বিরোধী। আর আল্লাহর এই (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) বাণীতে প্রমাণিত হয়েছে দ্বীনকে আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ করতে হবে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে। অতএব সমস্ত প্রশংসা সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য।

[تفسير آية الكرسيِّ আয়াতুল কুরসীর ব্যাখ্যা]

(ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾)

আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান। *(সূরা বাকারা-২৫৫)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, এই আয়াতটি কুরআনের সর্বোত্তম আয়াত। কেননা তা তাওহীদের ব্যাপক অর্থ ও আল্লাহর মহত্ব এবং অসীম গুণাবলীর আলোচনা করেছে। আল্লাহ বলেছেন: (ٱللَّهُ) তিনি এমন প্রভূ যার জন্য ইবাদতের সমস্ত অর্থই নির্দিষ্ট। আর তিনি ব্যতীত ইবাদত-বান্দেগীর কেউ যোগ্য না। তাই অন্যদের ইবাদত করা বাতিল। আর তিনি হচ্ছেন চিরঞ্জীব যার জন্য পূর্ণ জীবনের সমস্ত অর্থই নির্দিষ্ট। যেমন: শ্রবণ, দর্শন, ক্ষমতা ইচ্ছা ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর ক্ষেত্রে। অনুরূপ (ٱلْحَىُّ) এর মধ্যে তাঁর সমস্ত কর্মগত সিফাত প্রমাণিত। কেননা (ٱلْقَيُّومُ) তিনিই যিনি নিজেই প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত সৃষ্টি হতে অমুখাপেক্ষি। আর তিনিই সমস্ত সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এভাবে যে, তাদেরকে অস্তীত্ব দান করেছেন ও অবশিষ্ট রেখেছেন এবং সে ক্ষেত্রে যা কিছু তাদের প্রয়োজন তা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। তাঁর পূর্ণ জীবন ও নিজ প্রতিষ্ঠিত এমনই যে (لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ) তাঁকে কখনোই তন্দ্রা ও (وَلَا نَوْمٌ) ঘুম আসে না। কেননা এই দুইটি সৃষ্টিকে স্পর্শ করে তাদের দূর্বল ও অপারগতার কারণে। কিন্তু কখনো তা সেই মহান আল্লাহ তায়ালাকে স্পর্শ করতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, আসমান-যামীন ও উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সকলেরই তিনি মালিক। তাদের কেউ এই সীমা থেকে বের হতে পারবে না ﴿ إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴾

অর্থ: আসমানসমূহ ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তাই তিনি সকলেরই মালিক তাঁরই রয়েছে পূর্ণ মালিকানা-রাজত্ব, হস্তক্ষেপ। এবং তাঁর পূর্ণ মালিকানা এমনই যে, (يشفع عنده إلا بإذنه) কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারবে না। সুতরাং সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিগণ ও সুপারিশ কারীগন তাঁর বান্দা ও দাস । এবং যতক্ষন তিনি অনুমতি না দিবেন ততক্ষন তারা সুপারিশ করতে পারবে না (قل لله الشفاعة جميعا)

অর্থ: বলুন: সকল সুপারিশ আল্লারই মালিকানাধিন, আসমানসমূহ ও যমীনের মালিকানা তাঁরই।

(وَلَا نَوْمٌ) অর্থ: আল্লাহ তায়ালা সুপারিশের অনুমতি দিবেন শুধুমাত্র সে ব্যক্তির জন্য যার থেকে আল্লাহ সন্তুষ্ট। আল্লাহ সন্তুষ্ট হন শুধুমাত্র তাওহীদ ও তাঁর রাসূলগণের অনুসরণে। আর যে ব্যক্তি এরূপ না হবে তার জন্য কোন সুপারিশ নেই। অতঃপর তিনি তাঁর অগাদ জ্ঞানের কথা বলছেন যে, নিশ্চয় তিনি সমস্ত মাখলুকের ভবিস্যৎ বিষয়দী সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন এবং (وَمَا خَلْفَهُمْ) তাদের অতীতের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আর তাঁর নিকট কোন বিষয় কখনো গোপন থাকে না

﴿ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴾ অর্থ: চোখসমূহের খিয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে তা তিনি জানেন।

আর সৃষ্টি জীবের কেউ আল্লাহর জ্ঞানকে বেষ্টন করতে পারে না ﴿إِلَّا بِمَا شَآءَ﴾ তিনি নিজ ইচ্ছায় নাবী ও রাসূলদেরকে যা অবগত করেছেন শারঈ ও কদরের জ্ঞান হতে বস্তুত তা অতি অল্প যা তুলনাতীত।

যেমন: তাঁর নাবী-রাসূলগণ ও ফেরেশতাগণ বলেছেন: ﴿سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ﴾ এরপর আল্লাহ তাঁর মহত্ব-বড়ত্ব সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, আর তাঁর কুরসী সমস্ত আসমান-যমীন প্রশস্ত হয়েছে। আর অবশ্যই তিনি আসমান-যমীন ও উভায়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সকলকেই তিনি তাঁর শক্তি, নিয়ম ও পদ্ধতি দ্বারা হিফাযত করেছেন। অথচ তাঁর পূর্ণ বড়ত্ত, শক্তি ও ব্যাপক প্রজ্ঞার কারণে তাদের হিফাযত তাঁর নিকট কোন বোঝা নয় ও তাঁকে বিন্দুমাত্র অসুবিধায় পতিত করে না। আর তিনি ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ﴾ সমস্ত মাখলুকের উর্ধে স্ব-শরীরে এবং তিনি এমনই যে, সব কিছুকেই পরাভুত করেছেন আর সবাই তাঁর নিকট মাথা নত করেছে এবং কাঁধকে নমনীয় করেছে। এবং ﴿ٱلْعَظِيمُ﴾ তিনি হচ্ছেন এমন 'মাবূদ যিনি সমস্ত মহত্ব, সম্মান-মর্যাদা অন্তর্ভূক্ত করেছেন, এবং তাঁকে অন্তর সমূহ ভালবাসে, আর আত্মাসমূহ সম্মান প্রদর্শন করে, এবং প্রকৃত জ্ঞানীরা জানেন যে, কখনো কোন মহত্ব-বড়ত্ব তাঁর বড়ত্বের সমকক্ষ হতে পারে না। আর যে আয়াতে এই মহান অর্থ বহন করে সেই সর্বশ্রেষ্ট আয়াত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর যে ব্যক্তি আয়াতটি বুঝে ও গবেষণার সাথে পাঠ করবে তার অন্তর বিশ্বাস ও ঈমানে ভরে যাবে এবং শয়তানের অনিষ্ঠ হতে হেফাযত থাকবে।

ΞΞΞ

সূরা যিলযাল এর তাফসীর, মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾.

১. পৃথিবীকে যখন তার প্রচণ্ড কম্পনে কাঁপিয়ে দেয়া হবে, ২. পৃথিবী তার (ভেতরের যাবতীয়) বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে, ৩. এবং মানুষ বলবে 'এর কী হয়েছে?' ৪. সে দিন পৃথিবী তার (নিজের উপর সংঘটিত) বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, ৫. কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন, ৬. সে দিন মানুষ বের হবে ভিন্ন ভিন্ন দলে যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়, ৭. অতএব কেউ অণু পরিমাণও সৎ কাজ করলে সে তা দেখবে, ৮. আর কেউ অণু পরিমাণও অসৎ কাজ করলে সেও তা দেখবে।

(১-২) কিয়ামত দিবসে যা সংঘঠিত হবে আল্লাহ তা সংবাদ দিচ্ছেন। আর সেদিন পৃথিবী প্রকম্পিত ও ঝুকতে শুরু করবে যে, তার উপর যা কিছু দাঁড়িয়ে আছে তা পড়ে যাবে। অতঃপর পাহাড়সমূহ মিসমার হয়ে যাবে এবং টিলাগুলো সমান হয়ে যাবে এমনকি সেখানে কোন উঁচু-নিচু দেখা যাবে না। আর সেদিন যমীন সমস্ত খনিজ, মৃত্য সমূহকে তার পেট হতে বের করে ফেলবে।

(৩) (وَقَالَ الْإِنسَانُ) আর তার এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে মানুষ বলবে (مَا لَهَا) তার কি হয়েছে?

(৪-৫) (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ) সে দিন যমীন সংবাদ দিবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা সে আমল করেছে ভাল ও মন্দ হতে। যারা বান্দার আমল সমূহ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে তাদের মধ্যে পৃথিবীই হচ্ছে সাক্ষ্য প্রাদানকারীদের অন্তর্ভূক্ত। আর এর কারণ হচ্ছে

﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾﴾ অর্থাৎ তিনি পৃথিবীকে নির্দেশ দিবেন তার পৃষ্ঠে যা আমল করা হয়েছে তার বিবরণ দেওয়ার জন্য। পৃথিবী আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্য হবে না।

(৬) (يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ) যেদিন মানুষ বের হবে হাশরের ময়দানে (যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন। (أَشْتَاتًا) অর্থাৎ : ভিন্ন ভিন্ন দলে, (لِّيُرَوْا أَعْمَٰلَهُمْ) অর্থাৎ : আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দেখাবেন তারা যা ভাল-মন্দ আমল করেছে এবং তাদেরকে দেখাবেন পূর্ণ প্রতিফল।

(৭-৮) (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ) আর এটি সমস্ত ভাল-মন্দকে অন্তর্ভূক্তকারী। কেননা যখন সে বিন্দু পরিমাণ আমল দেখতে পাবে যা একবারেই তুচ্ছ, যদি এরও প্রতিফল দেওয়া হয় তাহলে এর চেয়ে বড় অপরাধগুলোর জন্য প্রতিফল দেওয়া বেশি উপযুক্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا)، (وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا) অর্থাৎ : আর এখানে সামান্যতম ভাল কর্মের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং বিন্দু পরিমাণ মন্দ কর্মের জন্য ভিতি প্রদান করা হয়েছে।

[تفسير سورة العاديات وهي مكّيّةٌ]
সূরা আল আদিয়াত এর তাফসীর: মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا ۝١ فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًا ۝٢ فَٱلْمُغِيرَٰتِ صُبْحًا ۝٣ فَأَثَرْنَ بِهِۦ نَقْعًا ۝٤ فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا ۝٥ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ ۝٦ وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝٧ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝٨ ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ ۝٩ وَحُصِّلَ مَا فِى ٱلصُّدُورِ ۝١٠ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌۢ ۝١١).

১. শপথ সেই (ঘোড়া) গুলোর যারা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়, ২. অতঃপর (নিজের ক্ষুরের) ঘর্ষণে আগুন ছুটায়, ৩. অতঃপর সকালে হঠাৎ আক্রমণ চালায়, ৪. আর সে সময় ধূলি উড়ায়, ৫. অতঃপর (শত্রু) দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে (এভাবে মানুষ নিজের শক্তি-সামর্থ্য ও আল্লাহ্‌র এক অতি বড় নি'মাত ঘোড়াকে অপরের সম্পদ লুণ্ঠন ও অন্যের প্রতি যুল্‌মের কাজে ব্যবহার করে), ৬. বস্তুতঃ মানুষ তার রব-এর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। ৭. আর সে নিজেই (নিজের কাজ-কর্মের মাধ্যমে)

এ বিষয়ের সাক্ষী। ৮. আর ধন-সম্পদের প্রতি অবশ্যই সে খুবই আসক্ত। ৯. সে কি জানে না, কবরে যা আছে তা যখন উত্থিত হবে, ১০. আর অন্তরে যা (কিছু লুকানো) আছে তা প্রকাশ করা হবে, ১১. নিঃসন্দেহে তাদের প্রতিপালক সেদিন তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন।

ব্যাখ্যা:

(১) আর আল্লাহ তায়ালা ঘোড়ার শপথ করেছেন, কেননা তাতে রয়েছে তাঁর উজ্জল নির্দেশসমূহ ও প্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ যা প্রত্যেকটি সৃষ্টির জানা। আর আল্লাহ তায়ালা ঘোড়ার শপথ করেছেন তাঁর সেই সমস্ত অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে যে অবস্থাগুলোতে অন্য প্রাণী তার অংশীদার হয় না। অর্থাৎ তার মাঝে পাওয়া যায় না।

অতঃপর আল্লাহ বলেন: (وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا) অর্থাৎ এমন পরিপূর্ণ শক্তিশালী ঘোড়া যার থেকে ঊর্ধশাস বের হয় আর তা হচ্ছে তার বক্ষের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ বা শব্দ যা তার দৌড়ের গতি প্রচন্ড হওয়ার সময় বের হয়।

(২) (فَٱلْمُورِيَٰتِ) অর্থাৎ এমন অশ্বরাজি যাদের ক্ষুরের আঘাতে পাথর থেকে আগুন বের হয়। (قَدْحًا) অর্থাৎ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বের হয় তাদের ক্ষুরের শক্ত আঘাতে।

(صُبْحًا) অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বেশির ভাগ প্রভাতেই হয়ে থাকে।

(৩) ﴿فَٱلْمُغِيرَٰتِ﴾ অর্থাৎ শত্রুদের উপর হঠাৎ আক্রমণ চালায়

(৪-৫) (فَأَثَرْنَ بِهِۦ) তাদের দৌড়ের কারণে (نَقْعًا) অর্থাৎ ধূলি উড়ায়, (فَوَسَطْنَ بِهِۦ) অর্থাৎ তাদের আরোহীদের নিয়ে, (جَمْعًا) তাদের শত্রু দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

(৬) আল্লাহ তায়ালার বাণী: (إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ) অর্থ: বস্তুতঃ মানুষ তার রব-এর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। এই আয়াতটি হচ্ছে কসমের উত্তর: নিশ্চয় মানুষের সভাব হচ্ছে তার প্রতি যে কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে তা সে পরিপূর্ণ আদায় করা হতে বিরত থাকে। বরং তার সভাব হচ্ছে অলসতা করা ও শারিরীক আর্থিক নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা করা হতে বিরত থাকা। তবে তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করেছেন আর যারা এই বৈশিষ্ট হতে মুক্ত।

(৭) (وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ) অর্থাৎ নিশ্চয় মানুষ নিজ সম্পর্কে যা জানে তা হলো শুকরিয়া করা হতে বিরত থাকা। এ ব্যাপারে সে নিজেই সাক্ষী। সে এটি অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা এটি একটি স্পষ্ট বিষয়। এখানে সর্বনামটি আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত হতে পারে । অর্থাৎ নিশ্চয় বান্দা তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। আর আল্লাহই এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষমান। সুতরাং এক্ষেত্রে যে তার রবের প্রতি অকতজ্ঞ

(৮) (وَإِنَّهُۥ)) নিশ্চয় মানুষ। (لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ) অর্থাৎ - সম্পদের ভালবাসা। (لَشَدِيدٌ) তার অনেক ভালবাসা। আর তার ঐ সম্পদের ভালবাসাই তাকে আবশ্যক করেছে তার উপর অর্পিত আবশ্যকীয় হক্ব আদায়কে পরিহার করতে, সে তার রবের সন্তুষ্টির উপর নিজের প্রবৃত্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এসব কিছুই তার দৃষ্টিকে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করেছে ও পরকালে হতে বিমূখ রেখেছে।

(৯-১০) এই জন্য তিনি কিয়ামত দিবসের ভয়ের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেছেন:

(أَفَلَا يَعْلَمُ) অর্থাৎ: এই দাম্ভিক কি জানে না। (إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ) অর্থাৎ: আল্লাহ তায়ালা বের করবেন মৃতদেরকে তাদের কবর হতে তাদেরকে তাদের হাশর নাশরের জন্য। (وَحُصِّلَ مَا فِى ٱلصُّدُورِ) অর্থাৎ: সেদিন স্পষ্ট হয়ে যাবে যা তাদের হৃদয়ে ভাল-মন্দ লুকায়িত রয়েছে। সুতরাং গোপন বিষয় প্রকাশিত হয়ে যাবে। আর সৃষ্টির সামনেই তাদের কৃতকর্মের ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যাবে।

(১১) (إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌۢ)অর্থাৎ: নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বান্দার জানা-অজানা ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য আমলের ব্যাপারে জ্ঞাত এবং তিনিই তার প্রতিদান দিবেন। আর তাদের সংবাদ গুলোকে কিয়ামত দিবসের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে সর্বদা জ্ঞাত। কেননা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কৃতকর্মের প্রতিদান হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান ও তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী।

∃∃∃

[تفسير سورة القارعة وهي مكّيَّةٌ]

সূরা আল ক্বরিয়া এর তাফসীর: মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(ٱلْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴿٥﴾ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌۢ ﴿١١﴾).

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।১. মহা বিপদ ২. কী সেই মহা বিপদ? ৩. মহা বিপদ সম্পর্কে তুমি কী জান? ৪. সে দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত ৫. আর পর্বতগুলো হবে ধুনা রঙ্গিণ পশমের মত। ৬. অতঃপর যার (সৎ কর্মের) পাল্লা ভারি হবে। ৭. সে সুখী জীবন যাপন করবে। ৮. আর যার (সৎকর্মের) পাল্লা হালকা হবে, ৯. (জাহান্নামের) অতলস্পর্শী গর্তই হবে তার বাসস্থান। ১০. তুমি কি জান তা কী? ১১. জ্বলন্ত আগুন।

ব্যাখ্যাঃ

(১-৩) (اَلْقَارِعَةُ) এটি একটি কিয়ামত দিবসের নাম। এই নাম করণের কারণ হচ্ছে যে, নিশ্চয় কিয়ামত মানুষকে মহা বিপদের ভীতিপ্রদ করবে ও বিরক্তিকর অবস্থায় নিক্ষেপ করবে। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের বিষয়টিকে অনেক কঠিন ও বড় আকারের বর্ণনা করেছেন তাঁর এ বাণী দিয়ে:

(اَلْقَارِعَةُ ۝١ مَا اَلْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا اَلْقَارِعَةُ)

(৪) (يَوْمَ يَكُونُ اَلنَّاسُ) অর্থাৎ যেদিন মানুষ হবে বিকট আওয়াজের কারণে

(كَاَلْفَرَاشِ اَلْمَبْثُوثِ) অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত কিটপতঙ্গের মত একটি অপরটির উপর পতিত হয়। আর তা হচ্ছে ঐ সকল প্রাণী যা রাত্রে একটি অপরটির উপর পতিত হয়। তারা জানে না তারা কোথায় ধাবিত হচ্ছে। যখন তাদের জন্য আগুন জালানো হয় তখন তারা তার দিকে ধাবিত হয়। ওহে বিবেকবানরা ! সেদিন এমনটিই হবে মানুষের অবস্থা।

(৫) আর মজবুত-শক্তিশালি পাহাড়গুলো হবে (كَاَلْعِهْنِ اَلْمَنفُوشِ) অর্থ: ধুনা পশমের মত যা হাল্কা বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَتَرَى اَلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحَابِ ﴾ তুমি পাহাড়কে মনে করবে যে, তা জমাট পদার্থ। অথচ তা মেঘমালার ন্যায় উড়ে বেড়াবে। অতঃপর পাহাড় পরিনিত হবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকনায়। সেখানে দেখার মত কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তখনি ডাঁড়িপাল্লা নিয়ে আসা হবে অতপর মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হবে। সৌভাগ্যবান অথবা হতভাগা।

(৬–৭) (فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ) অর্থাৎ : যার পাপের চেয়ে পূন্য বেশি হবে। (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ) সে সুখময় জীবনযাপন করবে।

(৮-১১) (وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ) অর্থাৎ : যার এমন কোন নেকী নাই যা দিয়ে পাপের সমতা করবে। (فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ) অর্থাৎ : তার আশ্রয়স্থল হচ্ছে জাহান্নাম যাকে 'হাওবিয়া' বলা হয়। তাকে মায়ের সাথে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে এ জন্যে যে, সে সার্বক্ষনিক তার সঙ্গে থাকবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ নিশ্চয় জাহান্নামের শাস্তি জরিমানা স্বরূপ।
কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো: সে জাহান্নামের আগুনে অধোমূখে মাথার মগজসহ উপুর হয়ে পতিত হবে। তাকে জাহান্নামে মাথার ভরে নিক্ষেপ করা হবে।

(وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ) অর্থ : আপনাকে কিসে জানাবে সেটা কী! এটা জাহান্নামের ভয়াবহত অবস্থা। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, (نَارٌ حَامِيَةٌ) অর্থাৎ সেটি অত্যাধিক উত্তপ্ত। তা দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তরগুণ বেশি উত্তপ্ত। আমরা তা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

[تفسير سورة ألهاكم التّكاثر وهي مكّيّةٌ]
সূরা আত-তাকাছুর এর তাফসীর : মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾).

১. অধিক (পার্থিব) সুখ সম্ভোগ লাভের মোহ তোমাদেরকে (অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে) ভুলিয়ে রেখেছে। ২. এমনকি (এ অবস্থাতেই) তোমরা কবরে এসে পড়। ৩. (তোমরা যে ভুল ধারণায় ডুবে আছো তা) মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, ৪. আবার বলি, মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। ৫. কক্ষনো না, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতে! (তাহলে সাবধান হয়ে যেতে) ৬. তোমরা অবশ্য অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে, ৭. আবার বলি, তোমরা তা অবশ্য অবশ্যই দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাবে, ৮. তারপর তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই (যা কিছু দেয়া হয়েছে এমন সব) নি'মাত সম্পর্কে সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে।

(১) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে ধমক দিতেছেন তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে বিমূখ হওয়ার কারণে। আর তা তাঁর ইবাদত করা যার কোন অংশিদার নাই, তাঁর পরিচয় জানা, তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া ও সকল কিছুর উপর তাঁর ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

(أَلْهَىٰكُمُ) অর্থ: তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রেখেছে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো হতে।)

(اَلتَّكَاثُرُ অর্থ: প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা। কি নিয়ে প্রতিযোগিতা হবে উল্লেখ করা হয়নি যাতে এর অন্তর্ভূক্ত হয় ঐ সকল বিষয় যা দিয়ে প্রতিযোগিতাকারী পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে, আত্মগৌরবকারীরা আত্মগৌরব করবে। তারা প্রতিযোগিতা করবে সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সাহায্য-সহযোগিতাকারী, সৈন্য-সামন্ত, দাস-দাসী, মান-মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যা প্রত্যেকে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করবে। তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন উদ্দেশ্য থাকবে না।

(২) তোমাদের খেল তামাশা, অমনোযোগিতা ও ব্যস্ততা চলমান থাকবে (حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ) যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। তখন তোমাদের সমস্ত গোপন তথ্য প্রকাশ পাবে। আর তা তোমাদের অপারোগতার পর। আর আল্লাহ তায়ালার বাণী প্রমাণ করে যে, (حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ) নিশ্চয় 'বারযাখ' একটি অবস্থান স্থল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেখানে থেকে পরকালের স্থলে ধাবিত হওয়া। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যিয়ারতকারী হিসেবে সম্বোধন করেছেন। তাদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা বলেননি। সুতরাং উক্ত বিষয়টি অনন্ত পরকালের পুনরুত্থান ও কর্মফলের প্রতিদানের প্রতি প্রমাণ করে।

(৩-৬) এ জনেই তিনি তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে বলেন: (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ) অর্থাৎ যদি তোমরা জানতে এমনভাবে যা হৃদয়গম হতো যে, তোমাদের সামনে কি রয়েছে, যখন প্রাচুর্য তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করেছে এবং সৎ আমলের দিকে দ্রুত ধাবিত হতে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান না থাকায় তোমরা যা মনে করছো তাই তোমাদেরকে পরিনতি করেছে।

(لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ) অর্থাৎ অবশ্যই তোমরা কিয়ামত দেখবে সাথে সাথে তোমরা জাহান্নাম দেখবে যা আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(৭) (ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ) অর্থাৎ স্ব-চক্ষে দেখা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًا ۝٥٣ ﴾ পাপিরা জাহান্নামকে দেখে বিশ্বাস করবে তারা উহাতে পতিত হবে। তারা সেখান হতে পালানোর কোন পথ পাবে না।

(৮) (ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ) তোমাদের সেদিন জিজ্ঞাসা করা হবে নিয়ামত সম্পর্কে যা তোমরা পার্থিব জীবনে ভোগ করেছ। তোমরা কি তার কৃতজ্ঞতা করেছো? তোমরা কি আল্লাহর হক্ব আদায় করেছো? তোমরা কি উক্ত নিয়ামত নিয়ে আল্লাহর অবাধ্য কাজে লিপ্ত হওনি? এর পরেও কি তিনি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম নিয়ামত দান করবেন? নাকি তোমরা তার ধোঁকায় পড়েছো? সুতরাং তিনি তোমাদেরকে এর শাস্তি প্রদান করবেন? আল্লাহ তায়ালা বলেন:)

(وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ...)

অর্থ: যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হবে, (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই তোমাদের অংশের নি'মাতগুলো নিঃশেষ করেছ আর তা ভোগ করেছ। কাজেই আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দ্বারা প্রতিফল দেয়া হবে, কেননা তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে অহঙ্কার করেছিলে আর না-ফরমানী করেছিলে। (সূরা আহকাফ: ২০)

ΞΞΞ

[تفسير سورة والعصر وهي مكّيّةٌ]

সূরা আল আছর: মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾).

১. কালের শপথ ২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (ডুবে) আছে, ৩. কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।

ব্যাখ্যা: (১-৩) আল্লাহ তায়ালা সময়ের শপথ করেছেন যা রাত ও দিন। আর তা হচ্ছে বান্দার কর্ম ও আমলের সময়। প্রত্যেকটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কল্যাণের বিপরীত শব্দ। ক্ষতির বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কখনো ক্ষতিটা হবে ব্যাপক। যেমন: যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। সে জান্নাত হারিয়েছে এবং জাহান্নামের উপযুক্ত হয়েছে। আবার কখনো ক্ষতিটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়। এ জন্যেই তিনি প্রত্যেকটি মানুষের জন্য ক্ষতিকে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে চারটি গুণে গুনান্বিত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা যে সকল বিষয়ে ঈমান আনতে বলেছেন, সে সকল বিষয়ে ঈমান আনা। জ্ঞান ব্যতীত ঈমান হতে পারে না। জ্ঞান বা বিদ্যা ঈমানের একটি শাখা যা ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হয় না।

২. সৎ আমল। এটি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার কল্যাণকর কাজ অন্তর্ভূক্ত করে, যা আল্লাহ ও বান্দার হক্বের সাথে সম্পর্কিত তা হতে পারে ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব।

৩. পরস্পরে সত্যের দাওয়াত দেওয়া যাকে ঈমান ও সৎ আমল বলে। অর্থাৎ পরস্পরে সত্যের দাওয়াত দেওয়া এবং সত্যের দাওয়াতে উৎসাহিত করা এবং আগ্রহ সৃষ্টি করা।

৪. পরস্পরে আল্লাহর আনুগত্যে ও অবাধ্য কাজে এবং ভাগ্যের মন্দ বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণের পরামর্শ দিতে হবে। সুতরাং প্রথম দুইটি বিষয়ে বান্দা নিজেকে পরিপূর্ণ করতে পারবে আর পরের দুইটি বিষয়ে অন্যকে পরিপূর্ণ করতে পারবে। আর চারটি বিষয় পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে বান্দা ক্ষতি হতে নিরাপদে থাকবে এবং মহা কল্যাণের সফলতা পাবে।

ΞΞΞ

[تفسير سورة الهمزة وهي مكِّيَّةٌ]

সূরা আল হুমাযাহ: মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ ۝١ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ ۝٢ يَحۡسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخۡلَدَهُۥ ۝٣ كَلَّاۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلۡحُطَمَةِ ۝٤ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ ٱللَّهِ ٱلۡمُوقَدَةُ ۝٦ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلۡأَفۡـِٔدَةِ ۝٧ إِنَّهَا عَلَيۡهِم مُّؤۡصَدَةٞ ۝٨ فِي عَمَدٖ مُّمَدَّدَۭ ۝٩).

১. দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনাসামনি) মানুষের নিন্দা করে আর (অসাক্ষাতে) দুর্নাম করে, ২. যে ধন-সম্পদ জমা করে আর বার বার গণনা করে, ৩. সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে, ৪. কক্ষনো না, তাকে অবশ্যই চূর্ণ-বিচূর্ণকারীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে,

৫. তুমি কি জান চূর্ণ-বিচূর্ণকারী কী? ৬. তা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত আগুন, ৭. যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ৮. তা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, ৯. (লেলিহান অগ্নিশিখার) উঁচু উঁচু স্তম্ভে।

১) (وَيْلٌ) অর্থাৎ- ভীতি প্রদর্শন, খারাপ পরিনতি ও কঠিন শাস্তি। (هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ) অর্থাৎ - যে ব্যক্তি তার কর্ম ও কথার দ্বারা মানুষকে নিন্দা করে। সুতরাং ''হুমাযাহ'' শব্দটি ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে ব্যক্তি কর্ম ও ইশারায় মানুষের পরনিন্দা করে ও ব্যঙ্গ করে । আর ''লুমাযাহ'' শব্দটি ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে ব্যক্তি তার কথার মাধ্যমে মানুষের গীবত করে।

২) ''হুমাযাহ ও লুমাযাহ' এ দুই শ্রেণীর মানুষের বৈশিষ্ট হচ্ছে: ধনদৌলত গচ্ছিত রাখা ও তা দিয়ে অহংকার করা। কল্যাণের কাজে ও আত্মীয়তা বন্ধনে ধন-সম্পদ খরচে বা ব্যয়ে তার কোন আগ্রহ নাই।

৩) (يَحْسَبُ) অর্থ: সে ধারণা করে তার অজ্ঞতার কারণে। (أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ) অর্থ: নিশ্চয় তার সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী রাখবে পৃথিবীতে। এ জন্যেই তার প্রচেষ্টা ছিল কেবলমাত্র সম্পদ বৃদ্ধি করা। যার কারণে সে ধারণা করে যে, তার সম্পদ তার হায়াত বৃদ্ধি করবে। সে জানে না যে, নিশ্চয় কৃপনতা জীবনকে ধ্বংস করে ও পরকালের ক্ষতি করে। পক্ষান্তরে দানশীলতা আয়ু বৃদ্ধি করে।

৪-৭) (كَلَّا لَيُنۢبَذَنَّ) অর্থ: নিশ্চয় নিক্ষেপ করা হবে হুতামায়। আর আপনাকে কিসে জানাবে হুতামা কী?) : তার কঠিন অবস্থা ও তার সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সেটিকে ব্যাখ্যা করেছেন : (فِى ٱلْحُطَمَةِ) অর্থাৎ এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন। যে আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর (نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ) যেটি তার প্রচন্ড উত্তপ্তের কারণে (ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ) অর্থ: মানুষের দেহ হতে হৃদয় পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিবে।

(৮) এ প্রচন্ড উত্তপ্তের মধ্যেও তাদেরকে সেখানে বন্দি রাখা হবে। এমনকি তারা সেখানে থেকে বের হওয়া হতে নিরাশ হয়েছে। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলেন: (إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ) অর্থ: নিশ্চয় এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখাবে। অর্থাৎ: তারা এটা আবদ্ধকারী। (فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ) অর্থ: স্তম্ভসমূহে। দরজার পিছন দিক থেকে এটি হবে দীর্ঘায়িত, যেন তারা সেখান হতে বের হতে না পারে। যখন তারা সেখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে আবার তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এটা হতে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

[تفسير سورة الفيل وهي مكّيَّةٌ]

সূরা আল-ফীল এর তাফসীর, মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَٰبِ ٱلۡفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِي تَضۡلِيلٖ ﴿٢﴾ وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۭ ﴿٥﴾).

অর্থ: ১. তুমি কি দেখনি (কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্য আগত) হাতীওয়ালাদের সঙ্গে তোমার প্রতিপালক কীরূপ ব্যবহার করেছিলেন? ২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? ৩. তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। ৪. যারা তাদের উপর পাথরের কাঁকর নিক্ষেপ করেছিল। ৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে করে দিলেন ভক্ষিত তৃণ-ভুষির মত।

(১-৫) অর্থাৎ আপনি কি লক্ষ করেননি আল্লাহর ক্ষমতা মহত্য, তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া, তাওহীদের প্রমানাদি ও তাঁর নাবী মুহাম্মাদ (স.) এর সত্যবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা হাতির মালিকদের সঙ্গে যা করেছেন। তারা বাইতুল্লাহর নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল ও তাঁকে বিনষ্ট করার ইচ্ছা কল্পনা করেছিল। সে জন্য তারা সৈন্য বাহিনী তৈরি করেছিল এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল হস্তবাহিনী বাইতুল্লাহকে ভাংগার জন্য। আর তারা ইয়ামান ও হাবশা হতে এতবড় শক্তিশালী দল এনেছিল যাদেরকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল না তাই মক্কাবাসী তাদের ভয়ে মক্কা হতে বের হয়ে গেল। আর আল্লাহ সৈন্য বাহিনীর উপর পাখি প্রেরণ করলেন। তারা পোড়ামাটি হতে ছোট ছোট পাথর নিয়ে এসে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করলো। আর সৈন্য বাহিনীর নিকটবর্তী ও দুরোবর্তী সবাইকে অনুসরণ করল ফলে তারা সকলেই ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যেন তারা চর্বিত তৃণের ন্যায় পরিণত হলো। আল্লাহই তাদের কুকর্মের ও কুচক্রের জন্য যথেষ্ট। আর তাদের কুউদ্দেশ্যকে তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। হাতী ওয়ালার ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। আর ঐ বছর আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (স.) জন্ম লাভ করেন।

[تفسير سورة لإيلاف قريشٍ وهي مكّيَّةٌ]

সূরা কুরাইশ : মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ﴿٣﴾ ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ﴿٤﴾).

অনুবাদঃ ১. কুরাইশদের অভ্যস্ত হওয়ার কারণে, ২. (অর্থাৎ) শীত ও গ্রীষ্মে তাদের বিদেশ সফরে অভ্যস্ত হওয়ার (কারণে) ৩. তাদের কর্তব্য হল এই (কা'বা) ঘরের রবের 'ইবাদত করা, ৪. যিনি তাদেরকে (কা'বা ঘরের খাদিম হওয়ার কারণে নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে) ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং তাদেরকে ভয়-ভীতি হতে নিরাপদ করেছেন।

(১-৪) অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বলেন: নিশ্চয় জার ও মাজরুর (আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী) পূর্বেও সূরার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ : হস্তি বাহিনীর সাথে আমি যা করেছি তা কুরাইশদের জন্য, তাদের নিরাপত্তা, তাদের কল্যাণের দিকগুলো অবিচল এবং তাদের ব্যবসায়ী সফর শীত মৌসুমে ইয়ামেনে ও গ্রীষ্ম মৌসুমে সিরিয়ায় নিয়মিত করার জন্য। সুতরাং যারা কুরাইশদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। তিনি হারাম শরীফ ও তার বাসিন্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন আরবদের হৃদয়ে যেন তারা তাদেরকে সম্মান করে, তাদের যে কোন সফরে তারা যেন বাধা সৃষ্টি না করে। এজন্যেই তিনি তাদেরকে কৃতজ্ঞতা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন: (فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ) অর্থ: তারা যেন এই ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করে। অর্থাৎ: তারা যেন তাঁর এককত্ব প্রকাশ করে এবং ইবাদতে তাঁর জন্যেই নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে।

(ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ) অর্থ: তিনি তাদেরকে ক্ষুধার্তে আহার করান ও ভয় হতে নিরাপত্তা দেন। সুতরাং রিযিকের স্বচ্ছলতা, ভয় হতে নিরাপদ হচ্ছে দুনিয়াতে প্রাপ্ত নিয়ামত গুলোর মধ্যে বড় নিয়ামত যেগুলো আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক করে। সুতরাং হে আল্লাহ আপনার জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আপনার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত রাজির জন্য। আর আল্লাহ তায়ালা প্রতিপালনকে কা'বা ঘরের সাথে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তার মর্যাদা ও ফজিলতের জন্য। তাছাড়া তিনিই তো সমস্ত কিছুর পালনকর্তা।

[تفسير سورة الماعون وهي مكّيّة]
সূরা মাউন এর তাফসীর, মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾).

১. তুমি কি তাকে দেখেছ, যে কর্মফল (দিবসকে) অস্বীকার করে? ২. সে তো সেই (লোক) যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, ৩. এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহ দেয় না ৪. অতএব দুর্ভোগ সে সব সলাত আদায়কারীর ৫. যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন, ৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, ৭. এবং প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী দানের ছোট খাট সাহায্য করা থেকেও বিরত থাকে।

(১) আল্লাহ তায়ালা বলতেছেন: তিরস্কার ও নিন্দা ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যারা আল্লাহ ও বান্দার অধিকার পরিত্যাগ করেছে। (أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ) অর্থ: আপনি কি দেখেছেন তাকে যে, দ্বীনকে অস্বীকার করে? অর্থাৎ - পূনরুত্থান ও প্রতিদান দিবসকে। সে তো বিশ্বাস করে না যা রাসূলগণ নিয়ে এসেছে।

(২) (فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ) অর্থ: সে তো সেই যে, ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাকে বের করে দেয় কঠোর আচরণ করে ও জোরপূর্বকভাবে, সে তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না তার হৃদয়ের কোঠুরতার কারণে। আর সে পুরস্কারের আশা করে না ও শাস্তিকে ভয় করে না।

(৩) (وَلَا يَحُضُّ) (অর্থ: সে উদ্বুদ্ধ করে না) অর্থাৎ অন্যকে (عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ) (অর্থ: মিসকিনদের খাদ্য দানে) অর্থাৎ এর চেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে সে নিজেও মিসকীনকে খাদ্য দেয় না।

(৪-৫) (ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) (অর্থ: দূর্ভোগ সে সলাত আদায় কারীদের) অর্থাৎ যারা সলাত আদায় করে কিন্তু তারা (অর্থ: তারা তাদের সলাত সম্বন্ধে উদাসীন) অর্থাৎ সলাতকে নষ্ট করে। সলাতের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, সলাতের রুকন সমূহ ছেড়ে দেয়। এটা আল্লাহর নির্দেশের গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে।

যেমনটি তারা সলাতকে নষ্ট করে করেছে যে সলাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আনুগত্য। আর সলাত হতে উদাসীন ব্যক্তিই তো লাঞ্ছনা ও তিরস্কারের উপযুক্ত। আর সালাতে কিছু ভূল-ত্রুটি হওয়া এটি প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়। এমনটি নাবীরও ﷺ হয়েছিল।

(৬-৭) এজন্যে আল্লাহ তায়ালা এসমস্ত ব্যক্তির পরিচয় বর্ণনা করেছেন বর্ণনা করেছেন, লৌকিকতা, হৃদয়ের কঠুরতা ও দয়হীনতা। অতঃপর তিনি বলেছেন: (ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ (যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে) অর্থাৎ তারা আমল করে লোক দেখানোর জন্য। (وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ) (অর্থ: এবং মাউন প্রদান করতে বিরত থাকে) অর্থাৎ যা দান করলে কোন ক্ষতি বা কমতি হবে না এমন জিনিসও দান করা হতে বিরত থাকে। যেমন: রান্না-বান্নার আসবাব পত্র, বালতি ও কূড়াল ইত্যাদি যা দৈনন্দিন প্রতিবেশিরা পরস্পরে লেন-দেন করে থাকে। আর তারা সেই সকল ব্যক্তি যারা দানের ব্যাপারে আগ্রহ থাকা সত্বেও সামান্য কিছু দান করা হতে বিরত থাকে। তাহলে যারা বড় উপকারী দান করা হতে বিরত থাকে তাদের কি হবে?

এই সূরাতে ইয়াতীম ও মিসকীনদেরকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করা হয়েছে। সলাতের প্রতি গুরুত্ব প্রদানে ও তা যথাযথভাবে আদায় করা, সালাতে ও সকল প্রকার আমল ইখলাসের সাথে আদায় করা। সৎ কাজে উৎসাহিত করা এমনকি সামান্যতম দান করা। যেমন: রান্না-বান্নার আসবাব পত্র, বালতি ও বই ইত্যাদি। কেননা যে ব্যক্তি এ সামান্যতম কাজটি করবে না আল্লাহ তায়ালা তাকে নিন্দা করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

[تفسير سورة الكوثر وهي مكّيَّةٌ]

সূরা আল কাউসার এর তাফসীর। ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴿٣﴾).

অনুবাদ: ১. আমি তোমাকে (হাওযে) কাওসার দান করেছি। ২. কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর, ৩. (তোমার নাম-চিহ্ন কোন দিন মুছবে না, বরং) তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই নাম চিহ্নহীন– নির্মূল।

(১) আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী (স.) কে বলেছেন তাঁর প্রতি যা অনুগ্রহ করেছেন তা স্বরণ করানোর দ্বারা (إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ) নিশ্চয় আমি তোমাকে আল কাওসার প্রদান করেছি। অর্থাৎ মহাকল্যাণ ও অসংখ্য অনুদান। আর তার অন্তর্ভুক্ত সেই নদী যা কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাঁর নবীকে দান করবেন। সেই নদীর নাম আল-কাওসার এবং তাঁকে আরও প্রদান করবেন সেই হাউজ যার দৈর্ঘ-প্রস্ত এক মাসের। তার পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি। তার পিয়ালাগুলো সংখ্যায় ও উজ্জলতায় তারকার ন্যায়। যে তার থেকে এক ঢোক পান করবে সে কখনোই পিপাসিত হবে না।

(২) যখন আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করলেন তাই তাঁকে তার শুকরিয়া করার নির্দেশ দিয়ে বললেন: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ) সুতরাং তুমি তোমার রব এর জন্য সলাত পড় ও কুরবানী কর। এখানে এই দুটি ইবাদতকে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ উহা সর্বোত্তম ইবাদত ও আল্লাহর বেশি নিকটবর্তীকারী। আর কেননা সলাত আল্লাহর জন্য অন্তরেও অঙ্গ প্রতঙ্গে নম্রতা বহন করে এবং বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের ক্ষেত্রে তাকে নিয়ে যাই। আর কুরবানী দ্বারা বান্দা তার সব চেয়ে উত্তম সম্পদের মাধ্যমে আল্লহর নিকটবর্তী হলো এবং সম্পদের উপর ভালবাসা ও কৃপনতা দূর হলো।

(৩) (إِنَّ شَانِئَكَ) অর্থাৎ তোমাকে যে ঘৃণা করে, বদনাম করে, ছোট করে) (هُوَ ٱلْأَبْتَرُ অর্থাৎ সেই সমস্ত কল্যাণ হতে বিচ্ছিন্ন, আমল বিহীন, সুনাম বিহীন। কিন্তু মুহাম্মাদ স. তিনি সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বনি আদম হতে।

[تفسير سورة قل يا أيُّها الكافرون و هي مكِّيَّةٌ]
সূরা আল কাফিরুন এর তাফসীর : মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾).

১. বল, 'হে কাফিররা!' ২. তোমরা যার 'ইবাদত কর, আমি তার 'ইবাদত করি না, ৩. আর আমি যার 'ইবাদত করি তোমরা তাঁর 'ইবাদতকারী নও, ৪. আর আমি তার 'ইবাদতকারী নই তোমরা যার 'ইবাদত করে থাক, ৫. আর আমি যার 'ইবাদত করি তোমরা তাঁর 'ইবাদতকারী নও, ৬. তোমাদের পথ ও পন্থা তোমাদের জন্য (সে পথে চলার পরিণতি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে) আর আমার জন্য আমার পথ (যে সত্য পথে চলার জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, এ পথ ছেড়ে আমি অন্য কোন পথ গ্রহণ করতে মোটেও প্রস্তুত নই)।

ব্যাখ্যা: (১-৬) অর্থাৎ তুমি কাফিরদেরকে স্পষ্ট করে বলে দাও: (لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) অর্থাৎ তারা আল্লাহ ব্যতিত যার পূজা করে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যেভাবে তুমি তা হতে নিজেকে মুক্ত করো। (وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ) আমি সেই সত্তার ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদত করো না।

কেননা তোমরা আল্লাহর ইবাদত ইখলাস সহকারে করো না। তাই শিরক মিশ্রিত তোমাদের ইবাদতকে ইবাদত বলা যায় না। আর এই বাক্যটি বার বার নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে প্রথমটি আমল না পাওয়ার উপর প্রমাণ করে। আর দ্বিতীয়টি প্রমাণ করে যে, সেটা তার আবশ্যক গুনে পরিণত হয়েছে। তাই সে জন্য দুই দলের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। এই বলে যে, (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) অর্থ: তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আর আমার দ্বীন আমার। যেমন আল্লাহ বলেছেন: (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ) আমি যা আমল করছি তোমরা তা হতে মুক্ত আর তোমরা যা আমল করছো আমি তা হতে মুক্ত।

ƎƎƎ

[تفسير سورة النَّصر وهي مدنيَّةٌ]

সূরা আন নাছর এর তাফসীর : মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا ﴿٣﴾).

অনুবাদ: ১. যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও (ইসলামের চূড়ান্ত) বিজয়, ২. আর তুমি মানুষদের দেখবে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে, ৩. তখন তুমি (শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশে) তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তিনি . ০১তাওবা কবূলকারী।

(১-৩) এই সূরায় সুসংবাদ রয়েছে এবং তা অর্জনের সময় রাসূলকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর সে ক্ষেত্রে যা বিধিত হবে তার ইঙ্গিত ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। আর সুসংবাদটি হলো রাসূলের বিজয়ের ও মক্কা বিজয়ের এবং ইসলাম ধর্মে মানুষের তলবদ্ধভাবে প্রবেশ (فِى دِينِ ٱللَّهِ) (أَفْوَاجًا এমনভাবে যে তারা অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করবে ও তার সাহায্যকারী হবে অথচ ইতিপূর্বে তারা তার চরম শত্রু ছিলো। তার এই সুসংবাদটি সংঘটিত হয়েছে।

আর সাহায্য ও বিজয় অর্জিত হলে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ করেছেন যে, তিনি যেন তাঁর রব এর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন, তাঁর তাসবীহ পাঠ করেন, তাঁর প্রশংসা করেন এবং তাঁর নিকট ইস্তেগফার করেন।

আর এই সূরাতে ২টি ইঙ্গিত রয়েছে: প্রথমটি হলো যে, ইসলামের বিজয় চলতে থাকবে এবং তা বৃদ্ধি পাবে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করা ও ক্ষমা চাওয়ার সময় রাসূল ﷺ কর্তৃক। কেননা ইহা শুকরিয়া করার অন্তর্ভূক্ত। আর আল্লাহ বলেন- لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর তাহলে আমি তোমাদের জন্য আরো বাড়িয়ে দিব। আর তা বাস্তবে খুলাফায়ে রাশেদার সময় পাওয়া গিয়াছে যে, দ্বীনের বিজয় চলতেই ছিলো এবং শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছে যেই প্রান্ত পর্যন্ত কোন ধর্ম পৌঁছতে পারিনি এবং অসংখ্য মানুষ তাতে প্রবেশ করেছে যা অন্য ধর্মে দেখা যায়নি। পরবর্তীতে মুসলমানগণ যখন আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করলো ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হলো এবং যা হওয়ার তা হয়ে গেল। তার পরেও এই দ্বীনের মান-সম্মান, আল্লাহর রহমতে অটুট রয়েছে যা মানুষের ধারণার বাইরে।

আর দ্বিতীয় ইঙ্গিতটি হলো: রাসূল ﷺ এর সময় সন্নিকটে। কেননা তাঁর জীবন হলো সম্মানিত জীবন আল্লাহ তাঁর কসম করেছেন। আর জ্ঞাত বিষয় হলো যে, মর্যাদাপূর্ণ বিষয়গুলো এস্তেগফারের মাধ্যমে শেষ করা হয়। যেমন সলাত, হজ্জ। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর নবীকে ইস্তেগফার করার নির্দেশ দিয়ে এই দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁর সময় শেষ। সুতরাং তিনি যেন তাঁর প্রভুর সাক্ষাতের প্রস্তুতি নেয় এবং সবোর্ত্তম আমল দ্বারা তাঁর জীবন শেষ করেন। তাই রাসূল ﷺ কুরআনের ব্যাখ্যা করেন এবং তা সলাতে বলতেন এবং রুকু ও সিজদায় বেশি বেশি বলতেন : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» .

হে আল্লাহ আপনার পবিত্রতা এবং প্রশংসা, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।

[تفسير سورة تبَّت وهي مكِّيَّةٌ]

সূরা তাব্বাত এর তাফসীর : মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾).

১. আবূ লাহাবের হাত দু'টো ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজে, ২. তার ধন-সম্পদ আর সে যা অর্জন করেছে তা তার কোন কাজে আসল না, ৩. অচিরে সে প্রবেশ করবে লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে, ৪. আর তার স্ত্রীও– যে কাঠবহনকারিণী (যে কাঁটার সাহায্যে নবী-কে কষ্ট দিত এবং একজনের কথা অন্যজনকে বলে পারস্পারিক বিবাদের আগুন জ্বালাত)। ৫. আর (দুনিয়াতে তার বহনকৃত কাঠ-খড়ির পরিবর্তে জাহান্নামে) তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।

(১) (تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ) অর্থাৎ তার দুই হস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হোক, (وَتَبَّ) অর্থ: সে ধ্বংস হয়েছে সুতরাং সে লাভবান হবে না।

(২) (مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ) অর্থ: তার নিকট যে সম্পদ ছিলো তার কোন কাজে আসেনি এবং সে সম্পদও নয় যা সে (كَسَبَ) অর্জন করেছে। সুতরাং তার সে সকল সম্পদ তাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারেনি।

(৩-৫) (سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ) অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন চারদিক হতে বেষ্টন করবে তাকে ও তার স্ত্রীকে (وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ) আর সেও অত্যান্ত রাসূলকে কষ্ট দিতো। সে ও তার স্বামী উভয় মিলে সহযোগিতা করতো গুনাহের ক্ষেত্রে এবং সে বেশি থেকে বেশি চেষ্টা করতো রাসূল ﷺ কে কষ্ট দেওয়ার ও তার পিঠে জমা করতো গুনাহ সমূহ লাকরী (জালানি কাঠ) জমাকারীর ন্যায়।

আল্লাহ তার জন্য গলাতে তৈরি করে রেখেছেন রশি যা (مِّن مَّسَدٍ) ছাল হতে তৈরি। অথবা তার অপর ব্যাখ্যা হলো সে জাহান্নামের আগুনে তার স্বামীর জন্য লাকড়ী বহন করবে ছালের তৈরি রশি গলায় পড়ে। মোটকথা এই সূরাতে আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়ের জীবিত অবস্থায় সূরাটি অবতীর্ণ করেন। এবং এই সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তা নিশ্চিত। আর এই সংবাদের আবশ্যক হলো যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে না। আর আল্লাহ আলীমুল গায়েব তাদের ক্ষেত্রে যেমনটি সংবাদ দিয়েছেন অনুরুপ সংঘটিত হয়েছে।

[تفسير سورة الإخلاص وهي مكِّيَّةٌ]

সূরা আল ইখলাস এর তাফসীর : মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾).

---

১. বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়, ২. আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী, ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। ৪. তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।

(১) অর্থাৎ (قُلْ) অর্থ বুঝে দৃঢ় বিশ্বাস করে বল (هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) অর্থাৎ তিনি এক-অদ্বিতীয়, তিনি সর্ব ক্ষমতায় একক। তিনি এমন মহান, যার অতি সুন্দর নামসমূহ ও মর্যাদাপূর্ণ সিফাত সমূহ এবং পবিত্রময় কাজসমূহ রয়েছে যার কোন সমতুল্য ও সাদৃশ্য নেই।

(২) (اللَّهُ الصَّمَدُ) সকল প্রয়োজনে তিনি উদ্দেশ্য। তাই উর্দ্ধো ও নিচের অধিবাসীগণ তাঁর নিকট অত্যান্ত মুখাপেক্ষী। সুতরাং তারা তাঁর নিকট তাদের প্রয়োজনের কথা পেশ করে এবং তাঁরই পানে চেয়ে থাকে। কেননা তিনি আল্লাহ সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। কেননা তিনি সেই বিজ্ঞ যিনি জ্ঞানের সর্ব পূর্ণ লাভ করেছেন।

এবং কেননা তিনি এমন দয়াশীল যিনি তাঁর দয়ায় পূর্ণ লাভ করেছেন। যার দয়া সমস্ত কিছুকে বেষ্টন করেছে। আর এভাবে তাঁর সমস্ত গুনসমূহ পূর্ণতা লাভ করেছে।

(৩) আর তাঁর পূর্ণতা এই যে, (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) অর্থ: তিনি কাউকে জন্ম দেননি, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর অমুখাপেক্ষিতার পূর্ণতার জন্য।

(৪) (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) অর্থ: তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়। নামসমূহের সিফাতের, কাজসমূহের কোন ক্ষেত্রেও না।
এই সূরাটি তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত এর উপর আলোচিত।

[تفسير سورة الفلق وهي مكِّيَّةٌ]

সূরা আল-ফালাক্ব এর তাফসীর : মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾
وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا

১. বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি উষার রবের, ২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, ৩. আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ৪. (জাদু করার উদ্দেশ্যে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে, ৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

ব্যাখ্যা:

(১) অর্থাৎ (قُلۡ) তুমি আশ্রয় প্রার্থনা করে বল (أَعُوذُ) আমি আশ্রয় প্রার্থনা কামনা করছি (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ) অর্থ: উষার রবের।

(২) (مِن شَرِّ مَا خَلَقَ) অর্থ: তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ঠ হতে। ইহা আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টি জীবকে অন্তর্ভূক্ত করে। তাই সকলের মাঝে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

(৩) অতঃপর তিনি ব্যাপকভাবে উল্লেখ করার পর নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করে বলেন (وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) অর্থাৎ রাতের অন্ধকারে অনেক খারাপ আত্মা ও ক্ষতিকর প্রাণী ছড়িয়ে পড়ে সে সময় সকলের অনিষ্ঠ হতে।

(৪) (وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ) অর্থাৎ ঐ সমস্ত যাদুকারিণী মহিলাদের অকল্যাণ হতে যারা তাদের যাদুর সহযোগিতা নেয় যাদুর গিরাতে ফুক দেওয়ার মাধ্যমে।

(৫) (وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) হিংসুক ঐ ব্যক্তি যে নিয়ামত চলে যাওয়া পছন্দ করে। তাই সে ঐ ক্ষেত্রে চেষ্টা করে। সে জন্য তার অকল্যাণ হতে এ কুচক্রকে নষ্ট করার জন্য আল্লাহর আশ্রয়ের প্রার্থনার প্রয়োজন হয় আর এই হিংসুকের অন্তর্ভূক্ত বদ নজরকারী। কেননা বদ নজর হিংসুক ব্যক্তির থেকেই সংঘটিত হয়। সুতরাং এই সূরাটি যাবতীয় অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা অন্তর্ভূক্ত করে এবং ইহা প্রমাণ করে যে, যাদুর বাস্তবতা রয়েছে। তার ক্ষতির আশংকা করা হয় এবং যাদুও যাদুকারী হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

[تفسير سورة النَّاس وهي مدنيَّةٌ]

সূরা আন-নাস এর তাফসীর : মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴿٦﴾).

---

১. বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, ২. মানুষের অধিপতির, ৩. মানুষের প্রকৃত ইলাহর, ৪. যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার এসে কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট হতে, ৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ৬. (এই কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

(১-৬) শয়তান হতে মানুষের প্রতিপালক, মালিক ও তাদের প্রভুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার উপর এই সূরাটি আলোচিত। আর শয়তান হলোই সমস্ত মন্দের মূল। যার ফিতনাও অনিষ্ঠ হলো যে, (يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ) মানুষের অন্তরের মাঝে কুমন্ত্রণা দেয়। অতঃপর সে খারাপকে তাদেও নিকট সৌন্দর্য আকারে প্রকাশ করে ও ভাল দৃষ্টিতে দেখায়। তাদেরকে সে উৎসাহিত করে তা করার জন্য। কল্যাণ হতে তাদেরকে বিমুখ করে ও কল্যাণকে তাদের নিকট অন্য চেহরায় প্রকাশ করে। আর ঐ শয়তান সর্বদায় এই নীতি অবলম্বন করে। সে মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয় অতঃপর বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে ও আশ্রয় প্রার্থনা করে শয়তান তখন দূরে সরে যায়। সুতরাং বান্দার উচিৎ হবে যে, সে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে নিজের ও সকলের জন্য। নিশ্চয় সকল সৃষ্টি আল্লাহর প্রতিপালন ও মালিকানার অন্তর্ভূক্ত এবং আরও আশ্রয় প্রার্থনা করবে আল্লাহর প্রভূত্বের যার জন্য আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

আর তাদের এই ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করবে না যতক্ষণ তাদের থেকে তাদের সেই শত্রুর অনিষ্ঠ প্রতিরোধ না করা হবে। তাদেরকে তাদের ইবাদত হতে দূরে রাখে ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং সে প্রত্যাশা করে যেন তারা তার দলের হয়ে জাহান্নামবাসি হয়। আর কুমন্ত্রণা যেমন জীনের হতে সংগঠিত হয় অনুরূপ মানুষদের থেকে হয় তাই তিনি বলেন:

(مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ) জ্বীনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে ।

أسئلةٌ على المقدِّمة والتَّفسير

ভূমিকা ও তাফসীর পর্বের প্রশ্নপত্র

(সঠিক উত্তর কোনটি?)

১. গুরুত্বপূর্ণ পাঠসমূহের বইটির লেখক কে?

০ আ: আযীয বিন বায ০ মুহা: বিন উসাইমীন ০ হাইসাম বিন সারহান

২. কেন এই বইটি অধ্যায়ন করবো?

০ কেননা তা গুরুত্বপূর্ণ ০ কেননা উলামাগণ তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার ওসিয়ত করেছেন।

৩. এই মূল বইটি অন্তর্ভূক্ত করে

০ শিষ্টাচার ও চরিত্রকে ০ গুনাহ হতে সতর্ক করণকে

০ কুরআন ও তাওহীদের সঙ্গে মুসলিম ব্যক্তির অবস্থাকে।

০ সলাতকে ও অযুকে ০ উপরের সবগুলোই কে।

৪. মুসলিম ব্যক্তি কুরআনের সহী তেলাওয়াত , মুখস্ত ও ব্যাখ্যা শুরু করবে:

০ সূরা আল-ফালাক দ্বারা ০ সূরা আল ফাতিহার দ্বারা ০ সূরা আল-ইখলাসের দ্বারা।

৫. কুরআন অনুধাবন ও আমল করার ক্ষেত্রে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত। (সঠিক-ভুল)

৬. ছাত্র সর্বপ্রথম তাফসীরের কোন বইটি অধ্যায়ন করবেঃ

০ ইবনে কাসীর ০ ইবনে সাদী ০ কুরতুবী

৭. ছাত্র সর্বপ্রথম সংক্ষিপ্ত বই পড়বে দীর্ঘ আলোচনা বইয়ের পূর্বে। (সঠিক - ভুল)

৮. ছাত্র তাফসীরের বইয়ের সর্ব প্রথম ঐ সমস্ত সূরার অধ্যায়ন শুরু করবে যে গুলো তাকে বার বার পড়াতে উৎসাহিত করবে। যেমন সূরা আল-ক্বসাস, সূরা মারইয়াম, আল-কাহাফ (সঠিক-ভুল)

৯. যদি দেখে পড়তে ছাত্রের সমস্যা হয় তাহলে অডিও তাফসীর পড়তে পারে। যেমন: তাফসীর ইবনে সাদীর অডিও প্রগ্রাম। (সঠিক-ভুল)

১০. যারা কুরআন পড়ে কিন্তু অনুধাবন করেনা তাদের হতে রাসূল ﷺ সতর্ক করেছেন। (সঠিক-ভুল)

أسئلةٌ على سورة الفاتحة
সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর পর্বের প্রশ্নপত্রঃ

১১. সূরাটির এই নামকরণ করা হয়েছে এই জন্য যে, তাহা প্রাচীর দ্বারা ঘেরাও। যাতে কোন কিছু প্রবেশ করতে পারবে না ও বের হতেও পারবে না। (সঠিক-ভুল)

১২. তার নাম করণ করা হয়েছে সূরা ফাতিহা কেননা তাহা .....

.....

.....

১৩. সূরা আল ফাতিহার নাম সমূহের মধ্যে

০ উম্মুল কুরআন ০ আস-সাব'উল মাসানী ০ রুকয়াহ(ঝাড়ফুঁক) ০ সলাত ০ উপরের সবগুলোই।

১৪. তেলাওয়াত শুরুর পূর্বে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়া ওয়াজেব। অথচ আমরা ইবাদতের কাজে রয়েছি পাপের কাজে নয়। তার করণ কি?

.....

.....

১৫. أَعُوذُ শব্দের অর্থ কি?

.....

.....

১৬. শয়তানকে বিতাড়িত নামকরণ করা হয়েছেঃ

০ কেননা সে আল্লাহর রহমত হতে বিতাড়িত ০ কেননা তাকে অগ্নীকাণ্ড দ্বারা রজম করা হয় ০ কেননা সে আদম সন্তানকে সন্দেহ ও খায়েশ দ্বারা নিক্ষিপ্ত করে। ০ উপরের সবগুলোই।

১৭. আল্লাহ তিনিই :

০ যার বন্দেগী করা হয় মহাব্বত ও মাহাত্ম্যের সঙ্গে। ০ আল্লাহ ব্যতীত কাউরি এই নাম রাখা হয় না। ০ সমস্ত নাম সমূহের মূল। ০ বলা হয় উহা আল্লাহর সর্বোত্তম নাম। ০ তার মধ্যে আলীফ ও লাম বর্ণটি আহ্বানের সময় উহ্য করা হয় না। ০ উপরের সবগুলোই।

১৮. আল্লাহর নাম আর-রহমান ও আর-রহীম এর মধ্যে পার্থক্য কি?

.....

.....

.....

১৯. সৃষ্টি জীবের ক্ষেত্রে আল্লাহর লালন-পালন দুই প্রকার উহা কি কি?

০ ব্যাপক ও নির্দিষ্ট ০ সর্ব সাধারণ ও নির্দিষ্ট।

২০. নবীদের অধিকাংশ দু'আ এই শব্দ দ্বারা:

০ আল্লাহুম্মা ০ আর রব

২১. ইয়াওমুদ্দীন:

০ কিয়ামত দিবস ০ যে দিন বান্দাদেরকে নিজ আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। ০ উপরের সবগুলোই।

২২. ﴿ اَهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيمَ ۝٦ ﴾ বান্দার সবচেয়ে উপকারী দোয়া (সঠিক- ভুল)

২৩. দ্বীন শব্দটি ব্যবহারিত হয়:

০ প্রতিদানের ক্ষেত্রে ০ আমলের ক্ষেত্রে ০ কখনো প্রতিদানের ক্ষেত্রে আর কখনো আমলের ক্ষেত্রে। (সঠিক- ভুল)

২৪. কেন আয়াতটি (إِيَّاكَ نَعۡبُدُ) আমরা আপনারই ইবাদত করি বহুবচনে এসেছে?

২৫. ইবাদত হলো:

০ প্রত্যেক ঐ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও আমলকে যা আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন।

০ আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য নমনীয় হওয়া মহাব্বত ও মাহাত্ম্যের সঙ্গে।

০ কখনো এই অর্থে ব্যবহৃত হয় আবার কখনো ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

الدَّرس الثّاني দ্বিতীয় পাঠঃ

দ্বিতীয় পাঠঃ ইসলামের রুকন বা স্তর সমূহ।

ইসলামের রুকন পাঁচটিঃ

যার প্রথম ও উৎকৃষ্টতম হলো: شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله অর্থাৎ- আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারার্থে কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এর সাক্ষ্য প্রদান করা।

لا إله إلا الله এর অর্থ (ব্যাখ্যা সহকারে)

لا إله إلا الله এর অর্থ: (لا اله) এ বাক্যাংশটুকু আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় সবকিছুকে নাকচকারী এবং (إلا الله) এ বাক্যাংশটুকু যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্তকারী, যার কোন অংশীদার নেই।

لا إله إلا الله এর শর্তসমূহ: আটটি

১. لا إله إلا الله সম্পর্কে বিদ্যার্জন করা, যার বিপরীত অজ্ঞতা। ২. দৃঢ়বিশ্বাস যার বিপরীত ধারণা বা সন্দেহ। ৩. নিষ্ঠাবান হওয়া, যার বিপরীত হলো শিরক ৪. সত্য বলা যার বিপরীত মিথ্যা বলা। ৫. ভালবাসা যার বিপরীত ঘৃণা করা। ৬. আনুগত্য করা, যার বিপরীত হলো পরিত্যাগ করা। ৭. গ্রহণ করা, যার বিপরীত পরিত্যাগ করা। ৮. আল্লাহ ব্যতীত সকল বাতিল মা'বূদকে অস্বীকার করা।

শর্তগুলো নিম্নোক্ত (কবিতার) দুটি পঙক্তিতে একত্রিত করা হয়েছে।

عِلْمٌ يَقِينٌ وَإِخْلَاصٌ وَصِدْقُكَ مَعْ ... مَحَبَّةٍ وَانْقِيَادٍ وَالْقَبُولُ لَهَا

وَزِيدَ ثَامِنُهَا الْكُفْرَانُ مِنْكَ ... سِوَى الْإِلَهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ قَدْ أُلِهَا

সে সাথে "নিশ্চয় মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল" এই সাক্ষ্যদানের বর্ণনা। আর এই কালিমার দাবি হলো তিনি যা সংবাদ প্রদান করেছেন তা বিশ্বাস করা এবং যা নির্দেশ দিয়েছেন তা মেনে চলা। আর যা থেকে নিষেধ করেছেন এবং হুশিয়ারি করেছেন তা বর্জন করা এবং একমাত্র শরীয়ত সিদ্ধ পন্থায় আল্লাহর ইবাদত করা। অতঃপর ছাত্রদের জন্য ইসলামের পাঁচটি রুকুনের অবশিষ্টগুলো বর্ণনা করা হবে। আর তা হলো সলাত, যাকাত, রমজানের রোযা এবং যার

لا إله إلا الله কালিমার রুকুন সমূহ।

النَّفي (لا إله)	الإثبات (إلَّا الله)
১. নাফী: আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা অস্বিকার করা। অর্থাৎ তাগুতের কুফরী করা।	২. ইছবাত: সকল ইবাদত আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা (অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা)

لِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ رُكْنَانِ هُمَا النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ فَاحْفَظْنَهُمَا

কালিমাতুল ইখলাছের আছে দুই রুকুন। নাফী ও ইছবাত দু'টিই মুখস্ত রাখুন।

لا إله إلا الله এর শর্ত সমূহের ব্যাখ্যা:

لا إله إلا الله এর শর্ত সমুহ চাবির দাঁতের ন্যায়। তাই **لا إله إلا الله** কালিমা হলো জান্নাতের চাবি। আর চাবি দাঁত ছাড়া তালা খুলতে পারেনা। তাই এই অনুযায়ী কিতাব ও সুন্নাতে বর্ণিত যে ব্যাক্তি **لا إله إلا الله** বলবে তার জন্য এমন এমন পুরস্কার ইত্যাদি রয়েছে তা অর্জনের জন্য অবশ্যই এই শর্তসমূহ বাস্তবায়ন আবশ্যক।

আর সেই শর্তগুলি ৮ টি:

১. জ্ঞান: তথা **لا إله إلا الله** এর অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। এর বিপরীত হলো এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা। সুতরাং যে এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে সে এর দ্বারা উপকৃত হবেনা। আর এ জন্যই যে ইসলামে প্রবেশ করতে চাই তার জন্য এর অর্থ জানা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন " যে ব্যাক্তি এ জেনে মারা গেল যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই সে ব্যাক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (মুসলিম)

২. দৃড় বিশ্বাস: তথা ১০০% খাটি বিশ্বাস। যদি তাগুতের কুফরীর ব্যাপরে ১% সন্দেহও করে অথবা দ্বিধাদ্বন্দে থাকে তাহলে সে তাওহীদপন্থী নয়। আর যে সকল ইয়াহুদি খৃষ্টানদের কাছে মুহাম্মাদ (স) এর দাওয়াত পৌঁছেছে তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ করে তাহলেও সে তাওহীদপন্থী নয়। রাসূল (স) বলেন: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই এবং নিশ্চয় আমি (তথা মুহাম্মদ) আল্লাহর রাসূল" যে কোন বান্দা দ্বিধাহীন চিত্তে এ দুটি কালিমা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" - (মুসলিম)

৩. একাগ্রতা: সুতরাং যে ব্যাক্তি লৌকিকতার জন্য বলবে অথবা বড় শিরক করবে, যেমন যে ব্যাক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, তাহলে এই কালিমা তার উপকারে আসবেনা। নবী ﷺ বলেন আমার শাফায়াতে মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে ধন্য ঐ ব্যক্তি যে অন্তর থেকে বা মন থেকে একাগ্রচিত্তে বলে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই।

৪. সততা: সুতরাং যে ব্যাক্তি মিথ্যাবাদী হয়ে এই কালিমা উচ্চারণ করে যেমন মুনাফিক, তাহলেও এই কালিমা তার উপকারে আসবেনা। নবী ﷺ বলেন: "যে কোন ব্যাক্তি সচ্ছ অন্তরে এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল তাহলে আল্লাহ সে ব্যাক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। (বুখারী, মুসলিম)

৫. ভালোবাসা: সুতরাং সে শুধু আল্লাহকেই ভালোবাসবে। আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে নয় এবং আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসতে বলেছেন তাদের সকলকেই ভালোবাসবে। আর ভালোবাসার বিপরীত হলো ঘৃণা। আর এজন্যই এটা ইসলাম বিনষ্টের কারণ সমূহের অন্যতম। তাই যে ব্যাক্তি রাসূল (স) এর আনিত কোন বিষয়কে ঘৃণা করবে যদিও সে তা আমল করে তবুও সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾

অর্থাৎ মানুষদের মধ্যে কতিপয় মানুষ আল্লাহকে ছাড়া আরো অনেক শরীক গ্রহণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহর ভালোবাসার মতোই ভালোবাসে।

৬. আনুগত্য স্বীকার করা: অর্থাৎ এই কালিমা অনুযায়ী আমল আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যাক্তি এ অনুযায়ী আমল করেনা এই কালিমা তার উপকারে আসবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾ "

তোমার রবের শপথ! কখোনই তারা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের মাঝে বিবাদমান বিষয়ে তোমার বিচার গ্রহণ করে এবং তুমি যে ফায়সালা দাও সে বিষয়ে তাদের অন্তরে কোন সংশয় না থাকে এবং (এক্ষেত্রে) আত্মসমর্পণ করে"।

৭. গ্রহণ করা: সুতরাং (শরীয়তের) কোন কথা, কর্ম অথবা বিশ্বাসকে প্রত্যাখান করবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓا۟ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا۟ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴾ "নিশ্চয় তারা ছিল এমন যে, যখন তাদেরকে বলা হতো যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই তখন তারা অহংকার করতো এবং তারা বলতো যে, আমরা কি একজন পাগল কবির কথার জন্য আমাদের উপাস্যদের বর্জন করবো? "

৮. অস্বীকার করা : তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত করা হয় তার ইবাদত বাতিল। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের হকদার নয়।

বি:দ্র: কালিমাতুল ইখলাছের ক্ষেত্রে অবশ্যই মুখে উচ্চারণ, অন্তরে বিশ্বাস ও কর্মে বাস্তবায়ন (তিনটিই) আবশ্যক।

ভালোবাসা এর প্রকারভেদ

আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ভালোবাসা। এটি বড় শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেন: মানুষদের মাঝে কতিপয় মানুষ আল্লাহকে ছাড়া আরো অনেককে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই তাদেরকে ভালোবাসে।

কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসা। এটি ওয়াজিব বা আবশ্যক। বরং এটি ঈমানের শক্ত ভিত্তি। এর এটি কর্ম, কর্তা, স্থান-কালপাত্র সকল ক্ষেত্রেই হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল আর যারা তাঁর সহচর তারা কাফেরদের উপর কঠিন, পরস্পরের মাঝে দয়াপ্রবণ" এটাও চার প্রকার।

স্বভাবগত ভালোবাসা। এটি জায়েজ বা বৈধ। তবে শর্ত হচ্ছে এটি যেন আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার উর্দ্ধে না হয়। যেমন সন্তান এবং স্ত্রীকে ভালোবাসা। রাসূল (স) বলেন: তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবেনা যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান এবং তার জন্মদাতা এবং সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হই।

কর্মের ক্ষেত্রে: আর তা এমন কাজ যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয় এবং প্রত্যেক এমন বিষয় যা নিয়ে শরীয়ত অবতির্ণ হয়েছে। যেমন: তাওহীদ, (তা ভালোবাসা)

কর্মীর ক্ষেত্রে: যেমন নবী রাসূল গণ, ফেরেস্তাগণ, সাহাবাগণ এবং প্রত্যেক তাওহীদ পন্থী ব্যাক্তিকে ভালোবাসা।

সময়ের ক্ষেত্রে: যেসব সময়কে আল্লাহ ভালোবাসেন যেমন: লাইলাতুল কদর এবং রাতের শেষ তৃতীয়াংশ।

স্থানের ক্ষেত্রে: তথা ঐ সমস্ত স্থানকে ভালোবাসা যেসব স্থানকে আল্লাহ ভালোবাসেন। যেমন: মাক্কা, আল মাদীনাহ্, আল-নাবাভিয়্যাহ।

"তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা" এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ কি?

অর্থাৎ তাঁর ইবাদত করা যাবে না কেননা প্রভুত্বের ও উপাস্যের এবং স্রষ্টার নাম-গুণের কিছুই তার নেই।

তিনি সৃষ্টির সর্বাধিক ইবাদতকারী এবং তিনি আল্লাহর দাসত্বের পূর্ণতা বাস্তবায়ন করেছেন।

দাসত্বের প্রকারভেদ

১. জনসাধারণের (দাসত্ব): এটি হচ্ছে প্রভুত্বের দাসত্ব করা। এটি প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি বাধ্যতা মূলক। যেমন আল্লাহর বাণী, ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا﴾ অর্থ: আসমানসমূহে ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।" সূরা মারীয়াম-৯৩ আর এর অন্তর্ভূক্ত কাফেরেরাও।

২. বিশেষ (দাসত্ব): এটি জনসাধারণের আনুগত্যের দাসত্ব। যেমন আল্লাহর বাণী, ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا﴾ অর্থ: আর 'রহমান' এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাচল করে।" সূরা আল ফুরকান-৬৩ এ আয়াতটি সকলকে অন্তর্ভূক্ত করছে যারা আল্লাহর শারয়ী বিধান অনুযায়ী তাঁর ইবাদত করে।

৩. বিশেষ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ (দাসত্ব): এটি রাসূলগণের দাসত্ব। যেমন আল্লাহর বাণী, ﴿إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ অর্থ: "তিনি ছিলেন পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।" সূরা আল ইসরা-৩। এ দাসত্বকে বিশেষ বৈশিষ্টের কারণে রাসূল গণের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কেননা কোন ব্যক্তি এই দাসত্বে রাসূলদের সমকক্ষ্য নয়।

আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী:

বংশ পরিচয়

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেম । হাশেম সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশ হতে আর কুরাইশ হচ্ছে আরব গোষ্ঠি এবং আরব হচ্ছে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) এর পুত্র নাবী ইসমাঈল (আ.) এর বংশধর।

مولده: তাঁর জন্ম

তিনি 'আমুল ফীলে (হাতি যুদ্ধের বছর) মাক্কা নগরিতে রাবীউল আওয়াল মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ৬৩ বছর জীবনযাপন করেন। তন্মধ্যে ৪০ বছর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আর ২৩ বছর নাবী ও রাসূল জীবনী। তিনি ছিলেন একজন ইয়াতিম কেননা তাঁর পিতা তাঁর জন্মের পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেন। তিনি তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্বাবধানে ছিলেন। তাঁর দাদার মৃত্যুর পর তাঁর দেখা-শুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর চাচা আবু তালিব।

الدَّرْسُ الثّالِثُ
তৃতীয় পাঠ

أَرْكَانُ الإِيْمَانِ (ঈমানের রুকণ সমূহ)

১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। ২. তাঁর ফেরেসতাদের প্রতি। ৩. তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি। ৪. তাঁর রাসূলের প্রতি। ৫. শেষ দিবসের প্রতি। ৬. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি।

تعريف الإيمان ঈমানের শারয়ী সংজ্ঞা

لغةً:

الإقرار والتَّصديق.

স্বীকৃতি প্রদান ও সত্যায়ন করা।

شرعًا:

জবানে উচ্চারণ করা ও অন্তরে বিশ্বাস করা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গর মাধ্যমে কর্মে বাস্তবায়ন করা।

জবানে উচ্চারণের প্রমাণ:

রাসূল ﷺ এর বাণী; আর তার (তথা ঈমানের) সর্বোচ্চ শাখা হলো "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই" এ কথা উচ্চারণ করা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কর্মের বাস্তবায়নের প্রমাণ:

রাসূল ﷺ এর বাণী; আর তার (তথা ঈমানের) সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।

অন্তরের কর্মের প্রমাণ হলো:

রাসূল ﷺ এর বাণী: "আর লজ্জা হলো ঈমানের অঙ্গ"।

ঈমান বৃদ্ধির প্রমাণ:

আল্লাহ তাআলার বাণী: (أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا). "এই (সূরা) তোমাদের কোন ব্যাক্তির ঈমান বৃদ্ধি করেছে?"

ঈমান কমতির প্রমাণ:

রাসূল ﷺ এর বাণী: (নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন) আমি তোমাদের চেয়ে অতি অল্প বুদ্ধি ও দ্বীনদারি আর কাউকে দেখিনি।

ঈমান বৃদ্ধির উপায়সমূহ:

১. তাওহীদ বিষয়ক অধ্যয়ন বিশেষ করে আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণসমূহের বিষয়ে।
২. সৎকর্ম বেশি করা।
৩. পাপ পরিত্যাগ।
৪. সৃষ্টিজীব সমূহ নিয়ে গবেষণা।

ঈমান কমতির কারণসমূহ:

১. তাওহীদ বিষয়ক অধ্যয়ন বর্জন। বিশেষ করে আল্লাহর নাম ও গুণসমূহের ক্ষেত্রে।
২. সৎকর্ম পরিত্যাগ করা।
৩. গুনাহ করা।
৪. সৃষ্টি জীবসমূহ নিয়ে গবেষণা না করা।



প্রথম রুকন: আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আর এর আবশ্যকীয় বিষয়গুলো হলো:

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস: আর তা অর্জন হয়ে থাকে চারটি বিষয়ের মাধ্যমে	পালনকর্তা হিসেবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস।	উপাস্য হিসেবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস।	আল্লাহর নামসমুহ ও গুণসমুহের প্রতি বিশ্বাস।
বিবেকের মাধ্যমে: কেননা বিবেক স্রষ্টা ব্যতীত কোন সৃষ্টির কল্পনাকে অসম্ভব মনে করে। (أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ). অর্থ: তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?	বাস্তবতার অনুভূতির মাধ্যমে: যেমন তুমি কোন বিপদ-আপদের সম্মূখীন হলে আকাশের দিকে তোমার দু হাত তুলে বলবে যে, হে আমার রব! বিনিময়ে তুমি দেখতে পাবে সে বিপদ আল্লাহর ইচ্ছায় দূর হয়ে গেছে।	সৃষ্টিগত স্বভাবের মাধ্যমে: রাসূল (স) বলেছেন: প্রতিটি নবজাতক ফিতরাত এর উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে হয়তোবা ইহুদী বানায় অথবা খৃষ্টান বানায় অথবা অগ্নিপূজক বানায়।	শরীয়তের মাধ্যমে: ইবনুল কায়্যিম উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহর কিতাবের প্রত্যেকটি আয়াতে তওহীদের প্রমাণ রয়েছে।

দ্বিতীয় রুকন: ফেরেস্তাদের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেস্তাগণ হলো এক অদৃশ্য জগৎ, যাদেরকে আল্লাহ নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁরা আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তাঁর অবাধ্যতা করেনা। তাদের আত্মা রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন (رُوحُ ٱلْقُدُسِ) তথা পবিত্র আত্মা। এবং তাদের শরীর রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন:(جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُو۟لِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۚ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ) তিনি দুই, তিন, চার ডানা বিশিষ্ট ফেরেস্তাদের বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরণ কারী। এবং তাদের বিবেক ও অন্তর রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন: (حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ) "অতঃপর যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দুর করা হয় তখন তারা বলে তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন?" আমরা তাদের প্রতি বিশ্বাস করি। এবং বিশ্বাস করি তাদের নামসমূহ যা আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যেমন, জিবরীল, মীকায়ীল ও ইসরাফীল। এবং (বিশ্বাস করি) তাদের গুন ও বৈশিষ্ট সমূহে। যেমন আল্লাহ বলেন: (لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) " আল্লাহ তাদেরকে যা নির্দেশ করেন তারা তা অমান্য করেনা, এবং তাদেরকে যা নির্দেশ করা হয় তাঁরা তাই করেন" এবং (বিশ্বাস করি) তাদের কর্মসমূহে।

ফেরেস্তাদের মধ্য থেকে যাদের সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে তাদের কতকজন। *তাদের মধ্যে রয়েছে আটজন আরশবহণকারী ফেরেস্তা। *অহীর বার্তাবাহক হিসেবে নিযুক্ত জীবরীল। *সৃষ্টির দায়িত্বে নিযুক্ত মীকায়ীল। তাদের সকলের প্রতি আমরা বিশ্বাস করি, এবং তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে যে সংবাদ এসেছে তার প্রতিও বিশ্বাস করি।

তৃতীয় রুকন: কিতাবসমুহের প্রতি বিশ্বাস

আমাদের প্রতি আবশ্যক এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, কিতাব সমূহ প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর বাণী, রূপকার্থে নয়। এবং সেসব অবতীর্ণ, সৃষ্টি নয়। এবং নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক রাসূলের সাথেই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আমরা এসবের প্রতি বিশ্বাস করি। এবং এসবের নাম, অন্তর্নিহিত সংবাদ, এবং বিধানবলীর প্রতি চাই তা সংক্ষিপ্ত হোক অথবা বিশ্লেষণসহ হোক যতক্ষণ না (কোন কিছু) রহিত (বলে প্রমাণিত) হয়। এবং বিশ্বাস করি যে, কুরআন হলো তার পূর্বেকার কিতাবসমূহের রহিতকারী। আর সেসব কিতাবগুলো হলো: ১. তাওরাত ২. ইঞ্জীল ৩. জাবুর ৪. ইবরাহীম ও মুসা (আ) এর সহীফাহসমূহ।

চতুর্থ রুকনঃ রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস।

আমাদের প্রতি আবশ্যক এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তাঁরা হলেন মানুষ, পালনকর্তার কোন বৈশিষ্ট্য তাঁদের জন্য সাব্যস্ত নয়। আর তাঁরা হলেন উপাসক, উপাস্য নয়। আল্লাহ তাঁদেরকে প্রেরণ করেছেন, তাঁদের প্রতি অহী করেছেন এবং বিভিন্ন নিদর্শন দিয়ে তাঁদেরকে শক্তিশালী করেছেন। আর নিশ্চয় তাঁর আমানত সঠিকভাবে আদায় করেছেন, মানুষ জাতিকে উপদেশ দিয়েছেন এবং তাঁদের প্রতি অর্পিত বিষয় পৌছিয়ে দিয়েছেন আর আল্লাহর পথে যথাযথভাবে জিহাদ ও প্রচেষ্টা করেছেন।

আমরা তাঁদের প্রতি বিশ্বাস করি এবং তাঁদের নামসমূহ গুণাবলী এবং তাঁদের সম্পর্কিত সংবাদের প্রতি যা আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। চাই তা সংক্ষিপ্ত ভাবে হোক অথবা বিশ্লেষণ সহ হোক। আর নবীদের প্রথম হলেন আদাম(আ) আর প্রথম রাসূল হলেন নূহ (আ) । নবী ও রাসূলদের সর্বশেষ হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর নিশ্চয় মুহাম্মাদ (স) এর শরীয়ত এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল শরীয়ত রহিত। এবং রাসূলদের মাঝে অতি দৃঢ়পদ হলেন পাঁচজন, যাদের বর্ণনা (শূরা) ও (আহযাব) এই দুটি সুরাতে এসেছে। আর তারা হলেন: ১. মুহাম্মাদ (স) ২. নুহ (আ) ৩. ইবরাহীম (আ) ৪. মূসা (আ) ৫. ঈসা (আ)

পঞ্চম রুকনঃ আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস

এ বিশ্বাস নবী (স) এর সংবাদ অনুযায়ী মৃত্য পরবর্তী সংগঠিত সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসকে শামিল করে। যেমন:-

কবরের পরীক্ষা, শিঙায় ফুৎকার, কবর থেকে মানুষের উত্থান, (নেকী ও পাপ মাপের) দাঁড়িপাল্লা, আমলনামা, পুলসিরাত, হাউজ, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম ও কিয়ামতের দিন জান্নাতে মুমিনদের তাদের প্রতিপালকের দর্শন ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়সমূহ।

الرُّكن السَّادس: الإيمان بالقدر خيره وشرِّه

ষষ্ঠ রুকন: ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস

আর এর চারটি স্তর রয়েছে; যা একজন কবি তার একটি কথায় একত্রিত করেছেন।

عِلْـمٌ، كِتابَـةُ مَولَانَـا، مَشِـيْئَتُه وَخَلْقُـهُ وَهُـو إيْجَـادٌ وَتَكْـوِيْنُ

১. জ্ঞান ও ২. লিখন মোদের প্রভুর
আর হলো তার মনের ৩. পণ;
এবং তাহার ৪. সৃষ্টি যাহা তিনিই করেন সুগঠন।

العِلْمُ

জ্ঞান: এ বিশ্বাস রাখা যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান রাখেন সামগ্রিকভাবে এবং বিশ্লেষণসহ এর প্রমাণ: আল্লাহর বাণী: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ "তিনি জানেন যা তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা তাদের পশ্চাতে রয়েছে"

الكتابةُ

লিখন: এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি জিনিসের ভাগ্য লিখে রেখেছেন। এর প্রমাণ: আল্লাহর বাণী ﴿وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾ "আকাশ ও জমিনে এমন কোন অদৃশ্য বিষয় নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই" অর্থাৎ তাতে সবকিছুই রয়েছে।

المَشيئةُ

ইচ্ছা: এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ যা চান তাই হয়। আর যা চান না তা হয় না। আর বান্দারও ইচ্ছা রয়েছে তবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। যেমন:- আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা কোন ইচ্ছা করতে পারনা"

الخَلْقُ

সৃষ্টি: এ বিশ্বাস রাখা যে, নিশ্চয় বান্দাহ ও তার কর্মসমূহ এবং এভাবে সকল জগতই আল্লাহর সৃষ্টি। এর প্রমাণ: আল্লাহর বাণী: (ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ) "আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকারী" (আল্লাহ আরও বলেন: (وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ). "আর আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যে কর্ম সম্পাদন করো তা সৃষ্টি করেছেন"

الدَّرْسُ الرَّابِعُ চতুর্থ পাঠ

أَقْسَامُ التَّوْحِيدِ، وَأَقْسَامُ الشِّرْكِ
তাওহীদ ও শিরকের প্রকারভেদ

تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ	وَتَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ	وَتَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এর পরিচয়: তা হলো একথা বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল কিছু সৃষ্টি কর্তা। তিনিই সবকিছুর পরিবর্তনকারী, এক্ষেত্রে তাঁর কোন অংশিদার নেই। (আল্লাহর সকল কার্যা দির ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করা। অর্থাৎ সৃষ্টি, রাজত্ব ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করা)।

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ এর পরিচয়: তা হলো একথা বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা একমাত্র সত্য 'মাবূদ। ইবাদতে তাঁর কোন অংশিদার নেই। এটিই হলো لا إله إلا الله এর অর্থ। কেননা لا إله إلا الله এর অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্য কোন 'মাবূদ নেই।

সুতরাং সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য একনিষ্ঠ হওয়া ওয়াজিব বা আবশ্যক। যেমন: সলাত ও রোযা ইত্যাদি। এগুলোর কোনটিই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করা জায়েয নেই। অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করাই হলো তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত: কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সেগুলোকে একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা কোন ধরণের পরিবর্তন, বিনষ্টকরণ, পদ্ধতি বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত প্রদান ব্যতীত। (আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যে সকল নামে ও গুণে তাঁর কিতাবে বা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন সেক্ষেত্রে তাঁর একত্ব ঘোষণা করা)। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তা তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহ তা'আলা যা দূরীভূত করেছেন তা দূরীভূত করা কোন ধরণের পরিবর্তন, বিনষ্টকরণ, পদ্ধতি বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত প্রদান ব্যতীত।

আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর প্রতি আমল করে:

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)

অর্থ:"বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয় (১) আল্লাহ হচ্ছেন সামাদ (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী); (২) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি (৩) এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই (৪)।" (সূরা ইখলাস: ১-৪) আল্লাহ আরো বলেন, (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ). অর্থ: কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রোষ্টা। (সূরা আশ-শুরা-১১)

কোনো কোনো আলেম তাওহীদকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তারা তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফতকে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এতে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা উভয় প্রকারেই উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

أَقْسَامُ الشِّرْكِ ثَلَاثَةٌ

শিরকের প্রকার সমূহের বিবরণ: শিরক তিন প্রকার

شِرْكٌ أَكْبَرُ	شِرْكٌ أَصْغَرُ	شِرْكٌ خَفِيٌّ
শিরকে আকবার বা বড় শিরক	শিরকে আসগার বা ছোট শিরক	শিরকে খফী বা গোপনীয় শিরক

বড় শির্কের পরিচয়: বড় শিরক আমলকে বাতিল ও জাহান্নামে যাওয়াকে আবশ্যক করে দেয় ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি বড় শিরক অবস্থায় মারা যায়। যেমন আল্লাহ বলেছেন, (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) অর্থ:"আর যদি তারা শির্ক করত তবে তাঁদের কৃত কর্ম নিষ্ফল হত। (সূরা আল আন'আম-৮৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ) অর্থ:"মুশরিক্‌রা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফুরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদসমূহের আবাদ করবে---এমন হতে পারে না। তারা এমন যাদের সব কাজই নষ্ট হয়েছে এবং তারা আগুনেই স্থায়ী ভাবে অবস্থান করবে।" (সূরা আত ত্বাওবাহ-১৭)

যে ব্যক্তি বড় শির্ক অবস্থায় মারা যাবে তাকে কখনই ক্ষমা করা হবে না। তার উপর জান্নাত হারাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

(إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ) অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (সূরা আন-নিসা-৪৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, (إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ) অর্থ: "নিশ্চয় কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা আল-মায়েদাহ-৭)

বড় শির্কের কিছু নমুনা

মৃত বা মূর্তির জন্য পশু যবেহ করা। ইত্যাদি	মৃত বা মূর্তির জন্য মানত করা।	মৃত বা মূর্তির নিকট সাহায্য চাওয়া।	মূর্তির নিকট প্রার্থনা করা।	মৃতদের নিকট প্রার্থনা করা।

ছোট শির্কের পরিচয়

যা কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা সাব্যস্ত ও শিরক নামে পরিচিত। কিন্তু তা বড় শিরকের অন্তর্ভূক্ত নয়। যেমন: কিছু কিছু আমলের ক্ষেত্রে লৌকিকতা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা বা একথা বলা যে, আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যা ইচ্ছা করেন ইত্যাদি। প্রমাণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী, «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: الرِّيَاءُ» অর্থ: "আমি তোমাদের ব্যাপারে যা সর্বাধিক ভয় করি তা হলো ছোট শিরক। অতঃপর তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন: তা হলো লৌকিকতা।" রাসূল (স.) আরো বলেন, «مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» অর্থ:"যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য নামে শপথ করল, সে অবশ্যই শিরক করল।" তিনি (স.) বলেন, «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ» অর্থ:"তোমরা একথা বলিও না যে, আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যা ইচ্ছা করেন। বরং তোমরা বল:আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা ইচ্ছা করে।" (আবুদাউদ) এ ধরণের শিরক দ্বীন থেকে বের করে দেয় না এবং জাহান্নামে চিরস্থায়িত্বকে আবশ্যক করে না। কিন্তু তা আবশ্যকীয় পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী ।

তৃতীয় প্রকার শিরক

তা হলো গোপন শিরক। এর প্রমাণ হলো রাসূল (স.) এর বাণী

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْهِ»

অর্থ: "আমি কি তোমাদেরকে ঐ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না যা তোমাদের ব্যাপারে আমার নিকট দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর? তাঁরা বললেন: হ্যাঁ- হে আল্লাহ রাসূল (স.) তিনি উত্তরে বললেন: তা হলো গোপন শিরক। একজন ব্যক্তি সলাত আদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হয় অতঃপর সে তার প্রতি মানুষের দৃষ্টিপাত দেখে তার সলাতকে সুশোভিত করে।"

শির্ককে শুধু দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়:

যথা- বড় শিরক ও ছোট শিরক। আর গোপন শিরক উভয় শিরককে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। সুতরাং গোপন শিরক বড় শিরকে পরিণত হবে। যেমন: মুনাফিকদের শিরক। কেননা তারা তাদের বাতিল আক্বীদাহসমূহকে গোপন করে রাখে আর আত্ম ভয়ের কারণে তারা ইসলামকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে। এবং গোপন শিরকও ছোট শিরকে পরিণত হবে। যেমন: লৌকিকতা। যেমনটি পূর্বোল্লেখিত হাদীস গুলো থেকে উপলব্ধি হয়।

الفرق بين الشّرك الأصغر والأكبر
বড় শির্ক ও ছোট শির্কের পার্থক্য

الشِّرك الأكبر: বড় শির্ক

১. দ্বীন থেকে বের করে দেয়।
২. সকল আমলকে নষ্ট করে দেয়।
৩. বড় শিরককারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী
৪. বড় শিরক সরকারের পক্ষ হতে তার জান ও মাল নেওয়া বৈধ করে দেয়।
৫. এটি যে বড় শিরক এ ব্যাপারে দলীল থাকবে।
৬. ব্যাক্তির এই বিশ্বাস থাকা যে এই বিশ্বের মাঝে কারণের (মাধ্যম) গোপন হস্তক্ষেপ রয়েছে।
৭. যে ব্যাক্তি বড় শিরক অবস্থায় মারা যাবে তাকে ক্ষমা করা হবে না।
৮. যদি তা থেকে সে তওবা করে তাহলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করতেন তবে দুটি জায়গায় নয়।

ক) পশ্চিম দিক থেকে যখন সূর্যোদয়ের সময়।
খ) মৃত্যু মুমূর্ষ অবস্থায়।

الشِّرك الأصغر: ছোট শির্ক

১. দ্বীন থেকে বের করে দেয় না।
২. সকল আমলকে নষ্ট করে দেয় না কিন্তু নির্দিষ্ট আমল নষ্ট করে দেয়।
৩. ছোট শিরক কারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়।
৪. ছোট শিরক তার জান ও মাল ছিনিয়ে নিতে বৈধতা দেয় না।
৫. এটি যে ছোট শিরক এ ব্যাপারে দলীল থাকা।
৬. আল্লাহ যাকে মাধ্যম করেননি তাকে মাধ্যম মনে করা।
৭. প্রত্যেক ঐ সকল পাপ যা বড় শিরকে পৌছার মাধ্যম তাই ছোট শিরক।
৮. যে সকল পাপের ব্যাপারে শরীয়ত বলেছে যে, এটি শিরক বা কুফরীকিন্তু তা নির্দিষ্ট জানা যাচ্ছে না তহলে (সেক্ষেত্রে মূলনীতি হলো): এটি ছোট শিরক (যা দ্বীন থেকে বের করে দেয় না) যতক্ষণ না এ বড় শিরক হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

الدَّرْسُ الْخَامِسُ
পঞ্চম পাঠ: ইহসান

الإِحْسَانُ ইহসানের পরিচয়:

رُكْنُ الْإِحْسَانِ، وَهُوَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

আপনি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আপনি যদি তাঁকে দেখতে না পান তাহলে মনে করেন যে, নিশ্চয় তিনি আপনাকে দেখছেন

الإحسان ركنٌ واحدٌ وتحته مرتبتان:
ইহসান একটি রুকন তবে তার দু'টি স্তর রয়েছে

عبادة المشاهدة:

১. চাক্ষুষ ইবাদত। তা হচ্ছে, আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা প্রাপ্তির আশায় আকাঙ্খা, ভালবাসা ও আগ্রহের সাথে ইবাদত করা। আর এটা হলো নবী ও রাসূলদের ইবাদত যেমন রাসূল (স) বলেন: "আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?" সুতরাং এই ইবাদতের কারণ হলো আল্লাহ ভীতির সাথে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তার প্রতি আগ্রহ ভালোবাসা ও অতি আকাঙ্খা।

عبادة المراقبة:

২. পর্যবেক্ষণের ইবাদত। তা হচ্ছে, ভয়-ভীতির ও (শাস্তি থেকে) পলায়নের জন্য ইবাদত। যার বাহিরে কোন মুসলিম নেই।

أسئلةٌ على التّوحيد
তাওহীদ বিষয়ক প্রশ্নমালা

১. দ্বীনের স্তর কয়টি?
ক. ৩ টি খ. ২ টি গ. ৫ টি

২. ইসলামের রুকন কয়টি?
ক. ৫টি খ. ৬টি গ. ৭টি

৩. ইসলাম ঈমানের চেয়ে উচু স্তর
ক. সঠিক খ. ভুল

৪. কালিমা তয়্যিবার রুকন কয়টি?
ক. ৭টি খ. ৮টি গ. ২টি

৫. কালিমা তায়্যিবার শর্ত কয়টি?
ক. ৮টি খ. ৭টি গ.৫টি

৬. কালিমা তয়্যিবার একটি শর্ত (জ্ঞান) তার অর্থ
ক. কোন বিষয়কে তার প্রকৃতরূপে জানা খ. আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই।

৭. কোন ব্যক্তি যদি ঐসকল মানুষের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে যাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছেছে অথচ তারা ঈমান আনেনি তবে তার বিধান কি হবে?

ক. তাহলে সে বড় কুফরী করল খ. বিশ্বাস যদি সন্দেহের চেয়ে বড় হয় তাহলে সে কুফরি করল না।

৮. কালিমা তয়্যিবার একটি শর্ত কবুল তথা গ্রহণ করা এর দ্বারা উদ্দেশ্য
ক. কথা খ. কর্ম গ. বিশ্বাস ঘ. উল্লেখিত সবগুলো

৯. কালিমা তয়্যিবার ক্ষেত্রে লৌকিকতা, দানের ক্ষেত্রে লৌকিকতার মতো ছোট শিরক।
ক. সঠিক খ. ভুল

১০. যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস করা ছাড়াই কালিমা তায়্যিবা জবানে উচ্চারণ করে সে ব্যক্তি হলো--
ক. তাওহীদ পন্থী খ. মুসলিম তবে মুমিন নয় গ. দূর্বল ঈমানদার ঘ.বড় কাফের

১১. যদি কেউ নবীকে আল্লাহর মতো সমান ভালোবাসে তবে
ক. বড় কুফরী করলো খ. ছোট কুফরী করলো গ. বড় গুণাহ করলো

১২. ভালোবাসা কত প্রকার?

ক. চার খ. তিন গ. দুই

১৩. আল্লাহর জন্য ভালোবাসা কর্ম, কর্মী, সময়, স্থান সকল কিছুতেই হতে পারে

ক. সঠিক খ. ভুল

১৪. আল্লাহর সমান কাউকে ভালোবাসা

ক. ছোট শিরক খ. আবশ্যক গ. বড় শিরক

১৫. আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা

ক. বৈধ খ. আবশ্যক গ. বড় শিরক

১৬. ইবাদতের প্রকার কয়টি?

ক. দুইটি খ. তিনটি গ. চারটি

১৭. সকল সৃষ্টি এমন কি কাফেররা পর্যন্ত জবরদস্তিমূলক দাসত্বের অর্থে আল্লাহর দাস

ক. সঠিক খ. ভুল

১৮. যদি কোন ব্যক্তি কালিমা তায়্যিবা বলে সকল আমল ছেড়ে দেয়, সলাতও পড়ল না এবং অন্য কোন ইবাদতও করল না তাহলে সে কালিমা তার

ক. উপকারে আসবে খ. উপকারে আসবেনা

১৯. (عبده و رسوله) অর্থ এমন বান্দা যার ইবাদত করা যায় না, এমন রাসূল যাকে মিথ্যা বলা যায় না

ক. সঠিক খ. ভুল

২০. তিনি যা আদেশ করেন সে ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা এবং যে সংবাদ প্রদান করেন তা সত্যায়ন করা এটা (ان محمدا عبده و رسوله) এর

ক. অর্থ খ . দাবি

২১. যে ব্যক্তি নবী (স) এ জন্য রবের কোন বৈশিষ্ট সাব্যস্ত করলো সে যেন তাঁকে বান্দা হিসেবে সাক্ষই দেয়নি।

ক. সঠিক খ. ভুল

২২. নবীর জন্য সবচেয়ে বড় গুণ হলো তিনি

ক. আল্লাহর রাসূল খ. তাঁর বান্দাহ ও রাসূল গ. সর্বশেষ নবী।

২৩. যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে ভালো কাজ মনে করে কোন নতুন কিছু আবিস্কার করলো সে যেন এ ধারণা করলো যে মুহাম্মাদ (স) তাঁর রিসালাতের খিয়ানত করেছেন।

কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ " আজকের দিন আমি তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিলাম। সুতরাং সেদিন যা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত ছিলনা আজও তা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনা কথাটি কার?

ক. ইবনে তায়মিয়্যার খ. ইমাম মালেকের গ. ইবনে বাযের.

২৪. নবী (স) কোন নবীর বংশধর?

ক. ইসহাকের খ. ইসমাইলের

২৫. শুন্যস্থান পূরণ কর

নবী (স) জন্মগ্রহণ করেছেন ------- সালে -------- শহরে এবং তাঁর বয়স মোট ---- বছর। এর মধ্যে ------- বছর নবুয়াত দান করা হয়েছে ------ মাধ্যমে এবং রিসালাত দান করা হয়েছে ------ মাধ্যমে।

২৬. তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে

ক. তাঁর জাতির প্রতি খ. মানুষের কাছে গ. মানুষ ও জ্বীনদের কাছে।

২৭. মেরাজ হলো তাঁর মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ

ক. সঠিক খ. ভুল

২৮. নবী (স.) হিজরত করেছেন কোন দিকে?

ক. তায়েফে খ. হাবশায় গ. মদীনায় খ. উল্লেখিত সবখানেই।

২৯. নবী (স.) এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ কয়টি?

ক. একটি খ. দুইটি গ. তিনটি ঘ. চারটি ঙ. পাঁচটি

৩০. রাসূলের সন্তানাদির সংখ্যা কত?

ক. তিন খ. চার গ. সাত

৩১. নবী (স.) বিদায় হজ্জ করেছেন এটা প্রমাণ করে যে ইতিপূর্বে তিনি আরও হজ্জ করেছেন

ক. সঠিক খ. ভুল

৩২. রাসূলের জীবন চরিত্র অধ্যয়ন করা

ক. আবশ্যক খ. উত্তম গ. বৈধ

৩৩. শুন্যস্থান পূরণঃ

ঈমানের শারয়ী অর্থ হলো ------ উচ্চারণ করা -------- বিশ্বাস করা -------- মাধ্যমে আমল করা ----- মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং ----- মাধ্যমে হ্রাস পায়।

৩৪. ঈমানের রুকন কয়টি?

ক. ছয়টি খ. পাঁচটি গ. চারটি

৩৫. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আরো কতিপয় বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসকে আবশ্যক করে। তার সংখ্যা কতটি?

ক. চার খ. তিন গ. দুই

৩৬. আল্লাহর অস্তিত্ব চেনার ব্যাপারে মৌলিক দলিল কয়টি?

ক. চারটি খ. অসংখ্য

৩৭.মীকায়ীল হলেন বৃষ্টির জন্য নিযুক্ত ফেরেস্তা
ক. সঠিক খ. ভুল

৩৮.আদম সন্তানের অন্তর রয়েছে ফেরেস্তাদের নেই
ক. সঠিক খ. ভূল

৩৯.আমরা যেসব কিতাবের নাম জানি সেসবের সংখ্যা কত?
ক. ছয় খ. চার গ. সাত ঘ. অনেক

৪০. আল্লাহ্ প্রত্যেক নবীর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন
ক. সঠিক খ. ভুল

৪১. সর্বপ্রথম রাসূল হলেন আদম (আ.)
ক. সঠিক খ. ভুল

৪২. মুহাম্মাদ (স.) রাসূল, তিনি নবী নন
ক. সঠিক খ. ভুল

৪৩. রাসূলদের মধ্যে দৃঢ় চিত্তের অধিকারীদের সংখ্যা কত?
ক. পাঁচ খ. চার গ. অনেক

৪৪. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস, মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে মানুষের কবর থেকে উত্থান পর্যন্ত সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসকে শামিল করে
ক. সঠিক খ. ভুল

৪৫. ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তার সংখ্যা কত?
ক. চার খ. পাঁচ গ. তিন

৪৬. কোন জিনিস সংগঠিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ জানেন কি?
ক. হ্যাঁ খ. না

৪৭. মানুষ যা করে আল্লাহ্ কি তা সব জানেন?
ক. হ্যাঁ খ. না।

৪৮. মানুষ যা করে আল্লাহ কি তা সব লিখে রেখেছেন?

ক. হ্যাঁ খ. না

৪৯. বান্দার স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি রয়েছে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে?

ক. সঠিক খ. ভুল

৫০. বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি?

ক. হ্যাঁ খ. না

৫১. তাওহীদ কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিন গ. এ ব্যাপারে কোন বিরোধ নেই।

৫২. বড় শিরক ও ছোট শিরক এর মাঝে ৫ টি পার্থক্য নির্ণয় কর

ক.

খ.

গ.

ঘ.

ঙ.

৫৩. বড় শিরক ও ছোট শিরকের প্রত্যেকটি থেকে পাঁচটি উদাহরণ পেশ কর।

৫৪. বিশ্বাসগত নেফাক্বী ছোট শিরক, যা ইসলাম থেকে বহিস্কারকারী নয়

ক. সঠিক খ. ভুল

৫৫. ইহসানের রুকন-?

ক. একটি খ. দুইটি।

الدَّرس السادس
ষষ্ঠ পাঠ

شُرُوطُ الصَّلاةِ সলাতের শর্তসমূহ

১. মুসলিম হওয়া। ২. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। ৩. ভাল-মন্দের পার্থক্যকারী হওয়া। ৪. সাময়িক অপবিত্রতা দূর করা। ৫. অপবিত্র বস্তু পরিস্কার করা। ৬. গোপনাঙ্গ আবৃত করা। ৭. সলাতের সময় হওয়া। ৮. ক্বিবলামুখী হওয়া। ৯. নিয়্যাত করা।

الشَّرط الأوَّل: الإسلام প্রথম: মুসলিম হওয়া:

এর বিপরীত হলো কুফরী। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহকে গালি দেয় বা যেকোন ধরণের ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সম্পাদন করে তাহলে ত্বাওবা না করা পর্যন্ত তার সলাত গ্রহণ করা হবে না।

الشَّرط الثَّاني: العقل দ্বিতীয়: জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া

এর বিপরীত হলো পাগল আর মাতাল

الشَّرط الثَّالث: التَّمييز তৃতীয়: পার্থক্যকারী হওয়া:

(এখানে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং তার অর্থ হলো জিনিসের পার্থক্য করা। অর্থাৎ সে প্রশ্ন ও উত্তর উভয়টি জানে। এ ক্ষেত্রে বয়সের সীমাবদ্ধতা নেই। কিন্তু সাধারণত সাত বছর বয়সে পার্থক্য করতে পারে।)

ছোট বাচ্চার সলাত কখন সঠিক হবে? যখন সে বিভিন্ন জিনিসের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে অর্থাৎ প্রশ্ন ও উত্তর বুঝতে পারবে এবং পানি ও আগুনের মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারবে। নচেৎ সলাত সহীহ হবে না।

الشَّرط الرَّابع: رفع الحدث
চতুর্থ: অপবিত্রতা দূর করা

الحدث الأصغر: ছোট অপবিত্রতা

যা অযুর মাধ্যমে দূর করা হয়।

الحدث الأكبر: বড় অপবিত্রতা

যা গোসলের মাধ্যমে দূর করা হয়।

الشَّرط الخامس: إزالة النَّجاسة পঞ্চম: অপবিত্র বস্তু পরিস্কার করা:

(শরীর হতে, সলাতের জায়গা হতে বা কাপড় হতে। কেউ যদি অপবিত্র অবস্থায় সলাত আদায় করে অথচ সে অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে অবহিত, তা দূর করতে সক্ষম এবং তা তার স্বরণে রয়েছে তাহলে তার সলাত বাতিল। অপবিত্র বস্তু তিনভাবে পরিস্কার করা যায়:

متوسِّطةٌ:

মধ্যম অপবিত্র

যেমন নারী-পুরুষের পেশাব। এ ক্ষেত্রে পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে।

مخفَّفةٌ

ছোট অপবিত্র

যেমন ছেলে শিশুর পেশাব যে খাবার খায় না (অর্থাৎ শুধু মায়ের দুধ খায়)। এ ক্ষেত্রে তা পেশাবের স্থানে শুধু পানি ছিটা দিলেই যথেষ্ট, ধৌত করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে বীর্য, মুযি,ওয়াদী বা মানী এগুলো ছোট অপবিত্রের অন্তর্ভূক্ত। কেননা তা পবিত্র। তবে রাসূল (স.) বির্যের উপর পানি ছিটিয়ে দিতেন যখন বির্য তরল থাকত, আর যদি বির্য শুকিয়ে যেত তাহলে তিনি নখ দিয়ে উঠিয়ে ফেলতেন।

مغلَّظةٌ

বড় অপবিত্র

যেমন কুকুরের অপবিত্রতা। কুকুরের অপবিত্রতাকে দূর করতে সাত বার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে যার প্রথম বার মাটি দিয়ে।

الأعيان النّجسة
কিছু অপবিত্র বস্তু

মানুষের পেশাব-পায়খানা, যে সকল প্রাণীর গোস্ত ভক্ষণ করা বৈধ নয় তার পেশাব ও মল এবং সমস্ত হিংস্র প্রাণী অপবিত্র। তবে তন্মধ্যে কিছু প্রাণীকে পৃথক করা হয়েছে যার থেকে দূরে থাকা কষ্টকর। যেমন-বিড়াল, কচ্ছপ ও গাধা, খচ্ছর। অনুরুপ অপবিত্র বস্তু হলো প্রবাহিত রক্ত যা প্রাণী যবেহ করার পর প্রবাহিত হয়। (গোপনাঙ্গ) পথ দিয়ে নির্গত রক্ত, সমস্ত মৃত প্রাণী তবে মৃত মানব, মাছ ও ফড়িং ব্যতীত।

الشَّرط السَّادس: ستر العورة ষষ্ঠ: গোপনাঙ্গ আবৃত করা
والعورات ثلاثةٌ: (আবৃতের দিক দিয়ে) গোপনাঙ্গ তিন প্রকার

مخفَّفةٌ:
১. যা ঢাকার বিধান হালকা। ছোট আবৃত গোপনাঙ্গ তা হলো সাত থেকে দশ বছরের ছেলের ক্ষেত্রে। সে তার দুই গোপনাঙ্গ আবৃত করে রাখবে।

مغلَّظةٌ:
২. যা ঢাকা অতি আবশ্যক। অধিক আবৃত গোপনাঙ্গ। তা হলো পূর্ণ বালেগা নারীর ক্ষেত্রে। সে তার মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর আবৃত করে রাখবে। তবে মাহরাম নয় এমন লোকদের কাছে মুখও আবৃত করবে।

متوسِّطةٌ:
৩. যা ঢাকার বিধান পূর্বের দৃষ্টির মাঝামাঝি। মধ্যম আবৃত গোপনাঙ্গ। তা হলো উপরোল্লেখিত ব্যতীত সকল অবস্থা। সে তার নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত আবৃত করে রাখবে। এ ক্ষেত্রে দুই কাধ আবৃত করা মুস্তাহাব ও পূর্ণ সৌন্দর্য্য গ্রহণ করা।

الشَّرط السَّابع: دخول الوقت সপ্তম: সলাতের সময় হওয়া

সলাতের সময় হওয়ার পূর্বে এবং সলাতের সময় শেষ হওয়ার পর সলাত আদায় করা শুদ্ধ হবে না। তবে বিশেষ কারণ স্বাপেক্ষে যদি অন্য আরেকটির সাথে একত্রে আদায় করা হয় তবে তা ভিন্ন কথা। যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে সলাতকে বিলম্ব করে তাহলে সে গুণাহগার হবে।

الشَّرط الثَّامن: استقبال القبلة অষ্টম: ক্বিবলা মুখি হওয়া

তবে সফররত অবস্থায় নফল সলাতে তার বাহন বা বিমান যেদিকে থাকনা কেন সে সলাত আদায় করতে পারবে। এবং যদি কিবলামুখী হতে সক্ষম না হয় এবং সেদিক হলে শত্রুর ভয় থাকে তাহলেও কিবলমুখী না হলে সমস্যা নাই।

الشَّرط التَّاسع: النِّيَّة নবম: নিয়ত করা-

নিয়তের স্থান হলো অন্তর। মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যাত করা বিদ'আত। আর যদি নিয়তটা সলাতের কিছু সময় পূর্বে করে অথবা সলাতের সময় শুরু হওয়া মাত্রই করে তবে তার সলাত শুদ্ধ হবে।

تنبيهاتٌ مهمَّة: বিশেষ সতর্কিকরণ:

১. শর্ত ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে, অজ্ঞতা, ভূলে যাওয়া, সেচ্ছায় এ সব কিছু গ্রহণ করা হবেনা। তবে যদি কোন ব্যাক্তি অজ্ঞতাবশত অথবা ভূলে তার উপর অপবিত্র কিছু থাকা অবস্থায় সলাত আদায় করে তবে তার সলাত শুদ্ধ হবে। কেননা এই শর্তটি হলো বর্জনের শর্ত, কর্মের শর্ত নয়।

২. শর্তসমূহ ইবাদতের বহির্ভূত এবং তা ইবাদতের পূর্বে আসের। আর এই শর্তসমূহ ইবাদতের শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

الدَّرْسُ السَّابع সপ্তম পাঠ:

أَرْكَانُ الصَّلاةِ সলাতের রুকনসমূহ

সলাতের রুকনসমূহ: ১৪ টি যথা-

১. সক্ষমতা অনুযায়ী দন্ডায়মান হওয়া: ইহা ফরজ সলাতের ক্ষেত্রে। দাঁড়াতে অক্ষম এমন ব্যক্তিদের জন্য দন্ডায়মান হওয়া জরুরী নয়। কেননা এমতাবস্থায় দাঁড়ালে সলাতের বিনম্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে। যদি সে দাঁড়াতে কিছু সক্ষম হয় তাহলে সে দাঁড়াবে। বসে নফল সলাত আদায় করা জায়েয আছে কিন্তু সে দাঁড়ানো ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে, আর যদি পার্শ্বদেশে ভর করে সলাত আদায় করে তাহলে সে বসা ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে।

২. তাকবীরে তাহরীমা বলা: অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা। এছাড়া অন্য শব্দ বলা বৈধ নয়।

৩. সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা: প্রত্যেক রাক'আতে সূরা আল-ফাতিহার আয়াত, হারকাত, শব্দসমূহ ও অক্ষরসমূহ ধারাবাহিকভাবে পূর্ণতার সাথে পড়া চায় তা উচ্চ স্বরে কেরাতের সলাত হোক বা নিম্ন স্বরের কেরাতের সলাত হোক। যখন সে ইমামকে রুকু অবস্থায় পাবে তখন তার উপর সূরা আল-ফাতিহা পড়তে হবে না।

৪. রুকু করা।

৫. রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৬. সাতটি অঙ্গের উপর ভর করে সাজদাহ দেওয়া: (কপাল, নাক, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ।)

৭. সাজদাহ থেকে উঠা।

৮. দুই সাজদার মাঝে বৈঠক করা।

৯. সকল কার্যাদির ক্ষেত্রে ধীরস্থতা অবলম্বন করা: প্রত্যেক রুকনে আবশ্যকীয় দু'আ পড়ার মাধ্যমে ধীরস্থতা অবলম্বন হয়ে থাকে।

১০. রুকন সমূহে ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।

১১. শেষে তাশাহ্হুদ পাঠ করা। ১২. শেষ তাশাহ্হুদে বৈঠক করা।

১৩. রাসূল (স.) এর প্রতি দুরূদ পাঠ করা: দুরূদে ইবরাহীম পড়া।

১৪. দুদিকে সালাম ফিরানো।

প্রথম রুকন :সক্ষমতা অনুযায়ী দন্ডায়মান হওয়া:

ফরজ সলাতের ক্ষেত্রে :

ইহা ফরজ সলাতের ক্ষেত্রে। দাঁড়াতে অক্ষম এমন ব্যক্তিদের জন্য দন্ডায়মান হওয়া জরুরী নয়। কেননা এমতাবস্থায় দাঁড়ালে সলাতের বিনম্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে। যদি সে দাঁড়াতে সক্ষম হয় তাহলে সে দাঁড়াবে।

নফল সলাতের ক্ষেত্রে:

বসে নফল সলাত আদায় করা জায়েয আছে কিন্তু সে দাড়ানো ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে, আর যদি পার্শ্বদেশে ভর করে সলাত আদায় করে তাহলে সে বসা ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে।

দ্বিতীয় রুকন:

তাকবীরে তাহরীমা বলা: অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা। এছাড়া অন্য শব্দ বলা বৈধ নয়।

তৃতীয় রুকন:

সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা: প্রত্যেক রাক'আতে সূরা আল-ফাতিহার আয়াত, হারকাত, শব্দসমূহ ও অক্ষরসমূহ ধারাবাহিকভাবে পূর্ণতার সাথে পড়া চায় তা উচ্চ স্বরে কেরাতের সলাত হোক বা নিম্ন স্বরের কেরাতের সলাত হোক। যখন সে ইমামকে রুকু অবস্থায় পাবে তখন তার উপর সূরা আল-ফাতিহা পড়তে হবে না।

নবম রুকন:

সকল কার্যাদির ক্ষেত্রে ধীরস্থতা অবলম্বন করা: প্রত্যেক রুকনে আবশ্যকীয় দু'আ পড়ার মাধ্যমে ধীরস্থতা অবলম্বন হয়ে থাকে।

تنبيهٌ مهمٌّ: বিশেষ সতর্কিকরণ:

রুকনসমূহ ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। অজ্ঞতাবশত ভুলে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে রুকন ত্যাগ করা গ্রহণযোগ্য নয়। রুকনসমূহ ত্যাগ ভুলের সাজদাহ ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। বরং ব্যাক্তিকে উপস্থিত সলাতকে পুনরায় পড়তে নির্দেশ করা হবে। আর এই সময়ের সলাতের পূর্বে যেসব সলাত পড়েছে এবং কতিপয় রুকন ছেড়ে দিয়েছে তবে এক্ষেত্রে তার উজর গ্রহণ করা হবে। কেননা নবী (স.) ভুল পদ্ধতিতে সলাত আদায়কারী এক ব্যক্তিকে সকল সলাতের পুনরাবৃত্তি করতে নির্দেশ করেননি। তাকে শুধু মাত্র উপস্থিত সলাতকে পুনরায় পড়তে বলেছেন, অথচ সে তাতে ধীরস্থিরতা ত্যাগ করেছে। আর তা হলো রুকুন। আল্লাহ অধিক জানেন।

الدَّرْسُ الثَّامن
অষ্টম পাঠ

وَاجِبَاتُ الصَّلاةِ সলাতের ওয়াজিবসমূহ

সলাতের ওয়াজিবসমূহ ৮টি:

১. তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সকল তাকবীর বলা।

২. ইমাম ও একক ব্যক্তি সকলের জন্য سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলা ।

৩. সকলের জন্য رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ) বলা।

৪. রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুবহানা রব্বিইয়াল আযীম) বলা।

৫. সিজদাহতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহানা রব্বিইয়াল আলা) বলা।

৬. দুই সাজদার মাঝে رَبِّ اغْفِرْ لِي (রব্বিগফিরলি) বলা।

৭. প্রথম তাশাহহুদে পাঠ করা।

৮. প্রথম তাশাহহুদে বৈঠক করা।

تنبيهٌ مهمٌّ: গুরুত্বপূর্ণ সতর্কীকরণ:

রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুবহানা রব্বিইয়াল আযীম) এই শব্দ বলা আবশ্যক। অতঃপর আরো যা বর্ণিত হয়েছে তা বৃদ্ধি করতে পারবে। এমনিভাবে সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহানা রব্বিইয়াল আলা) এই বলা অতঃপর আরো যা বর্ণিত হয়েছে তা বৃদ্ধি করতে পারবে।

الدَّرْسُ التَّاسع
নবম পাঠ

بَيَانُ التَّشَـهُّدِ তাশাহ্হুদের বর্ণনা:

«التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ ত্বইয়্যিবাতু আস্লামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সলিহীন, আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ: '(মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক) সমস্ত ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কোন মা'বূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।'

اَللّٰـهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُـحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُـحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْـرَاهِـيْـمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِـيْـمَ إِنَّـكَ حَـمِـيْـدٌ مَّـجِـيْـدٌ اَللّٰـهُمَّ بَـارِكْ عَلٰى مُـحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُـحَمَّدٍكَمَا بَارَكْـتَ عَلٰى إِبْرَاهِـيْـمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْـرَاهِـيْـمَ إِنَّـكَ حَـمِـيْـدٌ مَّـجِـيْـدٌ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা সল্লি'আলা-মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা-আ-লি মুহাম্মাদ, কামা-সল্লাইতা 'আলা-ইব্-রাহীমা ওয়া'আলা-আ-লি ইব্-রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা-মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা-আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা-ইব্রাহীমা ওয়া'আলা-আ-লি ইব্-রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি মুহম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ কর। যেভাবে ইবরাহীম ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান কর, যেভাবে ইবরাহীম ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান করেছিলে নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

অতঃপর শেষ তাশাহ্হুদে আল্লাহর নিকট জাহান্নাম, কবরের শাস্তি হতে, জীবন-মৃত্যুর ও দাজ্জালের ফিতনা হতে আশ্রয় চাইবে। তারপর সে কিছু ঐচ্ছিক দু'আ নির্বাচন করে পড়বে। তবে এক্ষেত্রে দু'আ মা'সূ রা তথা হাদীসে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ দু'আ। যেমন:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ: *'আল্লা-হুম্মা আইন্নী আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা'*

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর।

اللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুল্‌মান কাছীরাও ওয়ালা- ইয়াগ্‌ফিরুযযুনূবা ইল্লা- আন্‌তা ফাগ্‌ফির্‌লি মাগ্‌ফিরাতাম মিন ইন্‌দিকা ওয়ার্‌হাম্‌নী ইন্নাকা আন্‌তাল গফুরুর্ রহীম।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অধিক অত্যাচার করেছি, তুমি ছাড়া পাপ সমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

অতঃপর প্রথম তাশাহ্হুদে যোহর, আসর, মাগরিব ও 'ইশার সলাতে তাশাহুদ পড়ার পর তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াবে। তবে যদি সে এই বৈঠকে রাসূল (স.) এর প্রতি দরূদ পাঠ করে তাহলে (তার জন্য") এ ব্যাপরে হাদীসের ব্যাপকতা বর্ণনার আলোকে এটাই উত্তম। তারপর সে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াবে।

الدَّرْسُ العاشر দশম পাঠ

سُنَنُ الصَّلاةِ সলাতের সুন্নাতসমূহ

সলাতের সুন্নাতসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো-

১. সূচনা বা সানা পড়াঃ যেমন বর্ণিত হয়েছে-

اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়াবাইনা খাতা-ইয়া-ইয়া কামা বা'আদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়ালমাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাতা-ইয়া-ইয়া কামা ইউনাক্কাস সাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্‌দানাস্, আল্লাহুম্মাগ্‌সিল খাতা-ইয়া-ইয়া বিলমায়ি ওয়াস্‌সালজি ওয়াল্‌বারাদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার পাপ সমূহের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার পাপসমূহ হতে পরিচ্ছন্ন কর, যেমন ময়লা থেকে সাদা কাপড়কে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার পাপ সমূহকে পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ধুয়ে দাও।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ: *সুব্‌হা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম বরকতময় হউক, তোমার নাম সুউচ্চ হউক। তুমি ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই।

২.দাঁড়ানো অবস্থায় রুকুর আগে ও পরে ডান হাতের তালু বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখা।

৩. হাতের আঙ্গুল গুলো একত্রিত অবস্থায় কাঁধ বা কান বরাবর প্রসারিত করে দু'হাত উত্তোলন করা প্রথম তাকবীরের সময়, রুকু করার সময়, রুকু হতে উঠার সময় ও প্রথম তাশাহ্হুদের পর তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময়।

৪. রুকু ও সাজদাতে একাধিক তাসবীহ পাঠ করা।

৫. রুকু হতে উঠার সময় رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ দুআটির চেয়ে যা অতিরিক্ত (বর্ণিত হয়েছে) তা পাঠ করা। দুই সাজদার মাঝে ক্ষমা প্রার্থনার দুআ একধিকবার পাঠ করা।

৬. রুকুতে পিঠ বরাবর মাথা রাখা।

৭. সাজদাহ করার সময় দুই বাহুকে দুই পার্শ্বদেশ হতে পেটকে দুই রান হতে এবং দুই রানকে দুই পিণ্ডলি হতে পৃথক রাখা।

৮. সাজদার সময় মাটি হতে দুই কনুইকে উঁচু রাখা।

৯. প্রথম তাশাহ্হুদ ও দুই সাজদার মাঝে বাম পাকে বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাঁড়া করে রাখা।

১০. চার রাক'আত বা তিন রাক'আত সলাতের শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসা এবং বাম পাকে ডান পায়ের নীচে রেখে ডান পা খাড়া রাখা।

১১. প্রথম ও শেষ তাশাহ্হুদে বসার প্রথম থেকে তাশাহহুদের শেষ পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা এবং দু'আ পাঠ করার সময় নাড়ানো।

১২. প্রথম তাশাহহুদে মুহাম্মাদ (স.) এবং ইবরাহীম (আ.) ও উভয়ের পরিবার প্রতি দরূদ ইবরাহীম পড়া।

১৩. শেষ তাশাহ্হুদে দু'আ করা।

১৪. ফজরের সলাতে, জুম'আর সলাতে, দুই ঈদের সলাতে, ইসতেসকার সলাতে ও মাগরিব এবং 'ইশার সলাতের প্রথম দু রাক'আতে উচ্চ স্বরে কেরাত পাঠ করা।

১৫. যোহরের সলাতে, আসরের সলাতে, মাগরিবের তৃতীয় রাক'আতে ও 'ইশার সলাতের শেষ দুই রাক'আতে নিম্ন স্বরে কেরাত পড়া।

১৬. সূরা ফাতিহার পর কুরআন হতে যেকোন অংশ পড়া।

বিঃদ্রঃ- আমরা যা উল্লেখ করলাম ইহা ছাড়াও সলাতের আরোও সুন্নাত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: ইমাম, মুক্তাদী বা একাকি সলাত আদায় করলেও রুকু হতে উঠার পর **رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ** এ দু'আটির চেয়ে আরো অতিরিক্ত বর্ণিত দুআ পাঠ করা আর এটা সুন্নাত। রুকু করার সময় দুই হাতের আঙ্গুলগুলো পৃথক পৃথক রেখে দুই হাত হাটুর উপর রাখা।

(সলাত) সূচনার দু'আ دعاء الاستفتاح

প্রত্যেক সলাতের তাকবীরে তাহরীমা বলার পর রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত দুআগুলো পাঠ করতে হবে। যেমন দুআগুলো হলো-

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়াবাইনা খাতা-ইয়া-ইয়া কামা বা'আততা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়ালমাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাতা-ইয়া কামা ইউনাক্কাস সাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্‌দানাস্, আল্লাহুম্মাগ্‌সিল খাতা-ইয়া-ইয়া বিলমায়ি ওয়াস্‌সালজি ওয়াল্‌বারাদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার পাপ সমূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার পাপসমূহ হতে পরিচ্ছন্ন কর, যেমন ময়লা থেকে সাদা কাপড়কে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার পাপ সমূহকে পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ধুয়ে দাও।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ: *সুব্‌হা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম বরকতময় হউক, তোমার নাম সুউচ্চ হউক। তুমি ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই।

الدَّرْسُ الحادي عشر একাদশ পাঠ

مُبْطِلاتُ الصَّلاةِ সলাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

সলাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ ৮টি। সেগুলো হলো-

১. জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা। আর ভুলকারী ও অজ্ঞ ব্যক্তির সলাত নষ্ট হবে না। ২. অট্ট হাসি দেওয়া। ৩. খাওয়া। ৪. পান করা। ৫. গোপনাঙ্গ প্রকাশ হওয়া। ৬. ক্বিবলা দিক হতে অন্য দিকে অধিকাংশ ফিরে থাকা। ৭. সলাতে ধারাবাহিকভাবে অপ্রয়োজনীয় কিছু অধিকহারে করা। ৮. ওযু ভেঙ্গে যাওয়া।

المبطل الأوَّل: الكلام العمد مع الذِّكر والعلم

يُستثنى من ذلك الفتح على الإمام إذا سها أو أخطأ في القراءة.

** তবে ইমাম যদি কোন কিছু ভুলে যায় অথবা কিরআতে ভুল করে তাহলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলার অর্ন্তভুক্ত হবে না।

সলাতে নড়াচড়া (করা) পাঁচ ভাগে বিভক্ত

হারাম	মাকরুহ	মুবাহ	মুস্তাহাব	ওয়াজিব
নড়াচড়া: আর তা হলো অপ্রয়োজনে লাগাতার অধিক নড়া-চড়া হিসেবে পরিচিত। যেমন: খাওয়া ও পান করা।	নড়াচড়া: অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সামান্য নড়াচড়া করা। যেমন- সামান্য তাকাতাকি করা।	নড়াচড়া: প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নড়াচড়া করা। যেমন- প্রয়োজনে দাড়ি চুলকানো।	নড়াচড়া: তা হলো এমন নড়াচড়া করা যার উপর সলাতের পূর্ণতা নির্ভর করে। যেমন- সলাতে কাতারের খালি জায়গা পূর্ণ করা।	নড়াচড়া: তা হলো এমন নড়াচড়া করা যার উপর সলাতের পরিশুদ্ধতা নির্ভরকরে। যেমন অপবিত্রতা জিনিস দূর করা।

تنبيهٌ مهمٌّ: বিশেষ সতর্কীকরণ

ইতোপূর্বে সলাতের শর্ত, রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নাত গত হয়েছে। এগুলোর মাঝে পার্থক্য নির্ণয়

الشَّرط শর্ত	الرُّكن রুকন	الواجب ওয়াজিব	السُّنَّة সুন্নাত
ইবাদতের বাইরের বিষয়	ইবাদতের আভ্যন্তরিন বিষয়		
সকল ইবাদতেই প্রযোজ্য	ইবাদতের কিছু কিছু অংশে প্রযোজ্য		
এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও ভুল গ্রহণযোগ্য। ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল গ্রহণযোগ্য নয়।		এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়।	এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল গ্রহণযোগ্য
এর কোন সাহু সাজদাহ নেই।	সাহু সাজদাহ দ্বারা সম্পূর্ণ হয় না। বরং রুকুন আদায় করতে হবে।	সাহু সাজদাহ দ্বারা যথেষ্ট হবে ।	

سجود السَّهو: সাহু সাজদাহ
সাহু সাজদাহ এর কারণ তিনটি

الشَّكُّ: সন্দেহ হওয়া
সন্দেহ হওয়া। যেমন- সে কত রাকআত সলাত পড়েছে? তিন নাকি চার রাকআত।

এটা আবার দুই ধরণের

النَّقص ঘাটতি করা:
। যেমন কোন ওয়াজিব ছুটে যাওয়া এবং তার স্থান ছুটে যাওয়া।

الزِّيادة: বৃদ্ধি
কোন কিছু অতিরিক্ত করা। যেমন: রুকু, সাজদাহ, কিয়াম, বৈঠক বৃদ্ধি করা।

شكٌّ بعد الفراغ والانتهاء من العبادة:
সলাত শেষ হওয়ার পর সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া: এ ক্ষেত্রে সন্দেহের ব্যাপারে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই।

شكٌّ داخل العبادة
সলাত চলাকালীন সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া: যদি তার সন্দেহ প্রবল হয় তাহলে সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই। আর যদি সন্দেহ দিক কম হয় তাহলে তার নিকট যা অগ্রাধিকার পায় সে তার সিদ্ধান্ত নিবে অন্যথায় কমের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিবে।

ملاحظاتٌ: বি: দ্র:

--আর যদি সে সাহু সাজদাতেও ভুল করে তাহলে কোন সমস্যা নেই সলাত সঠিক হবে।
--আর যদি রুকন ছুটে যায় তাহলে উক্ত রুকন এবং তার পরবর্তী অবশিষ্টগুলো আদায় না করা পর্যন্ত ও সাহু সাজদাহ না দেওয়া পর্যন্ত সলাত বিশুদ্ধ হবে না।
--আর যদি ভুলবশত ওয়াজিব ছুটে যায় ও তার স্থানে পার হয়ে যায় তাহলেও সাহু সাজদাহ দিতে হবে।

ملخّصٌ مُصوَّرٌ لصفة الصَّلاة: সংক্ষিপ্তাকারে ছবিসহ সলাত আদায়ের পদ্ধতি

প্রথমত একজন মুসলিম বাড়িতে ওযু করবে, সুন্দর পোশাক পরিধান করবে তারপর মাসজিদে যাবে। তার জন্য সওয়ারীতে চড়া বৈধ। পথ চলার সময় অবশ্যই ধীরস্থরতা ও নমনীয়তা অবলম্বন করবে। অর্থাৎ দ্রুত হাটবে না বা দৌড়াবে না, অনার্থক এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করবে না ও উচ্চ স্বরে কথাও বলবে না।



অতঃপর যখন সে মাসজিদের নিকটে পৌঁছবে তখন তার -সেন্ডেল খুলে জুতা রাখার নির্দিষ্ট স্থানে রাখবে এমনকি দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় সাথে রেখে দিবে অর্থাৎ দুনিয়ার কোন চিন্তা মাথায় রাখবেনা। কেননা মাসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা ও হারানো বস্তুর ঘোষণা দেওয়া হারাম। প্রবেশের সময় ডান পা আগে প্রবেশ করাবে এবং বলবে

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি অসস্বলাতু অস-সালামু আলা রসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রহমাতিকা

আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ আমার জন্য তুমি তোমার করুনার দুয়ারসমূহ খুলে দাও এবং বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করবে আর বলবে,

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি অস্বলাতু অস-সালামু আলা রসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আলআলুকা মিন ফাযলিকা।

আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

পুরুষরা সামনের কাতারে দাঁড়াবে এবং মহিলারা পিছনের কাতারে দাঁড়াবে। যদি সলাতের ইকামাত দেওয়া হয়ে যায় তাহলে প্রথমে তাকবীরে তাহরিমা বলবে তারপর ইমামকে যে অবস্থায় পাবে তার সাথে (স্বলাতে) শামিল হবে। যদি ইমামকে দাঁড়ানো বা রুকু করা অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে সেটা রাক'আত হিসেবে গন্য করবে। অতঃপর যখন ইমাম সালাম ফিরাবেন তখন সে তার ছুটে যাওয়া রাক'আত পূর্ণ করবে।

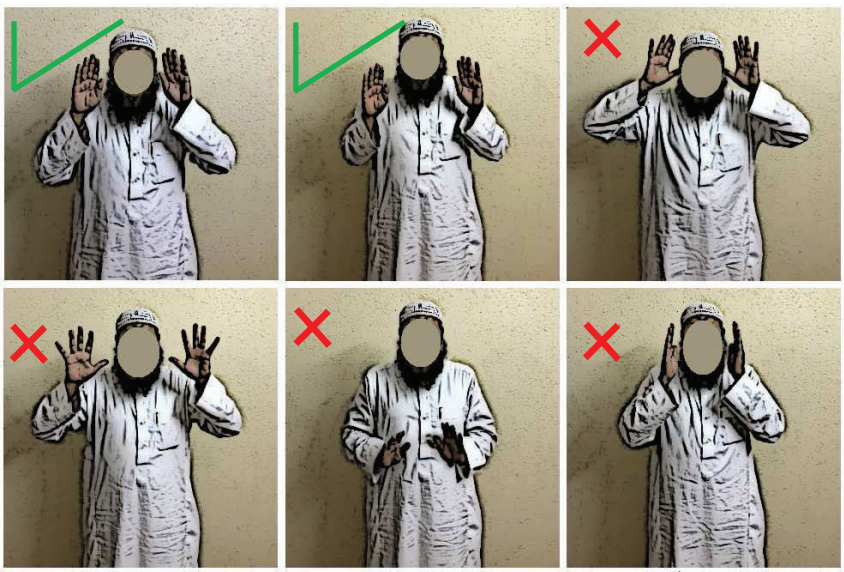
আর যদি মাসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে, ইকামাত দেওয়া হয়নি তাহলে সলাতের পূর্বের সুন্নাতগুলো আদায় করবে। যদি সলাতের পূর্বের সুন্নাত সলাত না থাকে তাহলে বসার পূর্বে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ দুই রাক'আত আদায় করবে। মাসজিদের সম্মান বিনষ্ট হয় এমন কাজ করা যাবে না। যেমন: যেমন সলাতে দাড়িয়ে ঘড়ির দিকে বার বার তাকানো বা গলায় আওয়াজ দেওয়া ইত্যাদি। ইমাম ও একাকী ব্যক্তি সুতরাহকে সামনে করে সলাত আদায় করা সুন্নাত আর ইমামের সুতরাই মুক্তাদির সুতরাহ।



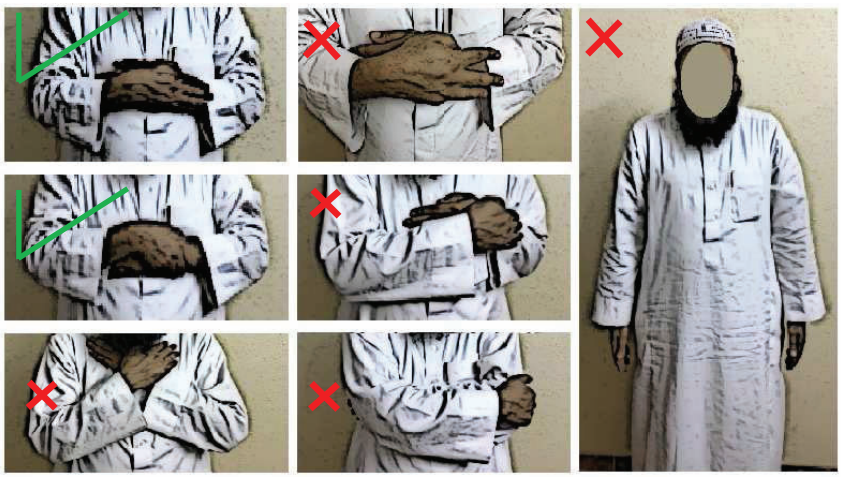
দুই কাঁধের মধ্যবর্তী দুরত্বের সমান দুই পায়ের মাঝ খানে ফাঁকা রাখবে এর চেয়ে বেশি নয় ও কমেও নয় এবং পা দ্বয়ের বহির্ভাগ সমান রাখবে।



তারপর সলাতের অবশিষ্ট শর্তসমূহ পূর্ণ করবে অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলবে এবং সাথে সাথে দুই হাতের আঙ্গুল গুলো একত্রিত রেখে দুই হাত কান বা কাধ বরাবর উত্তোলন করবে এবং দুই তালুকে ক্বিবলামুখী রাখবে।



তারপর ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর উল্টো পিঠে কিংবা কব্জি বা বাহুর উপর রাখবে অথবা আঁকড়ে ধরবে।



সে তার দৃষ্টিকে সাজদার স্থানে রাখবে। এদিক সেদিক ফিরাবে না।



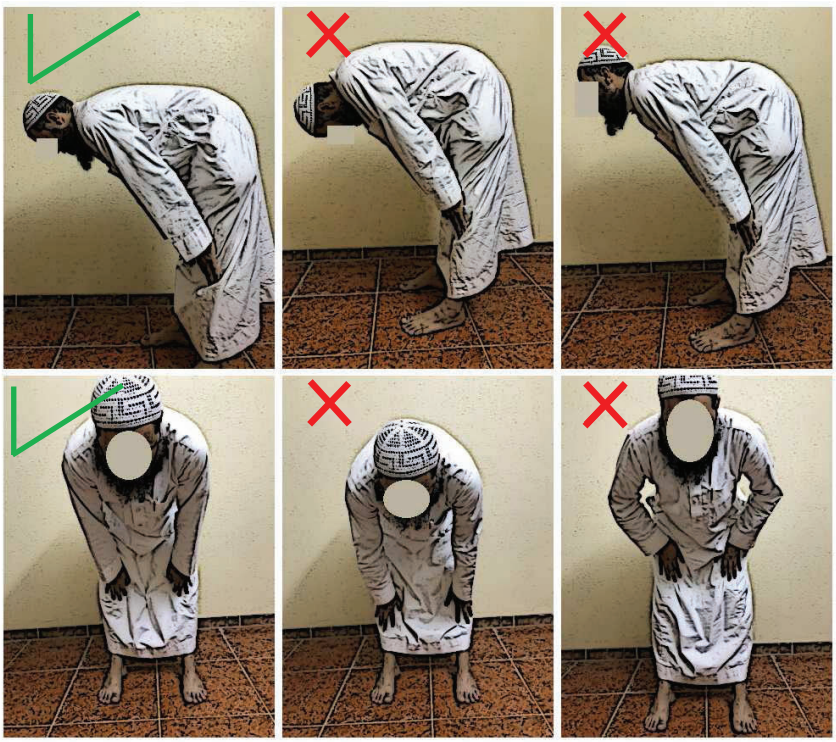
তারপর শুধু প্রথম রাক'আতে সানা পড়া মুস্তাহাব। তবে উত্তম হচ্ছে বিভিন্ন দু'আ পড়া যে দু'আ গুলো সানার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে।
তারপর আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলবে,

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উচ্চারণ: আউযূ বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম। অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারপর বিসমিল্লাহ বলবে-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অর্থ: আমি পরম করুনাময় ও দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। তারপর সূরা ফাতিহা তার হরকত, অক্ষর, শব্দ ও আয়াতসমূহকে পূর্ণকরে ধারাবাহিকভাবে পাঠ করবে তারপর আউযুবিল্লাহ ছাড়াই কুরআন থেকে সাধ্যমত কিছু পড়বে। তবে প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়বে। তারপর "আল্লাহু আকবার" বলে দুই হাত উত্তোলন করবে যেমনভাবে তাকবীরাহ তাহরিমাতে উত্তোলন করেছিল এবং রুকু করবে। হাটুকে আঁকড়ে ধরবে এবং কনুইদ্বয়কে ভাজ করবে না এবং পিঠ ও মাথা বরাবর রাখবে।আর কমপক্ষে **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** **সুবহানা রব্বিইয়াল আযীম** একবার বলবে। তবে রুকুর ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত দু'আগুলো রুকুতে পড়া মুস্তাহাব।



তারপর রুকু হতে উঠার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে বলবে **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** (সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ) এবং সাথে সাথে দুই হাত কান বা কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে। যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন বলবে **رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد** (রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ) এবং হাদীসে বর্ণিত দু'আ গুলো পড়া মুস্তাহাব। তারপর হাত উত্তোলন ছাড়াই "আল্লাহু আকবার" বলবে এবং সাত অঙ্গের উপর ভর দিয়ে সাজদাহ করবে। তা হলো: কপাল ও নাক, দুই তালু, দুই হাঁটু, দুইপায়ের আঙ্গুলের পেট। দুই বগলের মাঝে পেট ও রানের মাঝে এবং রান ও পিণ্ডলীর মাঝে দূরত্ব বজায় রাখবে। দুই কুনুইকে মাটি থেকে উঁচু রাখবে।



আর سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى একবার বলবে। একাধিকবার বলা সুন্নাত এবং দোয়া করবে। উত্তম হলো বর্ধিত দোয়ার মাধ্যমে দোয়া করা।

তারপর **"আল্লাহু আকবার"** বলবে এবং বাম পাঁ কে বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে ও আঙ্গুল গুলোর পেটকে মাটিতে রাখবে। হাতের আঙ্গল গুলোকে ক্বিবলা মুখি করে রাখবে। দুই তালুর রানের শেষভাগে রাখবে। এ ধরণের বসা সলাতে বসার সকল স্থানে করতে হবে। তবে চার রাক'আত বা তিন রাক'আত বিশিষ্ট সলাতের শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসবে এবং বাম পাকে ডান পায়ের পিণ্ডলীর (গোছার) নীচে রাখবে।



তারপর "আল্লাহু আকবার" বলে সাজদাহ করবে প্রথম সাজদার মত। তারপর **"আল্লাহু আকবার"** বলে দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াবে। প্রথম রাক'আতে যেমনটি করেছে ঠিক দ্বিতীয় রাক'আতেও করবে কিন্তু দ্বিতীয় রাক'আতে তাকবীরে তাহরিমা ও সানা নেই। যখন দ্বিতীয় রাক'আত শেষ করবে তখন তাশাহহুদের জন্য বৈঠক করবে এবং শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুলকে মিলিয়ে গোল করে রাখবে এবং তা নাড়াবে ও দুআ পড়বে। এখানে তাশাহ্হুদ পড়া আবশ্যক। যদি দুই রাক'আত বিশিষ্ট সলাত হয় তাহলে দরূদে ইবরাহীম পড়া আবশ্যক। আর চারটি জিনিস হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। যথা- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ مَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

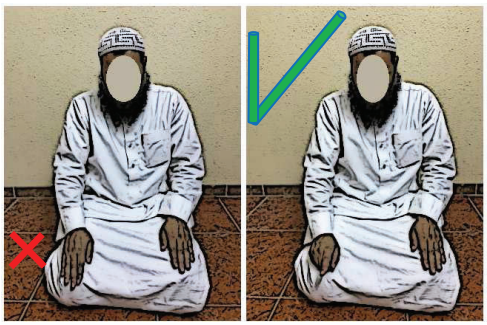
আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন্ আযাবি জাহান্নামা ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ আযাবিল ক্বাবরি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাসীহিদ্ দাজ্জালি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাহ্ ইয়ায়ি-ওয়াল মামা-ত।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

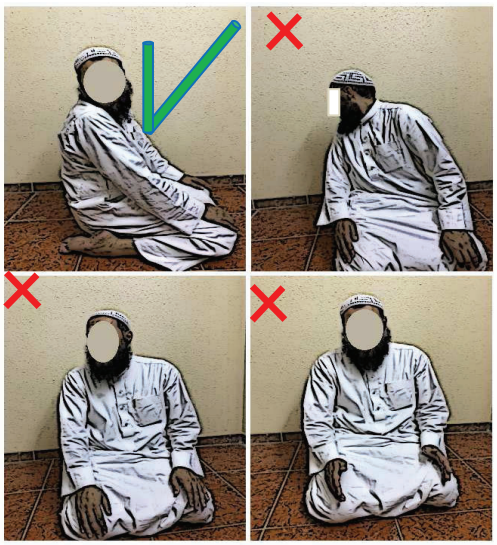
এখানে সে তার পছন্দনীয় দু'আ পড়তে পারে তবে হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়াই উত্তম। তার সাথে এটাও বলবে:اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ: *'আল্ল-হুম্মা আইন্নী আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা'*

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর।



তারপর দুই দিকে ডানে ও বামে শুধু মাথা ঘুরিয়ে সালাম ফিরাবে কিন্তু কাঁধ ঘুরাবে না। নীচে বা উপরে মাথা নাড়াবে না ও হাত দিয়ে ইশারা করবে না।



আর যদি স্বলাত তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট হয় তাহলে প্রথম তাশাহ্হুদের সাথে মুস্তাহাব হিসেবে দরূদে ইবরাহীম পড়ার পর দাঁড়িয়ে যাবে। যদি তিন রাক'আত বিশিষ্ট সলাত হয় তাহলে তাকবীর দিয়ে তৃতীয় রাক'আত পূর্ণ করবে এবং তাশাহহুদের জন্য বসে যাবে। আর যদি চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাত হয় তাহলে চতুর্থ রাক'আত আদায় করার পর শেষ তাশাহ্হুদের জন্য বসবে। তারপর দরূদে ইবরাহীম এবং চারটি জিনিস হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। যথা- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন্ আযাবি জাহান্নামা ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ আযাবিল ক্বাবরি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ দাজ্জালি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাহ্ ইয়ায়ি-ওয়াল মামা-তি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

এখানে সে তার পছন্দনীয় দু'আ পড়তে পারে তবে হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়াই উত্তম। তার সাথে এটাও বলবে:اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ: *আল্লাহুম্মা আইন্নী আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা'* অর্থ: হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর।

আর যদি ফরয সলাত হয় তাহলে সালামের পর বর্ণিত দু'আসমূহ সলাতের পরে পড়া মুস্তাহাব। যেমন-

أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

উচ্চারণ:(আস্ তাগফিরুল্লাহ) তিনবার *(আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া-যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম)* অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমা হতেই শান্তি উৎসারিত হয়। তুমি বরকতময়। হে মহাত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী।

سُبْحَانَ اللهِ (সুব্হানাল্লাহ) ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্হামদুলিল্লাহ) ৩৩ বার اَللهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আক্বার) ৩৪ বার অথবা ৩৩ সাথে নিম্নের কালিমা পড়া-

لَا إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيٍّ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ: *লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ দাহু লা- শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।*

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। এর পর আয়াতুল কুরসী পড়বে-

(اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى اَلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى اَلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا اَلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ اَلسَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ اَلْعَلِىُّ اَلْعَظِيمُ)

উচ্চারণ: *আল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম। লা তা'খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাউম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা- ফিল আরয। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহূ ইল্লা- বিইযনিহী। ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়ামা খলফাহুম,ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন ইল্মিহী ইল্লা- বিমা- শা-আ; ওয়াসি'আ কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরয; ওয়ালা ইয়া উদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল 'আলিইউল আযীম।*

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই তাঁর। কে আছে এমন যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে ? দৃষ্টির সামনে ও পিছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। মানুষ ও সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞনের কোন একটি অংশ বিশেষকেও পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করেন তিনি ততটুকু পান। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীন পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলো ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা আল বাক্বারা:২:২৫৫) এরপর নিম্নের তিনটি সূরা পড়বে-

(قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ...)، و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ...)، و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ...)

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস

বিশেষ সতর্কতা: تنبيهاتٌ مهمَّةٌ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বলাতে গোপনাঙ্গ ঢাকা স্বলাতের বিশুদ্ধতার অন্যতম একটি শর্ত। তাই সলাতী ব্যক্তি স্বলাতে তা প্রকাশ থেকে সতর্ক থাকে। ফলে এর কারণে তার স্বলাত যেন বাতিল হয়ে না যায়।



মুক্তাদী যদি ঈমামের সাথে সলাত পড়ে তবে ঈমামের ডান পাশে তার জন্য দাঁড়ানো বৈধ। এবং টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়াবে, তার আগেও যাবেনা পিছেও যাবেনা। আর অন্যান্য মুসল্লীর সাথে দাড়ালেও একই নিয়মে দাঁড়াবে (তথা টাখনু মিলিয়ে সমান ভাবে)।



ملخص الصّلوات غير المفروضة
বিভিন্ন সলাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

নাম	হুকুম	সময়	সংখ্যা	পদ্ধতি
জুম'আর সলাত	واجبةٌ ওয়াজিব	সলাত যোহরের ওয়াক্ত	ركعتان ২ রাক'আত	উঁচ্চ স্বরে কিরাত পাঠ ও জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করা তিন বা তার অধিক ব্যক্তি দ্বারা
সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সলাত	واجبةٌ ওয়াজিব	সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের	ركعتان ২ রাক'আত	উঁচ্চ স্বরে ও প্রত্যেক রাক'আতে দুই রুকু করতে হবে
বিতের সলাত	سنَّةٌ مؤكَّدةٌ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ	من بعد العشاء إلى الفجر 'ইশারের পর থেকে ফজর পর্যন্ত	من ١-١١ ১-১১ রাক'আত	হয়তো এক রাক'আত অথবা তিন রাক'আত একসাথে একটিমাত্র তাশাহহুদের জন্য বসবে অথবা দুই রাক'আত পড়ে আবার আরেক রাক'আত পড়বে। পাঁচ রাক'আত, সাত রাক'আত এ দুটির ক্ষেত্রে শেষ রাক'আতে তাশাহহুদের জন্য বসবে। নয় রাক'আত আট রাক'আতে একটি তাশাহহুদ পড়ে সালাম না ফিরিয়ে নবম রাক'আতের জন্য উঠে যাবে অতঃপর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। দুই রাক'আত করে পড়বে শেষে এক রাক'আত বিতর পড়বে।

راتبة الفجر ফজরের সুন্নাত	سنَّةٌ مؤكَّدةٌ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	قبل صلاة الفجر ফজর ফরজ সলাতের পূর্ব পর্যন্ত	ركعتان ২ রাক‘আত	প্রথম রাক‘আতে সূরা আল-কাফেরূন ও দ্বিতীয় রাক‘আতে সূরা আল-ইখলাস পড়বে
سنَّة الظُّهر যোহরের সুন্নাত	سنَّةٌ সুন্নাত	৪ রাক‘আত যোহরের ফরজের ফরজের পূর্বে এবং ২ রাক‘আত যোহরের পরে	٤/٢ ৪ রাক‘আত ও রাক‘আত	ركعتين ركعتين منفصلة দুই দুই রাক‘আত পৃথক করে পড়বে
سنَّة المغرب মাগরিবের সুন্নাত	سنَّةٌ সুন্নাত	মাগরিবের ফরজ সলাতের পরে	ركعتان ২ রাক‘আত	প্রথম রাক‘আতে সূরা আল-কাফেরূন ও দ্বিতীয় রাক‘আতে সূরা আল-ইখলাস পড়বে
سنَّة العشاء ‘ইশার সুন্নাত	سنَّةٌ সুন্নাত	‘ইশার সলাতের পরে	ركعتان ২ রাক‘আত	
التَّراويح তারাবীর	سنَّةٌ সুন্নাত	‘ইশার সলাতের পর থেকে ফজর সলাতের সময় হওয়া পর্যন্ত	২ রাক‘আত হতে দশ রাকআত	

تحيَّة المسجد তাহিয়্যাতুল মাসজিদ	واجبةٌ ওয়াজিব	মাসজিদে প্রবেশের সময় বসার	ركعتان ২ রাক'আত	
الضُّحى চাশতের সলাত	سنَّةٌ সুন্নাত	সূর্য উপরে উঠার পর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত	من ركعتين إلى ثمانٍ ২ রাক'আত হতে ৮ রাক'আত পর্যন্ত	
الاستخارة ইস্তেখারার সলাত	سنَّةٌ সুন্নাত	যে কোন সময়	ركعتان 2 রাক'আত	সালামের পূর্বে ইস্তেখারার দু'আ পড়বে
ইস্তেস্কার সলাত	সুন্নাত প্রয়োজনে	সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পর	২ রাক'আত	ঈদের সলাতের মধ্যে ১২ তাকবীর। প্রথমে ৭ পরে ৫
ঈদের সলাত	সুন্নাত	সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পর	২ রাক'আত ও খুতবাহ	ঈদের সলাতের মধ্যে ১২ তাকবীর। প্রথমে ৭ পরে ৫

أوقات النّهي عن النّوافل المُطلقة:

সাধারণ নফল সলাতের নিষিদ্ধ সময়সমূহঃ

১. ফজরের পর থেকে সূর্য উচু হওয়া পর্যন্ত।
২. আসরের সলাত থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত।
৩. দ্বিপ্রহর থেকে সূর্য ঢলা পর্যন্ত।

أسئلة على الصَّلاة
সলাত সম্পর্কিত প্রশ্নমালা

১. সলাতের শর্ত কয়টি?
ক. নয়টি খ. ১১টি গ. ৮টি

২. ইসলামের শর্ত সলাতের শর্তের আওতাভূক্ত করা ভুল। কেননা মুসলমান ছাড়া কেউ সলাত পড়েনা।
ক. সঠিক খ. ভুল

৩. পার্থক্য বুঝা অর্থ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া?
ক. সঠিক খ. ভুল

৪. নাপাকীদূর করাটা শরীর, স্থান, কাপড় সব কিছুতেই শামিল করে?
ক. সঠিক খ. ভুল।

৫. শুকরের নাপাকিটা--
ক. বড় খ. মধ্যম

৬. বীর্য অপবিত্র, কারণ তা বের হলে গোসল করা আবশ্যক?
ক. সঠিক খ. ভুল।

৭. পানি ছিটা এবং ধৌত করা উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।
ক. সঠিক খ. ভুল।

৮. সকল মৃত জিনিসই অপবিত্র?
ক. সঠিক খ. ভুল

৯. কুকুরের অপবিত্রতার ক্ষেত্রে মাটি ছাড়া অন্য কিছু এবং আধুনিক পরিস্কারের উপাদানই যথেষ্ট?
ক. সঠিক খ. ভুল।

১০. যা থেকে বেঁচে থাকা দু:সাধ্য তা হলো ঐসব প্রাণি যার বিচরণ বেশি। সুতরাং বিড়াল কারো জন্য পবিত্র, আবার কারো জন্য অপবিত্র?
ক. সঠিক খ. ভুল।

১১. যার নাফস (প্রাণ) সচল নয়, সুতরাং নাফস অর্থ আত্মা? ক. সঠিক খ. ভুল

১২. রগসমূহে অবশিষ্ট রক্ত? ক. অপবিত্র খ. পবিত্র

১৩. সলাতের রুকন কয়টি? ক. ১৪ টি খ. ৯ টি গ. ৮ টি

১৪. তাকবীরে তাহরীবা হলো দুই হাত উঠানো?
ক. সঠিক খ. ভুল।

১৫. যদি কোন রুকুন ভুলে ছেড়ে দেয় তাহলে শুধু সাহু সাজদাহ দিতে হবে?
ক. সঠিক খ. ভুল

১৬. সলাতের ওয়াজিবের সংখ্যা কতটি?
ক. ৮টি খ. ১৪টি গ. ৯টি

১৭. যদি ব্যক্তি সাজদায় বলে
سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ অথচ সে জানে যে, (سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى) একবার বলা ওয়াজিব, তাহলে তার সলাত বাতিল?

ক. সঠিক খ. ভুল

১৮. নামাযে ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর উল্টো পিঠে, বা কব্জির উপরে অথবা কনুইয়ের উপরে রাখা সবই বৈধ?
ক. সঠিক খ. ভুল

১৯. রাত্রিকালের ফরয সলাতের প্রথম দুই রাকাতে এবং প্রত্যেক এমন সলাত যাতে সাধারণভাবে সমবেত হওয়ার বিধান করা হয়েছে তাতে ক্বিরাত উচ্চস্বরে পড়তে হবে?
ক. সঠিক খ. ভুল

২০. সলাত বিনষ্টকারী বিষয় কয়টি?
ক. ৮টি খ. ৯টি গ. ১৪টি।

২১. নিতম্বের উপর বসতে হবে ---
ক. প্রথম তাশাহুদে খ. শেষ তাশাহুদে গ. সবটিতেই

২২. (والشكر) শব্দটি (ربنا لك الحمد والشكر) এর মধ্যে বৃদ্ধি করার হুকুম কি?
ক. বৈধ খ. উত্তম গ. হারাম

২৩. দুই সাজদার মাঝখানে (ربى اغفرلى ولوالدى) পড়ার বিধান কি?
ক. বৈধ খ. হারাম গ. মাকরূহ

২৪. সিজদাই দুই কুনুই মাটিতে রাখার বিধান কি?
ক. হারাম খ. উত্তম গ. মাকরূহ

২৫. সাহু সাজদার কারণ কয়টি?
ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি।

২৬. কোন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পওে, এমনি ভাবে কোন বিষয়ে সন্দেহ বেশি হলে তাহলে সেই সন্দেহের কোন প্রভাব নেই?
ক. সঠিক খ. ভুল

২৭.ফজরের সুন্নাত অন্যান্য সুন্নাতে রাতেবা থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মর্যাদার ক্ষেত্রে, হালকায়, বিশেষ ক্বিরাআতে এবং সফরের অবস্থাতেও তা পালনে এবং শুধুমাত্র বাড়িতে, তা পড়ার পর শুয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে?
ক. সঠিক খ. ভুল।

২৮. নিম্নোল্লেখিত মাসআলাগুলোর হুকুম বর্ণনা কর?

মাসআলা	হুকুম
যে দ্বীনকে গালি দেয় তার সলাত	
নেশাগ্রস্থেও সলাত	
রোগীর সলাত	
বাচ্চাদেও সলাত	
কোন ব্যক্তির ভুলবশত অযু ছাড়া সলাত আদায়	
ভুলবশত অপবিত্র কাপড়ে সলাত পড়লে	
গরুর পেশাব	
কাকের পেশাব	
দুই রান খোলা রেখে সলাত	
ভুলবশত সময়ের পূর্বে সলাত	
বিমানে সলাত	
অস্পষ্ট সলাত	
বসে সলাত	
সূরা ফাতিহা ভুলে গেলে	

মাসআলা	হুকুম
ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে	
স্বলাতে তাড়াহুড়া করা	
অধিক সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির স্বলাতের পওে সন্দেহ	
তাকবীওে তাহরীমার পওে অজুর ব্যাপাওে সন্দেহ	
ভুলে রুকু বেশি হয়ে গেলে	
তাকবীওে তাহরীমা ছেড়ে দিলে	
প্রথম তাশাহুদ ছেড়ে দিলে	
শেষ তাশাহুদ ছেড়ে দিলে	
স্বলাতে তিন না চার রাকাত পড়েছে সন্দেহ	
স্বলাতের পওে সন্দেহ হলে	
স্বলাতের মধ্যে সন্দেহ হলে	
সাহু সাজদা ভুল হলে	
স্বলাতে ভুলে কথা বল্লে	
যদি ছুর খোলা অবস্থায় সলাত পড়ে এবং তা সলাতের পর জানতে পারে	
স্বলাতে বের হওয়ার আগে ঘওে পবিত্রতা অর্জন	
মসজিদে বেচা কেনা	
মসজিদে মুদ্রা ভাঙ্গানো	
শেষ তাশাহুদে ইমামকে পেলে	
স্বলাতে সুতরার বিধান	
সামান্য তাকাতাকি	
বেশি তাকাতাকি	
পাখির ঠুকরের মত দ্রুত সলাত পড়া	
স্বলাতে দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করা	
স্বলাতে কথা বলা	
স্বলাতে নড়াচড়া	

মাসআলা	হুকুম
সূরা ফাতিহা ভুলে গেলে	
জুমআর সলাত	
বিতর সলাত	
তাহিয়্যাতুল মাসজিদ	

(সলাতের) শর্ত, রুকুন, ওয়াজিব ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।

শর্ত	রুকন	ওয়াজিব	সুন্নাত

الدَّرْسُ الثّاني عشر
দ্বাদশ পাঠঃ

شُرُوطُ الْوُضُوءِ ওযুর শর্তসমূহ

ওযুর শর্তসমূহ ১০টি। যথা-

১. মুসলিম হওয়া
২. বিবেকবান হওয়া
৩. ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম হওয়া
৪. নিয়ত করা
৫. ওযু পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ওযু ভাঙ্গার ইচ্ছা না করা
৬. ওযু আবশ্যক করে দেয় এমন বিষয় দূর করা।
৭. (প্রস্রাব-পায়খানা করার পর) পানি ব্যবহার করা বা ঢিলা ব্যবহার করা ওযু শুরু করার পূর্বে।
৮. পানি পবিত্র হওয়া। অর্থাৎ অপবিত্র পানি দিয়ে ওযু করবে না পানি বৈধ হওয়া। অর্থাৎ চুরি করা বা ছিনতায় করা পানি দিয়ে ওযু করবে না
৯. ওযুর স্থান গুলোতে পানি পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি করে এমন বিষয় দূর করা। যেমন- আটা।
১০. ঐ ব্যক্তির জন্য সলাতের সময় হওয়া যে সর্বদায় অপবিত্র থাকে।

কতিপয় শর্তের ব্যাখ্যা

১. পঞ্চম শর্তটির অর্থ হচ্ছে অযুর শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত নিয়্যাতের উপর বহাল থাকা।

২. অযু আবশ্যক কারী বিষয়ের সমাপ্তি ঘটা (৬ নং) এ শর্তের উদ্দেশ্য হলো যেমন- উটের গোশত খাওয়া অবস্থায় এবং পেশাব করা অবস্থায় অযু করবেনা। বরং অযু শুরু করার পূর্বে অযু ভঙ্গকারী বিষয়ের সমাপ্তি ঘটাতে হবে।

৩. অজুর পূর্বে টয়লেট সেরে পানি বা ঢিলা ব্যবহার। তবে অজু যদি বায়ূ নির্গত হওয়ার কারণে বা ঘুমের কারণে বা উটের গোস্ত খাওয়ার কারণে হয় তাহলে তা করতে হবেনা।

৪. পানির পবিত্রতা ও বৈধতা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অপবিত্র পানি বা ছিনতাই করা পানি দ্বারা অযু করবেনা।

৫. চামড়াতে পানি পৌঁছাতে প্রতিবন্ধক এমন জিনিস দূর করা। এর অর্থ হলো যেমন- আটা, নেল পালিশ, কারণ এসব কিছু অঙ্গে পানি পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

স্বভাবগত সুন্নাতসমূহ

১. খাৎনা করা। এটা পুরুষদের জন্য ওয়াজিব। আর নারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সুন্নাত। ২. গোঁফ খাটো করা। ৩. নখ কেটে ফেলা। ৪. বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা। ৫. নাভির নিচের লোম মুণ্ডন করা। আনাস (র) বলেছেন: গোঁফ খাটো করা, নখ কাটা, বগল পরিস্কার করা এবং নাভীর নিচের লোম পরিস্কার সময় সীমা তিনি (স) আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হলো, আমরা যেন এসব ৪০ রাতের অধিক সময় রেখে না দেয়।

সুতরাং মোট কথা হলো, এসব বিষয়ে ৪০ রাতের বেশি সময় দেরি করা যাবে না। ৬. দাড়ি ছেড়ে দেওয়া। এর বিধান ওয়াজিব। এবং দাড়ি মুণ্ডন বড় গুণাহ সমূহের একটি বড় গুণাহ। ৭. মিসওয়াক করা। আর তা হলো আরাক গাছের ডাল বা এ রকম কিছু দিয়ে দাঁত পরিস্কার করা। আর এটা সুন্নাত, সবসময় করা অতি জরুরী এবং অযুর সময়ে, স্বলাতের সময়, ঘরে প্রবেশের সময়, কুরআন পড়ার সময়, ঘুম থেকে উঠার সময়, মৃত্যুর সময় এবং মুখের গন্ধ পরিবর্তন হলে।

الدَّرْسُ الثَّالث عشر
ত্রোয়দশপাঠ

فُرُوضُ الْوُضُوءِ ওযুর ফরয

ওযুর ফরজ ৬ টি। যথা-

১. মুখ ধৌত করা (কপালের দুই প্রান্ত হতে থুতনির নিচ পর্যন্ত) কুলি করা ও নাকে পানি দিয়ে ঝাড়া। মুখ ধৌত করার অর্ন্তভূক্ত।
২. কুনই সহ দুই হাত ধৌত করা।
৩. সমস্ত মাথা মাসাহ করা। মাথার অন্তর্ভূক্ত দুই কান।
৪. টাখনু সহ দুই পা ধৌত করা
. ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।
৬. ওযুর একটি অঙ্গ ধৌত করতে এমন বিলম্ব না করা যাতে পূর্বের ধৌত অঙ্গ শুকিয়ে যায়।

تحقيق الموالاة:

ধারাবাহিকতা বাস্তবায়ন

এটা হয়ে থাকে এভাবে যে, অযুকারী ব্যাক্তি যেন অযুর একটি অঙ্গ ধৌত করতে এমন বিলম্ব না করে যাতে পূর্বের ধৌত অঙ্গ শুকিয়ে যায়।

حكم التَّكرار:

মুখমন্ডল, দুই হাত ও দুই পা তিনবার করে ধৌত করা মুস্তাহাব। অনুরুপ কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াও। আর একবার করে ধৌত করা ফরয। কিন্তু একাধিকবার নয়। একাধিকবার মাথা মাসাহ করা মুস্তাহাব নয়। যেমনটি এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস প্রমাণ করেছে।

الدَّرْسُ الرَّابع عشر
চতুর্দশ পাঠ

نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ. ওযু ভঙ্গের কারণ

ওযু ভঙ্গের কারণ ৬ টি। যেমন-

১. দুই রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া। ২. শরীর থেকে অপবিত্র কিছু বের হওয়া। ৩. ঘুমের কারণে বা অন্য কারণে জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়া। ৪. কোন পর্দা ছাড়াই গোপনাঙ্গ বা নিতম্ব হাত দিয়ে স্পর্শ করা। ৫. উটের গোশত খাওয়া। ৬. ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা।

বিঃ দ্রঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়াঃ অধিকাংশ আলেমদের মত হচ্ছে যে, সঠিক হুকুম হলো মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে ওযু নষ্ট হবে না। কারণ এ ব্যাপারে দলীল নেই। কিন্তু যদি ধৌত কারীর হাত কোন পর্দা ছাড়াই ব্যক্তির গোপনাঙ্গে স্পর্শ করে তাহলে তার উপর ওযু ওয়াজিব।

তার উপর আবশ্যক হলো পর্দা ছাড়া মৃত ব্যক্তির গোপনাঙ্গ স্পর্শ না করা। অনুরূপভাবে স্ত্রীকে স্পর্শ করলেও ওযু নষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছু বের না হয়। চায় সেটি উত্তেজনার সাথে হোক বা উত্তেজনা ছাড়াই হোক। এটি আলেমগণের দুইটি মতামতের বিশুদ্ধ মতামত। কেননা নাবি ﷺ তাঁর কোন এক স্ত্রী কে চুম্বন করলেন অতঃপর সলাত আদায় করলেন কিন্তু তিনি ওযু করেননি। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী, (أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মিলন (সহবাস) করা। এটি আলেমগণের দুইটি মতামতের বিশুদ্ধ মতামত। এটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একদল সালাফদের মতামত।

شرح بعض النّواقض:

কতিপয় অযুভঙ্গের কারণের বিশ্লেষণঃ

১. পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া। যেমন- পেশাব, পায়খানা, বীর্য, মাজি (তথা উত্তেজনায় নির্গত বীয), অদী (তথা অসুস্থতার কারণে নির্গত বীয), বায়ূ, ছোট পাথর, রক্ত, ক্রিমি, মাসিক, প্রসবের পর রক্তস্রাব।

২. আর শরীর থেকে অপবিত্র কিছু বের হওয়া। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কথা হলো, যে তা অযুভঙ্গকারী নয়। তবে যদি তা পেশাব পায়খানা জাতীয় হয়।

৩. ঘুম বা অন্য কারণে বিবেকের বিলুপ্তি ঘটা। ঘুম মূলত অযুভঙ্গকারী নয় কিন্তু তা ভঙ্গকারী এজন্যই যে, সে অবস্থায় বায়ূ বের হওয়ার সম্ভাব্য বিষয়। সুতরাং যদি ব্যক্তি নিজে বুঝতে পারে যে কোন কিছু বের হয়নি তাহলে ঘুম অযু ভঙ্গকারী হবেনা।

৪. কোন প্রকার পর্দা ছাড়াই পেশাব বা পায়খানার রাস্তা স্পর্শ করা। সেক্ষেত্রে অযু করা আবশ্যক।

ملخّصٌ مُصوَّرٌ لصفة الوضوء:
অজুর পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত রূপ

১. নিয়ত করে (بسم الله) বলবে।
২. তারপর দুই কব্জির উপর পানি ঢেলে ধৌত করবে।
৩. অতঃপর ডান হাতে এক চুল্লি পানি নিয়ে মুখের মধ্যে ঘুরিয়ে কুলি করবে। অতঃপর নাকে পানি দিবে। তারপর নাক ঝাড়বে শাহাদাত ও বৃদ্ধা আঙ্গুলি নাকের বাঁশির উপর রেখে এভাবে তিনবার করবে।
৪. অতঃপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করবে। আর মুখমণ্ডলের সীমানা হলো; মাথার চুল গজানোর স্থান থেকে দুই চোয়ালের শেষ অংশ ও থুতনি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য এবং দুই কানের মধ্যবর্তী স্থানের প্রস্থ।
তারপর কনুইসহ দুই হাত তিনবার ধৌত করবে। ডান হাত থেকে শুরু করবে পরে বাম হাত।
তারপর মাথা মাসহ করবে। মাথার অগ্রভাগ থেকে নিয়ে পিছনের শেষ ভাগ পর্যন্ত হাত অতিক্রম করাবে আবার পিছন থেকে ফিরিয়ে সামনে নিয়ে আসবে।
তারপর দুই শাহাদাত আঙ্গুল দুই কানের ছিদ্রের ভিতর রেখে দুই কান মাসাহ করবে।
তারপর দুই টাখনুসহ দুই পা তিনবার ধৌত করবে।










এবং অযু শেষ করার পর এই দো'আ টি পাঠ করবে।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّااللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ -

উচ্চারণ: *'আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু।'*

অর্থ: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আর তিরমিযীতে রয়েছে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

আল্লাহুম্মাজ্ আলনী মিনাত্ তাওয়াবীনা, ওয়াজআলনী মিনাল মুতাত্বহহিরীন।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

শরীয়ত সিদ্ধ পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত করার বিধান

ওযুর ক্ষেত্রে শরীয়তসিদ্ধ পরিমাণের চেয়ে কোন কিছু অতিরিক্ত করা বৈধ নয়। যেমন তিন বারের চেয়ে বেশি ধৌত করা, কনুইয়ের উপর বাহু ধৌত করা, টাখনুর উপরে পিন্ডলী ধৌত করা অথবা ঘাড় মাসাহ করা।





ملحقٌ فيه بعض ما يتعلّق بأركان الإسلام
ইসলামের রুকুনসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সংযোজন।

أوّلًا: الطّهارة প্রথমত: পবিত্রতা

التّيمُّم: তায়াম্মুম

এটা হলো পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের বিকল্প পদ্ধতি। যখন পানি না পাওয়ার কারণে অথবা তা ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কার কারণে পবিত্রতা অর্জনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি ব্যবহার দু:সাধ্য হয়ে পড়বে তখন মাটি পানির স্থলাভিষিক্ত হবে।

صفة التّيمُّم: তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

১. নিয়ত করবে। ২. বিসমিল্লাহ বলবে। ৩. একবার দুই হাত মাটিতে মারবে ৪. তার দুই হাতের তালু দ্বারা মুখমন্ডল মাসাহ করবে এবং দুই হাতের পিঠ মাসাহ করবে।



মাটিতে হাত মারার সময় আঙ্গুল সমূহ ফাঁকা রাখার বিধান নেই, দুই কব্জি মাসাহ করার সময় আঙ্গুলসমূহ খিলাল করারও বিধান নেই।



صفة الغسل الواجب: ওয়াজিব গোসলের পদ্ধতি হলো

গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা দুর করার। নিয়্যাত করবে। বিসমিল্লাহ বলবে পানি দিয়ে সমস্ত শরীর ও চুলের গোড়া ধৌত করবে পাতলা চুল হোক বা ঘন চুল হোক এবং কুলি করবে ও নাকে পানি দিবে।

السُّنَّة في الاغتسال: সুন্নাত গোসলের পদ্ধতি

দুই গোপনাঙ্গ ধৌত করবে। দুই হাত ধৌত করবে। অত:পর ওযু করবে স্বলাতের ওযুর ন্যায়। মাথার চুল ভিজাবে। তার পর শরীরের ডান পার্শ্ব ধৌত করার পর বাম পার্শ্ব ধৌত করবে। দুই পা ধৌত করবে।

موجبات الغسل যে কারণে গোসল ওয়াজিব হয় গোসল ।

১. অপবিত্রতা: আর এটা হয়ে থাকে সহবাস বা অন্যভাবে বীর্যপাত অথবা দুই লিংগের মিলনের কারণে।
২. মাসিক এবং প্রসবোত্তর রক্তস্রাব।
৩. মৃত্য ব্যক্তির গোসল তবে শহীদদের গোসলের বিধান নেই।
৪. কাফের ব্যাক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে।

মোজার উপর মাস্‌হের শর্তসমূহ

পাতলা বা ভারি মোজা পবিত্র হতে হবে।

পানি দ্বারা অযু করার পর পরিধান করতে হবে।

মাসাহ হতে হবে ছোট অবিত্রতার ক্ষেত্রে। বড় অপবিত্রতার ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ যে অপবিত্রতা গোসল ওয়াজিব করে সে ক্ষেত্রে নয়।

মোজাটি অঙ্গটির অধিকাংশ আবরণকারী হতে হবে।

আর মাসাহ টি হতে হবে শরীয়ত নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আর তা হলো মুকিমের জন্য একদিন একরাত (২৪ ঘন্টা) আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত (৭২ ঘন্টা) আর সময়টি শুরু হবে ছোট অপবিত্রতার পর প্রথম মাসাহ থেকে।

كيفيَّة المسح على الخفَين: মোজার উপর মাসাহ করার পদ্ধতি

মাসাহকারী শুধু মাত্র পায়ের আঙ্গুলির অগ্রভাগ থেকে নিয়ে পিন্ডলী পর্যন্ত স্বীয় হাত অতিক্রম করাবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র মোজার উপরিভাগ মাসাহ করতে হবে। এবং একই সাথে দুই হাত দুই পায়ের উপরে রেখে মাসাহ করবে। অর্থাৎ ডান হাত ডান পায়ের উপর এবং বাম হাত বাম পায়ের উপর রেখে একই সময়ে মাসাহ করবে যেভাবে দুই কান মাসাহ করা হয়। কেননা এটাই সুন্নাতের অনুকুলে।

مسائل تتعلَّق بالمسح মাসাহ সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহ

১. যদি মাসহের সময় শেষ হয়ে যায় অথবা মোজা খুলে ফেলা হয় তবে পবিত্রতা নষ্ট হবেনা।

২. ছিড়া মোজা ও চামড়া দেখা যায় এমন পাতলা মোজার উপরেও মাসাহ করা বৈধ।

آداب قضاء الحاجة: পেশাব পায়খানার আদবসমূহ

১. টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা আগে দিয়ে এই দো'আ পাঠ করবে।

২. (بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ) উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খবাইস

অর্থাৎ (হে রব) আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই।

ওয়াজিব: তার উপর আবশ্যক হলো কোন দেয়াল বা অন্য কিছু দিয়ে নিজেকে আড়াল করে নিবে। আর যদি উন্মুক্ত ময়দানে হয় তাহলে দূরবর্তী স্থানে চলে যাবে।

তার জন্য নিষিদ্ধ হলো:

১. রাস্তায়, মানুষের বসার জায়গায়, অথবা ফলদার বৃক্ষের নিচে অথবা এমন জায়গায় যা মানুষকে কষ্ট দিবে এবং বদ্ধ পানিতে ইস্তেঞ্জা করা কোন ব্যাক্তির জন্য বৈধ নয়।

২. ইস্তেঞ্জার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিঠ রাখা।

৩. ডান হাতে লিংগ স্পর্শ করা।

৪. আল্লাহর জিকির করা।

অতঃপর তার ইস্তেঞ্জা শেষ হলে পানি বা ঢিলা ব্যবহার করবে। আর ঢিলা কুলুখের শর্তসমূহ হলো:

১. তিনবার বা ততোধিক মাসাহ করতে হবে। তবে একই জায়গায় নয়।

২. আর ঢিলা যেন পরিস্কার হয় তথা পাথর বা রুমাল যেন শুকনো হয়।

৩. ঢিলা যেন অপবিত্র জিনিস, সম্মানিত জিনিস যেমন খাদ্য, হাড্ডি এবং গোবর এসব কিছু না হয়। আর যদি শরীরে বা কাপড়ে পেশাব ছিটে আসে এবং গোপনাঙ্গ প্রকাশ হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে দাড়িয়ে পেশাব করা বৈধ। নবী (স) এক জাতির আবর্জনার জায়গায় এসে দাড়িয়ে পেশাব করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

أسئلة على الطّهارة
পবিত্রতা বিষয়ক প্রশ্নাবলী

১. **অযুর শর্ত কয়টি?**
ক. ৯ টি খ. ১০ টি গ. ৮ টি

২. **অযুর ফরযসমূহ হলো:**
ক. চারটি অঙ্গ খ. চার অঙ্গের সাথে ধারাবাহিকতা ও লাগাতার

৩. **অযু ভঙ্গের কারণ কয়টি?**
ক. ৬ টি খ. ৫ টি গ. ৮ টি

৪. **নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো থেকে অযু ভঙ্গের কারণ নির্ণয় কর।**
ক. উটের গোশত খ. হরিণের গোশত গ. পেটের আওয়াজ ঘ. বায়ূ
ঙ.তন্দ্রা চ. মুর্দাকে গোসল করানো ছ. মহিলাকে স্পর্শ করা।

৫. **তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

৬. **গোসলের পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

৭. **নিম্নে বর্ণিত প্রত্যেকটি মাসআলার হুকুম বর্ণনা কর।**

মাসআলা	হুকুম
নিয়্যত উচ্চারণ করা	
একটি অযু দিয়ে একটি সলাতের নিয়্যত করে একাধিক সলাত পড়লে।	
কুরআন পড়ার জন্য অযু করে সলাত পড়লে	
অযুর মধ্যে নিয়্যাত ভঙ্গ করলে	
অযুর পরে নিয়্যত ভঙ্গ করলে	
অযু করার সময় তার পিন্ডলীতে আটা থাকলে	

মাসআলা	হুকুম
উটের গোশত খাওয়া অবস্থা অযু করলে	
চুরি করা পানি দিয়ে অযু করলে	
পানি বা ঢিলা ব্যবহারের পূর্বে অযু করলে	
কানের জন্য নতুন পানি নেওয়া	
তিনবার মাথা মাসাহ করা	
একবার করে ধৌত করা	
তিনবার করে ধৌত করা	
অযুতে দুই কব্জি ধৌত করা	
দাড়ি খিলাল করা	
অযুতে কচলানো	
যা ধৌত করা আবশ্যক তা মাসাহ করলে	
মাথা ধৌত করা	
দুই হাত কব্জি পর্যন্ত পাত্রে প্রবেশ করালে	
অজুর ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা	
তিনের অধিক ধৌত করা	
পিন্ডলী ধৌত করা	
সাতারের পর সলাত পড়লে	
গোসলের পর অযু না করেই সলাত পড়লে	

ثانيًا: الزّكاة দ্বিতীয় পর্ব: যাকাত

উহা দুই প্রকার

সম্পদের যাকাত: উহা ইসলামের তৃতীয় রুকুন। উহা প্রত্যেক নেসাবের মালিক স্বাধীন মুসলিমের উপর ওয়াজিব। জমির ফসল ব্যতিত, সম্পদের যতক্ষণ এক বছর অতিক্রম না করবে ততক্ষণ তাতে যাকাত ফরজ হবেনা। আর অনুরূপ বিধান ব্যবসার ক্ষেত্রে। আর এই প্রকার যাকাত চার প্রকার:-

- স্বর্ণ-রোপ্যের মুদ্রা ও টাকা পয়সা হতে উক্তদ্বয়ের যা সমস্ত হবে। স্বর্ণের নিসাব ২০ মিসকাল (৮৫ গ্রাম) আর রোপ্যের নিসাব ২০০ দিরহাম (৫৯৫ গ্রাম)
- যে গৃহপালিত পশু বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চরে বা পুরো বছর ধরে মাঠে চরে। গৃহপালিত পশু বলতে উদ্দেশ্য: উট, গরু, ছাগল।
- জমির ফসল। আর তাহলো: শষ্য-ফল।
- ব্যবসার সামগ্রী উহা প্রত্যেক ঐ পণ্য যা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

শরীরের যাকাত: আর উহা হলো যাকাতুল ফিতর। আর উহা প্রত্যেক মুসলিম, ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা, দাস-আযাদ, এর উপর ফরজ।

أهل الزَّكاة: যাকাতের হকদারগণ

১. ফকীরঃ আর তারা অভাবগ্রস্থ যাদের কিছুই নেই। বা অল্প কিছু রয়েছে।

২. মিসকিনঃ আর তারা প্রয়োজনের অর্ধেক বা প্রয়োজনের কাছাকাছি অর্থ রয়েছে; যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ব্যক্তির এক বছরের জন্য ১২,০০০/- বারো হাজার রিয়াল যথেষ্ঠ, তাহলে এক্ষেত্রে ফকীর হলো ঐ ব্যক্তি যার নিকট ছয় হাজারের কম অর্থ রয়েছে বা তার নিকট কিছুই নেই। আর ঐ ক্ষেত্রে মিসকীন হলো: যার নিকট ছয় হাজার রিয়াল রয়েছে বা তার চেয়ে বেশি কিন্তু ১২,০০০/- বারো হাজারে পৌছায়নি। তাই আমরা ফকীর ও মিসকীনকে প্রদান করবো যা তাদেরকে এক বছরের জন্য যথেষ্ট করবে, কেননা যাকাত বছরে একবার ফরজ হয়।

৩. যাকাতের ক্ষেত্রে যারা কাজ করবেঃ তারা হলো: যাকাত একত্রকারী, সংরক্ষণ কারী, বন্টন কারী, যাদেরকে সরকার সেক্ষেত্রে দায়িত্ব দেবে। যাকাতের অংশ গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে দরিদ্র্য অবস্থা হওয়া আবশ্যক নয়। বরং যাকাতের অংশ হতে তাদেরকে প্রদান করবে যদিও তারা ধনী হয়।

৪. (**المؤلَّفة قلوبهم**) যাদের ইসলাম গ্রহণের আশা করা হয় বা ক্ষতি সাধন বন্ধ করা বা, তার ঈমান শক্তিশালী হওয়ার আশা করা হয়।

৫. মুক্তিপণঃ (ক) আর তারা হলো: যে মুসলিম দাস তার মালিক হতে নিজেকে মুক্তো করার জন্য করেছে। (খ) মুসলিম দাস মুক্তো করা। (গ) মুসলিম বন্দি। আর তাদের বিধান ঐ দাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যাকে তার মালিক সেচ্ছায় আযাদ করে দিবে।

৬. ঋণগ্রস্থ: তারা হলো (ক) যে মানুষের মাঝে সমাধানের ক্ষেত্রে ঋণী। (খ) যে নিজের কারণে ঋণী। আর ঋণী ফকীর ব্যক্তির ঋণকে যাকাতের নিয়তে মাফ করায় সে ব্যক্তির যাকাত প্রদান যথেষ্ট হবে না।

৭. আল্লাহর রাস্তায়: মুজাহিদগণ ও তাদের যা সরঞ্জাম এর প্রয়োজন হয়।

৮. মুসাফির ব্যক্তি: যার সফরের খরচ পত্র শেষে হয়ে গেছে তার নিজ দেশে পৌঁছাতে যা প্রয়োজন তা প্রদান করা হবে। আর উল্লেখিত প্রকারের যে কোন এক প্রকার কে যাকাত প্রদান করা বৈধ হবে। আর যাকাত কোন ধনী ও সুঠাম লেবারের জন্য বৈধ নয়। অনুরুপ ভাবে রাসূল ﷺ এর বংশের জন্য বৈধ নয়। তারা হলো: বনু হাশেম ও তাদের দাসসমূহ। অনুরুপ যাদের খরচ বহন করা ওয়াজিব এবং কাফের, তাদের জন্য যাকাত প্রদান বৈধ নয়। কিন্তু যাকাত ব্যতীত অন্য ধরণের সাদাকাহ তাদেরকে প্রদান করা বৈধ। আর যে ক্ষেত্রে প্রদান করাতে সবচেয়ে বেশি উপকার রয়েছে তাহাই পরিপূর্ণ।

গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ:

১. বিনতুল মাখায: যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে, তার এই নামকরণ করা হয়েছে কেননা তার মা গর্ভবতী।

২. বিনতুল লাবণ: ঐ বাচ্চাটিকে বলা হয় যার বয়স ২ বছর পূর্ণ হয়েছে। তার এই নামকরণ করা হয়েছে। কেননা তার মা দুধ প্রদান করে।

৩. আল হেক্কাহ: ঐ বাচ্চাটিকে বলা হয় যার বয়স ৩ বছর পূর্ণ হয়েছে। তার এই নাম রাখা হয়েছে কেননা ষাড় উট তার পিছনে লাগে।

৪. আল জাযআহ: ঐ বাচ্চাটিকে বলা হয় যার বয়স ৪ বছর পূর্ণ হয়েছে, কেননা এই বয়সে তার দুধ দাঁত উঠে যায়।

৫. আত্ তাবীঈ বা আত তাবীআহ: গরুর ঐ বাচ্চাটিকে বলা হয় যার এক বছর পূর্ণ হয়েছে।

৬. আল মুসিন্নাহ: ঐ বাচ্চাটিকে বলা হয় যার বয়স দু বছর পূর্ণ হয়েছে।

مقادير الزّكاة: যাকাতের পরিমাণ

الأموال সম্পদ	الحول বছর	النّصاب নিসাব	مقدار الزّكاة যাকাতের পরিমাণ
চরণশীল পালিত প্রাণী	শর্ত	পরবর্তী ছকে দেখে নিন	পরবর্তী ছকে দেখে নিন
জমির ফসল	শর্ত নয়	৩০০ সা,আ	যা আসমানের পানি ও ঝর্ণা দ্বারা হয় তাতে এক দশমাংশ।
			যা ছেঁচের পানিতে হয় তাতে এক বিশাংশ
			আর যা উভয় দ্বারা হয় তাতে এক চৌদ্দাংশ
অর্থকড়ি	শর্ত	৮৫ গ্রাম স্বর্ণ বা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য	এক দশাংশের চতুর্থাংশ
ব্যবসার সামগ্রী	শর্ত	স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য করে নিসাব করা হবে	এক দশাংশের চতুর্থাংশ

চারণশীল পশুর যাকাতের নিসাব ও পরিমাণঃ

ছাগল, ভেড়া, মেস			উট এক বা দুই কুঁজওয়ালা			গরু, মহিষ		
পরিমাণ		যাকাত	পরিমাণ		যাকাত	পরিমাণ		যাকাত
হতে	পর্যন্ত		হতে	পর্যন্ত		হতে	পর্যন্ত	
৪০	১২০	১টি ছাগল	৫	৯	১টি ছাগল	৩০	৩৯	১টি এক বছরের গরুর বাচ্চা (পুরষ বা মহিলা)
১২১	২০০	২টি ছাগল	১০	১৪	২টি ছাগল	৪০	৫৯	দুই বছরের ১টি গরুর মহিলা বাচ্চা
২০১	৩০০	৩টি ছাগল	১৫	১৯	৩টি ছাগল	৬০	৬৯	১বছরের গরুর ২টি মহিলা বাচ্চা
এর পর থেকে প্রত্যেক ১০০ টি ছাগলে ১টি ছাগল যাকাত লাগবে।			২০	২৪	৪টি ছাগল	এর পর থেকে প্রত্যেক ৩০টি গরুতে ১টি এক বছরের গরুর বাচ্চা এবং প্রত্যেক ৪০টি গরুতে ২ বছরের গরুর ১টি মহিলা বাচ্চা দিতে হবে।		
			২৫	৩৫	এক বছরের ১টি উটের মহিলা বাচ্চা			
			৩৬	৪৫	দুই বছরের ১টি উটের মহিলা বাচ্চা			
যেগুলোর যাকাত নেওয়া হবেনা: পাঁঠা, ত্রুটি যুক্ত প্রাণী, নিম্নমানের সম্পদ।			৪৬	৬০	তিন বছরের ১টি উটের মহিলা			

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>বাচ্চা</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>আর গ্রহণ করা হবেনা: দূর্বল প্রাণী, গর্ভবতী প্রাণী, অতিভোজী প্রাণী ও সর্বত্তম সম্পদ।</td><td>৬১</td><td>৭৫</td><td>চার বছরের ১টি উটের মহিলা বাচ্চা</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>৭৬</td><td>৯০</td><td>দুই বছরের উটের ২টি মহিলা বাচ্চা।</td></tr>
<tr><td>৯১</td><td>১২০</td><td>তিন বছরের উটের ২টি মহিলা বাচ্চা।</td></tr>
<tr><td>১২১</td><td>১২৯</td><td>২ বছরের উটের ৩টি মহিলা বাচ্চা।</td></tr>
<tr><td colspan="3">এর পর থেকে প্রত্যেক ৪০টি উটে ১টি বিনতে লাবুল প্রদান করতে হবে এবং প্রত্যেক ৫০টি উটে ১টি হাককা যাকাত প্রদান করতে হবে।</td></tr>
</table>

যাকাত পর্বের প্রশ্নসমূহ

১. সম্পদে এক বছর অতিক্রম না করলে যাকাত নেই
ক. হিজরী বছর খ. খ্রিষ্টাব্দ বছর গ. কোন পার্থক্য নেই

২. বছর অতিক্রমের শর্ত থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে:
ক. গুপ্তধন খ. জমির ফসল গ. উল্লেখিত সবগুলোই

৩. স্বর্ণের নিসাব:
ক. ৮৫ গ্রাম খ. ৫৯৫ গ্রাম গ. ৯৫ গ্রাম

৪. রৌপ্যের হিসাব:
ক. ২০০ দিরহাম খ. ৫৯৫ গ্রাম গ. উল্লেখিত সবগুলোই

৫. গৃহপালিত পশু হলো: উট, গরু, মহিষ ও ছাগল
ক. সঠিক খ. ভুল

৬. ফলের কোন যাকাত নেই।
ক. সঠিক খ. ভুল

৭. চরণশীল প্রাণী:
ক. যার মূল্য বেশি খ. যা বছরের অধিকাংশ সময়ে মাঠে চরে।

৮. যে পশু বৈধতে চরে
ক. পবিত্র ভক্ষণ করে। খ. যার মালিক নেই।

৯. যদি মিসকিনদের উল্লেখ করা হয় তাহলে ফকীরও উদ্দেশ্য।
ক. সঠিক খ. ভুল

১০. ফকীরকে যাকাত হতে প্রদান করা হবে যা যথেষ্ট হবে:

ক. এক বছরের জন্য খ. ১ মাসের জন্য

১১. যাকাতের কর্মচারী হলো তারা:

ক. প্রত্যেকেই যারা সেক্ষেত্রে কাজ করে। খ. শুধুমাত্র সরকার যাদের দায়িত্ব দিয়েছে।

১২. নিম্নে বর্ণিতের যাকাতের পরিমাণ নির্ণয় করুন:

সম্পদ	যাকাতের পরিমাণ	নিসাবের অপরিপূর্ণ সংখ্যা
১০০ দিরহাম		
৩০০ দিরহাম		
৪০০ দিরহাম		
৮০ গ্রাম স্বর্ণ		
৫০০ গ্রাম রোপ্য		
৩০ টি ছাগল		
৬০টি ছাগল		
৫৬৫টি ছাগল		
৪টি উট		
১৭টি উট		
৪৪৯ টি উট		
৩০টি গরু		
৪৯ টি গরু		
৭৭ টি গরু		
৯৯ টি গরু		
২০ মিলিয়ন রিয়াল		
৪০ রিয়াল		
৪৫৬৭৯ রিয়াল		
২৫৫ সা গম		

১৩. মনজয় করাদের অন্তর্ভূক্ত হবে সেই কাফের ব্যক্তি যার ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায় না।
ক. সঠিক খ. ভুল

১৪. মালিক তার দাসকে মুক্ত করে দিলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।
ক. সঠিক খ. ভুল

১৫. কোন ধনী ব্যক্তি ফকীরের থেকে তার ঋণের থেকে তার ঋণের অর্থ চাইলে। কিন্তু ধনী ব্যক্তিটি ঋণ পরিশোধ নিলো না এবং সেই অর্থকে তার যাকাত প্রদান মনে করল। তার এই কাজটি কি সঠিক।
ক. সঠিক খ. ভুল

১৬. আল্লাহর রাস্তা বলতে বুঝায় সমস্ত কল্যাণের কাজ, যেমনঃ মসজিদ বানানো।
ক. সঠিক খ. ভুল

১৭. টাকা কড়ির যাকাত চল্লিশাংশে ভাগ করে হিসাব করা হবে।
ক. সঠিক খ. ভুল

১৮. চরণশীল পশুর যাকাত ফরজ কিন্তু যে পশুকে খাওয়ানো হয় এবং যাকে কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাতে যাকাত ফরজ নয়।
ক. সঠিক খ. ভুল

১৯. শস্য ও ফলের যাকাত ফরজ হবে নিসাব পূর্ণ হলে এবং যখন সেগুলো পাকার উপক্রম হবে।
ক. সঠিক খ. ভুল

২০. শস্য-ফল সেচের মাধ্যমে হয় তাতে বিশমাংশ যাকাত ফরজ।
ক. সঠিক খ. ভুল

২১. স্বর্ণে যাকাত ফরজ হবে নিসাব পূর্ণ হলে, আর তার পরিমাণ হলো ২০ মিসকাল।
ক. সঠিক খ. ভুল

২২. নিম্নের যেগুলোর যাকাত ফরজ টিক চিহ্ন দিনঃ
ক. মুরগী খ. দোকান পাট গ. ছাগল যেগুলোকে খাবার ক্রয় করে খাওয়ানো হয়
ঘ. চরণশীল উট ঙ. খেজুর বাগান চ. ২৫ মিসকাল পরিমাণ স্বর্ণ

২৩. গরুর তাবী বলা হয় যে বাচ্চার দুই বছর পূর্ণ হয়েছে।

ক. সঠিক খ. ভুল

২৪.টাকা পয়সার নেসাব নির্ধারণ করা হবেঃ

ক. ব্যবসার সামগ্রীর সঙ্গে খ. স্বর্ণের বা রোপ্যের নেসাবের মুল্যের সঙ্গে।
গ. স্বর্ণ ও রোপ্যের নেসাবের মুল্যের সঙ্গে।

২৫.টাকা পয়সার যাকাতের ফরজ হলোঃ

ক. এক চল্লিশাংশ খ. এক বিশামাংশ।

২৬.৮০ গ্রাম স্বর্ণের যাকাত হলোঃ

ক. দুই গ্রাম খ. চার গ্রাম গ. কোন যাকাত নেই।

২৭.বসবাসের জন্য নির্মিত বাড়ীতে যাকাত ফরজ।

ক. সঠিক খ. ভুল

২৮.প্রত্যেক মুসাফির ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করা হবে কেননা সে পথিক।

ক. সঠিক খ. ভুল

তৃতীয় পর্ব

ثالثًا: الصِّيام সিয়াম বা রোযা:

এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। এর শারঈ অর্থ সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার রোযা ভঙ্গকারী বিষয় ও পানাহার পরিত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত

أركان الصِّيام রোযার রুকনসমূহ

নিয়ত করা। নিয়্যাত দুই প্রকার

সিয়াম বা রোযা ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থাকা

نيَّة الفرض

ফরয নিয়্যাত যা ফজরের পূর্বেই নিয়্যাত স্থির করা। আর মাস প্রবেশ করার পর নিয়্যাত করা পূর্ণ মাসের জন্য যথেষ্ঠ। নিয়তের জায়গা হলো অন্তর। তা মুখে উচ্চারণ করে বলা বিদআত

نيَّة النَّفل

নফল নিয়্যাত। এটি দিনের যেকোন সময় করা যায় তবে শর্ত হলো (উক্ত সময়ের পূর্বে) কোন কিছু পানাহার না করা। আর নেকি গণ্য হবে নিয়ত করার পর থেকে।

أقسام الصِّيام সিয়াম বা রোযার প্রকারভেদ

واجبٌ:

ওয়াজিব: রমযানের কাফ্ফারা ও নযরের রোযা

نفلٌ:

في غير ذلك

নফল: সেগুলো ব্যতিত

شروط وجوب الصِّيام সিয়াম বা রোযা ওয়াজিবের শর্তসমূহ

১. মুসলিম হওয়া ২. বিবেকবান হওয়া

৩. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্কদের রোযা রাখার জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে এবং তার অভিভাবক তাকে আদেশ করবে।

৪. মুকিম হওয়া: তাই মুসাফিরের উপর রোযা ফরয নয়। কিন্তু উত্তম হলো কষ্ট না হলে রোযা রাখা। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আমলের কারণে এবং দ্রুত দায়মুক্ত হওয়ার জন্য, আর উহা তার জন্য সহজ ও মাসের ফযিলত পাওয়ার জন্য।

৫. সুস্থ হওয়া। ৬. হায়েজ ও নেফাস হতে মুক্ত হওয়া।

سিয়াম বা রোযার ক্ষেত্রে রোগের প্রকারভেদ

مرضٌ لا يُرجى زواله:

এমন রোগ যা ভালো হওয়ার আশা নেই: এর সঙ্গে প্রবীন অপারগ ব্যক্তিকে মিলিত করা হবে। সুতরাং তার প্রতি রোযা ফরজ নয়। বরং প্রতিদিন একজন মিসকিন কে খাবার খাওয়াবে। সে ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে: দিনের সংখ্যা হিসেবে মিসকিনদের একত্রিত করে দুপুর বা রাত্রের খানা খাওয়াবে। কিংবা তাদেরকে দিনের সংখ্যা হিসেব করে খাবার বন্টন করে দিবে। প্রত্যেক মিসকিনকে ৫১০ গ্রাম করে ভালো গম আর উত্তম হলো যে, তার সঙ্গে তরকারীর জন্য গোশত ও তৈল দিবে।

مرضٌ يُرجى زواله ويشقُّ عليه الصَّوم:

এমন রোগ যা ভালো হওয়ার আশা আছে কিন্তু রোজা রাখা তার জন্য কষ্টকর: এই অবস্থার সঙ্গে মিলিত হবে হায়েজ নেফাসে পতিত মহিলা, দুধ প্রদান কারিণী মহিলা, ও মুসাফির ব্যক্তি। তাই যে দিনগুলো রোযা রাখেনি কষ্ট দূর হলে উক্ত দিনগুলোর ক্বাযা করবে। আর কষ্ট দূর হওয়ার আগে মারা গেলে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

রমযান মাস প্রবেশ কি দ্বারা সাবস্ত হবে?

রমযানের চাঁদ দেখার মাধ্যমে বা শাবান মাসের ৩০ তম দিন পূর্ণ করার মাধ্যমে।

مفسدات الصِّيام সিয়াম ভঙ্গকারী কারণসমুহ

১. স্বইচ্ছায় খাবার পানাহার করা। কিন্তু কেউ তা ভুলে করলে তার রোযা সহি শুদ্ধ হবে।
২. সহবাস করা। যদি রমযানের দিনে তা করে, এবং রোযা তার উপর ফরজ তাহলে দাস আযাদ করা। যদি তা না পারে তাহলে পরপর দুই মাস রোযা রাখা। আর যদি তা করতে সক্ষম না হয় তা হলে ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো।
৩. হস্থমৈথুন বা চুমা খাওয়া বা জড়িয়ে ধরার মাধ্যমে বীর্য বের হওয়া।
৪. যা খাবার পানাহারের স্থলাভিষিক্ত। যেমন খাবার ইনজেকশন, আর যদি খাবার ইনজেকশন না হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।
৫. ইচ্ছাকৃত ভাবে বমন করা।
৬. সিংগার মাধ্যমে রক্ত বের করা। কিন্তু পরিক্ষার জন্য অল্প রক্ত বের করায় রোযা ভঙ্গ হবে না।
৭. হায়েয ও নেফাসের রক্ত বের হওয়া।

বৈধ কতিপয় কাজ রোযাদার ব্যক্তির জন্য

থুথু গিলে ফেলা, প্রয়োজনে খাবারের স্বাদ গ্রহণ, গোসল করা, মিসওয়াক করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, এসি ব্যবহার করা।

مستحبَّات الصِّيام রোযার মুস্তাহাব বিষয়াদি

১. সাহরী গ্রহণ করা। ২. সাহরী বিলম্ব করে গ্রহণ করা। ৩. সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা। ৪. আধা পাকা খেজুর দ্বারা ইফতার করা, তা না গেলে শুকনো খেজুর দ্বারা, আর খেজুর যেন বিজোড় হয়। যদি খেজুর না পায় তাহলে পানি দ্বারা। আর কিছুই না পায় তাহলে অন্তরে ইফতারের নিয়্যাত করবে।
৫. রোযা অবস্থায় ও ইফতারের সময় দো'আ করা। ৬. বেশি বেশি দান খয়রাত করা। ৭. রাত্রের সলাতের প্রচেষ্টা করা। ৮. কুরআন তেলাওয়াত করা। ৯. যে তাকে গালী দিবে তাকে বলা আমি রোযাদার। ১০. উমরাহ করা। ১১. শেষ দশকে এতেকাফ করা। ১২. লাইলাতুল ক্বদরের অনুসন্ধান করা।

সিয়ামের অপছন্দনীয় কাজ সমূহ

১. প্রবল ভাবে কুলি ও নাকে পানি দেওয়া
২. প্রয়োজন ব্যতিত খাবারের স্বাদ গ্রহণ করা।

রোযাদার ব্যক্তির উপর যা হারাম

১. নাকের পোঁটা গিলে ফেলা, কিন্তু তা দ্বারা রোযা নষ্ট হবে না।
২. ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে চুমা খাওয়া যার রোযা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
৩. মিথ্যা কথা বলা।
৪. মানুষের সঙ্গে মুর্খতা আচরণ প্রকাশ করা।
৫. দুই তিন দিন লাগাতার রোজা রাখা।

নফল সিয়াম/রোযা

১. রমযানের পূর্ণ রোযা যিনি করেছেন তার জন্য শাওয়াল মাসের ৬টি রোযা রাখা।
২. যিনি হজ্জ করতে এসেছেন তিনি ব্যতিত আরাফার দিন রোযা রাখা।
৩. আশুরার রোযা রাখা, সঙ্গে তার আগে একদিন কিংবা পরে একদিন।
৪. প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা, বিশেষ করে সোমবার।
৫. প্রতি মাসে ৩টি রোযা করা। আর উত্তম হলো ১৩, ১৪, ১৫।
৬. একদিন রোযা রাখা পরদিন ইফতার করা।
৭. মুহাররাম মাসের রোযা রাখা।
৮. জিলহজ্জ মাসের প্রথম নয়দিন রোযা রাখা।
৯. শাবান মাসের রোযা রাখা, কিন্তু মাস পূর্ণ করবে না।

মাকরূহ রোযা

শুধুমাত্র শুক্রবার, শনিবার, রবিবারের রোযা রাখা মাকরূহ। কিন্তু কোন কারণ বশত যদি তা করে যেমন আরাফার দিন তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

নিষিদ্ধ রোযা

১. একক ভাবে রজব মাসের রোযা রাখা
২. দুই ঈদের রোযা রাখা
৩. সন্দেহে দিনে রোযা রাখা। কিন্তু যার আমলগত ভাবে রোযা রাখার নিয়ম আছে তার জন্য অসুবিধা নেই।
৪. তাশরীকের দিনের রোযা রাখা (জিলহজ্ব মাসের ১১, ১২, ১৩) তারিখ কিন্তু যার হাদী দেওয়ার সমর্থ নেয় তার জন্য বৈধ।
৫. বছর ধরে রোযা রাখা।

রোযা কাযা করার বিধিবিধান।

১. কাযা করার ক্ষেত্রে লাগাতার ভাবে করা মুসতাহাব
২. ঈদের পরেই দ্রুত করা উচিৎ
৩. পরের রমযান পর্যন্ত কাযা বিলম্ব করা জায়েজ নয়।
৪. যদি কারণ ছাড়া বিলম্বিত করে ফেলে তা হলে তাকে অতিরিক্ত রোযা রাখতে হবে না। কিন্তু সে জন্য সে গুণাহগার হবে।

যাকাতুল ফিতর

মুসলিম অবস্থায় রমযান মাসের শেষ দিন যে পেয়েছে তার উপর ওয়াজিব। সে হোক বড়-ছোট, পুরুষ-মহিলা, দাস-আযাদ। ঈদের দিন রাত্রীতে প্রদান করা উত্তম। তার পরিমাণ হলো এক সা'আ খাদ্য এবং গর্ভের বাচ্চার যাকাতুল ফিতর দেওয়া মুস্তাহাব।

আর ফিতরার হিকমত হলো:

১. রোযাদার ব্যক্তির বেহুদা কথা-কর্মের পবিত্রতা করণ।
২. ফকীর মিসকিনদের ঈদের দিন মানুষের নিকট চাওয়া হতে বাঁচিয়ে রাখবে।

যাকাতুল ফিতরা প্রদান করার সময়

وقت جوازٍ:
বৈধ সময়: ঈদের ১দিন বা ২ দিন আগে।

وقت استحبابٍ:
উত্তম সময়: ফজরের পর ঈদের সলাতের আগে।

وقت تحريمٍ:
নিষিদ্ধ সময়: ঈদের সলাতের পর।

مقدار زكاة الفطر

যাকাতুল ফেতরার পরিমাণ

এক সা'আ খাদ্য যা মানুষ গ্রহণ করে, সুতরাং অর্থ যথেষ্ট হবে না। আর সা'আর পরিমাণ হলো ২ কেজি ৪০ গ্রাম ভালো গম।

صلاة العيد ঈদের সলাত

ঈদের সলাত প্রত্যেকের উপর ফরজ। সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পর হতে দুপুর পর্যন্ত পড়া যাবে। ছুটে গেলে কাযা করা যাবেনা। উত্তম হলো সলাত মাঠে পড়া। মসজিদে পড়া বৈধ। সলাতের আগে বিজোড় খেজুর খাবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করবে। সুগন্ধি ব্যবহার করবে। উত্তম পোশাক পরিধান করবে, এক রাস্তা দিয়ে যাবে অপর রাস্তা হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করায় অসুবিধা নেই। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের কে কবুল করে নেন। ঈদের রাত্রীতে ও দিনে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত নামাযের পরে তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত। তাকবীরের শব্দগুলো হলো।

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার অলিল্লাহিল হাম্‌দ।

অর্থ: *আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আ ল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।* *(মাশা.৩/১২৮, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, মাশা. হা/৫৬৯৭, সহীহ, যাদুল মা'আদ, মাশা. পৃ. ২/৩৯৫)*

ঈদের সলাতের পদ্ধতি হলো: খুতবার আগে ২ রাকাআত সলাত। প্রথম রাকাআতে তাকবীরাতুল ইহরামের পরে ৬ তাকবীর দিবে। এবং দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাতের পূর্বে ৫ তাকবীর দিবে, দাঁড়ানোর তাকবীর ব্যতিত।

সিয়াম পর্বের প্রশ্নপত্র

১. **সিয়ামের রুকুনের সংখ্যা কয়টি?**
ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি

২. **সিয়াম কার উপর ফরয?**
ক.
খ.
গ.
ঘ.

৩. **প্রত্যেক রোগ সিয়াম পালন করাতে বাধা দেয়।**
ক. সঠিক খ. ভুল

৪. **নিম্নের প্রত্যেক আমলগুলোর হুকুম উল্লেখ করুন**

মাসআলা	হুকুম
ফজরের পর সিয়ামের নিয়্যাত করেছে	
নিয়ত ছাড়া সিয়াম	
ছোটদের সিয়াম রাখা	
মুসাফির ব্যক্তির সিয়াম রাখা	
নেফাসে পতিত মহিলার সিয়াম রাখা	
অপারগ ব্যক্তির সিয়াম রাখা	
সিয়াম অবস্থায় খেয়েছে	
সিয়ামকারী ব্যক্তির জন্য খাবারের ইনজেকশন	

মাসআলা	হুকুম
চোখের ড্রপ	
ব্যথার ইনজেকশন	
শিংগা লাগানো	
বমন করা	
থুথু গিলে ফেলা	
খাবারের স্বাদ গ্রহণ করা	
ঘুম যাওয়া	
গোসল করা	
এসি ব্যবহার করা	
মিসওয়াক করা	
সুগন্ধির কাঠ ব্যবহার করা	
সাহরির সময়	
কি দিয়ে সাহরী করবে?	
কি দ্বারা ইফতার করবে	----------যদি না পায় ----------
	যদি না পায় ----------
	যদি না পায় ----------
তারাবীর সলাত	
রামযান মাসে উমরাহ করা	
সিয়াম অবস্থায় প্রবল ভাবে কুলি করা	
সিয়ামকারী ব্যক্তির চুমু খাওয়া	
লাগাতার দুই দিন সিয়াম রাখা	

মাসআলা	হুকুম
শাওয়াল মাসের ৬টি সিয়াম	
আরাফার দিনের সিয়াম	
সন্দেহের দিনের সিয়াম	
ঈদের দিনের সিয়াম	
তাশরীক দিনগুলোর সিয়াম	
মুহাররাম মাসের সিয়াম	
রজব মাসের সিয়াম	
পুরো বছরের সিয়াম	
শুধু মাত্র শুক্রবারের সিয়াম	
দ্বিতীয় রমাযান পর্যন্ত সিয়াম ক্বাযা বিলম্ব করা	

رابعًا: الحجُّ চতুর্থ পর্ব: হজ্জ

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম রুকুন। তা এই শর্ত সাপেক্ষে ওয়াজিব মুসলিম হওয়া, বিবেকবান হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, স্বাধীন হওয়া, সক্ষম হওয়া। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্ত হলো সফরের সময় তার সঙ্গে মাহরাম থকতে হবে। আর হজ্জে রুকুন চারটি।

الإحرام
ইহরাম বাঁধা
হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার নিয়ত করা। কিন্তু তালবীয়াহ পাঠ করা ও কাপড় পরিধান করার নাম ইহরাম নয়।

الوقوف بعرفة
আরাফায় অবস্থান করা। যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে ঈদের দিনের ফজরের আগ পর্যন্ত।

طواف الإفاضة
ত্বওয়াফুল ইফাদাহ (ত্বওয়াফে যিয়ারত) আর তা হবে আরাফায় অবস্থান করার পরে। তা কিন্তু তওয়াফে কুদুম না।

السّعي
সায়ী করা। সাফা-মারওয়ার। আল্লাহ বলেন-
(إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ).
অর্থ: নিশ্চয় সফা ও মারওয়া (পর্বত) আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনের অন্তর্ভূক্ত।

হজ্বের প্রকারসমূহ

الإفراد
ইফরাদ হজ্জ: শুধুমাত্র হজ্বের নিয়ত করবে, এবং এককভাবে তার কাজগুলো সম্পাদন করবে।

القران
কিরান হজ্জ: হজ্জ ও উমরার এক সঙ্গে নিয়ত করবে এবং তার উপর হাদয়ী ফরয।

التَّمتُّع
তামাত্তু হজ্ব: প্রথমে হজ্বের মাসে উমরার নিয়ত করবে এবং তা করে ফেলবে এবং হালাল হয়ে যাবে অতঃপর হজ্বের দিনে হজ্বের নিয়ত করবে। আর উপর হাদয়ী ফরয।

واجبات الحجِّ হজ্জের ওয়াজিবসমূহ:

এই ওয়াজিব গুলোর যেকোন ১টি পরিত্যাগ করলে তাকে পশু যবেহ করে হজ্জ পূর্ণ করতে হবে। আর তা গোশত নিজে না খেয়ে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দিবে।

মিকাত হতে ইহরাম বাধা	সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা
মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা	তাশরীকের দিন গুলোতে মিনায় রাত্রী যাপন করা
জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা	মাথা মুন্ডন বা চুল খাটো করা।

যে ব্যাক্তি মক্কা থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তার বিদায়ী ত্বওয়াফ করা। কিন্তু ইহা হায়েয ও নিফাসে আক্রান্ত মহিলার জন্য প্রযোজ্য নয়।

হজ্ব-উমরার মীকাত সমূহ:

زمانيَّةٌ

সময়ের মীফাত: আর তা হলো হজ্জের মাস সমূহ: শাওয়াল, যিল কাআদাহ, ও যিল হজ্জ। আর এই সময়ের মীকাতগুলো হজ্জে জন্যই নির্দিষ্ট। কিন্তু উমরার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেয়।

مكانيَّةٌ

স্থানের বর্ণনা: যুল হুলাইফাহ: মদিনাবাসীদের জন্য এবং তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে।
যুহফাহ: সিরিয়া, মিশর ও মরক্কো বাসিদের জন্য।
কারনুল মানাজিল: নাজদবাসীদের জন্য।
ইয়ালামলাম: ইয়ামান বাসীদের জন্য
যাতে ইরাক: ইরাক বাসীদের জন্য

হজ্বের মুস্তাহাব
আমলসমূহ

ইহরামের জন্য গোসল করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা

পুরুষদের জন্য ২টি সাদা কাপড় পরা লুঙ্গী ও চাদর

ইহরামের নিয়্যাত করার পূর্বে নখ কাটা এবং যে সমস্ত জায়গার চুল কাটা আবশ্যক সেগুলো কেটে ফেলা

ইহরামের দিন হতে জামরায়ে আকাবাকে পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবীয়াহ পাঠ করা।

ইফরাদ ও কেরান হজ্ব আদায়কারীগণ মক্কা শরীফে ত্বওয়াফ কুদুম করবে (আগমনের ত্বওয়াফ)

ত্বওয়াফ কুদুমের প্রথম দিন তিন চক্করে সাভাবিকের চেয়ে দ্রুত চলা, এবং তামাত্তু হজ্বকারীর উমরার ত্বওয়াফে। আর রামল বলা হয় দ্রুত ভাবে চলাকে।

ত্বওয়াফে কুদুম ও তামাত্তু হজকারীর উমরার ত্বওয়াফে ইযতেবা করা। আর তাহলো তার ডান কাঁধ খুলে রাখবে।

মুযদালিফায় পৌছার পরই মাগরিব ও এশার সলাতকে একত্রিত করে পড়া।

আরাফার রাত্রীতে মিনায় অবস্থান করা।

হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়া।

মুযদালিফায় আল-মাশআরুল হারামের নিকট ফজরের সলাতের পর হতে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করা। আর মুযদালিফার সকল স্থানই অবস্থানস্থল।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ

উহা নয়টি: মাথা ও শরীরের চুল মুণ্ডন করা, নখ কাটা, পুরুষের ক্ষেত্রে মাথা স্পর্শ করে ঢাকা, পুরুষের ক্ষেত্রে সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা। মহিলাদের ক্ষেত্রে নিকাব ও হাত মোজা পরা, সুগন্ধী ব্যবহার করা, যেমন: গন্ধময় সাবান, স্থলের শিকারকৃত প্রাণী হত্যা করা ও শিকার করা, নিজের বা অন্যের ক্ষেত্রে বিবাহের আঞ্জাম করা, সহবাস করা, বা সহবাস ছাড়া উপভোগ করা। যে ব্যক্তি এই নিষিদ্ধ কাজ সমূহের কোন একটি কাজ ভুলে বা অজ্ঞতাবশত বা নিরুপায় হয়ে করে তাহলে তার উপর কোন ফিদয়াহ (জরিমানা) নেই। কিন্তু শিকার হত্যা করা ব্যতীত, তাতে সর্বাবস্থায় ফিদয়াহ (জরিমানা) দিতে হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হয় তাহলে চার প্রকার:

ما فديته فدية أذًى

যার ফিদইয়া হচ্ছে কষ্ট দায়কের ফিদইয়ার ন্যায় আর তা হলো অবশিষ্ট নিষিদ্ধ কাজ সমূহ। তার ফিদইয়া হলো নিম্নের তিনটি বিষয়ে ইচ্ছানাধীন: হয় তিনটি রোযা বা ৬ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো প্রত্যেকে আধা কিলো করে বা ছাগল জবেহ করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বন্টন করা।

ما فديته مغلَّظةٌ

যার ফিদইয়া হচ্ছে ভারী শক্ত আর তা হলো সহবাস করা। আর যে ব্যক্তি প্রথম হালালের পূর্বে সহবাস করবে সে তার হজ্জ নষ্ট করবে। আর হজ্জের বাকী কাজ গুলো পূর্ণ করবে এবং আগামীতে পুনরায় হজ্জ করবে এবং দুম্বা প্রদান করবে।

ما فديته مثله

যার ফিদইয়াহ হচ্ছে অনুরূপ দেওয়া। আর তা হচ্ছে স্থলের শিকারকে হত্যা ও শিকার করা। আর যে তাকে হত্যা করবে তাকে সর্বাবস্থায় ফিদইয়া লাগবে। আর তার ফিদইয়া হচ্ছে অনুরূপ প্রাণী দেওয়া।

ما لا فدية فيه

যাতে কোন ফিদইয়া নেই। আর তা হলো বিবাহ বন্ধন। তা নিজের জন্য হোক বা অপরের জন্য হোক। অনুরূপ সহবাস ছাড়া উপভোগ করা যদি বীর্য বের না হয় তাহলে তাকে কোন কাফফারা দিতে হবে না বরং তাওবাহ করতে হবে।

হাজ্জের দিনগুলোর নামসমূহ أسماء أيَّام الحجِّ

পানি পান করানোর দিন। তা হচ্ছে অষ্টম দিন। এদিনে হাজ্বীগণ মিনাতে পানি বহন করতেন।	আরাফাহ ও অবস্থানের দিন। তা হচ্ছে নবম দিন।	ঈদ ও কুরবানীর দিন। তা হচ্ছে দশম দিন	(মিনায়) অবস্থানের দিন। তা হচ্ছে একাদশ তম দিন।	(মিনা) হতে প্রথম প্রত্যাবর্তন দিন। তা হচ্ছে দ্বাদশ তম দিন	(মিনা) হতে দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তন দিন। তা হচ্ছে ত্রয়োদশ তম দিন।

একত্রিত হওয়ার রাত: তা হলো ঈদের রাত। কেননা মানুষেরা আরাফার মাঠে অবস্থানের পর থেকেই সেখানে একত্রিত হয়। আর জালেহি যুগে মাক্কা বাসীরা আরাফার মাঠে যেত না।

হাজ্জে দু'আ করার পাঁচটি স্থান

في عرفة. আরাফার মাঠে। সূর্য পশ্চিমে হিলার পর হতে সূর্যাস্ত হওয়া পর্যন্ত।	ফজরের সলাতের পর মুযদালিফায় ফর্সা হওয়া পর্যন্ত।	তাশরীকের দিনগুলোতে ছোট ও মধ্যম জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর	في الطَّواف. বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করার সময়	في السَّعي. সাফা-মারওয়াহ পাহাড় সা'য়ী করার সময়

صفة العمرة والحجِّ হাজ্জ ও উমরার পদ্ধতি

قال الشَّيخ محمَّد بن صالح العثيمين:

শাইখ ইবনে উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ

আপনারা যখন মীকাতে পৌঁছবেন তখন গোসল করবেন, আপনাদের শরীরে, মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি ব্যবহার করবেন অতঃপর আপনারা হজ্জে তামাত্তুর জন্য ইহরাম বাঁধবেন এবং তালবিয়া পাঠ করতে করতে মাক্কার পথে রওনা করবেন। যখন বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছাবেন তখন উমরার সাতটি ত্বাওয়াফ করবেন।

আপনারা জেনে রাখবেন যে, নিশ্চয় মাসজিদ হারামের সমস্তই ত্বাওয়াফের স্থান। চায় তা 'কাবার নিকটবর্তী হোক কিংবা দূরবর্তী হোক। কিন্তু 'কাবার নিকটবতমস্থান গুলোতে ত্বাওয়াফ করা উত্তম যখন ভিড়ের কারণে অন্য কেউ আপনাদের দ্বারা কষ্ট পাবে না। সুতরাং যখন ভিড় থাকবে তখন 'কাবা হতে দূরে থাকবে। সকল প্রশংসা আল্লার জন্য যে, তিনি কাজ গুলোতে প্রশস্থতা দিয়েছেন।

আপনারা যখন ত্বাওয়াফ শেষ করবেন তখন যতটুকু সম্ভব মাকামে ইবরাহীমের পিছনের নিকটবর্তী স্থানে দুই রাক'আত সলাত আদায় করবেন। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে যতই দূরে হোক না কেন মাকামে ইবরাহীমকে আপনার ও 'কাবার মাঝে রেখে দুই রাক'আত সলাত আদায় করবেন।

অতঃপর আপনারা উমরার সা'য়ী করার জন্য সাফা পাহাড়ে যাবেন এবং সাফা পাহাড় হতে সা'য়ী শুরু করবেন। যখন আপনারা সাত বার পূর্ণ করবেন তখন আপনারা আপনাদের মাথার সমস্ত স্থান হতে চুল ছোট করে নিবেন। কেননা কোন এক পার্শ্ব হতে চুল ছোট করা জায়েয নেই। অনেক মানুষের এ ধরণের কাজে আপনারা ধোকায় নিপতিত হবেন না।

যিল হাজ্জ মাসের ৮ তারিখে গোসল করবেন, সুগন্ধি ব্যবহার করবেন এবং আপনারা যে স্থান হতে বের হবেন সেই স্থান হতে হাজ্জের ইহরাম বাঁধবেন। তারপর মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব,

‘ইশা ও ফজরের সলাত কসর করে আদায় করবেন কিন্তু জ‘মা (দুই সলাতকে একত্রিত করে আদায় করা) করবেন না। কেননা আপনাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনি মিনা ও মাক্কায় কসর করে সলাত আদায় করতেন কিন্তু জ‘মা (দুই সলাতকে একত্রিত করে আদায় করা) করতেন না।

আরাফাতের দিন সূর্য উদিত হওয়ার পর তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে ও আল্লাহর জন্য নম্র হয়ে আরাফার মাঠে রওনা করবেন। সেখানে যোহর ও আসরকে জ‘মা ও তাকদীম (দুই সলাতের পবরর্তী সলাতকে নির্দিষ্ট সময়ের আগে আদায় করা) দুই রাক‘আত করে আদায় করবেন। তারপর আল্লাহর নিকট দু‘আ ও অনুনয়-বিনয়ের জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। এমতাবস্থায় নিজেকে ওযু অবস্থায় রাখতে চেষ্টা করুন এবং ‘কাবাকে সামনে রাখুন যদিও জাবালে রহমাত আপনাদের পিছনে হয়ে যায়। কেননা শরীয়তের বিধান হল ‘কাবাকে সামনে রাখা। আর আরাফার সীমানা ও তার আলামত সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা বা সতর্ক থাকা। কেননা অনেক হাজি আরাফার সীমানার বাইরে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি আরাফার সীমানার মধ্যে অবস্থান করবে না তার হাজ্জই হবে না। রাসূল ﷺ এর বাণী: “হাজ্জ হলো আরাফায় অবস্থান করা। আর আরাফার পুরো মাঠ তার পূর্ব হতে পশ্চিম ও উত্তর হতে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত অবস্থানের সীমানা। তবে বাতনে ওয়াদী (ওয়াদী উরনাহ) ছাড়া”। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী: “আমি এখানে দাঁড়িয়েছি সুতরাং আরাফার পুরো মাঠই অবস্থানের স্থান”।

যখন সূর্যাস্ত হয়ে যাবে এবং আপনারা সূর্যাস্তের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবেন তখন তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন। যতটুকু সম্ভব এ ক্ষেত্রে ধীরতা অবলম্বন করবেন। যেমনটি আপনাদের নাবী ﷺ আপনাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি আরাফার মাঠ ত্যাগ করলেন এমতাবস্থায় তিনি তা উটের লাগাম টেনে ধরলেন এমনকি উটের মাথা তাঁর পা রাখার স্থানে লেগে যাচ্ছিল। আর তিনি ইশারা করে বলছিলেন: হে সাহাবীগণ আসতে আসতে ।

আপনারা যখন মুযদালিফায় পৌঁছে যাবেন তখন সেখানে মাগরিব ও ইশার সলাত আদায় করবেন। অতঃপর সেখানে ফজর পর্যন্ত অবস্থান করবেন। কেননা নাবী ﷺ কাউকে ফজরের পূর্বে মুযদালিফা ত্যাগ করার অনুমতি দেন নাই।

তবে তিনি দূর্বল লোকদের জন্য রাতের শেষাংসে মুযদালিফা ছাড়ার অনুমতি দিয়েছেন। আর যখন আপনারা ফজরের সলাত আদায় করে নিবেন তখন কিবলা মুখি হবেন, তাকবীর পাঠ করবেন, আল্লাহর প্রশংসা করবেন ও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন যতক্ষণ না ভালভাবে ফর্সা হয়। অতঃপর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন। তারপর সাতটি কঙ্কর সংগ্রহ করবেন এবং সেগুলো নিয়ে জামারাত আকাবায় যাবেন। জামারাত আকাবাহ রয়েছে সর্বশেষ প্রান্তে মাক্কার দিকে। সূর্য উদিত হওয়ার পর কঙ্কর সাতটি নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেকটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবেন নম্র-বিনয় ও মহাত্ম বর্ণনার সাথে ।

জেনে রাখবেন যে, নিশ্চয় কঙ্কর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার মহাত্ম বর্ণনা করা ও তাঁর যিকিরকে প্রতিষ্ঠা করা। কঙ্করটি গর্তে নিক্ষেপিত হওয়া আবশ্যক। এমনকি পিলারে মারাও শর্ত নয়। যখন আপনারা কঙ্কর মারা শেষ করবেন তখন কুরবানীর পশু কুরবানী করবেন। কুরবানীর পশু ব্যতীত অন্য কুরবানী করা জায়েয হবে না। কুরবানীর পশু যবেহ করার জন্য অন্য কাউকে দায়িত্ব দিলে কোন সমস্যা নেই। অতঃপর আপনারা মাথার চুল মুন্ডন করবেন। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাথার চুল মুন্ডন করা আবশ্যক। কিছু অংশ মুন্ডন না করা জায়েয নেই। মহিলারা তাদের চুলের শেষাংসের কিছু অংশ ছোট করবেন। তারপর আপনারা প্রথম হালাল হবেন। এখন আপনারা সাধারণ পোশাক পরিধান করবেন, নখ কাটবেন ও সুগন্ধি ব্যবহার করবেন কিন্তু স্ত্রীর সাথে মিলন করতে পারবেন না। অতঃপর যোহরের সলাতের পূর্বেই মাক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন। তারপর হাজ্জের ফরজ ত্বাওয়াফ (ত্বাওয়ফে ইফাযা) করবেন। তারপর মিনায় পুনরায় ফিরে আসবেন। তারপর মাথা মুন্ডন, কঙ্কর নিক্ষেপ ও ত্বাওয়াফ এবং সা'য়ী করার মাধ্যমে আপনারা দ্বিতীয় হালাল হলেন। এখন আপনাদের যেকোন কাজ করা জায়েয। এমনকি স্ত্রীর সাথে মিলনও করতে পারবেন।

জেনে রাখুন, নিশ্চয় একজন হাজি ঈদের দিন চারটি কাজ করবেন (কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী, মাথা মুন্ডন ও ত্বাওয়াফ এবং সা'য়ী করবেন)। এটিই হচ্ছে হাজ্জের কাজের পূর্ণ ধারাবাহিকতা। কিন্তু যদি আপনারা একটিকে অপরটির আগে করে ফেলেন তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই।

যেমন কুরবানী করার আগে মাথা মুন্ডন করা। আর আপনারা যদি ত্বাওয়াফ ও সা'য়ীকে বিলম্ব করেন এমনকি মিনা ছাড়ার পর করলেও কোন সমস্যা নেই। আপনারা যদি বিলম্ব করে কুরবানী করেন কিংবা ১৩ তম দিনেও করেন তাতেও কোন সমস্যা নেই। তবে এগুলো প্রয়োজন সাপেক্ষে করা যায়।

১১ তম রাত্রি মিনায় অবস্থান করবেন এবং পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর তিনটি জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। প্রথম জামারাহ দিয়ে শুরু করবেন তারপর দ্বিতীয় জামারাহ অতঃপর তৃতীয় জামারাহ। প্রত্যেকটি জামারাতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেকটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবেন। সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ঈদের দিন কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হলো সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে। আর দূর্বল ব্যক্তিদের জন্য রাতের শেষাংসে। কঙ্কর নিক্ষেপের শেষ সময় আর ঈদের পরের দিন গুলোতে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যা ওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এদিন গুলোতে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয নেই। দিনের বেলায় প্রচুর ভিড় হলে রাত্রে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয আছে।

যে ব্যক্তি ছোট বাচ্চা কিংবা বা অসুস্থার কারণে নিজে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে সক্ষম না সে অন্যকে তার পক্ষ হতে কঙ্কর নিক্ষেপের দায়িত্ব দিতে পারে। দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি তার নিজের পক্ষ হতে ও যে ব্যক্তি তাকে দায়িত্ব দিয়েছে তার পক্ষ হতে একই স্থান থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারে। এতে কোন সমস্যা নেই। তবে সে নিজের জন্য সর্বপ্রথম শুরু করবে। যখন আপনারা ১২ তম দিনে কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করবেন তখন আপনাদের হাজ্জ শেষ হয়ে যাবে। তখন আপনারা যদি চান মিনা ত্যাগ করতে পারবেন। আর চাইলে ১৩ তম রাত্রি মিনায় অবস্থান করতে পারেন। আর সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর তিনটি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। এটাই উত্তম। কেননা নাবী ﷺ এটি করেছেন। আপনারা যখন মক্কা ছাড়ার ইচ্ছা করবেন তখন বিদায়ী ত্বাওয়াফ করবেন। ঋতুবতী ও নেফাসী মহিলাদের জন্য বিদায়ী ত্বাওয়াফ করা জায়েয নেই। এমনকি মাসজিদের দরজার নিকট আসা ও সেখানে অবস্থান করাও শরীয়ত অনুমতি দেয়নি।

হজ্জ পর্বের প্রশ্নপত্র

১. হজ্জ কার উপর ওয়াজিব?

ক.

খ.

গ.

ঘ.

ঙ. আর মহিলাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্ত হলো:

২. হজ্জর রুকুন সংখ্যা কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি

৩. ইহরাম হচ্ছে হজ্জর একটি রুকুন আর তা হলো: মীকাত হতে লুঙ্গী ও চাদর (সিলাই বিহীন দুইটি সাদা কাপড়) পরিধান করা।

ক. সঠিক খ. ভুল

৪. ত্বওয়াফে ইফাযাহ ও ত্বওয়াফে যিয়ারাহ একই না। প্রথমটি রুকুন ও দ্বিতীয়টি সুন্নাত

ক. সঠিক খ. ভুল

৫. নবী (স) তিনবার হজ্জ করেছেন।

ক. সঠিক খ. ভুল

৬. হজ্জ দ্রুত আদায় করা ওয়াজিব।

ক. সঠিক খ. ভুল

৭. মদীনাবাসী ইয়ালামলাম মীকাত হতে ইহরাম বাধবে।

ক. সঠিক খ. ভুল

৮. উমরার সময়ের মীকাত হচ্ছে রামাযান মাস।

ক. সঠিক খ. ভুল

৯. শুন্যস্থান পূরণ করুন:

হজ্জ ও উমরাহ ------- জীবনে ------- একবার। আর যে হজ্জ করলো অতঃপর না ----- এবং না -------- সে তার গুণাহ হতে বের হয়ে গেল সেই দিনের ন্যায় যেদিন তার মা তাকে জন্ম দেয়। আর হজ্জে মাবরুর এর প্রতি দান শুধু মাত্র ---------।

১০. মক্কাবাসী হজ্জের নিয়্যাত তান'ঈম হতে করবে।
ক. সঠিক খ. ভুল

১১. ইহরামের জন্য মহিলা সাদা কাপড় পরবে।
ক. সঠিক খ. ভুল

১২. যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরায় ইহরাম বাঁধবে সে সুগন্ধি ব্যবহার করবে --------- এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবেনা ------

১৩. মহিলার জন্য সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা বৈধ না।
ক. সঠিক খ. ভুল

১৪. মুহরিম ব্যক্তির জন্য বেল্ট পরা বৈধ না।
ক. সঠিক খ. ভুল

১৫. মুহরিমা মহিলা পরিধান করবেনা ------ ও ----------।

১৬. ইযতেবা করা সুন্নাত:
ক. উমরার ত্বওয়াফে খ. ত্বওয়াফে কুদুসে গ. যিয়ারত ত্বওয়াফে ঘ. প্রথম ও দ্বিতীয়টিতে শুধু মাত্র ঙ. সবগুলোতেই।

১৭. সায়ী শুরু হবে ------- এবং শেষ হবে --------

১৮. হাজ্বীগণ আরাফা হতে মাগরিবের পূর্বেই চলে আসবে।
ক. সঠিক খ. ভুল

১৯. আরাফার মাঠে অবস্থান করা হজ্বের ওয়াজিবের অন্তর্ভূক্ত।
ক. সঠিক খ. ভুল

২০. হজ্জের কাজ সমুহ শুরু হবে --------- আর চলতে থাকবে ঐ দিনের শেষ হওয়া পর্যন্ত --------।

২১. আরাফায় পাহাড়ে উঠা যাবেনা।
ক. সঠিক খ. ভুল

২২. হাদয়ী প্রদান করা তামাত্তু ও কেরান হজ্জ কারীর উপর ওয়াজিব এবং ইফরাদ হজ্জকারীর ক্ষেত্রে সুন্নাত।
ক. সঠিক খ. ভুল

২৩. তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করবে জামারায়ে আকাবাকে পাথর নিক্ষেপ করার পর।
ক. সঠিক খ. ভুল।

২৪.যদি হাজী সাহেব পাথর শুধু হাউজের ভিতর রেখে দেয় পিলারকে স্পর্শ করা ব্যতীত তাহলে তার নিক্ষেপ করা সহিহ হবে।
ক. সঠিক খ. ভুল

২৫.হাজী সাহেব দশতম তারিখে ৩টি জামারাকেই পাথর নিক্ষেপ করবে।
ক. সঠিক খ. ভুল

২৬.তাশরীকের দিনগুলোতে জামারায় পাথর নিক্ষেপ শুরু হবে সূর্য ঢোলার পর।
ক. সঠিক খ. ভুল

২৭.জামারা আকাবায় পাথর নিক্ষেপের পর দোআ করা।
ক. সঠিক খ. ভুল

২৮.যদি ব্যক্তি ত্বওয়াফে ইফাযা মক্কা থেকে চলে যাওয়ার দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করে তাহলে বিদায়ী ত্বওয়াফ যথেষ্ট হবে। আর ত্বওয়াফে ইফাযা উমরার ত্বওয়াফের ন্যায় কিন্তু ---------- আর ---------

২৯.কেরান ও ইফরাদ হজ্ব কারীর উপর ওয়াজিব হলো যে সায়ী করবে ---------- - আর তামাত্তু হজ্বকারী সায়ী করবে -------।

৩০.নিম্নের আমলগুলোর হুকুম উল্লেখ করুনঃ

মাসয়ালা	হুকুম
ছোট বাচ্চার হজ্জ	
মাহরাম ব্যাতিত মহিলার হজ্জ	
ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির হজ্জ	

الدَّرْسُ الخامس عشر
পঞ্চদশ পাঠ

প্রত্যেক মুসলিমকে শারয়ী চরিত্রবান হওয়াঃ

প্রত্যেক মুসলিমকে শারয়ী চরিত্রে চরিত্র বান হওয়া। আর তার মধ্যে হতে হচ্ছে: সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, নিজেকে পবিত্র রাখা, লজ্জাশীলতা, সাহসিকতা, উদারতা, বিশ্বস্ততা, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হতে পবিত্র থাকা, প্রতিবেশীর সাথে সৎব্যবহার করা, সাধ্যমত মুখাপেক্ষীদের সাহায্য করা, এছাড়া আরও অন্যান্য শারয়ী চরিত্র যা কুরআন ও হাদীসে এসেছে।

تعليقاتٌ مهمَّةٌ: গুরুত্বপূর্ণ টীকা:

১. সত্যবাদিতা : (তার কথা, কাজ ও বিশ্বাসে আল্লাহর সাথে সত্য কথা বলবে এবং আল্লাহর বান্দাদের সাথেও সত্য কথা বলবে। এর বিপরীত হলো মিথ্যা বলা)।

২. আমানত দারিতা : (একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয যা মানুষের প্রতি অর্পিত । এর বিপরীত হলো খিয়ানত করা)।

৩. সংযম অবলম্বন করা : (তা হলো হারাম হতে নিজেকে বিরত রাখা)।

৪. লজ্জাশীলতা : (তা হলো এমন চরিত্র যা চায় ভাল কাজ করা ও মন্দ কাজ পরিহারের মাধ্যমে)।

৫. সাহসিকতা

৬. উদারতা

৭. বিশ্বস্ততা

৮. আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা

৯. প্রতিবেশির সাথে সৎ ব্যবহার করা। আর অন্তর্ভূক্ত হলো তার গোপনীয়তা রক্ষা করা।

১০. সক্ষমতা অনুযায়ী মুখাপেক্ষীদের সাহায্য করা। আরো অনেক শারয়ী চরিত্র রয়েছে যার বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে এসেছে।

الدَّرْسُ السَّادس عشر
ষষ্ঠদশ পাঠ

التَّأَدُّبُ بِالآدَابِ الإِسْلامِيَّةِ ইসলামী শিষ্টাচারে শিষ্ট হওয়া:

ইসলামী শিষ্টাচারে শিষ্ট হওয়া। তার মধ্যে হতে: সালাম দেওয়া, হাস্যোজ্জল থাকা, ডান হাত দিয়ে পানাহার করা, খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, খাবারের শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা, হাঁচি দেওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বলা, হাঁচির দাতার উত্তরে বলা (ইয়ারহামুকাল্লাহ), হাঁচি দাতা তার উত্তরে বলবে (এ্যাহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম)। রোগীদর্শন করা, জানাযা ও দাফন কাজে অংশগ্রহণ করা, আরও শরয়ী শিষ্টাচার মাসজিদ বা বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়, পিতা-মাতার সঙ্গে, আত্মীয় সজনদের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে, বড়-ছোটদের সঙ্গে, নবজাতককে সম্ভাষণ দেওয়া, বিবাহে শুভ কামনা করা, মসিবতের সময় সান্তনা দেওয়া। এছাড়া অন্যান্য ইসলামী শিষ্টাচার রয়েছে পোশাক পরিধান-খোলা, জুতা পরার ক্ষেত্রে।

تعليقاتٌ مهمَّةٌ: গুরুত্বপূর্ণ টীকা:

১. সালাম দেওয়া : (অর্থাৎ "আসসালামু আলাই ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ" বলা। পরিচিত বা অপরিচিত সকলকে সালাম দেওয়া। যে সালাম দিবে তার সালামের উত্তর দেওয়া)

২. হাস্যোজ্জল থাকা।

৩. ডান হাত দিয়ে পানাহার করা ওয়াজিব (ডান হাত দিয়ে নেওয়া বা প্রদান করা মুস্তাহাব।

৪. খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা।

৫. খাওয়ার শেষে আল হামদু লিল্লাহ বলা: হাদীসে বর্ণিত

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قوة

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আতআমানি হাযা ওয়া রযাকানিহি মিন গইরি হাওলিম মিননী ওয়ালা কুওয়াতা।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এ আহার করালেন এবং এ রিযিক দিলেন যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে কোন উপায়, ছিল না কোন শক্তি সামর্থ।

৬.হাঁচি দেওয়ার পর (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) হামদু লিল্লাহ বলা। অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

৭. হাঁচি দাতার উত্তরেব বলা (يَرْحَمُكَ اللهُ) ইয়ারহামুকাল্লাহ। অর্থ: আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুক। তখন হাঁচিদাতা তার উত্তর দিবে এ বলে যে, (يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ) (এ্যাহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম) অর্থ: আল্লাহ আপনাদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করুন এবং আপনাদের অবস্থা উন্নত করুন।

৮. রোগীদর্শন করা (উপযুক্ত সময়ে বার বার রোগীর কাছে যাওয়া। তার কাছে দির্ঘক্ষণ অবস্থ ন না করা এবং তাকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ না করা)।

৯. পুরুষদের জন্য জানাযা ও দাফন কার্যে অংশ গ্রহণ করা।

১০. শারয়ী শিষ্টাচার অবল্বন করা : মাসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং এ দু'আ বলা: بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রহমাতিকা।

অর্থ: আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। আর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

এর পর মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করে এ দুআ বলবে: بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা।

অর্থ: আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। আর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

আর বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় এ দুআ পড়বে:

«بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

উচ্চারণ- বিসমিল্লাহি তাওাক্কালতু আলাল্লাহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওাতা ইল্লা বিল্লাহি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা আন আযি্ল্লা আউ উয্াল্লা [(*)] আউ আযিল্লা আউ উযাল্লা, আউ আযলিমা আউ উযলামা আউ আজহালা আউ ইউজহালা আলাইয়্যা।

অর্থ- *আল্লাহর নামে বের হলাম, তাঁর উপর ভরসা করলাম। আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি এবং ক্ষমতা নেই।* হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি ভ্রষ্ট হই বা আমাকে ভ্রষ্ট করা হয়, আমার পদ±খলন হয় বা পদ±খলন করানো হয়, আমি অত্যাচারী হই অথবা অত্যাচারিত হই অথবা আমি মূর্খামি করি অথবা আমার প্রতি মূর্খামি করা হয় -এসব থেকে। *(সহীহ তিরমিযী ৩/১৫২)*

আর বাড়ীতে প্রবেশ করার সময় এ দুআ পড়বে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খয়রা মাওলিজে ওয়া কয়রাল মাখরাজে। বিসমিল্লাহি অলাজনা ওয়া বিসমিল্লাহি খরাজনা ওয়া আলা রব্বিনা তাওয়াক্কালনা।

অর্থ: হে আল্লাহ প্রবেশস্থল ও বের হওয়ারস্থলে তোমার নিকট কল্যাণ কামানা করছি। তোমার নামেই প্রবেশ করছি, তোমার নামেই বের হচ্ছি আর আমাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা করছি।

১১. এর পর বাড়ীর লোকজনকে সালাম প্রদান করবে। এর পর বিয়েতে মুবারোকবাদ জানাতে এ দুআ পড়বে:

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ

(বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়া বা-রাকা আলাইকা ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফীল খাইরি)

অর্থ: আল্লাহ তোমার জন্য (এই বিবাহকে) বরকতপূর্ণ করুন এবং তোমার উপর বরকত বর্ষণ করুন ও তোমাদের উভয়কে কল্যাণে মিলিত রাখুন। *(আবু দাউদ হা/২১৩০, সহীহ আত-তিরমিযী হা/১০৯১, মিশকাত হা/২৪৪৫, সহীহ: আলবানী রহ.)*

১২. এর পর বিপদ ও মসীবতে দুঃখ প্রকাশ করা তিন দিনের বেশি নয়।

الدَّرْسُ السَّابع عشر
সপ্তদশ পাঠ

শিরক ও পাপসমূহ হতে সতর্ক করা।

শিরক ও পাপসমূহ হতে সতর্ক হওয়া ও সতর্ক করা।

আর সেগুলোর মধ্যে হলো: সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় তা হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, কারণ ছাড়া যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা, সহ-পবিত্রা মুমিনা নারীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।

তার মধ্যে হতে আরও হলো: পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মিথ্যা শপথ করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, মানুষের জান মাল ও সম্মানে জুলুম করা, নেশা গ্রহণ করা, জুয়া খেলা, গিবত করা, চোগলখুরী করা, এ জাতীয় আরোও রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ টিকা

১. আল্লাহর সাথে শিরক করা: ছোট শিরক ও বড় শিরক।।

২. যাদু করা: যে ব্যক্তি যাদু করবে বা তাতে সন্তুষ্ট হবে সে কুফরী করলো। যাদুকরের কাছে যাওয়া, যাদুর ওয়েব সাইডে প্রবেশ করা, ও যাদুর চ্যানেল পত্রপত্রিকা পড়াও হারাম। আর যাদু দূর করতে হবে শারঈ ঝাড়ফুঁক-দো'আ, বৈধ ঔষধের দ্বারা যেমন শিংগা লাগানো।

৩. অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা: চাই সে মুসলিম হোক বা চুক্তিবদ্ধ কাফের বা নিরাপত্তায় থাকা কাফের হোক।

তবে ন্যায় ভাবে হত্যা করা যাবে। আর তা তিন প্রকার: ক. হত্যার বদলে হত্যা করা, বিবাহিত ব্যভিচারীকে হত্যা করা, ধর্ম ত্যাগকারীকে হত্যা করা।

ইয়াতীম: যার পিতা মারা গেছে আর সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা: অর্থাৎ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।

সহ-পবিত্রা মুমিনা মহিলাদের অপবাদ দেওয়া: অর্থাৎ অবিবাহিতদের।

মিথ্যা শপথ: আর অনুরূপ গাইরুল্লাহর নামে কসম করা। যেমন: নবী ﷺ এর সম্মানের, জীবনের, বার্ধেক্যের।

জুয়া খেলা: অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ জুয়া যার মধ্যে হার-জীত রয়েছে।

গীবত করা: নবী (স) তার সংজ্ঞায় বলেছেন:**ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ**

চুগোলখুরী করা: বিদ্বেষের জন্য একজনের কথা অন্য একজনের নিকট লাগানো।

حكم المسابقة والمغالبة
হারজিত খেলায় প্রতিযোগিতা করার হুকুম।

يجوز بلا عوضٍ ولا يجوز بعوضٍ:
বিনিময় গ্রহণ করা ছাড়া বৈধ, আর বিনিময়ে অবৈধ: তাহলো: উল্লেখিত প্রতিযোগিতাগুলো ব্যাতিত অন্য সবগুলো।

مُحرَّمٌ مطلقًا:
সর্বাবস্থায় হারাম: তাস ও জুয়া এবং এ জাতীয় খেলা।

يجوز بعوضٍ وغيره:
বিনিময় নিয়ে করা: যাবে। যেমন: উট, ঘোড়া, তীরের প্রতিযেগিতা, কেননা রাসূল (স) বলেছেন: শুধু উট ঘোড়া, ও তীরে প্রতিযোগিতা করা যাবে।

الدَّرْسُ الثَامن عشر
অষ্টদশ পাঠ

মৃত ব্যক্তির কাফন, জানাযার নামায ও দাফন:

প্রথম: যে ব্যক্তি মৃত্যুর সন্নিকট হবে তাকে **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** এর তালকীন দেওয়া।

দ্বিতীয়: যখন তার মৃত্যু সুনিশ্চিত হবে তখন তার চোখ বন্ধ করে দিবে এবং তার দাড়ি বেঁধে দিবে। কেননা এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়: মৃত মুসলিম ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব। তবে এমন শহীদ যে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে গোসল দিতে হয় না এবং তার জানাযার সলাতও পড়তে হয় না। বরং তাকে তার স্ব কাপড়েই দাফন দিতে হয়। কেননা নাবী (স.) উহুদ যুদ্ধের শহীদদের গোসল দেন নাই এবং জানাযার সলাতও আদায় করেন নাই।

চতুর্থ: মৃত্যু ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি:

তার গোপনাঙ্গ আবৃত করে রাখতে হবে। তারপর তার পেটে ধীরে চাপ দিবে। অতঃপর গোসল দাতা তার হাতে একটি কাপড় বা কাপড় জাতীয় কিছু বেঁধে নিবে এবং তা দিয়ে তাকে পরিস্কার করে দিবে। অতঃপর তাকে সলাতের ওযুর মত ওযু করাবে। তারপর পানি ও বরই পাতা বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে তার মাথা ও দাড়ি ধৌত করাবে। তারপর তার ডান পার্শ্ব ধৌত করাবে অতঃপর বাম পার্শ্ব। অনুরুপভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার একই নিয়মে ধৌত করাবে। প্রত্যেক বারই তার পেটের উপর দিয়ে হাত নিয়ে যাবে। যদি তার পেট থেকে কোন কিছু বের হয় তাহলে তা ধৌত করে দিবে। যদি তার গোঁফ ও নখ লম্বা হয়ে থাকে তাহলে কেটে দিবে। আর যদি নাও কাটে তাতে কোন সমস্যা নেই। চুলগুলো এলোমেলো করে রাখবে। গোপনাঙ্গের লোম পরিস্কার করবে না, তার খাতনাও করাবে না। কেননা এ ব্যাপারে দলীল পাওয়া যায় না। মহিলাদের চুলকে তিনটি বেনিতে গেঁথে দিবে এবং তা পিছনের দিকে ছেড়ে দিবে।

পঞ্চম: মৃত্যু ব্যক্তিকে কাফন পরানো:

পুরুষকে তিনটি সাদা কাপড়ের কাফন পরানো উত্তম যাতে কোন জামা এবং পাগড়ি থাকবে না। যেমনটি নাবী (সা.) এর ক্ষেত্রে করা হয়েছিল।

যদি একটি জামা, লুঙ্গি ও একটি লম্বা কাপড়ে কাফন পরানো হয় তাতেও কোন সমস্যা নেই। আর মহিলাদেরকে পাঁচটি কাপড়ে কাফন পরানো হবে। জামা, ওড়না, ছায়া ও দুটি লম্বা কাপড়। ছোট বাচ্চাদেরকে এক থেকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া যায়। আর ছোট শিশুদেরকে একটি জামা ও দুইটি লম্বা কাপড়ে কাফন দেওয়া যায়। সকলের ক্ষেত্রে এমন একটি কাপড় থাকা আবশ্যক যা মৃত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ আবৃত করবে।

কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি ইহরাম অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দিতে হবে। তাকে তার লুঙ্গি ও চাদরে কাফন দিতে হবে বা ইহা ব্যতীত অন্য কাপড়েও কাফন দেওয়া যায়। তার মুখ ও মাথা আবৃত করতে হবে না। এমনকি সুগন্ধিও লাগানো যাবে না। কেননা তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে। যেমনটি রাসূল ﷺ হতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ব্যক্তি যদি মহিলা হয় তাহলেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। তাকে সুগন্ধি লাগানো যাবে না, নিকাব দিয়ে মুখ আবৃত করা যাবে না ও মোজা দিয়ে হাত আবৃত করা যাবে না। কিন্তু তার হাত ও মুখকে উক্ত কাফনেই আবৃত করতে হবে। যেমনটি ইতিপূর্বে মহিলাদের কাফনের বর্ণনাতে উল্লেখিত হয়েছে।

ষষ্ঠ: মৃত পুরুষ ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া, জানাযার সলাত পড়ানো ও দাফন কার্যের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি বেশি হকদার যাকে তিনি ওসিয়ত করবেন। তারপর যথাক্রমে: পিতা, দাদা, ওয়ারিসদের মধ্য হতে যে বেশি নিকট আত্মীয়। মহিলা ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি বেশি হকদার যাকে তিনি ওসিয়ত করবেন। তারপর যথাক্রমে: মা, দাদী বা নানী, তার বংশের মহিলাদের মধ্য হতে যে বেশি নিকট আত্মীয়। স্বামী ও স্ত্রী একে অপরকে গোসল দিতে পারবে। কেননা আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তাঁর স্ত্রী গোসল দিয়েছিলেন এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর স্ত্রী ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে গোসল দিয়েছিলেন।

সপ্তম: মৃত ব্যক্তির জানাযার সলাতের পদ্ধতি

মোট চার তাকবীর দিবে। প্রথম তাকবীরের পর ফাতিহা পড়বে। তার সাথে একটি ছোট সূরা বা ১-২ আয়াত পড়াও ভাল কাজ। যেমনটি ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় তাকবীর দিবে এবং দরূদ শরীফ পাঠ করবে যেমনটি তাশাহ্হুদের

সময় করা হয়। তারপর তৃতীয় তাকবীর দিবে এবং জানাযার দু'আ পাড়বে:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِـحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ أُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَه" مِنَّا فَأَحْيِه# عَلَى الْإِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَه" مِنَّا فَتَوَفَّه" عَلَى الْإِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تفتنا بَعْدَهُ-اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَـهُ وَارْحَـمْـهُ وَعَافِه# وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَـه" وَوَسِّعْ مَدْخَلَـه" وَاغْسِلْـه" بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَـقِّـه# مِنَ الْـخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْـهُ دَارًاخَيْرًا مِّنْ دَارِه# وَ أَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِـه# وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِه# وَأَدْخِلْـهُ الْـجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ - وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

(আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা অ মাইয়িতিনা অ শা-হিদিনা অগা-য়িবিনা অস¶াগীরিনা অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনসা-না, আল্লা-হুম্মা মান আহয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলাম, অমান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মাগফির লাহু অরহামহু অআ-ফিহী অ'ফু আনহু অআকরিম নুযুলাহু অঅসসি' মুদখালাহু, অগ্সিলহু বিলমা-ই অস্সালজি অলবারাদ। অনাক্কি¶হী মিনাল খাত্বায়া কামা য়্যুনাক্ক¶াস সাউবুল আবয়্যায¶ মিনাদ দানাস। অ আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী অ আহলান খাইরাম মিন আহলিহী অযাওজান খাইরাম মিন যাওজিহ। অ আদখিলহুল জান্নাতা অ আইয্হু মিন আযা-বিল ক্বাবরি অ আযা-বিন্নার। অফসিহ লাহু ফি কবরিহি অনাব্বির লাহু ফিহ। আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু অলা তুযিল্লানা বা'দাহু।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত- অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নর-নারী সকলকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের জীবিত রাখবে, তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ। আর যাদের মৃত্যু দান করবে, তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তাকে মাফ কর, তাকে সম্মানজনকভাবে আপ্যায়ন কর, তার প্রবেশস্থল প্রশস্থ কর। তুমি তাকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত কর। আর তুমি তাকে পাপ হতে এমনভাবে পরিষ্কার কর যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা

পরিষ্কার করে থাক। তুমি তাকে তার ঘর অপেক্ষা উত্তম ঘর দান কর। তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার এবং তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান কর। তুমি তাকে জান্নাতে দাখিল কর, আর তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর। হে আল্লাহ তার কবরকে প্রশস্ত কর ও তার কবরকে আলোকিত কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার নেকী হতে বঞ্চিত কর না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না। (আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৩২০১, তিরমিযী, মাপ্র. হা/১০২৪, ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/১২১৭, মিশকাত হা/১৬৭৫, মুসলিম হা/২১৩৫, ২১২৪, ইফা. হা/২১০০, নাসায়ী হা/১৯৮৪, মিশকাত, হা/১৬৫৫।)

তারপর চতুর্থ তাকবীর দিবে এবং ডান দিকে একবার সালাম ফিরাবে। আর প্রত্যেক তাকবীর দেওয়ার সময় দুই হাত উত্তোলন করবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি মহিলা হয় তাহলে বলবে- **«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا... إلخ» এভাবে শেষ পর্যন্ত। আর যদি জানাযা দু জনের হয় তাহলে এভাবে বলবে اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمَا... إلخ» এভাবে শেষ পর্যন্ত। আর যদি জানাযা দুয়ের অধিক হয় তাহলে এভাবে বলবে «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ... إلخ» এভাবে শেষ পর্যন্ত। আর যদি শিশু হয় তাহলে اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، এ দুআ এর পরিবর্তে বলবে**

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাজআলহু লানা ফারাত্বাঁউ অযুখরান লিওয়ালিদাইহি অশাফি'আম মুজাবা আল্লাহুম্মা সাক্কিল বিহি মাওয়াযিনাহুমা ওয়া আ'যিমা বিহি উজুরাহুমা ওয়া আলহিক্বহু বিসলিহি সালাফিল মু'মিনীনা ওয়াজআলহু ফি কাফালাতি ইবরাহীমা আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালামু ওয়াকিহি বিরহমাতিকা আযাবাল জাহীম।

জানাযার সলাতে পুরুষ ব্যক্তির মাথা বরাবর ও মহিলার মাঝ বরাবর ইমামের দাড়ানো সুন্নাত। যখন একত্রে অনেক গুলো জানাযা হবে তখন পুরুষ লাশকে ইমামের সামনে রাখবে তারপর ক্বিবলার দিকে মহিলাকে রাখবে। যদি ছেলে শিশু থাকে তাহলে তাকে মহিলার আগে রাখতে হবে তারপর মহিলাকে অতঃপর কন্যা শিশুকে। পুরুষের মাথা বরাবর ছেলে শিশুর মাথা রাখবে অনুরুপভাবে কন্যা শিশুর মাথা মহিলার মাথা বরাবর রাখবে এবং মহিলা ও কন্যা শিশুর বক্ষকে পুরুষের মাথা বরাবর রাখবে। সকল মুসল্লী ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। তবে একজন যদি ইমামের পিছনে জায়গা না পায় তাহলে সে ইমামের ডানে দাড়াবে।

অষ্টম: মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পদ্ধতি

শরীয়ত সম্মত বিষয় হলো: কমর পর্যন্ত কবরকে গভীর করা, ক্বিবলার দিকে কবরে লাহাদ করা ও লাহাদ কবরের ডান কাঁধের উপর ব্যক্তিকে রাখা। কাফনের গিট খুলে দিবে কিন্তু তা টেনে নিবে না বরং স্ব অবস্থাতেই রেখে দিবে। তার মুখ খুলে দিবে না চায় সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। তারপর কবরে ইট সাজাবে এবং তাতে কাদা মাটি লাগাবে যাতে করে মজবুত হয় ও মাটি তা ধরে রাখতে পারে। যদি ইট না পাওয়া যায় তাহলে তকতা, পাথর বা কাঠ দিবে যাতে করে মাটি তা ধরে রাখতে পারে। তারপর মাটি চাপা দিবে। এ সময় নিম্নের দু'আটি পড়া মুস্তাহাব:

بِسْمِ اللهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ(বিসমিল্লা-হি অআলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হ)

অর্থ: আল্লাহর নামে ও আল্লাহর রসূলের মতাদর্শের উপর (কবরে রাখছি)। (সহীহ আত-তিরমিযী হা/১৪৬, সহীহ ইবনে হিব্বান, মাশা. ১০/৩৫৩ পৃ.)

একবিদ পরিমাণ উঁচু করবে এবং তার উপর একটি ছোট পাথর রাখবে যদি তা পাওয়া যায় এবং পানি ছিটিয়ে দিবে। এবং তার কবরের পাশে দাড়িয়ে ব্যক্তির জন্য দু'আ করা অনুমতি রয়েছে। কেননা নাবী (স.) যখন দাফন কাজ শেষ করতেন তখন তিনি কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেল: তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তার জন্য স্থীরতা কামনা কর। কেননা এখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

নবম: যে ব্যক্তি তার জানাযার সলাত আদায় করতে পারে নাই, দাফনের পর কবরের নিকট জানাযার সলাত আদায় করা তার জন্য জায়েয রয়েছে। কেননা নাবী (স.) এরূপ করেছেন। তবে শর্ত হলো তা এক মাসের কম হতে হবে।

যদি দাফন করা এক মাসের বেশি হয় তাহলে কবরের নিকট জানাযার সলাত জায়েয নেই। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) থেকে এমন কোন দলীল নেই যে, দাফন করার এক মাস পরে তিনি কবরের নিকট জানাযার সলাত আদায় করেছেন।

দশম: মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে লোকজনের জন্য খাবার ব্যবস্থা করা জায়েয নেই। যেমন সম্মানিত সাহাবী জারির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর উক্তি: (আমরা দাফনের পর মৃতব্যক্তি পরিবারে একত্রিত হতাম সমবেদনা ও তাদের খাবার ব্যবস্থার জন্য)। সুতরাং তাদের ও তাদের মেহমানদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করতে কোন সমস্যা নেই। মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশির পক্ষ থেকে তার পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা জায়েয আছে। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) এর নিকট যখন 'জাফর বিন আবি ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মৃত্যুর সংবাদ আসল তখন তিনি তাঁর পরিবারকে 'জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পরিবারের জন্য খাবার তৈরীর নির্দেশ দিলেন এবং তিনি বললেন: (নিশ্চয় তাদের নিকট এমন সংবাদ এসেছে যা তাদেরকে ব্যস্ত রাখবে)। মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য যে খাবারগুলো হাদিয়া দেওয়া হয়েছে তাতে তাদের প্রতিবেশি বা অন্যদেরকে দাওয়াতে কোন সমস্যা নেই। আমরা যতটুক শরীয়ত হতে জানি যে, এ ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সময় নাই ।

একাদশ: কোন শোক পালনকারিনী মাহিলার জায়েয নাই যে, সে তিন দিনের বেশি ব্যক্তির জন্য শোক পালন করবে। তবে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ব্যতীত। কেননা তার উপর তার স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করা ওয়াজিব। তবে সে যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত শোক পালন করবে। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) থেকে এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস সাব্যস্ত আছে। আর পুরুষের ক্ষেত্রে তার কোন নিকট আত্মীয় বা অন্য কারো জন্য শোক পালন করা জায়েয নাই।

দ্বাদশ: মৃত ব্যক্তিদের জন্য দু'আ করা, তাদের জন্য রহমত কামনা করা এবং ও আখিরাতকে স্বরনের জন্য পুরুষদের জন্য যে কোন সময় বিশেষ করে রাতের শেষাংসে কবর যিয়ারত করা জায়েয আছে। কেননা নাবী ﷺ বলেছেন:

(তোমরা কবর যিয়ারত কর, নিশ্চয় কবর যিয়ারত তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে)। যখন তাঁর সাহাবীরা কবর যিয়ারত করতেন তখন তিনি তাদেরকে কবর যিয়ারতের দু'আ শিক্ষা দিতেন যাতে তাঁরা কবর যিয়ারতের সময় বলেন:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، يَرْحَمِ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ

মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয নাই। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) কবর যিয়ারতকারিনীদের জন্য অভিশাপ করেছেন। কেননা তাদের কবর যিয়ারতের মাধ্যমে এবং তাদের ধৈর্য ধারণ ক্ষমতা কম থাকার কারণে তিনি ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা করেছেন। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির পিছে পিছে কবরস্থানে যাওয়াও তাদের জন্য জায়েয নাই। কেননা নাবী (সা) তাদেরকে ইহা হতে বারণ করেছেন। আর মাসজিদে কিংবা কোন সলাতের স্থানে মৃত ব্যক্তির জানাযার সলাত আদায় করা পুরুষও মহিলা সকলের জন্য জায়েয।

কবর যিয়ারতের প্রকারভেদ

زيارةٌ شرعيَّةٌ.	زيارةٌ بدعيَّةٌ.	زيارةٌ شركيَّةٌ.
শারয়ী যিয়ারত: কবর যিয়ারতের মাধ্যমে আখিরাতকে স্বরণ করার নিয়্যাত করা, কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বাহন প্রস্তুত না করা। নিজের জন্য ও ব্যক্তিদের জন্য বর্ণিত দু'আর মাধ্যমে নিয়্যাত করা।	বেদ'আতী যিয়ারত: যদি কবর যিয়ারতের মাধ্যমে কবরের নিকট আল্লাহর কাছে প্রার্থনার নিয়্যাত করে।	শিরকি যিয়ারত: যদি কবর যিয়ারতের মাধ্যমে কবরবাসীর কাছে প্রার্থনা নিয়্যাত করে।

যা সঙ্কলন করা সম্ভব হয়েছে তা এখানেই সমাপ্তি । আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (স.) ও তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি রহমত ও শান্তিবর্ষণ করুন। আমীন-

পূর্বে যা আলোচিত হয়েছে তার প্রশ্নপত্র

১) নিয়মনীতি ও শারয়ী শিষ্টাচার সংরক্ষণ করা মুসলিমের চরিত্রঃ

ক. সঠিক খ. ভুল

২) আমার দ্বীন আমাকে আদেশ করে খারাপ ব্যক্তিদের সঙ্গ দিতে এবং সৎ ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকতে।

ক. সঠিক খ. ভুল

৩) ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে চাকর, লেবার ও অন্যান্যদের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে।

ক. সঠিক খ. ভুল

৪) যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও হাত দ্বারা অন্যদের কষ্ট দেয় আমি তার সঙ্গ দিবো।

ক. সঠিক খ. ভুল

৫) কেউ আমাকে গালি দিলে আমিও তাকে গালি দিব

ক. সঠিক খ. ভুল

৬) ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যারা মুখাপেক্ষী ও দূর্বল তাদের সাহায্য করবো।

ক. সঠিক খ. ভুল

৭) একজন মুসলিম এর হক অপর মুসলিমের উপর যে, অসুস্থ হলে তাকে যিয়ারত করবে ও সুস্থতার দো'আ করবে।

ক. সঠিক খ. ভুল

৮) প্রতিবেশীর গোপন বিষয় খোঁজ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট

ক. সঠিক খ. ভুল

৯) আল্লাহর নিকট প্রিয় সেই যে মানুষের বেশি উপকার করে।

ক. সঠিক খ. ভুল

১০) বাড়ী হতে বের হওয়ার দো'আ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

ক. সঠিক খ. ভুল

১১) যে আমার হাঁচির উত্তর দিবে আমি তার জন্য বলবো يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

ক. সঠিক খ. ভুল

১২) দো'আ আযকার মুসলিমকে হেফাযত করে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী করে।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৩) তোমার মুসলিম ভাইকে তোমার ভালোবাসার পরিচয় কি? উত্তরঃ

১৪) ঈমান কমে যাওয়ার প্রমাণ হলো তোমার মুসলিম ভাইকে হিংসা করা।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৫) ভালোবাসা সৃষ্টি করার কারণসমূহ কি কি? উত্তরঃ

১৬) মাদকের মধ্যে সেটিই হারাম যার নাম রাখা হয়েছে খাম্‌র (মদ)

ক. সঠিক খ. ভুল

১৭) খাবার দাবারে ফুঁক দেওয়া মাকরূহ

ক. সঠিক খ. ভুল

১৮) খাবার শেষ করার পর এবং হাত ধৌত করার পর আঙ্গুল চাটা মুস্তাহাব।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৯) খাবার, পরিধান, সৌন্দর্যে মধ্যপন্থা গ্রহণ করাই হলো সঠিক পথ।

ক. সঠিক খ. ভুল

২০) মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি হকদার গোসল, জানাযার, সলাত **পড়া, ও দাফন করাতে ------ তারপর ----------তারপর ---------- তারপর।**

২১) মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করাঃ

ক. ওয়াজিব খ. সুন্নাত গ. বৈধ

২২) মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার হুকুমঃ

ক. সুন্নাত খ. ওয়াজিব গ. ফারজে কেফায়াহ

২৩) মৃত্যুর সময়ে ব্যক্তিকে তালকীন দেওয়ার হুকুমঃ

ক. ওয়াজিব খ. সুন্নাত গ. হারাম

২৪) যে মৃত ব্যক্তিকে গোসলের সাহায্য করে না তাকে গোসল দেওয়ার সময় তার উপস্থিত হওয়ার হুকুম

ক. হারাম খ. সুবাহ গ. মাকরূহ

২৫) মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হবে তখন তার কাফনের গিরাগুলো খুলে ফেলতে হবে। ক. সঠিক খ. ভুল

২৬) স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে গোসল দিতে পারবে না, কেননা মৃত্যুর কারণে বিবাহ বন্ধন শেষ হয়েছে। ক. সঠিক খ. ভুল

২৭) পুরুষ-মহিলা গোসল দিতে পারবে তাকে ----------।

২৮) যার জানাযার সলাত ছুটে যাবে সে সলাত পড়বে ---------- আর তা এত দিনের মধ্যে ----------।

২৯) সর্বাবস্থায় মৃত্যু ব্যক্তির জন্য কান্না করা বৈধ? ক. সঠিক খ. ভুল

৩০) মায়্যেতকে কবরে ডান কাঁথে কিবলার দিকে মুখ করে রাখতে হবে।

ক. সঠিক খ. ভুল

তিনটি মূলনীতি ও তার প্রমাণপঞ্জি এবং চারটি নীতির ব্যাখ্যাগ্রন্থ

মূল লেখক

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ)

ব্যাখ্যাকার

শাইখ হাইছাম বিন মুহাম্মাদ জামিল সারহান

শিক্ষক: মা'হাদুল হারাম, মাসজিদ নাববী, মাদীনা

htt://attasseel-alelmi.com

বাংলা ভাষান্তর

কাওসার এরশাদ

অধ্যয়নরত

মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর পিতা-মাতা এবং এ বইটি প্রকাশ করতে যারা সহযোগিতা করেছে সকলকে ক্ষমা করুন-আমীন।

তিনটি মূলনীতি ও তার প্রমাণপঞ্জি

بسم الله الرحمن الرحيم

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই আমরা সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জীবনের অনিষ্ট ও আমাদের খারাপ আমল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত প্রদান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়াত দিতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

ব্যাখ্যাসংশ্লিষ্ট ভূমিকা:

মূল গ্রন্থের লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাইখুল ইসলাম ও তাওহীদের দাওয়াতের প্রবক্তা ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব বিন সুলাইমান আত তামীমী। ডাক নাম আবুল হুসাইন। তিনি ১১১৫ হিজরীতে (সৌদী আরবের) উয়াইনাহ নামক স্থানে জন্ম লাভ করেন এবং ১২০৬ হিজরীতে দিরইয়াহ নামক স্থানে মারা যান।

আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করব?

১. কেননা আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।	২. আল্লাহ তাওহীদ ব্যতীত কোন আমল গ্রহণ করবেন না।
৩. কেবল এককত্ব ঘোষণাকারীই জান্নাতে প্রবেশ করবে।	৪. তাওহীদ অধিক সাওয়াব পাওয়ার একটি মাধ্যম।
৫. তাওহীদ অধিক পাপ মোচনের একটি মাধ্যম।	৬. তাওহীদ নিরাপত্তা ও হেদায়াত পাওয়ার একটি মাধ্যম।
৭. তাওহীদ প্রশান্তি পাওয়ার একটি মাধ্যম।	৮. তাওহীদ নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুপারিশ পাওয়ার একটি মাধ্যম।

শিক্ষার্জনের শুরুতেই এ (মতন বা মূল পাঠ) বইটি চয়নের কারণ

সালফে সালেহীন ও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়াতের আলেমবৃন্দ এ (মতন বা মূল পাঠ) বইটি চয়ন করেছেন। কেননা এ (মতন বা মূল পাঠ) বইটিতে অনেক উপকারিতা ও ফায়েদা রয়েছে যার মাধ্যমে একজন ছাত্র তার জীবন পরিচালনা করতে পারে এবং এর উপরেই ভিত্তি করে শরীয়তের জ্ঞানার্জন করতে পারে। সুতরাং আমরা তাদের আদর্শ গ্রহণ করছি ও নীতিমালায় তাদের পথ অনুসরণ করছি।

যেমনভাবে সর্বসাধারণও এ মতনটি (মূল পাঠ) ও তার অধীনস্থ এমন কতিপয় মূলনীতির আবশ্যিকভাবে মুখাপেক্ষী যেগুলোর ব্যাপারে কোন সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই ঈমান আনা অপরিহার্য।

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ)'র এই গ্রন্থ ও অন্যান্য বইয়ের বৈশিষ্ট্য

১. সহজবোধ্য ও স্পষ্ট	২. প্রমাণসহ মাসআলার আলোচনা	৩. মাসআলাসমূহকে একত্রিতকরণ ও সংখ্যা সহকারে বিন্যাস। অতঃপর তা থেকেই ব্যাখ্যা প্রদান।	৪. লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এর পাঠ্যসমূহের পাঠকবৃন্দ ও শ্রোতাদের জন্য অধিক পরিমাণে দু'আ।

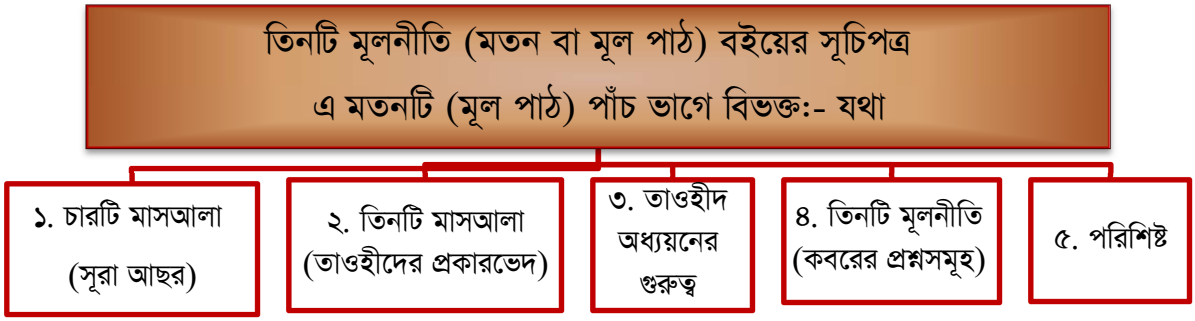
তিনটি মূলনীতির পরিচয়

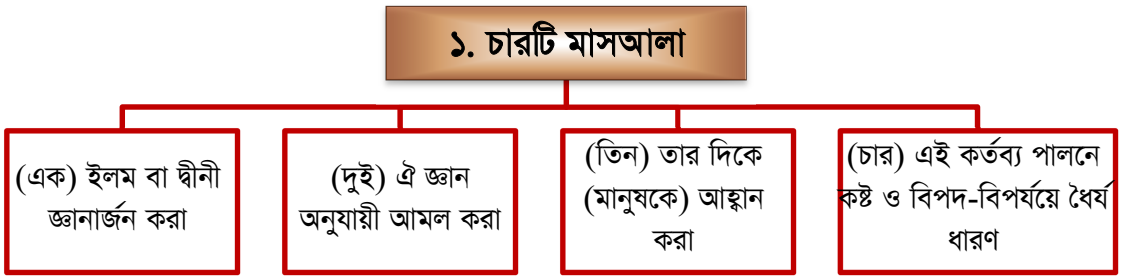
তিনটি মূলনীতিকে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়: কবরের তিনটি প্রশ্ন

- তোমার প্রতিপালক কে?
- তোমার ধর্ম কী?
- তোমার নাবী কে?

তিনটি মূলনীতি অধ্যয়নে আমাদের কী উপকার রয়েছে?

তুমি যখন তিনটি মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে ও তদনুপাতে আমল করবে, দাওয়াত দিবে এবং জ্ঞানার্জন করা, আমল করা কিংবা দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করবে, তখন তুমি আল্লাহর ইচ্ছায় কবরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।


তিনটি মূলনীতি (মতন বা মূল পাঠ) বইয়ের সূচিপত্র
এ মতনটি (মূল পাঠ) পাঁচ ভাগে বিভক্ত:- যথা
১. চারটি মাসআলা (সূরা আছর)
২. তিনটি মাসআলা (তাওহীদের প্রকারভেদ)
৩. তাওহীদ অধ্যয়নের গুরুত্ব
৪. তিনটি মূলনীতি (কবরের প্রশ্নসমূহ)
৫. পরিশিষ্ট


১. চারটি মাসআলা
(এক) ইলম বা দ্বীনী জ্ঞানার্জন করা
(দুই) ঐ জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা
(তিন) তার দিকে (মানুষকে) আহ্বান করা
(চার) এই কর্তব্য পালনে কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে ধৈর্য ধারণ

২. তিনটি মাসআলা

- ১. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ ওয়াল আসমা ওয়াস সিফাত (প্রভুত্ব ও নাম এবং গুণসমূহের এককত্ব প্রদান)
- ২. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ
- ৩. শিরক ও মুশরিকদের হতে মুক্ত থাকা (অন্তর,জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে)

৩. তাওহীদ অধ্যয়নের গুরুত্ব

প্রশ্নোত্তর: আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করব?

৪. তিনটি মূলনীতি

তিনটি মূলনীতিকে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়: কবরের তিনটি প্রশ্ন

- তোমার প্রতিপালক কে?
- তোমার ধর্ম কী?
- তোমার নাবী কে?

৫. পরিশিষ্ট

লেখক (রহিমাহুল্লাহু) এর উক্তি হতে: (মানুষের মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে----------) (মতন বা মূল পাঠ) বইয়ের শেষ পর্যন্ত।

প্রথমত: চারটি মাসআলা

بسم الله الرحمن الرحيم

জেনে রেখ-আল্লাহ্ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন![১] চারটি মাসআলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।[২]

(প্রথম) ইলম বা দ্বীনী জ্ঞান: আর তা এমন বিদ্যা যার সাহায্যে দলীল-প্রমাণসহ আল্লাহ, তাঁর নাবী এবং দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।

(দ্বিতীয়) ঐ জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা।[৩]

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এই মতনটি (মূল পাঠ) বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করার কারণ

১. আল্লাহর কিতাব ও নাবীদের অনুসরণার্থে	২. তাঁর (লেখক) পূর্ববর্তী সালফে সালেহীন আলেমগণকে আর্দশ হিসেবে গ্রহণ করে, কেননা তাঁরা তাদের লিখন বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করেছেন	৩. আল্লাহর সম্মানিত নামের বরকত নেয়ার জন্য

(২) যেমনভাবে আমরা ভূমিকাতে বলেছি: লেখকের একটি বিশেষ গুণ হলো ছাত্রদের জন্য দু'আ দিয়ে শুরু করেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট রহমত কামনা করেন। আর তা প্রমাণ করে যে-

১. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়াতের আলেমগণ তাদের শিক্ষার্থীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন।	২. নিশ্চয় ইসলাম ধর্ম মূলত রহমতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

العلم বা বিদ্যার পরিচয়: العلم বা বিদ্যা হলো সত্যকে দলীলসহ জানা। আর এর বিপরীত হলো অজ্ঞতা বা মূর্খতা।

(৩) ইলম ও আমলের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা হয়: ইলম আমলকে আহ্বান করে যদি সাড়া দেয়া হয়, অন্যথায় তা চলে যায়।

সুতরাং আমল ব্যতীত ইলমের কোন উপকারিতা নেই। যখন কেউ বিদ্যার্জন করবে তখন তার উপর করণীয় হলো: উক্ত ইলম অনুযায়ী আমল করা। অন্যথায় তার মাঝে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা ইয়াহুদীদের নিকট ইলম ছিল, কিন্তু তারা আমল করত না।

আল্লাহ বলেছেন: ﴿ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡۘ ﴾ [الأنعام: ٢٠] অর্থ:তারা তাকে চিনতো যেমন তাদের পুত্রদেরকে চিনতো। [সূরা আল আন'আম : ২০]

আর যাদেরকে সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়া হবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো ঐ আলেম যে বিদ্যার্জন করল কিন্তু আমল করল না।

যেমন একজন কবি বলেছেন:

যে আলেম ইলম অনুযায়ী আলম করে না, তাকে মূর্তি পূজকদের পূর্বে শাস্তি দেয়া হবে।

(তৃতীয়) উক্ত জ্ঞানের দিকে (মানুষকে) আহ্বান করা।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত ও নীতিমালা আছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য

১. দাওয়াত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে

২. দাওয়াতের ভিত্তি হবে শারয়ী ইলমের উপর

৩. হেকমত ও ধৈর্যের সাথে দাওয়াত দেয়া

৪. আহ্বানকৃত ব্যক্তিদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা

এই শর্তসমূহের দলীল:

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨]

অর্থ: আপনি বলে দিন, এই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীরা আল্লাহর দিকে বুঝে-সুঝে দাওয়াত দেই। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। [সূরা ইউসুফ :১০৮]

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي: এতে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শরীয়ত হতে নিয়ে এসেছেন। আর سَبِيلِ অর্থ: পথ বা পদ্ধতি। أَدْعُو إِلَى اللّهِ : সেই ব্যক্তি আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠভাবে আহ্বানকারী যে মানুষকে আল্লাহর দিকে পৌঁছে দেয়। عَلَى بَصِيرَةٍ : بَصِيرَةٍ হলো জ্ঞানার্জন করা। এখানে জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

১. শারয়ী জ্ঞান।	২. আহ্বানকৃত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।	৩. গন্তব্যে পৌঁছানোর আহ্বানকারীর উদ্দেশ্য ।

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এখানে বলতে চাচ্ছেন: যখন তুমি কোন বিদ্যার্জন করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে তখন তোমার প্রতি কর্তব্য হচ্ছে সেই পথে চলা যে পথে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীরা এবং সালফে সালেহীনগণ চলেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ

অর্থ: আপনি বলে দিন, এই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীরা আল্লাহর দিকে বুঝে-সুঝে দাওয়াত দেই।

সুতরাং এখানেই বুঝা যাচ্ছে যে, দাওয়াত প্রদান করা আবশ্যক।

(চতুর্থ) ধৈর্য অর্থাৎ এ সমস্ত কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে ধৈর্য ধারণ করা।[১]

উপরোক্ত কথার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

﴿وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣﴾

[العصر: ١، ٣]

অর্থ: ''কালের শপথ, সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ সম্পাদন করেছে, আর যারা পরস্পরকে হক্ক তথা সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্য ধারণের নিরন্তর উপদেশ দিয়েছে।''[২]

[সূরা আল-আসর :১-৩]

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) দাওয়াতের পর ধৈর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তোমাকে বলতে চাচ্ছেন: যে ব্যক্তি এই দাওয়াতের পথে চলবে তার অনেক কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয় আসবে, যেমন নাবী ও রাসূলগণের ক্ষেত্রেও এসেছিল। সুতরাং এ সকল কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যক।

الصبر বা ধৈর্যের পরিচয়

- শাব্দিক অর্থ: আটকে রাখা।
- পারিভাষিক অর্থ: সৎ আমলের উপর আত্মাকে অবিচল রাখা এবং অসৎ কাজ হতে বিরত থাকা।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) ধৈর্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন

১. আল্লাহর আনুগত্য আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা

২. আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কাজ হতে বিরত থাকার জন্য ধৈর্য ধারণ করা

৩. আল্লাহর নির্ধারিত বেদনাদায়ক ভাগ্যের উপর ধৈর্য ধারণ করা

(২) চারটি মাসআলা উল্লেখ করার পর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত মাসআলার উপর কুরআন হতে দলীল প্রদান করেছেন। আর তা হচ্ছে সূরা আছর।

প্রশ্ন: লেখক (রহিমাহুল্লাহ) কেন সর্বদাই দলীলসহ মাসআলা উল্লেখ করেন?

উত্তর:

১. তিনি যেন একজন ছাত্রকে তাকলীদহীন ইত্তেবা বা আনুগত্যের উপর গড়ে তুলতে পারেন

২. যাতে ছাত্রের নিকট দলীল থাকে এবং উক্ত দলীলের মাধ্যমে মতানৈক্যকারীদের উত্তর দিতে পারে

৩. মূল দলীলের ভিত্তিতে ছাত্র যেন মাসআলার হুকুম সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয়

উপরে বর্ণিত সূরা সম্পর্কে ইমাম শাফে'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) এ অভিমত পেশ করেছেন যে, ''যদি আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির উপর প্রমাণ পেশ করার জন্য এ সূরা ব্যতীত অন্য কোনো কিছু অবতীর্ণ নাও করতেন, তাহলে এ সূরাই তাদের জন্য সব দিক দিয়ে যথেষ্ট হতো।''(১)

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সংকলিত সহীহ বুখারীর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন: বলা ও আমলের পূর্বে জ্ঞানার্জন করা। (২)

এর সমর্থনে দলীলঃ

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ ﴾ [محمد: ١٩]

অর্থ: ''কাজেই জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনোই ইলাহ নেই। আর (রাসূল) নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য ও মু'মিন নর-নারীর জন্যও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।'' (সূরা মুহাম্মাদ :১৯)

সুতরাং আল্লাহ এখানে কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান ও বিদ্যার কথাই প্রথমে উল্লেখ করেছেন। (২)

(১) ইমাম শাফে'ঈ (রহিমাহুল্লাহ)'র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, নিশ্চয় এ সূরাটি এককভাবে মানব জাতির উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম যে, যেন তারা বিদ্যার্জন করে অতঃপর আমল করে এবং দাওয়াত দেয় ও সে ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করে।

সুতরাং কুরআনের অন্যান্য সূরার ক্ষেত্রে তোমার কী অভিমত? বরং পূর্ণ কুরআনই দলীল ও প্রমাণ।

(২) আমীরুল মু'মিনীন ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সহীহুল বুখারী হাদীস গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন: বিদ্যার স্থান হচ্ছে কথা ও কাজের পূর্বে এবং তিনি এর দলীলও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং কথা ও কাজের পূর্বেই বিদ্যার্জন আবশ্যক।

তাই ইলম ব্যতীত কারো আমল পরিশুদ্ধ হয় না, অন্যথায় তার মাঝে খৃষ্টানদের সাদৃশ্য রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: তিনটি মাসআলা

জেনে রেখ, আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ এবং তদনুযায়ী আমল করা অবশ্য কর্তব্য।(১)

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) মতনের (মূল পাঠ) এ অংশটি ছাত্রদের জন্য দু'আ দিয়ে শুরু করেছেন। তিনি 'তিনটি মূলনীতি' বইটিতে ছাত্রের জন্য তিন স্থানে দু'আ করেছেন:
১. চারটি মাসআলার শুরুতে।
২. তিনটি মাসআলার শুরুতে।
৩. তৃতীয় স্থানটি হলো, জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাকে তাঁর আনুগত্য করার তাওফীক দান করুন, নিশ্চয় একনিষ্ঠ দ্বীন হচ্ছে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর মিল্লাত।

তিনটি মাসআলার ব্যাখ্যার পূর্বে কিছু কথা

তাওহীদ এর পরিচয়

শাব্দিক অর্থ: توحيد শব্দটি وحد - يوحد এর মাসদার বা মূল উৎস। যখন কেউ কোন বিষয়কে একক করে তখন বলা হয়, وحد الشيئ সে তাকে একক করেছে

পারিভাষিক অর্থ: প্রতিপালন, ইবাদত ও আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে ঘোষণা করা

তাওহীদ তিন প্রকার

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ : আল্লাহর সকল কার্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা। অর্থাৎ সৃষ্টি, রাজত্ব ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা।

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ : ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত : আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত নাম বা গুণাবলী নিজের জন্য তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন অথবা তাঁর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন সে ব্যাপারে তাঁর এককত্ব ঘোষণা করা। আর তা হচ্ছে এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা যা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করা এবং যা দূরীভূত করেছেন তা দূরীভূত করা কোন ধরণের পরিবর্তন, বিনষ্টকরণ, পদ্ধতি বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত প্রদান ব্যতীত।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত : কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল আসমা ওয়াস সিফাত এর নির্ধারিত সীমার মধ্যে সিমাবদ্ধ থাকা। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যা নিজের জন্য তাঁর কিতাবে সাব্যস্ত করেছেন অথবা তাঁর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাব্যস্ত করেছেন তা তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা দূরীভূত করেছেন তা দূরীভূত করা কোন ধরণের পরিবর্তন, বিনষ্টকরণ, পদ্ধতি বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত প্রদান ব্যতীত।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

অর্থ: তাঁকে (অর্থাৎ আল্লাহকে) কোন তন্দ্রা বা নিদ্রা আচ্ছন্ন করতে পারে না। (সূরা আল বাকারাহ: ২৫৫)

﴿ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٖ ﴾ [ق: ٣٨]

অর্থ: ''আর আমাকে কোন প্রকার ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।'' (সূরা ক্বাফ: ৩৮)

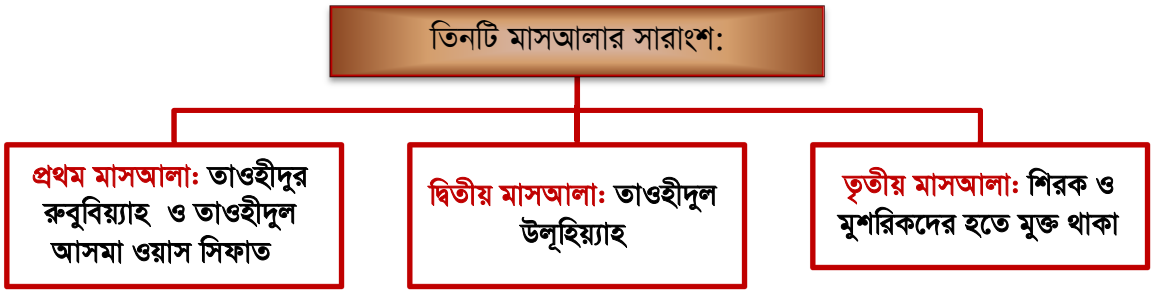
এ তিনটি মাসআলা হচ্ছে :

প্রথম মাসআলা: আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, জীবিকা প্রদান করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে দেননি। (বরং হেদায়াতের জন্য) তিনি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ পালন করবে তার বাসস্থান হবে জান্নাত এবং যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ অমান্য করবে তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ رَسُولٗا شَٰهِدًا عَلَيۡكُمۡ كَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ رَسُولٗا ١٥ فَعَصَىٰ فِرۡعَوۡنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذۡنَٰهُ أَخۡذٗا وَبِيلٗا ١٦ [المزمل: ١٥، ١٦]

অর্থ: ''নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ, যেমন পাঠিয়েছিলাম একজন রাসূল ফের'আউনের প্রতি। কিন্তু ফের'আউন সেই রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলো। ফলে আমরা তাকে পাকড়াও করলাম অত্যন্ত কঠোরভাবে।''[১] (সূরা আল-মুযযাম্মিল: ১৫-১৬)



(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) প্রথম মাসআলাটিতে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতকে সাব্যস্ত করেছেন। (নিশ্চয় আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন) সুতরাং তিনিই সৃষ্টিকর্তা, (আল্লাহ আমাদেরকে রিযিক দান করেন) সুতরাং তিনিই রিযিকদাতা। (তিনি আমাদেরকে অনর্থক ছেড়ে দেননি) অর্থাৎ তাঁর কোন আদেশ ও নিষেধ অমান্য না করা হয় (বরং তিনি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন)।

রাসূলগণকে (আলাইহিমুস সালাম) প্রেরণের উদ্দেশ্য:

১. সৃষ্টির উপর দলীল সাব্যস্ত করা:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

(سورة بني إسرائيل:١٥)

অর্থ: কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি দান করি না। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১৫)

২. রহমত বা দয়া-অনুকম্পা:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورة الأنبياء: ١٠٧)

অর্থ: আমি আপনাকে বিশ্ববাসির জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া: ১০৭)

দ্বিতীয় মাসআলা: ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহ কাকেও তাঁর অংশীদার বা শরীক হিসেবে পছন্দ করেন না তা কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা হোন কিংবা কোনো প্রেরিত রাসূলই হোন না কেন।
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا

[الجن: ١٨]

অর্থ: "নিশ্চয়ই মাসজিদসমূহ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য, অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না।" (সূরা আল-জ্বিন: ১৮)

দ্বিতীয় মাসআলাটিতে আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রভুত্বকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে অংশিদার করাকে তিনি পছন্দ করেন না। أحد শব্দটি অনির্দিষ্ট। এটি সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে। সে কোনো নাবী হোক, ওলী হোক, ফেরেশতা হোক, কোন সৎ বান্দা বা অন্য কোনো সৃষ্টি যেই হোক না কেন।
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا [الجن: ١٨]

অর্থ: "নিশ্চয়ই মাসজিদসমূহ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য, অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না।" (সূরা আল-জ্বিন: ১৮)

মাসজিদের প্রকৃত অর্থ কী এ সম্পর্কে তিনটি মতামত রয়েছে, সবগুলোই একত্রিতকরণ সম্ভব

১. এমন মাসজিদসমূহ যেগুলোকে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে

২. সেজদাহ করার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

৩. পৃথিবী: [রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: সমগ্র ভূমিকে আমার জন্য মাসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে]

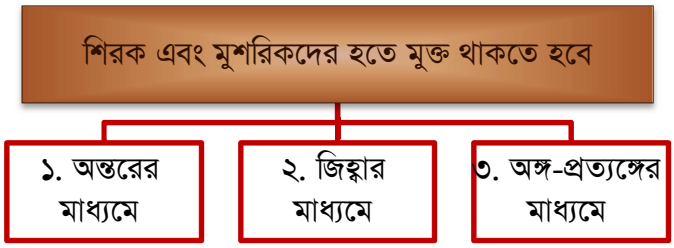
وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا এখানে أَحَدًا শব্দটি অনির্দিষ্ট যা নিষেধসূচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ জন্যে লেখক (রহিমাহুল্লাহ) দ্বিতীয় মাসআলার শুরুতে বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশিদার স্থাপন করা পছন্দ করেন না। অর্থাৎ সে কোন নাবী, ওলী, জ্বীন বা কোন সৎ বান্দা যেই হোক না কেন।

তৃতীয় মাসআলা: যিনি রাসূলের আনুগত্য করেন এবং আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেন, তার পক্ষে এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা মোটেই জায়েয নয় যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী ঐ লোকেরা যদি তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হয়, তথাপিও নয়।
এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾ [المجادلة: ٢٢]

অর্থ: ''আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপরে ঈমান পোষণকারী এমন কোনো সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে- হোক না কেন তারা ঈমানদারদের পিতা, পুত্র বা ভ্রাতা কিংবা গোত্র-গোষ্ঠী। আল্লাহ এদের হৃদয়ে ঈমানকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত (ফেরেশতা তথা) আত্মিক শক্তি দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন যার নিম্নদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী, সেখানে তারা অবস্থান করবে চিরকাল। আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের উপর এবং তারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর উপর। বস্তুত এরাই হচ্ছে আল্লাহর সেনাদল। জেনে রাখো, আল্লাহর এই সেনাদলই হবে পরিণামে সফলকাম।''
(সূরা আল-মুজাদালাহ্ঃ ২২)

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তৃতীয় মাসআলায় এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, শিরক ও মুশরিকদের হতে মুক্ত থাকা আবশ্যক ।



১. অন্তরের মাধ্যমে: তা হচ্ছে, কাফেরকে ঘৃণা করা, তাদের বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানকে অপছন্দ করা এবং বিশেষ করে তাদের শিরক ও বিদআতী কার্যকলাপ ঘৃণা করা।

২. জিহ্বার মাধ্যমে: إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ [الزخرف: ٢٦] অর্থ: ''তোমরা যার ইবাদত করছো নিশ্চয় আমি তা হতে মুক্ত।'' (সূরা আয যুখরুফ : ২৬)

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾ ﴾ [الكافرون: ١-٦]
অর্থ: ''আপনি বলুন, হে কাফেরেরা, তোমরা যার ইবাদত কর আমি তার ইবাদত করি না। এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যার ইবাদত কর। তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য। (সূরা কাফিরুন: ১-৬)

৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে: তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিনোদনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ না করা অথবা তাদের পোশাকের সদৃশ পোশাক পরিধান না করা এবং তাদের আক্বীদাহগত বিষয়ে অংশগ্রহণ না করা।

তৃতীয়: তাওহীদ অধ্যয়নের গুরুত্ব

জেনে রেখ, (আল্লাহ তাঁর আনুগত্য বরণ ও আদেশ পালনের জন্য তোমাকে পথ প্রদর্শন করুন) নিশ্চয় একনিষ্ঠ আনুগত্যই হল মিল্লাতে ইবরাহীম:

তা এই যে তুমি কেবল আল্লাহর ইবাদত করবে এবং কেবল তাঁরই জন্য দ্বীনকে খালেস করবে। আর আল্লাহ সকল মানুষকে এরই আদেশ দিয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

[الذاريات: ٥٦]

অর্থ: ''আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে।''[১] (সূরা আয- যারিয়াত: ৫৬)

তারা আমারই ইবাদত করবে -এর অর্থ, তারা আমারই উলূহিয়্যাত্বর এককত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

আর আল্লাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশটি হচ্ছে তাওহীদ। যার অর্থ সর্বপ্রকারের ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে তাঁর বড় নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে শির্ক। তার অর্থ: আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে আহ্বান করা।[১]

الحنيفية এর পরিচয়

শাব্দিক পরিচয়: الحنيفية শব্দটি حنفথেকে গৃহিত। যার অর্থ ধাবিত হওয়া।

পারিভাষিক পরিচয়: ঐ মিল্লাতকে বলা হয়, যা শিরক থেকে বিমুখ হয়ে ইখলাস, তাওহীদ ও ঈমানের দিকে ধাবিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا [النحل: ١٢٠]

অর্থ: (ইবরাহীম ছিলেন) আল্লাহরই অনুগত একনিষ্ঠ বান্দা। (সূরা নাহল: ১২০)

অর্থাৎ আল্লাহর দিকে আগমনকারী ও শিরক হতে পশ্চাদস্রণকারী। সুতরাং حنيف বা একনিষ্ঠ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে সর্বদাই তাওহীদের দিকে ফিরে আসে এবং শিরক হতে দূরে থাকে।

(৩) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এখানে সুস্পষ্ট করেছেন, আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করবো। আর পূর্বেই আমরা তাওহীদের গুরুত্ব আলোচনা করেছি।

তাওহীদ এর পরিচয়

শাব্দিক অর্থ: توحيد শব্দটি وحد - يوحد এর মাসদার বা মূল উৎস । যখন কোন বিষয়কে একক করে তখন বলা হয়, وحد الشيئ সে তাকে একক করেছে।

পারিভাষিক অর্থ: প্রতিপালন, ইবাদত ও আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে ঘোষণা করা।

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলছেন: তারা আমার ইবাদত করবে এর অর্থ হলো: তারা আমার এককত্ব ঘোষণা করবে। আর এটিই ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উক্তি। যেমন তিনি বলেছেন: কুরআনে বর্ণিত প্রত্যেকটি ইবাদতের অর্থ হলো তাওহীদ বা এককত্ব ঘোষণা করা। (তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর) অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা কর।হে মানব সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর অর্থাৎ হে মানব সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের একত্ববাদের ঘোষণা কর।

চতুর্থত: তিনটি মূলনীতি

সুতরাং যদি তোমাকে বলা হয়, যে তিনটি মূলনীতি সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষেরই জানা অবশ্য কর্তব্য তা কী কী?

তুমি উত্তর দেবে যে, বিষয় তিনটি হলো:

মানুষের কর্তব্য তার রব সম্পর্কে, তাঁর দ্বীন সম্পর্কে এবং তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।[১]

যদি তোমাকে বলা হয়, ''তোমার রব কে?„ তা হলে বল, আমার রব সেই মহান আল্লাহ্ যিনি আমাকে ও অন্যান্য সকল সৃষ্টি জীবকে তাঁর বিশেষ নে'য়ামতসমূহ দ্বারা লালন-পালন করেন। তিনি আমার একমাত্র মা'বুদ, তিনি ব্যতীত আমার অন্য কোনো মা'বুদ নেই।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ [الفاتحة: ٢]

অর্থঃ ''যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের রব।''[২] (সূরা আল- ফাতিহা: ১)

আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই হচ্ছে তাঁর সৃষ্ট বস্তু এবং আমিও সেই সৃষ্ট জগতের একটি অংশ মাত্র।[৩]

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তিনটি মূলনীতি দিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন যার সারাংশ কবরের তিনটি প্রশ্ন এবং প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠক ও শ্রোতাকে সচেতন করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন ও নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন।

(২) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) প্রথম মূলনীতিটি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বর্ণনা দিয়েছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহই প্রতিপালক এবং তিনিই ইবাদতের যোগ্য অধিকারী। তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী উল্লেখ করে দলীল দিয়েছেন:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ [الفاتحة: ٢]

অর্থঃ ''যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের রব।'' (সূরা আল- ফাতিহা: ১)

সুতরাং প্রতিপালকই মা'বুদ।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এ আয়াতটি তাওহীদের তিনটি প্রকারকে অন্তর্ভূক্ত করেছে।

- ১. الْحَمْدُ এ শব্দটিতে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতকে সাব্যস্ত করা।
- ২. لِلَّهِ এ শব্দটিতে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহকে সাব্যস্ত করা।
- ৩. رَبِّ এ শব্দটিতে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহকে সাব্যস্ত করা।

(৩) অর্থাৎ: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সবকিছুই সৃষ্টি। সুতরাং আমি যেহুত একজন সৃষ্ট বস্তু তাই আমার জন্য কর্তব্য হলো সৃষ্টিকর্তা ও অসংখ্য নিয়ামত ও অনুগ্রহ দাতার শুকুর গুজার করা।

আর যদি তোমাকে বলা হয়, ‘‘তুমি কিসের মাধ্যমে তোমার প্রতিপালকের পরিচয় লাভ করেছো?’’ তখন তুমি উত্তর দেবে, তাঁর নিদর্শনসমূহ ও তাঁর সৃষ্টিরাজির মাধ্যমে (আমি আমার প্রতিপালককে চিনেছি)। আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবা-রাত্রি, সূর্য-চন্দ্র আর তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে রয়েছে সাত আকাশ, সাত জমিন এবং যা কিছু তাদের ভিতরে এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যস্থলে রয়েছে।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [فصلت: ٣٧]

অর্থ: ‘‘আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করবে না, চন্দ্রকেও নয়; বরং সাজদাহ করবে একমাত্র সেই আল্লাহকে যিনি ঐ সবকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাক।’’(সূরা ফুসসিলাত: ৩৭)

অনুরূপ আল্লাহর বাণী,

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ [الاعراف: ٥٤]

অর্থ: ‘‘নিশ্চয় তোমাদের রব হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনি রজনীর দ্বারা দিবসকে সমাচ্ছন্ন করেন, যে মতে তারা ত্বরিৎ গতিতে একে অন্যের অনুসরণ করে চলে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে স্বীয় নির্দেশের অনুগতরূপে। জেনে নাও, সৃষ্টি করার ও হুকুম প্রদানের মালিক তো তিনিই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কতই না বরকতময়।" [১] (সূরা আল-আ‘রাফ: ৫৪)

আর যিনি রব হবেন তিনিই হবেন মা‘বুদ বা উপাস্য।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: ٢١، ٢٢]

অর্থ: ‘‘হে মানুষ! তোমরা ইবাদাত করবে সেই মহান রবের যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও। যিনি তোমাদের জন্যে জমিনকে করেছেন বিছানাস্বরূপ আর আসমানকে করেছেন ছাদস্বরূপ। আর যিনি আকাশ হতে বৃষ্টি নাযিল করেন, অতঃপর এর দ্বারা উদ্গত করেন নানা প্রকার ফলশস্য তোমাদের জীবিকা হিসেবে। অতএব তোমরা জেনে শুনে কোনো কিছুকেই আল্লাহর সমকক্ষ তথা অংশীদার করোনা।’’[২] (সূরা আল-বাকারাঃ ২১-২২)

ইবনে কাসীর বলেছেন, ‘‘যিনি এ সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তিনিই তো ইবাদতের যোগ্য।’’[৩]

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বেশ কিছু সৃষ্টিগত নিদর্শন ও সৃষ্টিসমূহকে উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় এবং তা সাব্যস্ত করে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারার্থে কোনো প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা ও মা'বুদ নেই। আর এর স্বপক্ষে তিনি প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন যেমনটি তা মূল বইয়ে উল্লেখিত।

* প্রত্যেকটি সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন বা প্রমাণ। কিন্তু শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নিদর্শন ও সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য করেছেন। কেননা নিদর্শনসমূহ পরিবর্তন হয়। যেমন দিন-রাত। সুতরাং যা পরিবর্তন হয় তাতে প্রমাণ পাওয়া যায় শক্তি তারই বেশি যা পরিবর্তন হয় না।

(২) এ আয়াতখানা সূরা বাকারার। কতিপয় আলেম বলেছেন: কুরআনের মধ্যে এ (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ) আয়াতটিতে সর্বপ্রথম আহ্বানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর উক্ত আয়াতেই সর্বপ্রথম আদেশসূচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। (ٱعۡبُدُواْ) অর্থাৎ তোমরা এককত্ব ঘোষণা কর; এবং উক্ত আয়াতেই সর্বপ্রথম নিষেধসূচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ অর্থাৎ- তোমরা শিরক হতে মুক্ত থাক।

(৩) অর্থাৎ তাওহীদুর রুবুবিয়্যার এককত্ব ঘোষণাকারীর উপর কর্তব্য হলো তাওহীদুল উলূহিয়্যার ক্ষেত্রেও এককত্ব ঘোষণা করা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে সব ইবাদাতের নির্দেশ দিয়েছেন: তা হচ্ছে,

১. ইসলাম (আত্মসমর্পন করা)।
২. ঈমান (স্বীকৃতি দেয়া তথা অন্তর, মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা মেনে নেয়া) ।
৩. ইহসান (সার্বিক সুন্দরতমভাবে যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা) ।
৪. الدعاء (আদ-দু'আ) প্রার্থনা, আহ্বান।
৫. الخوف (আল-খাউফ) ভয়-ভীতি।
৬. الرجاء (আর-রাজা) আশা-আকাঙ্ক্ষা।
৭. التوكل (আৎ-তাওয়াক্কুল) নির্ভরশীলতা, ভরসা।
৮. الرغبة (আর-রাগবাহ) অনুরাগ, আগ্রহ।
৯. الرهبة (আর-রাহ্বাহ) শঙ্কা।
১০. الخشوع (আল-খুশূ') বিনয়-নম্রতা।
১১. الخشية (আল-খাশিয়াত) ভীত হওয়া।
১২. الإنابة (আল-ইনাবাহ) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে আসা।
১৩. الاستعانة (আল-ইস্তে'আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা।
১৪. الاستعاذة (আল-ইস্তে'আযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা।
১৫. الاستغاثة (আল-ইস্তেগাসাহ) উদ্ধার প্রার্থনা।
১৬. الذبح (আয্-যাবহ) যবাই করা।
১৭. النذر (আন্-নযর) মান্নত করা ইত্যাদি।

এগুলোসহ আরও যেসব ইবাদতের নির্দেশ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন সেগুলো কেবল আল্লাহর জন্যই করতে হবে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا [الجن: ١٨]

অর্থ: ''আর মাসজিদসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। অতএব আল্লাহর সঙ্গে কাউকেই আহ্বান করবে না।'' (সূরা আল-জিন: ১৮)

সুতরাং কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোনো একটি কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে তবে সে মুশরিক ও কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ [المؤمنون: ١١٧]

অর্থ: ''যে ব্যক্তি এক আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে আহ্বান করে, তার নিকট যার সমর্থনে কোনই যুক্তি প্রামাণ নেই তার হিসেব-নিকেশ হবে তার রবের কাছে, নিশ্চয় কাফের লোকেরা কখনই সফলকাম হবে না।'' (সূরা মু'মিনূন: ১১৭)

তাছাড়া হাদীসে এসেছে,

الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ

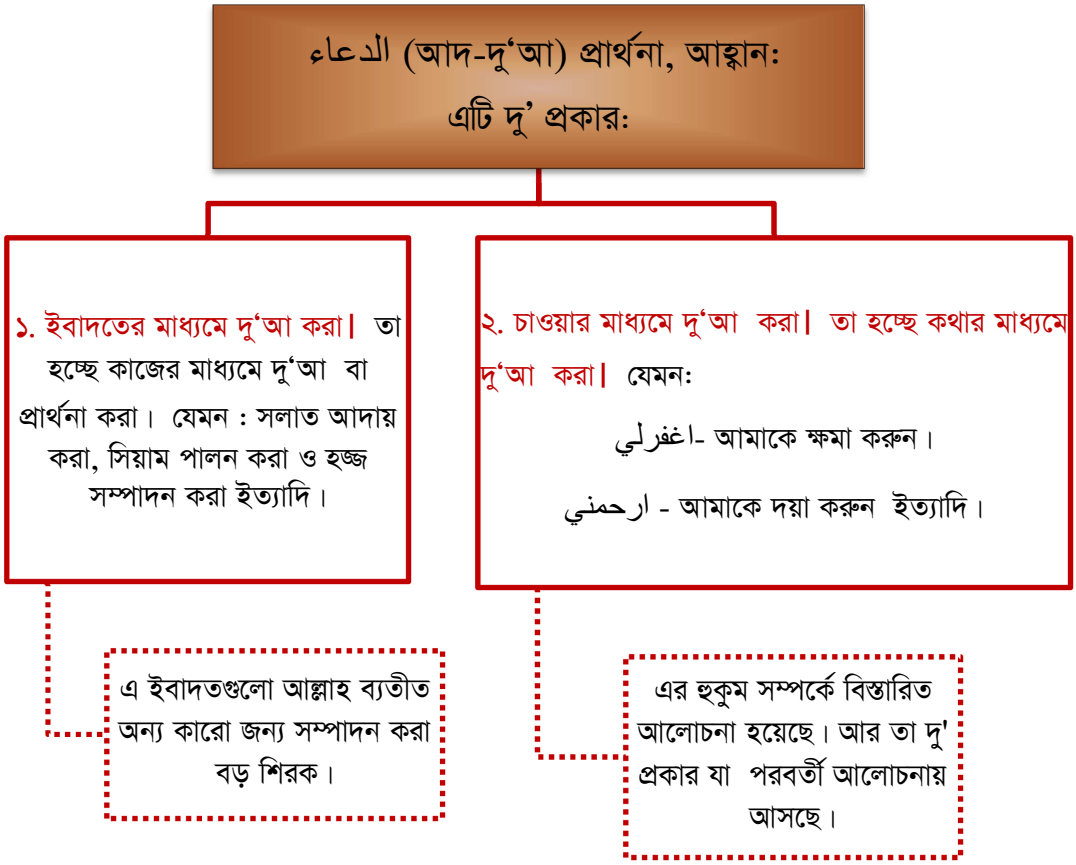
অর্থ: দু'আ বা প্রার্থনা হচ্ছে ইবাদতের সারাংশ।

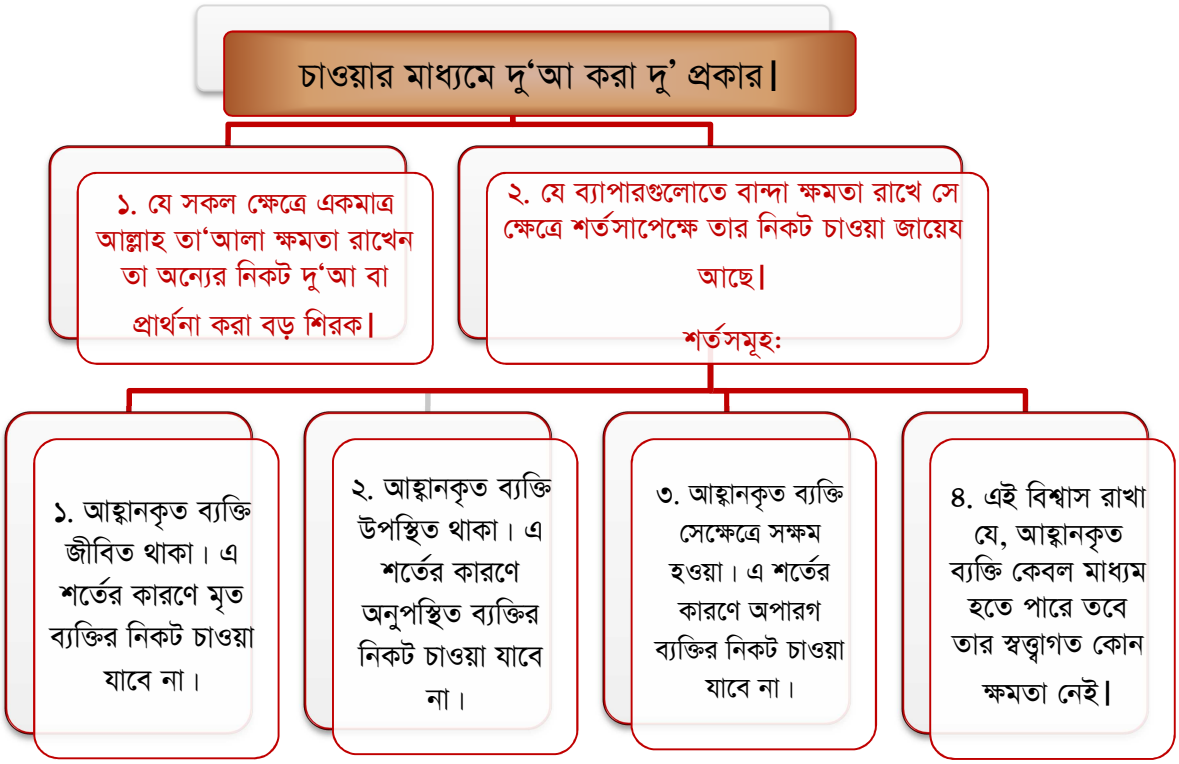
দু'আর ব্যাপারে আল্লাহর বাণী,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [الغافر: ٦٠]

অর্থ: ''আর তোমাদের রব বলেন: তোমরা সকলে আমাকেই ডাকবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব, যারা আমার ইবাদত করতে অহঙ্কার করে, তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায়।'' (সূরা গাফির: ৬০)

* লেখক (রহিমাহুল্লাহ) ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ)'র উক্তির পরে প্রত্যেকটি দৈহিক ও আত্মিক ইবাদতকে কুরআন হতে দলীলসহ উল্লেখ করেছেন যা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আসছে।


الدعاء (আদ-দু'আ) প্রার্থনা, আহ্বান:
এটি দু' প্রকার:
১. ইবাদতের মাধ্যমে দু'আ করা। তা হচ্ছে কাজের মাধ্যমে দু'আ বা প্রার্থনা করা। যেমন : সলাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা ও হজ্জ সম্পাদন করা ইত্যাদি।
২. চাওয়ার মাধ্যমে দু'আ করা। তা হচ্ছে কথার মাধ্যমে দু'আ করা। যেমন:
اغفرلي- আমাকে ক্ষমা করুন।
ارحمني - আমাকে দয়া করুন ইত্যাদি।
এ ইবাদতগুলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সম্পাদন করা বড় শিরক।
এর হুকুম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আর তা দু' প্রকার যা পরবর্তী আলোচনায় আসছে।

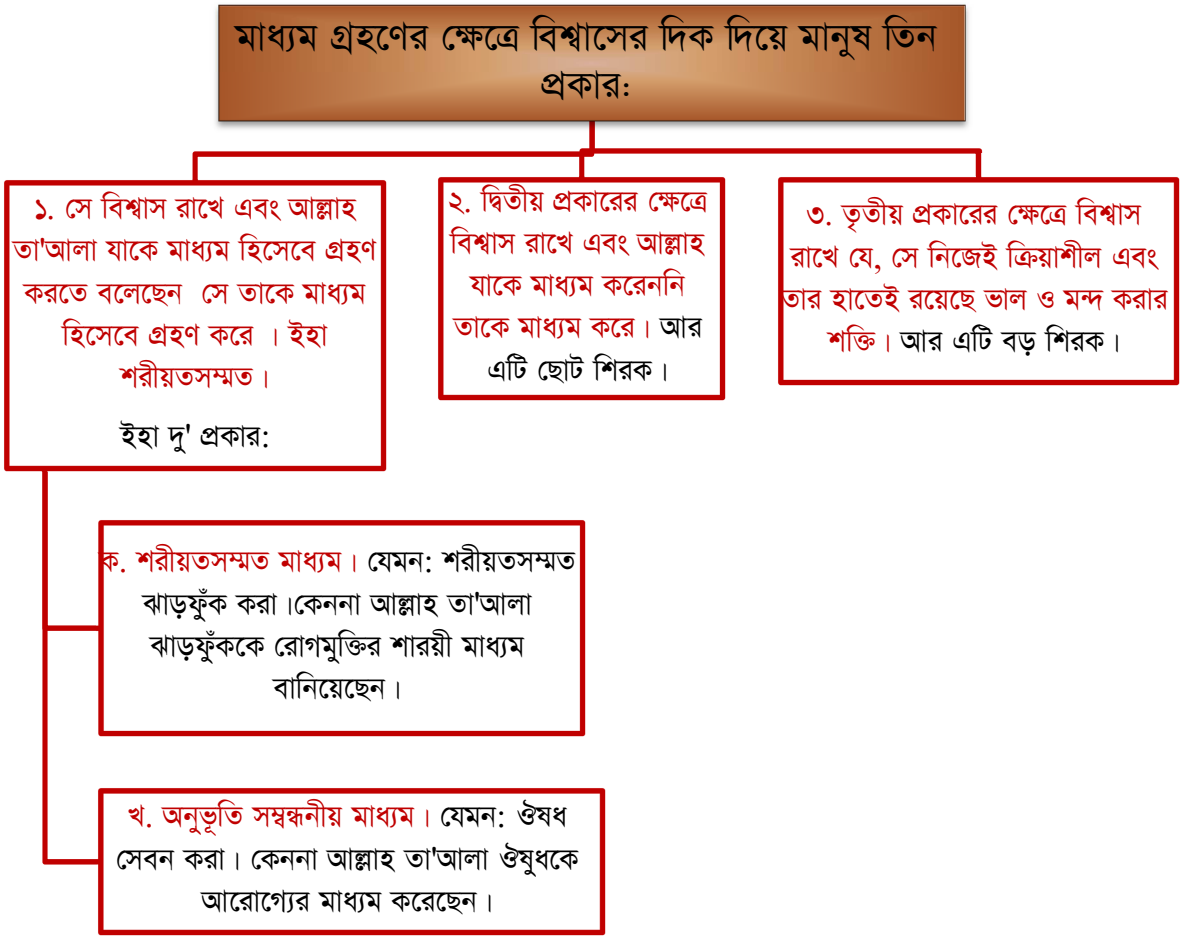


* সুতরাং যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, আহ্বানকৃত ব্যক্তির সৃষ্টির পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে এবং সে উপকার ও অপকার করতে পারে তাহলে এটি হবে শিরক।

বি:দ্র:

আমরা আমলের বিধান সম্পর্কে অধ্যয়ন করছি। কিন্তু আমলকারীর উপর হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে এবং সন্দেহযুক্ত বিষয় হতে দূরে থাকতে হবে।

আর আলেমগণ আমলকারীর উপর হুকুম দিবে যে, সে মু'মিন বা কাফের।



الدعاء مخ العبادة অর্থ: দু'আ ইবাদতের সারাংশ হাদীসটি যঈফ। কিন্তু রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ উক্তিটি সহীহ الدعاء هو العبادة অর্থ: দু'আই হচ্ছে ইবাদত।

দু'আ কিভাবে ইবাদত হয়?

এ আয়াতটি তার প্রমাণ,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [الغافر: ٦٠]

অর্থ: তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত হতে বিমুখ হয়, তারা অচিরেই জাহান্নামের অতল গভীরে প্রবেশ করবে।" (সূরা আল গাফির: ৬০)

এ আয়াতটি দু'আ ইবাদত হওয়ার প্রমাণ ।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: عِبَادَتِي

সুতরাং এটিই দলীল যে, নিশ্চয় দু'আ হচ্ছে ইবাদত।

الخوف (আল-খাউফ) ভয়-ভীতি:
ভয় করা ইবাদত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [ال عمران: ١٧٥]

অর্থ: ‘‘অতঃপর তোমরা তাদের ভয় করবে না। বরং আমাকেই ভয় করে চলবে, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাক।’’[১] (সূরা আলে ইমরান: ১৭৫)

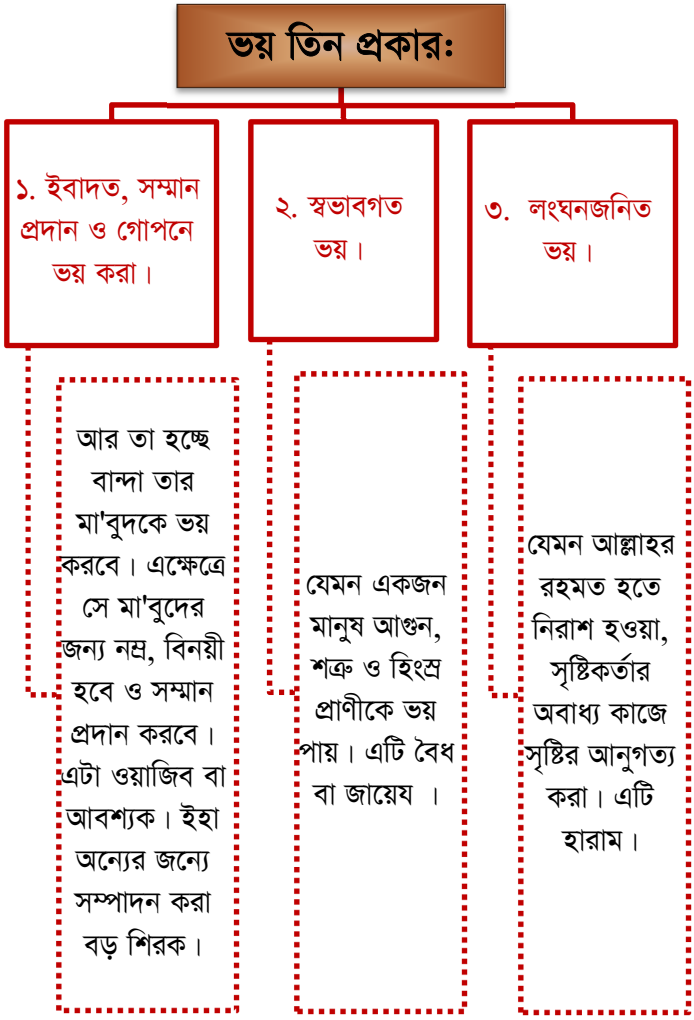
الرجاء (আর-রাজা) আশা-আকাঙ্ক্ষা:

আশা করা ইবাদত। এর দলীল আল্লাহর বাণী,

فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف: ١١٠]

অর্থ: ‘‘অতএব যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, সে যেন সৎ কর্ম করে। আর নিজ রবের ইবাদতে অপর কাউকে শরীক না করে।’’[২] (সূরা কাহাফ: ১১০)

(১) الخوف বা ভয়-ভীতি: এটি একটি প্রতিক্রিয়া যার দ্বারা মৃত্যু, ক্ষতি ও কষ্টের সম্ভাবনা থাকে।
আল্লাহ তা‘আলা শয়তানের চরদের ভয় করা থেকে নিষেধ করেছেন।



(২) الرجاء বা আশা-আকাঙ্ক্ষা:

তা হলো নিকটবর্তী কাজে প্রাপ্তির ব্যাপারে মানুষের আশা প্রকাশ করা। কখনো কখনো তা দূরবর্তী কাজের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। আর বিনয়সম্পৃক্ত আশা কেবল আল্লাহ তা‘আলার জন্য হবে। এটি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সম্পাদন করা বড় শিরক।

প্রশংসাযোগ্য আশা কেবল তার জন্য হবে যে, আল্লাহর আনুগত্যের আমল করে এবং পুণ্যের আশা করে অথবা অবাধ্য কাজ হতে তাওবা করে এবং তাওবা কবুলের আশা রাখে। পক্ষান্তরে আমল ব্যতীত আশা করা এক প্রকার প্রতারণা ও নিন্দনীয় আকাঙ্ক্ষা।

التوكل (আত-তাওয়াক্কুল) নির্ভরশীলতা, ভরসা:

নির্ভরশীলতা ইবাদত। এর দলীল আল্লাহর বাণী,

وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ [المائدة: ٢٣] .

অর্থ: "আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর করবে, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও।" (সূরা মায়েদাহ্ঃ ২৩)

আল্লাহ আরও বলেছেন:

وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓ [الطلاق: ٣] .

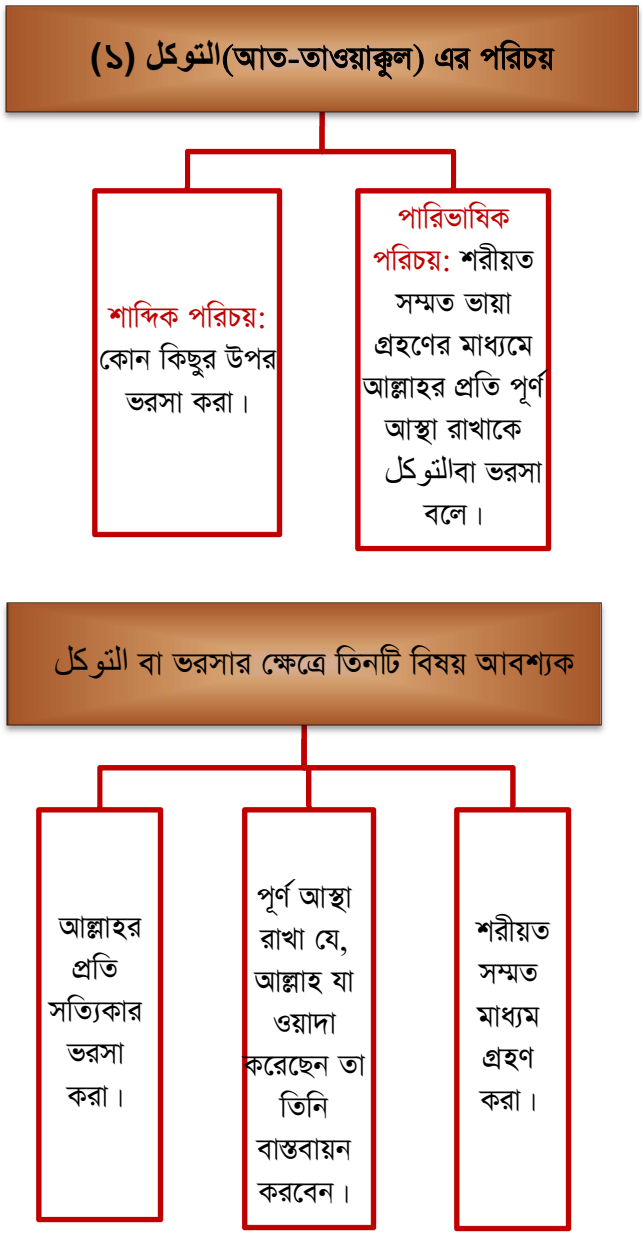
অর্থ:"আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হয়, তার জন্য তিনিই (আল্লাহ) যথেষ্ট।" (১) (সূরা তালাকঃ ৩)

الرغبة বা অনুরাগ, আগ্রহ, الرهبة বা শঙ্কা, الخشوع বা বিনয়-নম্রতা;

আগ্রহ, ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিনয় ইবাদত হিসেবে বিবেচিত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ [الانبياء: ٩٠]

অর্থ: "নিশ্চয়ই এরা সৎ কর্মে ত্বরিৎ ও সদা তৎপর ছিল। আর ভক্তি ও ভয়সহকারে আমাকে আহ্বান করতো এবং আমার প্রতি এরা বিনয়ী-বিনম্র।" (২)
(সূরা আম্বিয়া: ৯০)



(২) الرغبة (আর-রাগবাহ) বা অনুরাগ: প্রিয় জিনিসের দিকে পৌঁছার ভালবাসা রাখা।
الرهبة (আর-রাহবাহ) বা শঙ্কা: ভীতিকর বিষয়বস্তু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য ভয় করা। সুতরাং তা হলো আমলসহ ভয় করা।
الخشوع (আল-খুশুউ) বা বিনয়-নম্রতা: আল্লাহর সম্মানার্থে নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করা। আর সেটি হলো আল্লাহর সকল ফায়সালাকে মেনে নেওয়া।

* সকল অবস্থায় আল্লাহর পথের পথিক ভয় ও আশাকে একত্রিত করে। একটিকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দেয় না। অন্যথায় সে ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং তাঁর নিকট ভয় ও আশা করার বিষয়ে পাখির দু'টি ডানার মত সমতা থাকা আবশ্যক।

الخشية (আল-খাশিয়াত) ভীত হওয়া:

ভীত-শঙ্কিত থাকা ইবাদত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

فَلَا تَخْشَوْهُمْ [البقرة: ١٥٠]

অর্থ: ''সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করোনা, একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল।'' [১] (সূরা আল- বাকারা: ১৫০)

الإنابة (আল- ইনাবাহ) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে আসা:

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُۥ [الزمر: ٥٤]

অর্থ: ''আর তোমরা সকলে স্বীয় রবের পানে ফিরে এস এবং তাঁরই নিকট সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর।'' [২] (সূরা আয-যুমার: ৫৪)

الاستعانة (আল-ইস্তে'আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা:

সাহায্য প্রার্থনা ইবাদত হিসেবে পরিগণিত: এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة: ٥]

অর্থ: ''(হে আমাদের রব), আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।'' (সূরা আল-ফাতেহা: ৪)

আর হাদীসে এসেছে,

وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ.

অর্থ: ''যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই তা (বিনম্র ভাবে) চাইবে।'' [৩]

(১) الخشية (আল-খাশিয়াত) ভয় করা: আল্লাহর পূর্ণ নেতৃত্ব ও মহত্বকে যথাযথ ভয় করা।

(২) الإنابة (আল-ইনাবাহ) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে আসা: আল্লাহর আনুগত্য করে ও অবাধ্যতার কাজ পরিহার করে তাঁর দিকে ফিরে আসা। যেমন أَنِيبُوٓاْ অর্থাৎ: তোমরা ফিরে আসো। إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُۥ অর্থাৎ: তুমি তোমার সকল কার্যাদিকে আল্লাহর জন্য সমর্পণ কর। কেননা তুমি একজন বান্দা। আর দাসের করণীয় হলো মালিকের জন্য আত্মসমর্পণ করা। মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ তা'আলা। যেমন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: السيد هو الله আল্লাহই মালিক।

(৩) الاستعانة (আল-ইস্তে'আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ অর্থ: ''(হে আমাদের রব), আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।''

উক্ত আয়াতে যে অংশটি পরে হওয়ার কথা ছিল তা আগে নিয়ে আসা হয়েছে। আর এটিই প্রমাণ করছে সীমাবদ্ধতাকে। অর্থাৎ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

الاستعاذة (আল-ইস্তে'আযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা:

আশ্রয় চাওয়া ইবাদত হিসেবে পরিগণিত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ [الناس: ١، ٢]

অর্থ: ''বল, আমি মানুষের রব ও মানুষের অধিপতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'' [৪] (সূরা আন-নাসঃ ১,২)

الاستغاثة (আল-ইস্তেগাসাহ) উদ্ধার প্রার্থনা:

উদ্ধার কামনা করা ইবাদত হিসেবে পরিগণিত।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ [الانفال: ٩]

অর্থ: ''আরও (স্মরণ কর) যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে উদ্ধারের জন্য আবেদন জানিয়েছিলে তখন তিনি তোমাদের আবেদনে সাড়া দিলেন (কবুল করলেন)।''[৫] (সূরা আনফালঃ ৯)

الذبح (আয্-যাবহ) যবাই করা:

যবেহ করাও ইবাদত: এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

অর্থ: ''(হে রাসূল) বলে দাও, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্যই। তাঁর কোনোই শরীক নেই; এবং আমি এ জন্য আদিষ্ট আর আমিই হচ্ছি মুসলিমদের অগ্রণী।'' (সূরা আল-আন'আমঃ ১৬২-১৬৩)

হাদীসে এসেছে,

لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ.

''যারা অপরের নামে যবেহ করে আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন।„ [৬]

(৪) الاستعاذة (আল-ইস্তে'আযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা: তা হলো অপছন্দনীয় বস্তু হতে দূরে থাকা। أَعُوذُ অর্থাৎ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(৫) الاستغاثة (আল-ইস্তেগাসাহ) উদ্ধার প্রার্থনা: তা হলো বিপদ ও ধ্বংস হতে মুক্ত করার প্রার্থনা করা।

الاستعاذة – الاستغاثة-الاستعانة – الشفاعة	
বা সুপারিশ, সাহায্য প্রার্থনা, আশ্রয় প্রার্থনা ও উদ্ধার প্রার্থনা করা বিষয় গুলো চারটি শর্তসাপেক্ষে সৃষ্টির কাছে চাওয়া জায়েয আছে:	
১. জীবিত হওয়া	২. উপস্থিত থাকা
৩. উক্ত বিষয়ে সক্ষম হওয়া	৪. তাকে শুধু মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা

(৬) الذبح (আয্-যাবহ) যবাই করা: তা হলো নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে কোন জন্তু উৎসর্গ করা।

যবেহ তিন প্রকার:

১. আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করা যেমন: হজ্বের সময় কুরবানী করা, ঈদুল আযহাতে কুরবানী ও সাধারণ সাদকা করা।

২. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সম্মানার্থে ও ভালবাসার উদ্দেশ্যে যবেহ করা যেমন জ্বীন ও কবর বাসীদের জন্য যবেহ করা। এটি বড় শিরক।

৩. বৈধ সাধারণ যবেহ করা যেমন গোশত খাওয়া, মেহমানকে সম্মান করা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে যবেহ করা।

* বি:দ্র: যবেহ সংক্রান্ত মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা লেখকের কিতাবুত তাওহীদ নামক গ্রন্থে আসছে ইনশাআল্লাহ।

النذر (আন্-নযর) মানত করা ইত্যাদি:

মানত পূর্ণ করাও ইবাদত

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الانسان: ٧]

অর্থ: ''তারা অঙ্গীকার পূরণ করে আর সেদিনকে (কিয়ামত দিবসকে) ভয় করে, যেদিনের বিপদ-আপদ হবে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী।''[১] (সূরা আদ-দাহারঃ ৭)

(১) النذر (আন্-নযর) এর পরিচয়:

শাব্দিক পরিচয়: অঙ্গিকার করা বা মানত করা

পারিভাষিক পরিচয়: ওয়াজিব বা আবশ্যক নয় এমন বিষয়কে নিজের জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যক করে নেওয়া

*

বি:দ্র: নযর বা মান্নতের প্রকার, শর্তসমূহ ও এর কাফফারা সংক্রান্ত মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা লেখকের কিতাবুত তাওহীদ নামক গ্রন্থে আসছে ইনশাআল্লাহ।

النذر (আন্-নযর) এর প্রকারভেদ:

১. আল্লাহর জন্য মানত করা

২. আল্লাত ব্যতীত অন্যের জন্য মানত করা

বিঃদ্রঃ লেখক (রহিমাহুল্লাহ) যে ইবাদতগুলোর বিবরণ দিয়েছেন তা সীমাবদ্ধতার জন্য নয় বরং উদাহরণস্বরূপ। কেননা আরো অনেক ইবাদত রয়েছে যা উল্লেখ করা হয়নি। মূল কথা হলো, যে ব্যক্তি এই ইবাদতগুলো বা অন্য যে কোন ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সম্পাদন করবে সে অবশ্যই শিরক করবে।

দ্বিতীয় মূলনীতি:

প্রমাণাদিসহ ইসলাম সম্পর্কে জানা।

আর দ্বীন-ইসলাম হচ্ছে, তাওহীদ বা এককত্ব ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ, অকুণ্ঠ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর আনুগত্য বরণ এবং শিরক ও মুশরিকদের থেকে মুক্ত থাকা।

বস্তুত দ্বীনের রয়েছে তিনটি স্তর :

(ক) ইসলাম

(খ) ঈমান

(গ) ইহসান

আবার প্রত্যেক স্তরের কিছু রুকন বা স্তম্ভ রয়েছে।

প্রথম স্তর: ইসলাম[১]

ইসলামের রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি:

১) আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা।[২]

২) সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করা

৩) যাকাত প্রদান করা

৪) রামাযান মাসের সাওম পালন করা

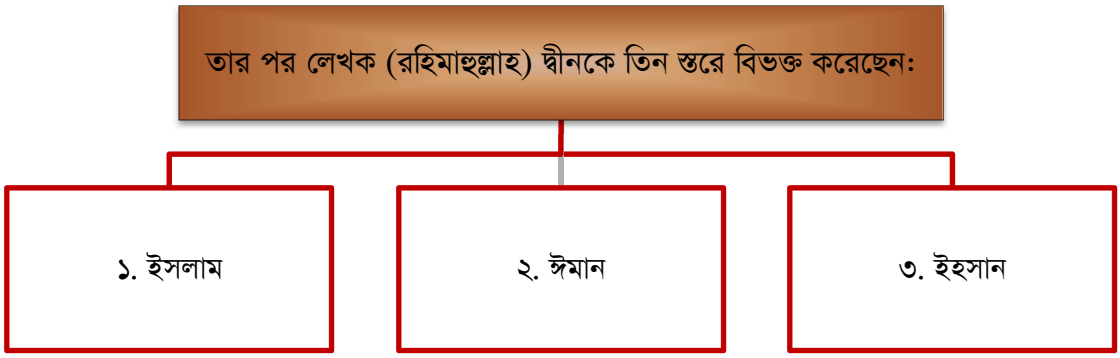
৫) আল্লাহর ঘর হারামে হজ্জ করা

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) দ্বিতীয় মূলনীতিটি ব্যাখ্যা করেছেন। আর তা হলো দ্বীন সম্পর্কে বান্দার জ্ঞানার্জন করা। এ ক্ষেত্রে তিনি ইসলামের পরিচয় দিয়ে শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন:

প্রথম স্তর: ইসলাম

ইসলামের পরিচয়: তাওহীদ বা এককত্ব ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ, অকুণ্ঠ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর আনুগত্য বরণ এবং শিরক ও মুশরিকদের থেকে মুক্ত থাকা

আর এটিই হচ্ছে ইসলামের পরিচয় যে, তুমি তোমার সকল কার্যাদিকে আল্লাহর জন্য সমর্পণ করবে। কেননা তুমি একজন দাস আর দাসের করণীয় হলো মালিকের জন্য আত্মসমর্পণ করা। মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ তা'আলা, যেমন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: السيد هو الله - আল্লাহই মালিক।



(২) ইসলামের রুকন বা স্তম্ভ পাঁচটি যার প্রথমটি হলো: الشهادة বা সাক্ষ্য প্রদান করা।

প্রথম রুকন বা স্তম্ভ: الشهادة বা সাক্ষ্য প্রদান করা এর পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী,

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

[ال عمران: ١٨]

অর্থ: ''আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই এবং ফিরিশতাবৃন্দ ও জ্ঞানবান ব্যক্তিগণও। আল্লাহ ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।'' (সূরা আলে-ইমরান:১৮)

এর অর্থ হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে একমাত্র তিনি আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইবাদতের ইলাহ নেই।

এর দু'টি দিক রয়েছে একটি নেতিবাচক, অপরটি ইতিবাচক। নেতিবাচক দিকটি হচ্ছে, لا إله বা কোনই মা'বুদ নেই, এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করা হয়েছে।

আর ইতিবাচক দিক হচ্ছে, إلا الله বা 'আল্লাহ ব্যতীত, এর দ্বারা ইবাদত দৃঢ়তার সঙ্গে একমাত্র আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর রাজত্বে যেমন কোনো অংশীদার নেই, তেমনি তাঁর ইবাদত ক্ষেত্রেও কোনো অংশীদার থাকতে পারে না।

এ তাওহীদ বা একত্ববাদের তাফসীর ও ব্যাখ্যা নিম্নের আয়াতটি স্পষ্ট করেছে। যেমন আল্লাহর বাণী,

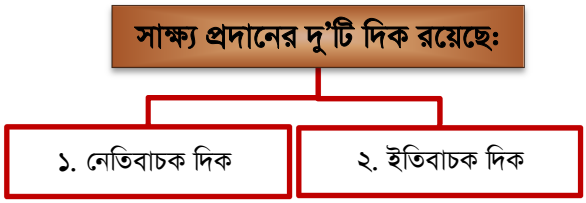
وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

[الزخرف: ٢٦، ٢٨]

অর্থ: ''আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম নিজ পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমরা যে সব মূর্তির পূজা অর্চনা করছ তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।[১] সম্পর্ক আছে তাঁরই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। এ ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গেছেন তার পরবর্তীদের জন্যে যাতে তারা (শিরক থেকে) প্রত্যাবর্তন করে।'' [২] (সূরা আয্-যুখরুফ: ২৬-২৮)

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) لا إله إلا الله এর সাক্ষ্য প্রদানের দলীল উল্লেখ করেছেন এবং এর অর্থ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

তা হলো, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই।



لا إله বা ''সত্য কোনো মা'বুদ নেই'' এটি হচ্ছে নেতিবাচক দিক।

আর إلا الله বা 'একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত' এটি হচ্ছে ইতিবাচক দিক।

সুতরাং إلا الله বা 'একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত' অংশটি সীমাবদ্ধতা ও ইতিবাচকের অর্থ প্রদান করছে। যেমনভাবে তা ইবাদতকে শুধু এক আল্লাহ তা'আলার জন্যই সীমাবদ্ধ ও সাব্যস্ত করছে এবং অন্যদের ক্ষেত্রে তা নাকচ করে দিচ্ছে।

এ জন্য লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যা তার ব্যাখ্যাকে নিম্নের আয়াতটি স্পষ্ট করে:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى [الزخرف: ٢٦]

অর্থ: ''আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম নিজ পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমরা যেসব মূর্তির পূজা অর্চনা করছ তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই ; সম্পর্ক আছে তাঁরই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।'' (সূরা আয্-যুখরুফ: ২৬)

(১) إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ এর অর্থ হচ্ছে لا إله বা সত্য কোনো মা'বুদ নেই।

(২) إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى অর্থাৎ إلا الله বা ''একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত,।

অনুরূপ আল্লাহর অপর বাণী,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [ال عمران: ٦٤]

অর্থ: ‘‘বল হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক বাণীর প্রতি আস যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান। আর তা হচ্ছে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবো না, আমরা কোনো কিছু তাঁর শরীক গণ্য করব না। আর আমরা আল্লাহকে ছেড়ে একে অপরকে কস্মিনকালেও রব বলে গ্রহণ করব না, কিন্তু তারা যদি এতে পরাম্মুখ হয়, তাহলে তোমরা (আহলে কিতাবদের) বলে দাও জেনে রেখ, আমরা হচ্ছি আল্লাহতে আত্মসমর্পিত মুসলিম।’’ (১)
(সূরা আলে-ইমরান: ৬৪)

* কেউ যদি বলে যে, সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হলো: আল্লাহ ব্যতীত মা‘বুদ নেই?

তাহলে আমরা বলবো এ কথাটি অগ্রহণযোগ্য। কেননা এ কথাটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য সমস্ত মা‘বুদকে সত্যায়ণ করছে। কিন্তু যখন بحق বা সত্য শব্দটি বলবে তখন এটি প্রমাণ করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত যে সব মা‘বুদের ইবাদত করা হয় সে তা অস্বীকার করছে এবং সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা‘বুদ নেই।

* কেউ যদি বলে, لا إله إلا الله এর অর্থ আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো প্রতিপালনকারী নেই|

তাহলে আমরা তার উত্তরে বলবো: এটি গ্রহণযোগ্য কথা। কিন্তু সেটি لا إله إلا الله এর ব্যাখ্যা নয় বরং সেটি তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ। কেননা রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যেসকল কাফেরদের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছিল তারা এটি স্বীকার করেছিল কিন্তু এটি তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করাতে পারেনি।

(১) قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ - এই আয়াতটি ধর্মসমূহের সমন্বয় বাতিলের উপর প্রমাণ করে।

আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, এ সাক্ষ্যের স্বপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ [التوبة: ١٢٨]

অর্থ: ‘‘অবশ্যই তোমাদের কাছে সমাগত হয়েছেন তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল যাঁর পক্ষে দূর্বহ ও অসহনীয় হয়ে থাকে তোমাদের দুঃখকষ্টগুলো, যিনি তোমাদের প্রতি সদা সচেতন, মু‘মিনদের প্রতি যিনি চির স্নেহশীল ও দয়াবান।’’ (১) (সূরা আৎ-তাওবাঃ ১২৮)

আর মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে,

১. তিনি যা আদেশ করেছেন তা অনুসরণ করা।

২. তিনি যে বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন তা সত্য বলে স্বীকার করা।

৩. তিনি যা থেকে সতর্ক করেন তা বর্জন করা এবং

৪. কেবল তার প্রবর্তিত শরীয়াত অনুযায়ীই আল্লাহর ইবাদত করা।(২)

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এ আয়াতটি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এর সাক্ষ্য প্রদানের দলীলস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ তা‘আলা উক্ত আয়াতে সাক্ষ্য প্রদানে তিনটি তা‘কীদ বা গুরুত্ব ব্যবহার করেছেন-

১. উহ্য কসম বা শপথ

২. لام - লাম হরফের মাধ্যমে তা‘কীদ

৩. قد -ক্বদ হরফের মাধ্যমে তা’কীদ

(২) মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ বর্ণনা করেছেন। আর এ সাক্ষ্যকে বাস্তবরূপ দানে মুসলিম প্রত্যেক নর-নারীর উপর আবশ্যক হলো: তিনি যা আদেশ করেছেন তা অনুসরণ করা, তিনি যে বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন তা সত্য বলে স্বীকার করা ও তিনি যা থেকে নিষেধ ও ধমক দিয়েছেন তা বর্জন করা এবং কেবল তাঁর প্রবর্তিত শরীয়াত অনুযায়ীই আল্লাহর ইবাদত করা।

নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এর মৌলিক অর্থ হলো: তিনি একজন বান্দা, সুতরাং তাঁর ইবাদত করা যাবে না । তিনি একজন রাসূল, সুতরাং তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে না।

আর এর ব্যাখ্যা মূলক অর্থ হলো:

১. তিনি যা আদেশ করেছেন তা অনুসরণ করা। কেননা তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে বাণী প্রচারক।	২. তিনি যে বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন তা সত্য বলে স্বীকার করা। কেননা তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন সত্যবাদী যাঁকে সত্যবাদী বলা হয়েছে।	৩. তিনি যা থেকে নিষেধ ও ধমক দিয়েছেন তা হতে বিরত থাকা এমনভাবে যে, তিনি যা থেকে বারণ করেছেন তা এক পার্শ্বে রাখবে এবং তুমি অন্য পার্শ্বে অবস্থান করবে।	৪. কেবল তাঁর প্রবর্তিত শরীয়াত অনুযায়ীই আল্লাহর ইবাদত করা। আর এটিই বিদআতীদের প্রতিবাদ করে।

আর সালাত, যাকাতের প্রমাণ এবং তাওহীদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লাহর বাণী,

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ [البينة: ٥]

অর্থ: ''তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সলাত কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম।'' [১] (সূরা আল-বাইয়্যেনাহঃ ৫)

সাওমের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ [البقرة: ١٨٣]

অর্থ: ''হে মু'মিনগণ, সিয়াম সাধনা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার।'' [২] (সূরা আল-বাকারা, ১৮৩)

হজ্জের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ [ال عمران: ٩٧]

অর্থ: ''আর আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে সফরের সামর্থ রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে কা'বাগৃহের হজ্ব করা ফরয, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি এ আদেশ অমান্য করে তা হলে (জেনে রাখ) আল্লাহ সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।'' [৩] (সূরা আলে-ইমরান: ৯৭)

(১) দ্বিতীয় স্তম্ভ : সলাত

সলাতের পরিচয়: তা হলো কতক কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা যা তাকবীর দিয়ে শুরু হয়ে সালামের মাধ্যমে শেষ হয়। এটিই দ্বীনের খুঁটি। মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সরাসরি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি মি'রাজের রজনীতে ফরয করা হয়েছে।

তৃতীয় স্তম্ভ: যাকাত

যাকাতের শাব্দিক পরিচয়: বৃদ্ধি করা ও পবিত্র করা।

ইহা দুই প্রকার:

১. শরীরের যাকাত।

২. মাল বা সম্পদের যাকাত।

(২) চতুর্থ স্তম্ভ: সিয়াম বা রোযা

সিয়ামের শাব্দিক পরিচয়: বিরত থাকা।

পারিভাষিক পরিচয়: সুবেহ সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে যাবতীয় রোযা ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থেকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা।

সিয়াম একটি উত্তম ইবাদত, কেননা তাতে ধৈর্য্যের তিনটি বিষয় রয়েছে। ইহার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সিয়াম পালনকারীকে তার প্রতিদান দিবেন।

(৩) পঞ্চম স্তম্ভ: হাজ্জ

হাজ্জের শাব্দিক পরিচয়: ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা।

পারিভাষিক পরিচয়: মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পদ্ধতি অনুযায়ী হাজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা।

এটা সামর্থবান ব্যক্তিদের উপর জীবনে একবার আদায় করা ফরয।

দ্বিতীয় স্তর: ঈমান

দ্বিতীয় স্তর: ঈমান

ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তরেরও অধিক। এর মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে, ''লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' মুখে উচ্চারণ করা। আর সর্বনিম্ন হচ্ছে পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরে সরিয়ে দেয়া, আর লজ্জাশীলতা হচ্ছে, ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে একটি শাখা।

তবে ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে ছয়টি:

(১) আল্লাহর উপর ঈমান
(২) ফেরেশতাগণের উপর ঈমান
(৩) আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান
(৪) রাসূলগণের উপর ঈমান
(৫) শেষ দিবসের উপর ঈমান
(৬) তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান

এ **ছয়টি রুকনের দলীল** হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ [البقرة: ١٧٧]

অর্থ: ''তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে এতে কোনোই পুণ্য ও কল্যাণ নেই। বরং পুণ্য হচ্ছে যে ব্যক্তি আল্লাহ, শেষ দিবস, ফিরিশতাকুল, কিতাবসমূহ ও নাবীগণের উপর ঈমান আনয়ন করে।'' (সূরা আল-বাকারাহ, ১৭৭)

আর **তাকদীর** এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ [القمر: ٤٩]

অর্থ: ''নিশ্চয় আমরা প্রতিটি জিনিসের তাকদীর নির্ধারণ করে সৃষ্টি করেছি।'' (সূরা আল-কামার, ৪৯)

ঈমানের শাব্দিক পরিচয়: দৃঢ়ভাবে স্বীকৃতি দেয়া।

পারিভাষিক পরিচয়: মুখে উচ্চারণ করা, অন্তরে বিশ্বাস করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমলে বাস্তবায়ন করা।

আনুগত্যের দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং অবাধ্য কাজের কারণে ঈমান হ্রাস পায়।

ঈমানের পারিভাষিক পরিচয়ে পাঁচটি বিষয় থাকা আবশ্যক। যখন পাঁচটি বিষয়ের কোন একটি পাওয়া না যায় তাহলে তখন আহলে সুন্নাহ ও জামা'আতের নিকট তা ঈমানের পরিচয় থেকে বের হয়ে যায়।

উক্ত পাঁচটি বিষয়ের প্রমাণ কী?

উত্তর: রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে, ''লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' মুখে উচ্চারণ করা। এটা মুখে উচ্চারণের দলীল।

আর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরে সরিয়ে দেয়া। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের দলীল।

আর লজ্জাশীলতা হচ্ছে অন্তরের আমলের দলীল।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী: أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا [التوبة: ١٢٤]

অর্থ: তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করলো? (সূরা আত-তাওবাহ:১২৪)

এটি প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় ঈমান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ঈমান যখন বৃদ্ধি হয় তা অবশ্যই হ্রাসও পায়। ঈমান কমে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা এসেছে। যেমন তিনিবলেছেন: অর্থ: আমি হ্রাস পাওয়া বিষয়গুলোর মধ্যে দেখতে পায় (মানুষের) বিবেক ও ঈমান। সুতরাং দ্বীন হ্রাসই পায়। মহিলাদেরকে বিবেক ও দ্বীনের দিক দিয়ে হ্রাস হতে দেখেছি।

ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ ছয়টি:

- (১) আল্লাহর উপর ঈমান
- (২) ফেরেশতাগণের উপর ঈমান
- (৩) আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান
- (৪) রাসূলগণের উপর ঈমান
- (৫) শেষ দিবসের উপর ঈমান
- (৬) তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান

প্রথম রুকন বা স্তম্ভ: আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, এক্ষেত্রে চারটি বিষয় থাকা আবশ্যক:

- ১. আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান আনা। এটি আবার চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে হয়ে থাকে:
  - ক. বিবেকের মাধ্যমে: সুতরাং অনুধাবন করবে যে, সৃষ্টি কর্তা ব্যতীত সৃষ্টি জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব। যেমন আল্লাহর বাণী: خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ [الطور: ٣٥]

    অর্থ: তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (সূরা আল-তুর:৩৫)
  - খ. অনুভূতির মাধ্যমে: বিপদে তুমি তোমার দু'হাতকে আকাশের দিকে উত্তোলন করবে এবং বলবে: হে আল্লাহ কেবল তুমিই এ বিপদ থেকে মুক্তি দিতে পারো। তুমি দেখতে পাও যে, আল্লাহই তোমাকে এ বিপদ হতে উদ্ধার করেন।
  - গ. ফিতরাতের মাধ্যমে: প্রত্যেকটি সন্তান তার মূল ফিতরাতের (তাওহীদ) উপর জন্ম লাভ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে হয়তো ইয়াহুদী বা খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়।
  - ঘ. শরীয়তের মাধ্যমে :ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত তাওহীদ বা এককত্বের প্রমাণ।
- ২. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এর প্রতি ঈমান আনা
- ৩. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ এর প্রতি ঈমান আনা
- ৪. তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত এর প্রতি ঈমান আনা

দ্বিতীয় রুকন বা স্তম্ভ: ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা

ফেরেশতাদের পরিচয়: তারা অদৃশ্য সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। তারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে কিন্তু তারা কক্ষনো তাঁর অবাধ্য হয় না। তাদের :

ক. রূহ বা আত্মা রয়েছে : روح القدس বা পবিত্র আত্মা।

খ. শরীর রয়েছে : جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُو۟لِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۚ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ [الفاطر: ١]

অর্থ: ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক, তারা দুই দুই, তিন তিন, চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। (সূরা আল-ফাতির:১)

গ. বিবেক-বুদ্ধি ও অন্তর রয়েছে: حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ [السبا: ٢٣]

অর্থ: যখন তাদের অন্তর হতে ভয়-ভীতি দূর করা হবে, তখন তারা পরস্পরে বলবে, তোমাদের প্রতিপালক কী বললেন? (সূরা আল-সাবা:২৩)

আমরা ঈমান আনবো:

ক. তাদের উপর যাদের নাম আমাদেরকে জানানো হয়েছে। (যেমন: জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফিল (আলাইহিমুস সালাম)।

খ. তাদের বৈশিষ্ট্যের উপর। لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم: ٦]

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তারা তা অমান্য করে না, এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তারা করে। (সূরা আত-তাহরীম:৬)

গ. তাদের কার্যাদির উপর। তাদের কার্যসমূহের একটি হলো: আরশ বহন করা।

ঘ. তাদের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত যেসকল সংবাদ এসেছে তার উপর।

তৃতীয় রুকন বা স্তম্ভ: কিতাবের প্রতি ঈমান আনা

আমাদের উপর একথা বিশ্বাস করা অপরিহার্য যে, প্রকৃতপক্ষে কিতাবসমূহ আল্লাহর বাণী। সেগুলো অবতীর্ণ বাণী কিন্তু সৃষ্টি নয়। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক রাসূলের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আমরা উক্ত বিষয়ে এবং যে সমস্ত কিতাবের নাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন সেগুলোর বিধি-বিধানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো যতক্ষণ পর্যন্ত তা রহিত করা না হয়। আর আমরা একথা বিশ্বাস করবো যে, নিশ্চয় কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে মানসুখ করে দিয়েছে। যেমন: তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর এবং ইবরাহীম ও মূসা (আলাইহিমুস সালাম)-এর সহীফাসমূহ ।

চতুর্থ রুকন বা স্তম্ভ: রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা

আমাদের করণীয় হলো একথা বিশ্বাস করা যে, তাঁরা সকলেই মানব। তাঁদের কোন প্রতিপালনের বৈশিষ্ট্য বা ক্ষমতা নেই। তারা আল্লাহ তা'আলার বান্দা। তাঁদের ইবাদত করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলাই তাঁদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের নিকট অহী অবতীর্ণ করেছেন। তাঁদেরকে বিভিন্ন নিদর্শন দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। তাঁরা আমানত আদায় করেছেন এবং উম্মাতকে নসিহত করেছেন ও তাঁদের নিকট বাণী পৌছিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর পথে সত্যিকার জিহাদ করেছেন। আমরা তাঁদের প্রতি ঈমান আনবো এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁদের যে নাম, আকার-আকৃতি ও খবর সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন সেক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে ঈমান আনয়ন করবো। আদম (আলাইহিস সালাম) প্রথম নাবী। নূহ (আলাইহিস সালাম) প্রথম রাসূল । মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

শেষ নাবী ও রাসূল । মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শরীয়তের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল শরীয়ত মানসুখ (রহিত) হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মর্যাদাসম্পন্ন পাঁচজন (নাবী ও রাসূল) যাদের নাম সূরা শূরা ও আহযাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

১. মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
২. নূহ (আলাইহিস সালাম)।
৩. ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)।
৪. মূসা (আলাইহিস সালাম)।
৫. ঈসা (আলাইহিস সালাম)।

পঞ্চম রুকন বা স্তম্ভ: কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনা

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামত দিবস সম্পর্কে যে সমস্ত খবর দিয়েছেন যা মৃত্যুর পর ঘটবে সবগুলোই ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। যেমন: কবরের পরীক্ষা, শিংগায় ফুৎকার দেয়া, কবর হতে মানুষকে উত্তোলন, দাঁড়িপাল্লা স্থাপন, আমলনামা প্রদান,পুলসিরাত, হাওযে কাওছার, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামতের দিন আল্লাহকে মু'মিনদের দর্শন লাভ এবং অদৃশের অন্যান্য বিষয়াবলী।

ষষ্ঠ রুকন বা স্তম্ভ: ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা

ঈমানের এ রুকনটি চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার সঙ্গে সম্পৃক্ত:

১. العلم- জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। তা হলো: একথা বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি বস্তুর ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন।

২. الكتابة- লিপিবদ্ধতার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। তা হলো: এ কথা বিশ্বাস করা যে, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যা ঘটবে মহান আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেকটি বিষয়ের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

৩. المشيئة- ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। তা হলো: এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয় এবং যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না। বান্দারও ইচ্ছা রয়েছে কিন্তু তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অধীন।

৪. الخلق- সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। তা হলো: এ কথা বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় বান্দা ও বান্দার যাবতীয় কার্যাবলীর সবগুলোই সৃষ্ট। অনুরূপভাবে সমস্ত সৃষ্টি। তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ [الصفات: ٩٦]

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আল-সফফাত:৯৬)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصفات: ٩٦]

অর্থ: আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আস-সফফাত:৯৬)

তৃতীয় স্তরঃ ইহসান

ইহসান-এর স্তম্ভ মাত্র একটি, আর তা হচ্ছে

‘‘তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যে তুমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তবে এ কথা মনে করবে যে, নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন।’’

ইহসানের প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ [النحل: ١٢٨]

অর্থ: ‘‘নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও ইহসান অবলম্বন করে, আল্লাহ (জ্ঞানে এবং সাহায্য-সহযোগিতায়) তাদের সঙ্গে রয়েছেন।" (সূরা আন্-নাহল, ১২৮)

অনুরূপ আল্লাহর বাণী,

وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢١٧ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٨ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّٰجِدِينَ ٢١٩ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ [الشعراء: ٢١٧، ٢٢٠]

অর্থ: ‘‘আর ভরসা কর সেই পরাক্রান্ত ও দয়াবানের উপর, যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (রাতে সলাতের জন্য) দাঁড়াও আর যখন তুমি সিজদাকারীদের সঙ্গে উঠাবসা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আশ্-শু‘আরা, ২১৭-২২০)

তদ্রূপ আল্লাহর অপর বাণী,

وَمَا تَكُونُ فِي شَأۡنٖ وَمَا تَتۡلُواْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ وَلَا تَعۡمَلُونَ مِنۡ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إِذۡ تُفِيضُونَ فِيهِۚ [يونس: ٦١]

অর্থ: ‘‘এবং তুমি (হে রাসূল) যে কোনো পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান কর না কেন, আর সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা কিছু তিলাওয়াত কর না কেন এবং তোমরা যে কোনো কর্ম সম্পাদন কর না কেন আমরা সে সবের পূর্ণ পর্যবেক্ষক হয়ে থাকি; যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও।" (সূরা ইউনুস, ৬১)

তৃতীয় স্তর: ইহসান

এটি দ্বীনের সর্বোচ্চ স্তর। তার এমন একটি স্তম্ভ রয়েছে যার দু'টি স্তর আছে:

১. চাক্ষুষ ইবাদত। তা হলো: আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভালাবাসা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ইবাদত করা। যেমন নাবী-রাসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) ইবাদত। তবে এ স্তরে অন্যদের পৌছার সম্ভাবনা রয়েছে।

২. মুরাকাবার ইবাদত। তা হলো: ভয় ও ভীতির সাথে ইবাদত করা। এ স্তর হতে কোন মুসলিম বের হতে পারবে না । (অর্থাৎ এটি ইবাদতের সর্বনিম্ন স্তর)।

* বিঃদ্রঃ- এটির অর্থ এই নয় যে, এ স্তরের লোকের নিকট শুধু আল্লাহর ভালবাসা রয়েছে, তার কাছে আল্লাহর ভয় নেই। তবে এ স্তরের বান্দারা ইবাদতের জন্য সর্বাধিক মনোযোগী হয়ে থাকে । আর এটিই হচ্ছে আল্লাহর ভালবাসা। যেমন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না।

এ সম্পর্কে হাদীসের প্রমাণ হচ্ছে জিবরীল আলাইহিস্ সালাম -এর এ সুপ্রসিদ্ধ হাদীস যা ওমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: ''একবার আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বসা ছিলাম এমতাবস্থায় সেখানে মিশমিশে কালকেশও ধবধবে সাদা পোষাক পরিহিত একজন মানুষ এসে উপস্থিত হলেন। ভ্রমণের কোনো নিদর্শনই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল না, আর আমাদের কেউ তাকে চিনেও না। অতঃপর তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং হস্তদ্বয় তাঁর উরুদেশে রাখলেন এরপর বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করুন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ইসলাম হচ্ছে, এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল। সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযান মাসের সাওম পালন করা এবং সামর্থ্য থাকলে আল্লাহর ঘরে হজ্জ করা।

আগন্তুক বললেন: আপনি ঠিক বলেছেন। এতে আমরা আশ্চর্য হলাম যে, তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করছেন আবার নিজেই তার সত্যায়ন করছেন।

অতঃপর তিনি বললেন: আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: (ঈমান হলো) আল্লাহ, ফিরিশতাকুল, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনয়ন করা। আগন্তুক বললেন: আপনি ঠিক বলেছেন।

এরপর আগন্তুক বললেন: আমাকে ইহসান সম্পর্কে সংবাদ দিন। উত্তরে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: যখন তুমি ইবাদতে লিপ্ত হবে, তখন তুমি যেন আল্লাহকে দেখছ একথা মনে করবে, আর যদি এটা সম্ভব নাও হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।

অতঃপর আগন্তুক বললেন: ''আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক জানে না।

এরপর আগন্তুক বললেন, তাহলে আমাকে কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে জানান। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন,

যখন দাসী স্বীয় মালিকের জন্ম দেবে, নগ্নদেহ ও নগ্নপদবিশিষ্ট ও জীর্ণ-শীর্ণ পোষাক পরিহিত ছাগলের রাখালরা সুউচ্চ অট্টালিকা তৈরী করবে।

হাদীস বর্ণনাকারী বললেন: আগন্তুক পরক্ষণেই প্রস্থান করলেন এরপর আমরা কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ থাকলাম। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে উমর, তুমি কি জান প্রশ্নকারী কে ছিলেন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তিনি হচ্ছেন জিবরীল, তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা প্রদানার্থে তোমাদের কাছে এসেছিলেন।'' (বুখারী- হাদীস নং ৫০ মুসলিম- হাদীস নং ৮)

এ হাদীসটি ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের প্রমাণ। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির চেয়ে জিজ্ঞাসাকারী কিয়ামতের ব্যাপারে ভাল জানেন। এ উক্তিটি প্রমাণ করে যে, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের সময় সম্পর্কে কেবল আল্লাহই জানেন।

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উক্তি: দাসী তার মুনিবকে প্রসব করবে এর অর্থ হলো:

১. অবাধ্যতা বেড়ে যাবে,
২. দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে,
৩. অবস্থার পরিবর্তন হবে,
৪. বাদশা বিবাহ করবে দাসীকে।

তারপর ঐ দাসী ছেলে জন্ম দিবে এবং এ ছেলেটি তার পিতার মৃত্যুর পর বাদশা হবে এবং সে তার মাতার মালিক হবে।

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: و أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان) আপনি দেখতে পাবেন, নগ্নদেহ ও নগ্নপদবিশিষ্ট ও জীর্ণ-শীর্ণ পোষাক পরিহিত ছাগলের রাখালরা সুউচ্চ অট্টালিকা তৈরী করবে।

الحفاة শব্দের অর্থ: নগ্নপদবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

يتطاولون في البنيان অর্থাৎ: মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হবে। দরিদ্ররা সীমাতীত ধনাঢ্যতার অধিকারী হবে।

হাদীসে জিবরীল হতে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

(১) ছাত্রদের উপর করণীয় হলো ৬টি অধিকার রক্ষা করা:

১. নিজের হক্ব রক্ষা করা ২. শিক্ষকের হক্ব রক্ষা করা ৩. স্বীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হক্ব রক্ষা করা ৪. সহপাঠীদের হক্ব রক্ষা করা ৫. কিতাবের হক্ব রক্ষা করা ৬. অর্জিত বিদ্যার হক্ব রক্ষা করা।

১. নিজের হক্ব রক্ষা করা:

জ্ঞানার্জন করা একটি ইবাদত (সুতরাং এক্ষেত্রেও নিয়তকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করা ও রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর অনুসরণ করা আবশ্যক)। তুমি আত্ম-প্রচেষ্টা, ভয়, সম্পর্ক স্থাপন, বিনয় নম্রতা ও অহংকার পরিহারে সালাফী (পূর্বসূরীদের অনুসারী) হয়ে যাও।

ছাত্রের আরো করণীয় হলো: অল্পে সন্তুষ্ট থাকা ও ইবাদতে মনোযোগী হওয়া, জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হওয়া, মহত্ব অর্জন করা, সাহসীদের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হওয়া, বিলাসিতা পরিত্যাগ করা, খেল-তামাশা হতে দূরে থাকা, দয়শীল হওয়া, ও প্রমাণাদীসহ সত্যের উপর অবিচল থাকা।

ছাত্রের আরো করণীয় হলো: জ্ঞান অন্বেষণে দৃঢ় বিশ্বাসী ও আশাবাদী হওয়া। জ্ঞান অন্বেষণের শর্ত হলো: ভ্রমণ করা, ভালভাবে মুখস্থ করা, মুখস্থ বিদ্যা যত্নসহকারে ধরে রাখা।

মূলনীতির উপর বিভিন্ন বিষয়ে তাখরীজ (শুদ্ধতা যাচাই) করার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করা,আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা, ইলমি আমানত ঠিক রাখা ও সত্য বলা।

অজানা বিষয়ে 'আমি জানি না' একথা বলা, এটি হচ্ছে ছাত্রের ঢাল, সময়ের সৎ ব্যবহার করাই হলো মূলধন সংরক্ষণ করা, বিভিন্ন লোভ-লালসা হতে আত্মাকে ধরে রাখাই হলো মূল শিক্ষার পরিচয়।

আদবের সাথে প্রশ্ন করার পর মনোযোগসহকারে উত্তর শ্রবণ করা, তারপর উপলব্ধি করা অতঃপর আমলে বাস্তবায়ন করা, কাউকে হারিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মুনাযারা (বিতর্ক) না করা, বিদ্যা চর্চা করা। কুরআন, হাদীস এবং এই সংক্রান্ত বিষয়ের গবেষণা করা, প্রত্যেকটি বিষয় পরিপূর্ণভাবে জানা।

বেশি বেশি আমল করা এবং নেতৃত্ব, প্রসিদ্ধিতা ও দুনিয়া পাওয়ার আশা না করা, নিজের ক্ষেত্রে কু-ধারণা করা এবং অন্যের ক্ষেত্রে সু-ধারণা করা।

জ্ঞানের যাকাত হচ্ছে: সত্যকে আঁকড়ে ধরা, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করা, ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করা, জ্ঞানের প্রচার করা, মানুষের উপকারে অনুরাগী হওয়া, পরিশ্রম করা, ভাল কাজে মুসলমানদের জন্য সুপারিশ করা।

মর্যাদাবান হওয়া, বিদ্যা পরিচর্যা করা, সৎ চরিত্রবান হওয়া ও অসৎ চরিত্র পরিহার করা, কোমল আচরণের অধিকারী হওয়া, চাটুকার না হওয়া, প্রতিযোগিতামূলক বিদ্যার্জন ও পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনের পূর্বে নিজেকে আত্ম-প্রকাশ করা হতে বিরত থাকা। আলেম-উলামাদের মতানৈক্য ও সন্দেহমূলক বিষয় পরিহার করা। দলগত, জাতিগত সমস্ত সংশয়কে প্রতিরোধ করা।

২. শিক্ষকের হক্ব রক্ষা করা:

এক্ষেত্রে জনগণ দু' ভাগে বিভক্ত:

ক. কিছু লোক দু' প্রান্তবর্তী।

খ. কিছু লোক মধ্যম পন্থী।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শিরক চালু হয়েছিল সৎ বান্দাদের ব্যাপারে সন্দেহমূলক বিষয় নিয়ে অতিরঞ্জিত করার মাধ্যমে। সুতরাং আমাদের করণীয় হলো সৎ বান্দাদের ব্যাপারে মধ্যম পন্থী হওয়া, তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা। এ ব্যাপাটি পরবর্তী আলোচনায় আসছে।

৩. স্বীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হক্ব রক্ষা করা।

৪. সহপাঠীদের হক্ব রক্ষা করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [آل عمران: ١١٠]

অর্থ: তোমরাই হচ্ছো উত্তম জাতি যাদেরকে মানব জাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে অন্য ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

৫. কিতাবের হক্ব রক্ষা করা:

তা হলো কিতাব সংরক্ষণের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবের মাধ্যমে আমাদেরকে নি'য়ামত দান করেছেন, সুতরাং কিতাবকে সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

৬. অর্জিত বিদ্যার হক্ব রক্ষা করা:

তা হলো ইলমকে ধরে রাখা এবং সর্বদায় তা পাঠ করা ও উক্ত ইলম অনুযায়ী আমল করা। অতঃপর মানুষকে তার দিকে দাওয়াত দেয়া। কেননা এটা নি'য়ামত, আর নি'য়ামতের শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। এটি একটি বড় নি'য়ামত। সুতরাং এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক।

(২) প্রশ্ন করার আদব হচ্ছে, এমন প্রশ্ন করা যেসকল প্রশ্নে উপকার ও ফায়েদা রয়েছে ।

(৩) ছাত্রের কর্তব্য হলো তার উত্তম চরিত্রের উপর অবিচল থাকা।

(৪) রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পরে '' الله و رسوله أعلم '' বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাল জানেন, এ কথা বলা যাবে না বরং শুধু বলতে হবে: ''الله أعلم'' বা আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

তৃতীয় মূলনীতি: নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে জানা

তৃতীয় মূলনীতি হচ্ছে নাবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে জানা। তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালেব ইবনে হাশেম। হাশেম কুরাইশ বংশ থেকে আর কুরাইশ হলো আরব গোষ্ঠী । এ গোষ্ঠী ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র ইসমাইলের বংশধর (আলাইহিমুস সালাম)।

তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় জন্ম লাভ করেন। তিনি তেষট্রি (৬৩) বছর জীবিত ছিলেন, নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর এবং ''নাবী ও রাসূল'' হিসেবে তেইশ বছর (অতিবাহিত করেছেন)।

তাকে সূরা ''ইকরা'' নাযিল করার মাধ্যমে নাবী এবং সূরা মুদ্দাসসির নাযিল করার মাধ্যমে রাসূল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি (জন্ম লাভ করেন) মাক্কাতে তার পর হিজরত করেন মাদীনাতে।

এ অনুচ্ছেদটিতে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনী সম্পর্কিত বিষয়াবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ রয়েছে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নাম,বংশ পরিচয়, বয়স এবং তাঁর দাওয়াত প্রচার সম্পর্কে।

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কতিপয় বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানা আবশ্যক

- ১. নাম ও বংশ পরিচয়: তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালেব ইবনে হাশেম। হাশেম কুরাইশ বংশ থেকে এবং এটি আরব কওম ও গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী। এ গোষ্ঠী ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র ইসমাইলের (আলাইহিমুস সালাম) বংশধর।
- ২. বয়স: তাঁর (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মোট বয়স ছিল ৬৩ বছর। এর মধ্যে ৪০ বছর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব জীবন এবং ২৩ বছর নবুওয়াতী জীবন।

তাঁর (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াতী জীবন দু' ভাগে বিভক্ত:

- ১. মাক্কী জীবন ১৩ বছর
- ২. মাদানী জীবন ১০ বছর

প্রশ্ন: মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাবী নাকি রাসূল ছিলেন?

উত্তর: তিনি নাবী ও রাসূল উভয়টি ছিলেন। সূরা ইকরা নাযিল করার মাধ্যমে 'নাবী' এবং সূরা মুদ্দাসসির নাযিল করার মাধ্যমে 'রাসূল' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

শিরক থেকে সতর্ক করার জন্য এবং তাওহীদ তথা আল্লাহর এককত্ব প্রচারের জন্য আল্লাহ তাঁকে (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরণ করেন।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤ وَٱلرُّجۡزَ ٥ فَٱهۡجُرۡ ٦ وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ ٧ وَلِرَبِّكَ فَٱصۡبِرۡ [المدثر: ١، ٧]

অর্থ: ''হে কম্বলে দেহ আবৃতকারী! উঠে দাঁড়াও, সকলকে সতর্ক কর ও নিজ রবের মহিমা ঘোষণা কর। বস্ত্রসমূহ পাক-সাফ রাখ, শির্কের কদর্যতাকে সম্পূর্ণ বর্জন কর, বিনিময় লাভের আশায় ইহসান করো না। আর নিজ প্রভুর(আদেশ পালনে) ধৈর্য ধারণ কর।'' (সূরা আল- মুদ্দাসসিরঃ ১-৭)

এখানে

قُمۡ فَأَنذِرۡ [المدثر: ٢]

অর্থ: ''উঠে দাঁড়াও ও সতর্ক কর।'' (সূরা আল মুদ্দাসিসর:২)

এর অর্থ, শিরক হতে সতর্ক করবে এবং তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানাবে।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ [المدثر: ٣]

অর্থ:''আর তোমার রবের মহিমা ঘোষণা কর।'' (সূরা আল মুদ্দাসিসর:৩)

এর অর্থ তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রচার কর।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ [المدثر: ٤]

অর্থ: ''আর তোমার পোষাক পরিচ্ছদ পাক-সাফ রাখ।''(সূরা আল মুদ্দাসিসর:৪)

এর অর্থ ''আমলসমূহ'কে শির্কের কলুষ কালিমা থেকে পবিত্র রাখ।

وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ [المدثر: ٥]

অর্থ: ''আর কদর্যতা বর্জন কর।''(সূরা আল মুদ্দাসিসর:৩)

এর মধ্যে রুজয, এর অর্থ প্রতিমা আর 'হাজর' এর অর্থ ছেড়ে দেয়া। সুতরাং আয়াতের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে, প্রতিমা পূজা ও পূজকদের ত্যাগ করা, প্রতিমা থেকে সম্পর্কচ্যুতি এবং পূজকদের সাথে সম্পর্ক করা থেকে দূরে বহু দূরে অবস্থান করা।

তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দশ বছর ধরে এ তাওহীদের দিকেই মানুষদের আহ্বান জানিয়েছেন। তারপর তাকে আসমানে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। অতঃপর মক্কা ভূমিতে তিন বছর উক্ত সালাত সম্পাদনের পর আল-মদীনায় হিজরত করার আদেশপ্রাপ্ত হন।

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনী:

মাক্কী জীবনে দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল তাওহীদ সংক্রান্ত। আর তা হলো শিরককে বর্জন করা এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদতকে একনিষ্ঠ করা। এই দাওয়াতের সময় ছিল ১০ বছর।

অতঃপর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মাদীনায় হিজরত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। সেখানেও দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল তাওহীদ। তবে সেখানে দ্বীনের অবশিষ্ট ইবাদত সমূহ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পার্থিব জীবন যাপনের বিভিন্ন নিয়মাবলী দাওয়াতের সাথে সংযুক্ত হয়।

সুতরাং তাঁর (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাওয়াতী জীবন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সম্পূর্ণ দাওয়াত ছিল তাওহীদের উপর। আর এটিই ঐ সকল লোকদের বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে যারা মানুষকে তাওহীদ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে অনুৎসাহিত করে এবং দাবি করে যে, তাওহীদ শিক্ষার্জন করতে হয় শুধুমাত্র কিছু সময়ের জন্য।

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এর উক্তি: মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে (মি'রাজের রজনীতে) আকাশে উঠানো হয়েছিল। একথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে-

১. রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অদৃশ্যের যেসব সংবাদ দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে আমরা বলবো:- আমরা ঈমান আনলাম, সত্য বলে স্বীকার করলাম ও আত্মসমর্পণ করলাম।

২. পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সলাতের গুরুত্ব, কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা তা আকাশে ফরজ করেছেন।

হিজরতের পরিচয়:

হিজরতের অর্থ: শিরক-কলুষিত দেশ পরিত্যাগ করে ইসলামী দেশে গমন করা। এ উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মদীয়া) জন্য শিরক-কলুষিত স্থান থেকে ইসলামী রাজত্বে হিজরত করা ফরয। এ হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত থাকবে।

এর স্বপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء: ٩٧، ٩٩]

অর্থ: ''নিশ্চয় যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের জান (রূহ) কবয করার সময় ফিরিশতাগণ বলবে, কী অবস্থায় তোমরা ছিলে? তারা বলবে, আমরা পৃথিবীতে ছিলাম অসহায় অবস্থায়। ফিরিশতাকুল বলবেন: আল্লাহর দুনিয়া কি এতটা প্রশস্ত ছিলনা যাতে তোমরা হিজরত করতে পারতে? অতএব এরা হচ্ছে সেইসব লোক যাদের শেষ আশ্রয় হবে জাহান্নাম। আর এ হচ্ছে নিকৃষ্টতম আশ্রয়স্থল। কিন্তু যেসব আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এমনভাবে অসহায় হয়ে পড়ে যে, কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে তারা সমর্থ হয় না, এমন কি পথ সম্পর্কেও তারা কোনো সহায় সম্বল খুঁজে পায় না, এদের আল্লাহ ক্ষমার আশ্বাস দিচ্ছেন, বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও পাপ মোচনকারী।'' (সূরা আন-নিসা, ৯৭-৯৯)

অনুরূপ আল্লাহর বাণী,

يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌ فَإِيَّٰىَ فَٱعْبُدُونِ [العنكبوت: ٥٦]

অর্থ: ''হে আমার মুমিন বান্দাগণ! নিশ্চয় আমার জমিন প্রশস্ত। অতএব তোমরা একমাত্র আমারই বান্দেগী করতে থাক।'' (সূরা আল-আনকাবূত, ৫৬)

ইমাম বাগাভী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

''এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণ এই যে, যেসব মুসলিম হিজরত না করে মাক্কায় রয়েছে, আল্লাহ তাদের ঈমানের সম্বোধন করে আহ্বান করেছেন।''

হিজরতের সমর্থনে হাদীস হতে প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

অর্থ: ''তাওবা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না আর সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তাওবার দ্বারও বন্ধ হবে না।'' (*)

হিজরত তিন প্রকার:

১. কুফরি দেশ ত্যাগ করে ইসলামী রাজ্যে হিজরত করা। এটি ওয়াজিব বা আবশ্যক।

২. মাক্কা হতে মাদীনাতে হিজরত করা। এটি মাক্কা বিজয়ের পর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।

৩. মহান আল্লাহ তা'আলা যা পরিহার করতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাকা। হোক তা যেকোন আমল বা আমলকারী অথবা কোন স্থান বা সময়। যেমন শিরক করা ও মুনাফিক বা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা ইত্যাদি। #

এখানে 'আমল' বলতে: আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন তা হতে বিরত থাকা। সবচেয়ে বড় নিষিদ্ধ হলো শিরক।

'আমলকারী' বলতে: কাফের,মুনাফিক ও অন্যান্যদেরকে বুঝানো হয়েছে।

'সময়' বলতে: কাফেরেরা যে সকল সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে তা পরিত্যাগ করা।

'স্থান' বলতে: কাফেরেরা যেসকল স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকে তা পরিহার করা।

* দু'টি জিনিসের যেকোন একটির মাধ্যমে তাওবা বন্ধ হয়ে যাবে:

১. পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হলে।

২. মৃত্যু হলে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ [النساء: ١٨]

অর্থ: আর এমন লোকদের ক্ষমা নেই যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে: আমি এখন তাওবা করছি। আর তাওবা নেই তাদের জন্য যারা কুফরী অবস্থায় মারা যায়।(সূরা আল-নিসা:১৮)

* রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই।

অর্থাৎ এটি শুধু মাক্কা হতে মাদীনাতে হিজরত করা নিষেধ। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর এই উক্তি ইঙ্গিত বহন করছে যে, মাক্কাতে আর কুফরী প্রবেশ করতে পারবে না।

অতঃপর যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় অবস্থান স্থির করেন তখন ইসলামের অন্যান্য শরীয়তভিত্তিক আদেশগুলো প্রাপ্ত হন। যথা যাকাত,[১] সাওম, হজ্জ, আযান, জিহাদ, ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ ইত্যাদি ইসলামী শরীয়তের বিধানসমূহ।

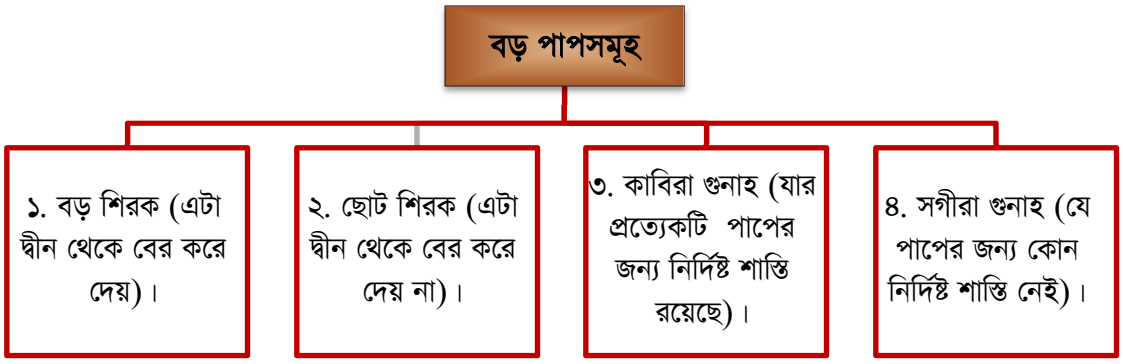
হিজরতের পরের দশ বছর তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি মারা যান (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হোক)।[২]

তাঁর প্রচারিত দ্বীন বিদ্যমান আছে, আর এই হচ্ছে তাঁর দ্বীন। তিনি তাঁর উম্মতকে যাবতীয় সৎ কর্ম সম্পর্কে অবহিত করেছেন আর যাবতীয় অপকর্ম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। আর কল্যাণের পথ সেটি যে পথ তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তা হচ্ছে: তাওহীদ বা এককত্ব ও ঐ সকল আমল যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন ও ভালবাসেন। পক্ষান্তরে অকল্যাণের পথ সেটি যা হতে তিনি সতর্ক করেছেন। তা হচ্ছে: শিরক ও আল্লাহ তা'আলা যে সকল কাজ অপছন্দ ও ঘৃণা করেন।[৩]

(১) শাইখ ইবনে উসাইমিন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: যাকাত প্রথমে মাক্কাতে ফরয হয় কিন্তু সেখানে সম্পদের নিসাব (পরিমাণ) নির্ধারণ করা হয়নি এবং কী পরিমাণ যাকাত আদায় করতে হবে সেটাও নির্ধারণ করা হয়নি। মাদীনাতে হিজরতের পর সম্পদের নিসাব নির্ধারণ করা হয় এবং কী পরিমাণ যাকাত আদায় করতে হবে সেটাও নির্ধারণ করা হয়।

(২) রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দশম হিজরীতে মারা যান এবং তাঁকে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর গৃহে দাফন দেয়া হয়।

(৩) রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতকে যে সমস্ত কাজ করার নির্দেশ করেছেন তাতেই কল্যাণ নিহিত এবং যা থেকে বারণ করেছেন তাতেই অকল্যাণ রয়েছে। এ বিষয়টি আবশ্যক করে আমাদেরকে সাক্ষ্য দিতে যে, নিশ্চয় তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমানতকে পূর্ণভাবে আদায় করেছেন, রিসালাত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, উম্মাতকে সৎ উপদেশ দিয়েছেন ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে সুস্পষ্ট দলীলের উপর রেখে গেছেন যার রজনীই হলো দিবালোকের ন্যায়। সুতরাং ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ পথভ্রষ্ট হয় না।



আল্লাহ নাবী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এই নিখিল ধরণীর সকল মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং সকল জ্বিন ও মানুষের উপর তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [الاعراف: ١٥٨]

অর্থ: ''বল (হে নাবী) হে মানুষ, আমি (আল্লাহ কর্তৃক) তোমাদের সকলের জন্য প্রেরিত রাসূল।''(১) (সূরা আল-আ'রাফ, ১৫৮)

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীর মাধ্যমে তাঁর এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেছেন।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا [المائدة: ٣]

অর্থ: ''আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আমার নে'আমতকে সুসম্পন্ন করলাম আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।'' (২) (সূরা আল-মায়েদা, ৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মারা গেছেন তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ [الزمر: ٣٠، ٣١]

অর্থ: ''(হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার মৃত্যু হবে এবং ওদেরকেও মরতে হবে। তারপর তোমরা সকলে তোমাদের রবের নিকটে বিবাদ বিসম্বাদ করবে।'' (সূরা আয্-যুমারঃ ৩১-৩২)

(১) রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সমগ্র মানব জাতির জন্য নাবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর মাধ্যমে পূর্বের শরীয়তের সকল বিধান মানসুখ করা হয়েছে। সুতরাং রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যামানার এবং বর্তমান সময়ের ইয়াহুদ ও নাসারাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছার পরেও যদি তারা ইসলামে প্রবেশ না করে তাহলে তারা কাফের যদিও তারা মূসা বা ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর অনুসারী হয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে কুরআন হতে প্রমাণ:

১.

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا [آل عمران: ٦٤]

অর্থ: তুমি বল: হে আহলে কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করব না। (সূরা আলে ইমরান: ৬৪)

২.

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ [التوبة: ٢٩]

অর্থ: তোমরা যুদ্ধ কর ঐ সকল আহলে কিতাবের লোকদের সাথে যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম। (সূরা আত-তাওবা:২৯)

৩. রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আমি ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা আমার কথা শোনার পরেও যদি আমার প্রতি ঈমান না আনে তাহলে তারা জাহান্নামী।

(২) এ আয়াতটি বিদ'আতীদের প্রত্যাখ্যান করছে।

পঞ্চম: পরিশিষ্ট

আর মানুষ যখন মারা যাবে, তখন তাকে অবশ্যই (কিয়ামতের দিন) পুনরুত্থিত করা হবে।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

مِنۡهَا خَلَقۡنَٰكُمۡ وَفِيهَا نُعِيدُكُمۡ وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً أُخۡرَىٰ [طه: ٥٥]

অর্থ: ''আমরা তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছি আর তার মধ্যেই তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করব এবং তা থেকেই একদিন আবার তোমাদেরকে বের করে আনব।'' (সূরা ত্বা-হা, ৫৫)

আল্লাহর অপর বাণী,

وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمۡ فِيهَا وَيُخۡرِجُكُمۡ إِخۡرَاجٗا [نوح: ١٧، ١٨]

অর্থ: ''আল্লাহ তোমাদের জমিন হতে উদ্ভুত করেছেন এক বিশেষ প্রণালীতে। এরপর তিনি তোমাদেরকে আবার তাতে প্রত্যাবর্তিত করবেন এবং (এর মধ্য থেকে) বের করবেন যথাযথভাবে।'' (সূরা নূহ, ১৭-১৮)

আর পুনরুত্থানের পর প্রত্যেক (জ্বিন ও ইনসান) থেকে তার কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব-নিকেশ নেয়া হবে এবং তাদের আমল অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করা হবে।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ بِٱلۡحُسۡنَى [النجم: ٣١]

অর্থ: ''আর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে অবস্থিত সব কিছু একমাত্র আল্লাহরই। যাতে তিনি দুষ্কর্মকারীদেরকে তাদের কর্মানুসারে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করেন, পক্ষান্তরে যারা ইহসান (যথাযথভাবে সুচারুরূপে সম্পন্ন) করেছে তাদেরকে পুণ্যফল দিবেন জান্নাতের মাধ্যমে।''[১] (সূরা আন্-নাজম, ৩১)

আর যারা পুনরুত্থান দিবসে মিথ্যারোপ করে, তারা কাফির।

এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী,

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ [التغابن: ٧]

অর্থ: ''কাফেররা মনে করে যে, তাদের পুনরুত্থিত করা হবে না। (হে রাসূল), তুমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও, অবশ্যই হ্যাঁ, আমার রবের শপথ, নিশ্চয় তোমাদের উত্থিত করা হবে, অতঃপর তোমাদের জানানো হবে, আর আল্লাহর নিকট এ কাজ অতি সহজ।'' [২] (সূরা আত-তাগাবুন: ৭)

আল্লাহ তা'আলা সব নাবীদের প্রেরণ করেছেন জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রদানার্থে আর জাহান্নাম থেকে সতর্ক করার জন্য।

এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী,

رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ [النساء: ١٦٥]

অর্থ: ''এই রাসূলগণকে (আমরা প্রেরণ করেছিলাম) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে যেন রাসূলগণের আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানবকুলের পক্ষে কৈফিয়ত দেয়ার মতো কিছুই না থাকে।'' (সূরা আন-নিসা, ১৬৫)

রাসূলদের মধ্যে নূহ (আলাইহিস সালাম) প্রথম আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশেষ। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বারাই নাবী-রাসূল প্রেরণের ধারা সমাপ্ত হয়েছে।

নূহ (আলাইহিস্ সালাম) সর্বপ্রথম রাসূল।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ [النساء: ١٦٣]

অর্থ: ''নিশ্চয়ই আমরা ওহী প্রেরণ করেছি তোমার প্রতি যেমন অহী প্রেরণ করেছিলাম নূহের প্রতি ও তাঁর পরবর্তী নাবীগণের প্রতি।'' [৩] (সূরা আন-নিসাঃ ১৬৩)

(১) সকল মানুষকে মরতে হবে। কেউ মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবে না। সকলের কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থান ঘটবে। সেখানে প্রত্যেকের হিসাব নেয়া হবে এবং আমল পরিমাপ করা হবে।

(২) যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসকে ও হিসাব দিবসকে অস্বীকার করবে সে কুফরী করবে। কেননা সে ঈমানের একটি রুকন অস্বীকার করল।

(৩) নূহ (আলাইহিস সালাম) প্রথম রাসূল।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ [النساء: ١٦٣]

অর্থ: "আমি তোমার নিকট অহী করেছি যেমনভাবে নূহ ও তার পরবর্তীদের নিকট অহী করেছিলাম।" (সূরা আন-নিসা: ১৬৩)

প্রথম নাবী আদম (আলাইহিস সালাম)।

এর প্রমাণ রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আদম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো- তিনি কি নাবী? তিনি বললেন: হ্যাঁ তিনি নাবী।

আর শেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ [الأحزاب: ٤٠]

অর্থ: "মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) তোমাদের কারো পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নাবী।" (সূরা আল-আহযাব:৪০)

সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর নিজেকে নাবী বা রাসূল দাবি করবে সে কাফের ও মিথ্যাবাদী এবং যারা ঐ ব্যক্তিটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে তারাও কাফের।

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বান্দাদের উপর তাগুতকে অস্বীকার করা এবং কেবল আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনা ফরয করেছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: তাগুত হলো, বান্দা যার মাধ্যমে ইবাদত বা আনুগত্য অথবা অনুসরণের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে।

নূহ (আলাইহিস সালাম) থেকে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত যত জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই তাদের উম্মতদের নির্দেশ দিতেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাগুতের পূজা থেকে বিরত থাকতে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل: ٣٦]

অর্থ: ''আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক উম্মতের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং সকল প্রকার তাগুতকে পরিহার কর।'' (সূরা আন-নাহাল ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের উপর তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করা ফরয করে দিয়েছেন।

বস্তুত তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি:

(১) ইবলিস শয়তান (তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক)

(২) যার উপাসনা করা হয় এবং সে উক্ত উপাসনায় সম্মত

(৩) যে নিজের উপাসনার দিকে মানুষদের আহ্বান জানায়

(৪) যে ব্যক্তি তার নিকট গায়েবী জ্ঞানের দাবী করে

(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত বিচার ফয়সালা করে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: ٢٥٦]

অর্থ: ''দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো প্রকার জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ নেই, নিশ্চয় হেদায়াত থেকে বিভ্রান্তি স্পষ্টরূপে পৃথক হয়ে গেছে। তাই যে ব্যক্তি ''তাগুতকে'' অমান্য করল এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনল, নিশ্চয় সে এমন একটি সুদৃঢ় বন্ধন বা অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরল যা কোনো দিন ছিন্ন হবার নয়। বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।'' (সূরা আল-বাকারাহ, ২৫৬)

আর এটাই হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ ও তাৎপর্য।

আর হাদীসে এসেছে,

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ

অর্থ:''দ্বীনের শীর্ষে রয়েছে ইসলাম, এর স্তম্ভ হচ্ছে সালাত, আর এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ।"

আল্লাহ তা'আলা নাবী ও রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। তারা সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে তাওহীদের দাওয়াতের আহ্বানকারী ও তাগুত এবং শিরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ছিলেন।
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ﷺ অর্থ: ''আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক উম্মতের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি।"

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ অর্থ: যেন তোমরা আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা কর। وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ অর্থ: এবং সকল প্রকার তাগুতকে পরিহার কর।

অর্থাৎ- তোমরা তাগুতকে এক পার্শ্বে রেখে দাও এবং তোমরা অবস্থান কর অন্য পার্শ্বে । আর এটিই হচ্ছে তাদের থেকে দূরে থাকার স্পষ্ট বাণী। এটাই হচ্ছে শিরক ও মুশরিকদের হতে মুক্ত থাকার মূল বা বাস্তব কথা।
আল্লাহ তা'আলা সকল বান্দার উপর ফরয করেছেন তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। সুতরাং ঈমান আনার পূর্বেই তাগুতকে অস্বীকার করা আবশ্যক।
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ [البقرة: ٢٥٦]

অর্থ: ''সুতরাং যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৬)
তাগুত এর পরিচয়: 'তাগুত' বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, কোনো বান্দা যাকে নিয়ে (দাসত্বের) সীমা অতিক্রম করেছে; (যেমন: গাছ ও পাথরের ইবাদত করা) বা অনুসরণের ক্ষেত্রে (যেমন: অন্যায় কাজে আলেমদের অনুসরণ করা) বা আনুগত্যের ক্ষেত্রে (যেমন: আল্লাহর অবাধ্য নেতাদের আনুগত্য করা)

বস্তুত তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি:
(১) ইবলিস শয়তান (তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক)।
(২) যার উপাসনা করা হয় এবং সে উক্ত উপাসনায় সম্মত।
(৩) যে নিজের উপাসনার দিকে মানুষদের আহ্বান জানায়।
(৪) যে ব্যক্তি তার নিকট গায়েবী জ্ঞান আছে বলে দাবি করে।
(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত বিচার ফয়সালা করে।

কুরআনের বিধি-বিধান ব্যতীত বিচার ফয়সালা করার হুকুম

১. বড় কুফরী

যখন কেউ বিশ্বাস করবে যে, মানব রচিত বিধান আল্লাহর বিধানের সমতুল্য বা তার চেয়ে উত্তম তখন এটি বড় কুফরী হবে।

২. ছোট কুফরী

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর কুরআনের বিধান ব্যতীত বিচার ফয়সালা করা বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য কিন্তু সে নিজেই খেল-তামাশা বা নেতৃত্বের লোভে বা অন্য কোন কারণে বিচার ফয়সালা করে, তাহলে সে ছোট কুফরী করল।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) জিহাদকে চার স্তরে বিভক্ত করেছেন

১. আত্মার সাথে যুদ্ধ করা। আর তা জ্ঞানার্জন, আমল, আল্লাহর পথে দাওয়াত ও ধৈর্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

২. শয়তানের সাথে যুদ্ধ করা। তা সন্দেহযুক্ত বিষয়াবলী (শিরক ও বিদআত) পরিহার করার মাধ্যমে ও মনোবৃত্তির অনুসরণকে (কাবিরা গুনাহ ও সাগীরা গুনাহ) পরিহার করার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৩. কাফের ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করা। তা হলো অন্তরে ঘৃণা (পরিকল্পনা), কথা এবং জান ও মালের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৪. জুলুম, বিদআত ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তা হলো হস্ত, কথা ও অন্তরে ঘৃণার (পরিকল্পনার) মাধ্যমে হয়ে থাকে।

উপসংহার:

প্রত্যেক বোধসম্পন্ন ব্যক্তির করণীয় হলো এ মহৎ মতনটি (মূল পাঠ) নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা এবং ভালভাবে গুরুত্ব দেয়া। কেননা এতে এমন কিছু মহা মূল্যবান মূলনীতিসমূহ রয়েছে যার প্রয়োজনবোধ প্রত্যেক মানুষই কবরেই।

আল্লাহই সর্বোজ্ঞ। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

<table>
<tr><td rowspan="6">তিনটি মূলনীতি ও প্রমাণপঞ্জি (কবরের প্রশ্নসমূহ), আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করবো? আমরা কেন তিনটি মূলনীতি অধ্যয়ন করবো? তিনটি মূলনীতি অধ্যয়নে কী উপকারিতা রয়েছে?</td><td rowspan="5">চারটি মাসআলা ও তার প্রমাণসমূহ (সূরা আছর)</td><td>ইলম বা দ্বীনী জ্ঞানার্জন</td><td>আর তা এমন বিদ্যা যার সাহায্যে দলীল-প্রমাণসহ আল্লাহ, তাঁর নাবী এবং দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।</td></tr>
<tr><td>উক্ত জ্ঞান অনুযায়ী আমল</td><td>ইলম আমলকে আহ্বান করে, যদি সাড়া না দেয়, তাহলে তা চলে যায়।
যে আলেম ইলম অনুপাতে আলম করে না তাকে মূর্তিপূজকদের পূর্বে শাস্তি দেয়া হবে।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">তার দিকে (মানুষকে) আহ্বান</td><td>দাওয়াতের শর্তসমূহ:
১. দাওয়াত শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে
২. দাওয়াতের ভিত্তি হবে শারয়ী ইলমের উপর
৩. হেকমত ও ধৈর্যের সাথে দাওয়াত দেয়া
৪. আহ্বানকৃত ব্যক্তিদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া।</td></tr>
<tr><td>সর্বপ্রথম দাওয়াত দিতে হবে তাওহীদের । কেননা এটি নাবী ও রাসূলদের দাওয়াত। আর দাওয়াতের সর্বোচ্চ স্তর হলো তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়া ও শিরক থেকে বাধা প্রদান করা।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">এই কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে ধৈর্য ধারণ</td><td>আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে, আল্লাহর অবাধ্য কাজ পরিহারে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের উপর ধৈর্য ধারণ করা। যেমন: সলাত আদায়, সুদকে
পরিহার করা ও দারিদ্রতা।</td></tr>
<tr><td>অর্থাৎ বিদ্যার্জন, আমলের বাস্তবায়ন ও দাওয়াত প্রদানের
ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা।</td></tr>
<tr><td>তিনটি মাসআলা:</td><td colspan="2">তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (রুবুবিয়্যাহর এককত্ব ঘোষণাকারীর উপর উলূহিয়্যাহর ক্ষেত্রেও এককত্ব ঘোষণা করা আবশ্যক) এবং তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রেও।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (একনিষ্ঠ): ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকেই তাঁর অংশীদার বা শরীক হিসেবে পছন্দ করেন না- তা কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা হোন কিংবা কোনো প্রেরিত রাসূলই হোন না কেন।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">শিরক ও মুশরিকদের হতে মুক্ত থাকা:
১. অন্তরের মাধ্যমে: তা হচ্ছে কাফেরকে ঘৃণা করা,
২. জিহ্বার মাধ্যমে:
إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ [الزخرف: ٢٦]
অর্থ: তোমরা যার ইবাদত কর আমি তা হতে মুক্ত। (সূরা আল-যুখরুফ: ২৬)
৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে:তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিনোদনে না যাওয়া অথবা তাদের পোশাকের সদৃশ্ পোশাক পরিধান না করা এবং তাদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী না হওয়া।</td></tr>
</table>

তিনটি মূলনীতি ও প্রমাণপঞ্জি (কবরের প্রশ্নসমূহ), আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করবো? আমরা কেন তিনটি মূলনীতি অধ্যয়ন করবো? তিনটি মূলনীতি অধ্যয়নে কী উপকারিতা রয়েছে?	তাওহীদ অধ্যয়নের কারণ	(الحنيفية) শিরক হতে বিমুখ হয়ে ইখলাস, তাওহীদ ও ঈমানের দিকে ধাবিত সম্প্রদায়।
		শাব্দিক অর্থ: توحيد শব্দটি وحد - يوحد এর মাসদার বা মূল উৎস । যখন কোন বিষয়কে একক করে তখন বলা হয়, وحد الشيئ সে তাকে একক করেছে। পারিভাষিক অর্থ: প্রতিপালন, ইবাদত ও আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে ঘোষণা করা।
		তাওহীদ তিন প্রকার: **তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ:** আল্লাহর সকল কার্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা। অর্থাৎ সৃষ্টি, রাজত্ব ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা। **তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ:** ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা। **তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত:** আল্লাহ তা'আলা যেসমস্ত নাম বা গুণাবলী নিজের জন্য তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন অথবা তাঁর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন সে ব্যাপারে তাঁর এককত্ব ঘোষণা করা। আর তা হচ্ছে এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা যা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করা এবং যা দূরীভূত করেছেন তা কোন ধরণের পরিবর্তন, বিনষ্টকরণ, পদ্ধতি বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত প্রদান ব্যতীত।
		শিরক: আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা। আর এটিই সবচেয়ে বড় পাপ।
	তিনটি মূলনীতি	মহান আল্লাহ তা'আলার পরিচয়: তোমার প্রতিপালক কে? কিভাবে তুমি আল্লাহকে চিনেছ? প্রতিপালকই হচ্ছেন ইবাদত পাওয়ার যোগ্য, ইবাদতের প্রকারসমূহ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের যেকোন ইবাদত করবে দলীলসহ তার হুকুম।
		প্রমাণসহ দ্বীন ইসলামকে জানা, ইসলামের পরিচয়, দ্বীনের স্তরসমূহ, ইসলামের রুকন সমূহ, শাহাদাতের পরিচয়, ঈমানের পরিচয়, ঈমানের শাখা-প্রশাখা, ইহসান, দ্বীনের স্তর সমূহের দলীল, কিয়ামতের আলামত।
		রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিচয়:তাঁর বংশ, জন্ম, বয়স, নবুওয়াত ও রিসালাত এবং জন্মভূমি সম্পর্কে জানা। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রেরণের উদ্দেশ্য, তাওহীদের দাওয়াতের সময়সীমা, ইসরা ও মি'রাজ, সলাত কখন ও কোথায় ফরজ হয়? হিজরত ও তার সময় এবং হুকুম, শরীয়তের অবশিষ্ট বিধান গুলো কখন চালু হয়? দাওয়াতের সময়সীমা, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যু, তিনি দ্বীনের যে বিধানগুলো নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাঁকে মানব ও দানব সকলের জন্য প্রেরণ, দ্বীনের ও নিয়ামতের পূর্ণতা।

তিনটি মূলনীতি ও প্রমাণপঞ্জি (কবরের প্রশ্নসমূহ), আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করবো? আমরা কেন তিনটি মূলনীতি অধ্যয় করবো? তিনটি মূলনীতি অধ্যয়নে কী উপকারিতা রয়েছে?

পরিশিষ্ট:

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও আমলের হিসাব, যে ব্যক্তি পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করবে সে কাফের, রাসূলগণের দায়িত্ব ও তাদের দাওয়াত, প্রথম ও শেষ রাসূল, তাওহীদের দুইটি রুকন: তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাগুতের পরিচয়, তাগুতের উল্লেখযোগ্য প্রকারসমূহ, তাগুতকে অস্বীকার করার পদ্ধতি, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ, ইসলাম হলো মূল ধর্ম, সলাত দ্বীনের স্তম্ভ, দ্বীনের শীর্ষবিন্দু রয়েছে জিহাদে।

জিহাদের প্রকারসমূহ

১. আত্মার সাথে যুদ্ধ করা।		আর তা জ্ঞানার্জন, আমল, আল্লাহর পথে দাওয়াত ও ধৈর্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে।	
২. শয়তানের সাথে যুদ্ধ করা।	মনোবৃত্তির অনুসরণ করা		কাবিরা গুনাহ (যার প্রত্যেকটি পাপের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে)।
			সগীরা গুনাহ (যে পাপের জন্য কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নেই)।
	সন্দেহযুক্ত বিষয়াবলী		বড় শিরক (তা দ্বীন থেকে বের করে দেয়), ছোট শিরক।
			বিদআত।
৩. কাফের ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করা।		তা হলো অন্তরে ঘৃণা- পরিকল্পনা, কথা, জান ও মালের মাধ্যমে হয়ে থাকে।	
৪. শিরক, বিদআত ও অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।		তা হলো হস্ত, কথা ও অন্তরে ঘৃণা-পরিকল্পনার মাধ্যমে হয়ে থাকে।	

তাগুত এর পরিচয়

'তাগুত' বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, কোনো বান্দা যাকে নিয়ে (দাসত্বের) সীমা অতিক্রম করেছে; (যেমন: গাছ ও পাথরের ইবাদত করা) বা অনুসরণের ক্ষেত্রে (যেমন: অন্যায় কাজে আলেমদের অনুসরণ করা) বা আনুগত্যের ক্ষেত্রে (যেমন: আল্লাহর অবাধ্য নেতাদের আনুগত্য করা)

বস্তুত তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি:

(১) শয়তান (তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক)
(২) যার উপাসনা করা হয় এবং সে উক্ত উপাসনায় সম্মত
(৩) যে নিজের উপাসনার দিকে মানুষদের আহ্বান জানায়
(৪) যে ব্যক্তি তার নিকট গায়েবী জ্ঞান আছে বলে দাবী করে
(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত বিচার ফয়সালা করে।

আল্লাহই সর্বোজ্ঞ। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

তিনটি মূলনীতির পরীক্ষা

* বন্ধনী থেকে সঠিক উত্তরটি বাছাই কর:

১. তিনটি মূলনীতির লেখক:
(মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত তামীমি/ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব/ উভয়ে)

২. তিনটি মূলনীতিকে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয় কবরের প্রশ্নসমূহ:
(সঠিক/ ভুল)

৩. লেখক তিনটি মূলনীতিতে পাঠকের জন্য দু'আ করেছেন:
(দু'টি স্থানে/ তিনটি স্থানে)

৪. লেখকের বইসমূহ বৈশিষ্ট মন্ডিত হয়েছে:
(সহজ ভাষ্য/ সংক্ষিপ্ত তার পর বিস্তারিত/ কুরআন-সুন্নাহ হতে প্রমাণাদি/ ছাত্রের জন্য দু'আ/ সমসাময়িক সন্দেহ পোষণকারীদের প্রত্যাখ্যান/ ব্যাপক ব্যাখ্যা/ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তরসমূহের বিবরণ/উক্ত কিতাবগুলোকে মানুষের নিকট আল্লাহ তা'আলা গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন/ সবগুলোই)

৫. তিনটি মূলনীতির মতটি:
(৫/৬) প্রকার।

৬. তাওহীদ অধ্যয়ন করা:
(ফরযে কেফায়াহ/ ফরযে আইন)

৭. চারটি মাসআলার দলীল:
(সূরা ইখলাস/ সূরা আছর)

৮. যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করল না তার সাদৃশ্য:
(ইয়াহুদীদের সাথে/ নাসারাদের সাথে/ উভয়ের সাথে)

৯. ধৈর্য:
(দুই প্রকার/ তিন প্রকার)

১০. সূরা আছরের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর উক্তির অর্থ:
(দলীল বা প্রমাণ সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট/ অন্য সূরাগুলো হতে যথেষ্ট)

১১. যে ব্যক্তি তিন প্রকার তাওহীদের যে কোন একটির প্রতি বিশ্বাস করে, তাহলে সে এককত্ব ঘোষণাকারী নয়:
(সঠিক/ভুল)

১২. শিরক ও মুশরিকদের থেকে মুক্ত থাকা যায়:
(অন্তর, কথা ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে/ শিরক ও শিরককারী হতে মুক্ত থাকার মাধ্যমে/ উভয়টি)

১৩. আল্লাহর বাণীতে: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ এর المساجد দ্বারা কী উদ্দেশ্য:
(নির্মিত মাসজিদসমূহ/ সিজদার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ/ যে স্থানে সিজদা করা হয়/ সবগুলো)

১৪. সালাফদের দাওয়াতের পদ্ধতি:
(সর্বপ্রথম প্রমাণ তারপর বিশ্বাস/ সর্বপ্রথম বিশ্বাস তারপর প্রমাণ)

১৫. আলেমদের মধ্যে থেকে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের সাদৃশ্য:
(ইয়াহুদীদের সাথে/ নাসারাদের সাথে)

১৬. যে সকল বান্দারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের সাদৃশ্য:
(ইয়াহুদীদের সাথে/ নাসারাদের সাথে)

১৭. তিনটি মাসআলা বলতে তিনটি মূলনীতিকে বুঝায়:
(সঠিক/ভুল)

১৮. দু'আর প্রকারভেদ:
(ইবাদতের মাধ্যমে দু'আ করা/ চাওয়ার দু'আ/ অবস্থার ও কথার মাধ্যমে দু'আ করা)

১৯. চাওয়ার দু'আ :
(দু' প্রকার/ চার প্রকার)

২০. বিশ্বাসের দিক থেকে মাধ্যম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মানুষের প্রকার:
(দুই প্রান্ত ও মধ্যম পন্থী/ বড় শিরক ও ছোট শিরকও বৈধ)

২১. সৃষ্টির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয:
(সকল ক্ষেত্রে / যে ক্ষেত্রে সে ক্ষমতা রাখে/ চারটি শর্ত সাপেক্ষে যে ক্ষেত্রে সে ক্ষমতা রাখে)

২২. لا إله إلا الله এর অর্থ:
(আবিস্কার করতে সক্ষম/ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই/ আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই/ সবগুলো)
২৩. সকল ধর্মকে সমপর্যায় করা:
(জায়েয/ কাবিরা গুনাহ/ কুফরী)
২৪. সামষ্টিকভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে দলীল:
(অনেকগুলো/ চারটি)
২৫. ফেরেশতাদের কি অন্তর রয়েছে?
(হ্যাঁ/না)
২৬. ঈমানের সাথে তাওহীদের সম্পর্ক হচ্ছে যে, ঈমান শব্দটি আ'ম বা ব্যাপক এবং তাওহীদ হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা:
(সঠিক/ভুল)
২৭. ঈমানের রুকন:
(৫টি/৬টি/৮টি)
২৮. মুশরিকদের ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে:
(সঠিক/ভুল)
২৯. আল্লাহ ব্যতীত যাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইবাদত করা হয় সে :
(তাগুত/ তাগুত নয়)
৩০. বিশ্ব পরিচালনা ও বৃষ্টি দানের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক ঘোষণা করা এটি তাওহীদ:
(উলূহিয়্যাহ/ রুবুবিয়্যাহ/ আসমা ওয়াস সিফাত)
৩১. তাওহীদের বিপরীত:
(বড় শিরক/ ছোট শিরক/ বিদআত)
৩২. পিতা-মাতার সেবা করা সর্বাধিক ওয়াজিব কাজ:
(সঠিক/ভুল)
৩৩. সবচেয়ে বড় পাপ ব্যভিচার করা ও কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা:
(সঠিক/ভুল)
৩৪. মাক্কা থেকে বায়তুল মাকদাস পর্যন্ত ভ্রমণ করাকে মি'রাজ বলে:
(সঠিক/ভুল)
৩৫. রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রেরণ করা হয়েছিল:
(শুধু তার কওমের জন্য/ মানব ও জ্বীন জাতির জন্য)
৩৬. নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম):
(মারা গেছেন/ নাবীরা মরেন না)
৩৭. যে ব্যক্তি পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করবে সে কুফরী করবে:
(বড় কুফরী/ ছোট কুফরী)
৩৮. নাবীদের ধর্ম:
(এক ধর্ম / প্রত্যেক নাবীর স্বতন্ত্র ধর্ম)
৩৯. হিজরত করা:
(মাক্কা বিজয়ের মাধ্যমে বন্ধ হয়ে গেছে/ কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে)
৪০. হিজরত বলতে বুঝায়:
(কুফরীর দেশ ত্যাগ করে ইসলামী রাজত্বে স্থানান্তরিত হওয়া/ আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা পরিহার করা)
৪১. ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তবে সৎ ব্যক্তিদের স্বপ্ন অবশিষ্ট রয়েছে:
(সঠিক/ভুল)
৪২. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য ইবাদত সম্পাদন করা শিরক:
(বড়/ছোট)
৪৩. কর্তা ও কর্মের বিধান ফয়সালা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে:
(সঠিক/ভুল)
৪৪. প্রথম নাবী:
(নূহ (আলাইহিস সালাম) / আদম (আলাইহিস সালাম))
৪৫. আমাদের নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনি:
(নাবী/ রাসূল/ উভয়টি)

প্রথম সারির শব্দাবলির সাথে দ্বিতীয় সারির উপযুক্ত শব্দাবলি মিলাও

প্রথম সারি	ক্রমিক নং	ক্রমিক নং	দ্বিতীয় সারি
তাওহীদের শাব্দিক অর্থ:		১	ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহু) এর উক্তি: আমি যখন কাফেরকে দেখি তখন আমি আমার চক্ষুদ্বয় আল্লাহর শত্রুকে দেখার ভয়ে বন্ধ করে দেই।
তাওহীদের পারিভাষিক অর্থ:		২	মৃত্যুর পরে যা ঘটবে সবগুলোই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।
তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ:		৩	মুখে উচ্চারণ করা, অন্তরে বিশ্বাস করা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা আর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় ও অবাধ্য কাজের মাধ্যমে তা হ্রাস পায়।
তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ:		৪	ইসলাম, ঈমান ও ইহসান।
তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত:		৫	আল্লাহ ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য।
একনিষ্ঠ বলতে বুঝায়:		৬	ওয়াজিব, জায়েয ও হারাম।
কুরআনে প্রথম আহ্বান ও আদেশের কথা উল্লেখ হয়েছে:		৭	শরীয়তগত ও অনুভূতিগত।
শিরক:		৮	কবরের প্রশ্নসমূহ।
ভয়-ভীতি:		৯	ইলম, আমল, দাওয়াত ও ধৈর্য।
তাওয়াক্কুল:		১০	ইখলাস ও আনুগত্য করা।
ইবাদত কবুলের শর্ত:		১১	আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা ও মাধ্যম গ্রহণ করা।
চারটি মাসআলাকে সংক্ষেপে বলা হয়:		১২	আল্লাহর পরিপূর্ণ নেতৃত্ব ও মহানত্বের জন্য জ্ঞানার্জন করার ক্ষেত্রে অটুট ভয় থাকা।
তিনটি মাসআলাকে সংক্ষেপে বলা হয়:		১৩	সমতুল্য, অনুরূপ, হুবহু।
মাধ্যম গ্রহণের প্রকারভেদ:		১৪	শিরক থেকে বিমুখ হয়ে তাওহীদের দিকে ধাবিত মিল্লাত।
তিনটি মূলনীতিকে সংক্ষেপে বলা হয়:		১৫	সূরা বাকারাহ।
মানতের প্রকার:		১৬	আল্লাহকে এক বলে ঘোষণা করা ঐ সকল নাম বা গুণের ব্যাপারে যেগুলো তিনি নিজেই তাঁর কিতাবে বা তাঁর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আর তা হচ্ছে: আল্লাহ যা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করা এবং তিনি তাঁর থেকে যা দূর করেছেন তা দূর করা কোনো ধরণের পরিবর্তন,নষ্ট করণ, পদ্ধতি বর্ণনা ও উদাহরণ প্রদান ছাড়া।
যবেহ এর প্রকার:		১৭	ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহকে একক বলে ঘোষণা করা।
ভয়ের প্রকার:		১৮	সৃষ্টি, কর্তৃত্ব ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক বলে ঘোষণা করা।
ইসলাম হলো:		১৯	যে বিষয়গুলো আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট সে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক বলে ঘোষণা করা।
দ্বীনের স্তরসমূহ:		২০	وَحَّدَ ক্রিয়ার মাসদার, যখন কোন কিছুকে এক বলে ঘোষণা করা হয়।

ঈমান:		২১	সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া বা মৃত্যুর সময় উপস্থিত হওয়া।
কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত :		২২	ইবাদত, অনুসরণ ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে বান্দা তার সীমা অতিক্রম করা।
শিরক থেকে মুক্ত থাকার বাস্তবতা হচ্ছে:		২৩	তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ওয়াল আসমা ওয়াস সিফাত, তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ ও শিরক বা মুশরিকদের হতে মুক্ত থাকা।
তাওবা বন্ধের সময়:		২৪	একত্ববাদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের মাধ্যমে তার অনুগত হওয়া ও শিরক বা মুশরিকদের হতে মুক্ত থাকা।
তাগুত:		২৫	যে-কোনভাবে আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয়।

চারটি নীতি

ভূমিকা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

মূলভাষ্যের লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাইখুল ইসলাম ও তাওহীদের দাওয়াতের প্রবক্তা ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব বিন সুলাইমান আত তামীমী। ডাক নাম আবুল হুসাইন। তিনি ১১১৫ হিজরীতে (সৌদি আরবের) উয়াইনা নামক স্থানে জন্ম লাভ করেন এবং ১২০৬ হিজরীতে দিরইয়াহ নামক স্থানে মারা যান।

দ্বিতীয় মতনটি (মূল পাঠ) হলো: চারটি নীতি

চারটি নীতি বইটি লেখকের দ্বিতীয় মূল বই যার পাঠক শিক্ষার্থীর মতনের (মূল পাঠ) ধারাবাহিকতায় হবে। আর এ মতনটির (মূল পাঠ) অনেক গুরুত্ব রয়েছে তার মধ্যে হতে:

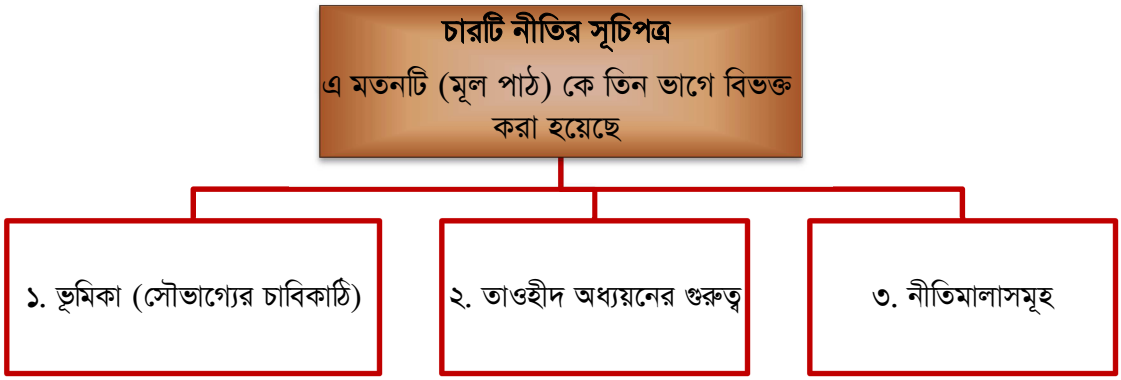
১. মতনটি (মূল পাঠ) অধ্যয়ন করার জন্য আলেমদের নসীহত বাণী

২. সালফে সালেহীন আলেমগণের অনুসরণ করা

৩. বর্তমান সময়ের মুশরিকদের সংশয়ের প্রত্যুত্তর

৪. কেননা এটি লেখকের কাশফুশ শুবহাত (সন্দেহ উন্মোচন) বই এর সংক্ষেপণ

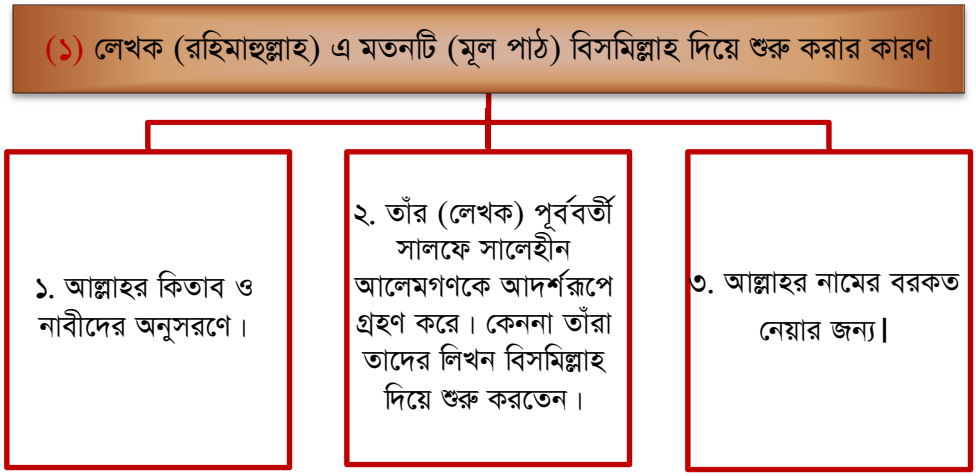
সুতরাং আমরা 'সন্দেহ উন্মোচন' বিষয়ক বইটি শুরু করার পূর্বে 'চারটি নীতি' বইটি দিয়ে শুরু করছি যাতে শিক্ষার্থীরা যেকোন সন্দেহের সম্মুখিন না হয়।


চারটি নীতির সূচিপত্র
এ মতনটি (মূল পাঠ) কে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে
১. ভূমিকা (সৌভাগ্যের চাবিকাঠি)
২. তাওহীদ অধ্যয়নের গুরুত্ব
৩. নীতিমালাসমূহ

প্রথমত: ভূমিকা (সৌভাগ্যের চাবিকাঠি)

بسم الله الرحمن الرحيم

(১) আরশে আযীমের রব মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করি, তিনি যেন দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার অভিভাবক হন ও আপনাকে বরকতময় করেন আপনি যেখানেই অবস্থান করুন না কেন।



শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন: যে ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন ও তাক্বওয়াহ অবলম্বনকারী সে আল্লাহর অলী ।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ

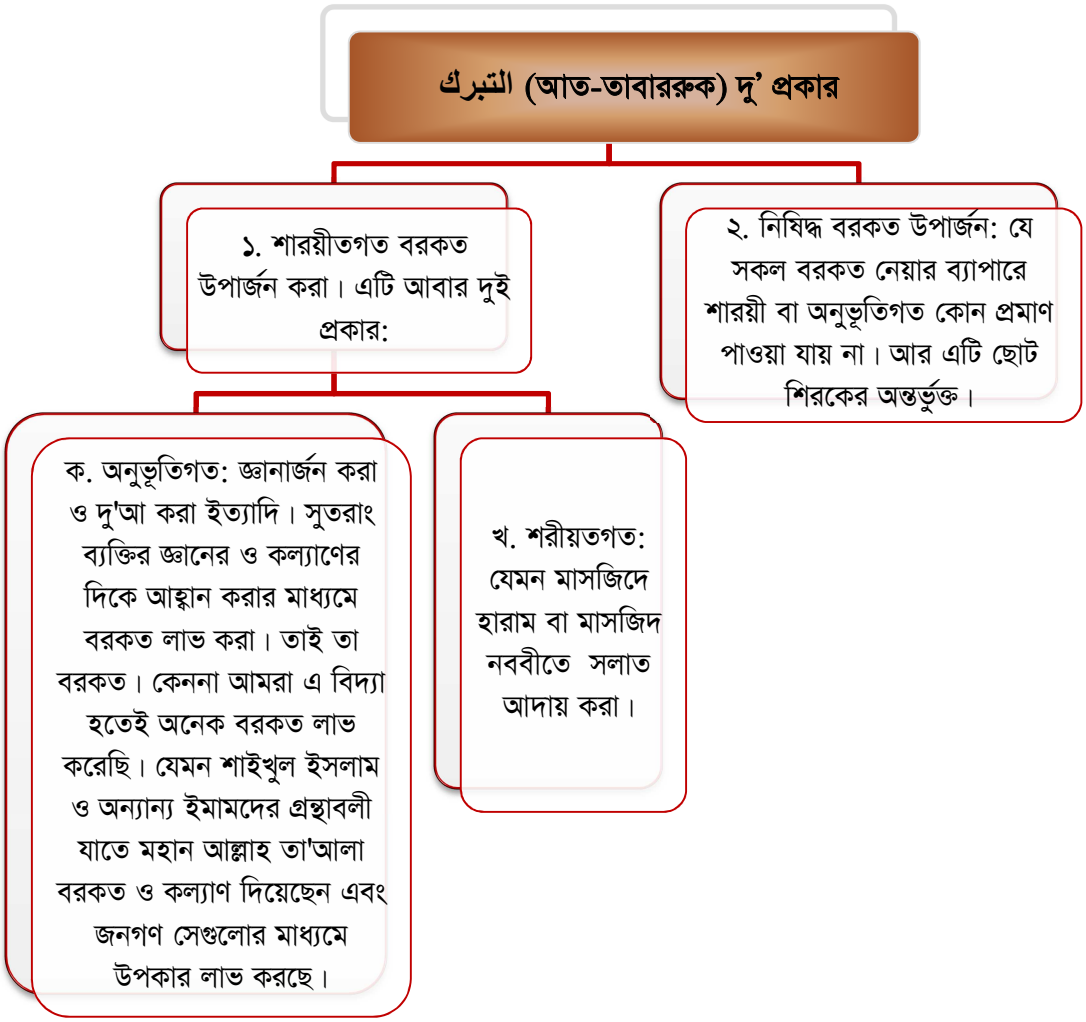
[يونس: ٦٢-٦٣]

অর্থ: ''মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। (তারা হলো): যারা ঈমান আনে ও আল্লাহর তাক্বওয়াহ অবলম্বন করে।'' (সূরা ইউনুস: ৬২-৬৩)

البركة - বৃদ্ধি পাওয়া, বেড়ে যাওয়া।

التبرك - বরকত বেশি পাওয়ার প্রার্থনা করা।

المبارك - যার দ্বারা সর্বাস্থায় উপকার লাভ করা যায়। সে যেখানেই অবতরণ করুক।



তোমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করবে, যাকে কিছু প্রদান করা হলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।[১]

(১) নিয়ামত হচ্ছে পরীক্ষাস্বরূপ। এ ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে তন্মধ্যে আল্লাহর বাণী:

وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً [الأنبياء: ٣٥]

অর্থ: "আমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করি।" (সূরা আল-আম্বিয়া:৩৫)

আল্লাহ আরোও বলেছেন:

فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ [النمل: ٤٠]

অর্থ: "অতঃপর যখন সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) তার সামনে আরশকে দন্ডায়মান দেখলেন, তখন তিনি বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃজ্ঞ হই। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপাশীল।" (সূরা আল- নামল:৪০)

فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ [الفجر: ١٥]

অর্থ:" মানুষ এরূপ যে যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন সে বলে, আমার পালনকর্তা আমাক সম্মান দান করেছেন।" (সূরা আল-ফাজর:১৫)

হাদীসে এসেছে: (বাণী ইসরাঈল বংশের তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করেছিলেন-------)

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ নি'য়ামতের সাথে সম্পর্কিত। আর নি'য়ামতের কৃতজ্ঞতা করা দু' ভাগে বিভক্ত

১. নিয়ামত পাওয়ার পূর্বে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা।

এই প্রকারটি প্রমাণ করে যে, বান্দা দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা রাখবে যে, মহান আল্লাহই নিয়ামতদাতা। সুতরাং তার অন্তর অন্য কারো সাথে সম্পর্ক রাখবে না আর কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটেই কল্যাণ কামনা করবে। যেমন আল্লাহর নিকট জান্নাত কামনা করা হয়। কেননা তিনিই জান্নাতের মালিক। অনুরূপভাবে রিযিকও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ [الفرقان: ٥٨]

অর্থ: তুমি ভরসা কর চিরঞ্জীবের উপর যিনি মরবেন না। (সূরা আল-ফুরকান: ৫৮)

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ [العنكبوت: ١٧]

অর্থ: তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করছ তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই তোমরা আল্লাহর কাছে রিযিক কামনা কর। (সূরা আল-আনকাবূত:১৭)

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট রিযিক প্রার্থনা করা যাবে না।

وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ [العنكبوت: ١٧]

অর্থ: তোমরা তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(সূরা আল-আনকাবূত:১৭)

২. নিয়ামত পাওয়ার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তা হবে:

ক. অন্তরের মাধ্যমে: তা হলো সত্যিকার ঈমান, বিশ্বাস ও পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করা যে, আল্লাহ তা'আলাই রিযিক দাতা ও নিয়ামত দাতা। আর প্রত্যেকটি নিয়ামত বান্দা আল্লাহর পক্ষ হতেই পায়।

খ. জিহ্বার মাধ্যমে: তা হলো আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের ব্যাপারে মুখে আলোচনা করা নিয়ামতের জন্য তাঁর প্রশংসা করা,কৃতজ্ঞতা করা ও তাঁর গুণগান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [الضحى: ١١]

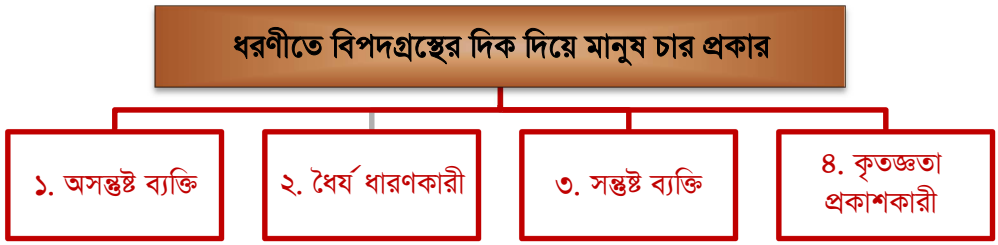
অর্থ: আর তোমার পালনকর্তার নিয়ামতের কথা প্রকাশ কর।

(সূরা আল-দ্বুহা: ১১)

গ. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে: তা হলো নিয়ামতের ব্যবহার এমন ভাবে করা যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর খুশি হন এবং সাথে সাথে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার জন্য আনুগত্যের আমল করা ও অবাধ্য কাজ হতে বিরত থাকা।

এবং যখন পরীক্ষা করা হয় তখন ধৈর্য ধারণ করে।[১]

(১) সকল আলেমদের মতে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক।



(১) অসন্তুষ্ট হওয়া হারাম। এটা কাবীরা গুনাহ। এটি হয়ে থাকে:



অন্তরের মাধ্যমে অসন্তুষ্ট হওয়া: ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন এর অর্থ হলো: কিছু মানুষ মুখে উচ্চারণ করে না কিন্তু তার অন্তর বলে আমার প্রতিপালক আমার প্রতি যুলুম করেছে, আমাকে বঞ্চিত করেছে ও আমাকে বাধা প্রদান করেছে। সে অল্প বলুক কিংবা বেশি বলুক। সুতরাং তুমি তোমার মনে মনে চিন্তা কর যে, তুমি কি তা হতে মুক্ত? যদি তুমি তা হতে মুক্ত থাকতে পার তাহলে তুমি বড় পাপ থেকে মুক্ত থাকবে।

জিহ্বার মাধ্যমে অসন্তুষ্ট হওয়া: তা আত্ম-চিৎকার, বিলাপ সুরে কান্না করা, অভিশপ্ত কথা বলা, লা'নাত বা গালিগালাজের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অসন্তুষ্ট হওয়া: এটা গাল আঁচড়ানো, পোশাক ছিঁড়ে ফেলা ও মাথার চুল উঠিয়ে ফেলা ইত্যাদির মাধ্যমে হয়ে থাকে।

(২) ধৈর্য ধারণ করা: এর হুকুম সকল আলেমদের ঐকমত্যে ওয়াজিব বা আবশ্যক। অন্তরের মাধ্যমে, জিহ্বার মাধ্যমে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব।

ইমাম আহমাদ বলেছেন: কুরআনুল কারীমে ৯০ জায়গায় ধৈর্য ধারণের কথা এসেছে। সকল আলেমদের ঐকমত্যে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব। ধৈর্য ধারণ করা ঈমানের অর্ধেক। কেননা ঈমান দু' ভাগে বিভক্ত: অর্ধেক ধৈর্য ধারণের এবং অর্ধেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের। (মাদারিজুস সালেকীন–ইবনুল কাইয়িম)

(৩) সন্তুষ্ট থাকা। এর হুকুম মুস্তাহাব। এটা ধৈর্যের সর্বোচ্চ স্তর।

(৪) কৃতজ্ঞতা করা। এর হুকুম মুস্তাহাব। এটা সর্বোত্তম ও পরিপূর্ণ স্তর।

দ্বিতীয়ত: চারটি নীতি

بسم الله الرحمن الرحيم

জেনে নিন- আল্লাহ আপনাকে তাঁর আনুগত্যের পথ দেখাক- নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত দীন তথা মিল্লাতে ইব্রাহীম হচ্ছে, আপনি কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করবেন তার জন্য আনুগত্যকে নির্ভেজাল করে। আর আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে এরই আদেশ করেছেন এবং এর জন্যই তাদের সৃষ্টি করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات: ٥٦]

অর্থ: ''আমি তো জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।''[১] [সূরা আয-যারিয়াত/৫৬]

অতঃপর যখন জানতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কেবল তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তখন এটাও জেনে নিও যে, তাওহীদ ব্যতীত কোনো ইবাদতই ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় না, যেমন পবিত্রতা ব্যতীত কোনো সালাতই সালাত হিসেবে গণ্য হয় না। সুতরাং ইবাদতে শির্ক প্রবেশ করলে তা তেমনি নষ্ট হয়ে যায় যেমনিভাবে পবিত্রতা অর্জনের পর বায়ু নির্গত হলে তা বিনষ্ট হয়।

অতঃপর যখন জানলে যে, যখন ইবাদতে শির্কের সংমিশ্রণ হয় তখন শির্ক সেই ইবাদতকে নষ্ট করে দেয় এবং যাবতীয় আমল ধ্বংস করে ফেলে এবং সে ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তখন তুমি বুঝতে পারলে যে, এ বিষয়টির জানাই হচ্ছে তোমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যাতে করে আল্লাহ তোমাকে এ বেড়াজাল থেকে মুক্তি দেন, আর তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করা তথা শির্কের বেড়াজাল। যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ [النساء: ٤٨]

অর্থ: ''নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করাকে ক্ষমা করবেন না, আর এর চেয়ে ছোট যা আছে তা তিনি যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।''[সূরা আন-নিসা-৪৮]

আর এটা (অর্থাৎ শির্কের বেড়াজাল থেকে মুক্তি) কেবল চারটি নীতি জানার মাধ্যমে সম্ভব হবে, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন,

প্রথম নীতি: জানা প্রয়োজন যে, ঐ সমস্ত কাফের যাদের সাথে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধ করেছিলেন, তারা স্বীকার করত যে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছুর পরিচালক। তবুও এ স্বীকারোক্তি তাদেরকে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করায়নি।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ

وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ [يونس: ٣١]

অর্থ: ''তুমি বল : তিনি কে, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমিন হতে রিজিক দিয়ে থাকেন? অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন? আর তিনি কে যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে যে, আল্লাহ। অতএব, তুমি বল: তবে কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?''[২] (সূরা ইউনুস: ৩১)

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করবো?

(২) যে সকল কাফেরদের মাঝে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল তারা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ স্বীকারোক্তি দেওয়া সত্ত্বেও রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। কারণ তাদের ও রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাঝে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর ব্যাপারে মতবিরোধ ছিল। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য যেকোন ইবাদত সম্পাদন করবে সে কাফের ও মুশরিক।

দ্বিতীয় নীতি: আরবের মুশরিকরা বলত: আমরা তো তাদেরকে কেবল নৈকট্য এবং সুপারিশ পাওয়ার আশায় আহ্বান জানাই এবং তাদের শরণাপন্ন হই।

তারা যে (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের প্রত্যাশা করে তাদের (মা'বুদদের) আহ্বান করত তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ [الزمر: ٣]

অর্থ: "আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, (তারা বলে) আমরা তো এদের ইবাদত এজন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্য এনে দিবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফায়সালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।"[১] [সূরা আয-যুমার:৩]

আর তারা যে (আল্লাহর কাছে এসব মা'বুদদের) শাফা'আত বা সুপারিশ প্রত্যাশা করে তাদের (মা'বুদদের) আহ্বান করত তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ [يونس: ١٨]

অর্থ: "আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহেরও ইবাদত করে যারা তাদের কোনো অপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না, আর তারা বলে: এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।" [সূরা ইউনুস-১৮]

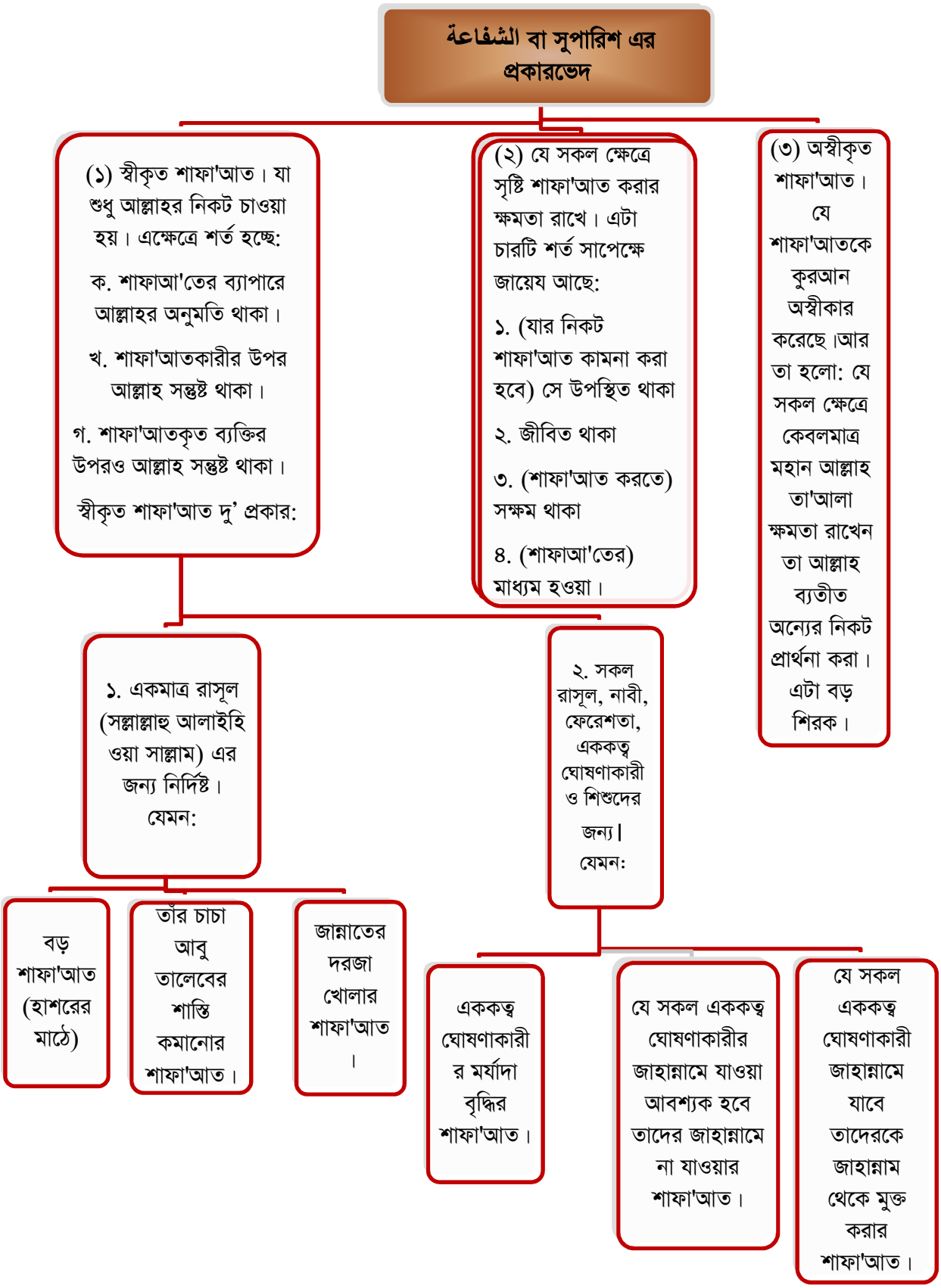
বস্তুত সুপারিশ বা শাফা'আত দু' প্রকার। ক) অস্বীকৃত খ) স্বীকৃত।[২]

(১) কাফের ও মুশরিকরা তাদের বাতিল মা'বুদদের আহ্বান করে শুধু নৈকট্য লাভ ও শাফাআ'তের আশায়। এ জন্যই রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে কাফের বলেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

(২) الشفاعة বা সুপারিশ এর পরিচয়:

শাব্দিক পরিচয়: একক বিষয়কে দ্বিত্ব করণ।

পারিভাষিক পরিচয়: উপকারার্থে বা ক্ষতি প্রতিকারার্থে অন্যের জন্য মাধ্যম হওয়া।


الشفاعة বা সুপারিশ এর প্রকারভেদ
(১) স্বীকৃত শাফা'আত। যা শুধু আল্লাহর নিকট চাওয়া হয়। এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে:
ক. শাফাআ'তের ব্যাপারে আল্লাহর অনুমতি থাকা।
খ. শাফা'আতকারীর উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকা।
গ. শাফা'আতকৃত ব্যক্তির উপরও আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকা।
স্বীকৃত শাফা'আত দু' প্রকার:
(২) যে সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টি শাফা'আত করার ক্ষমতা রাখে। এটা চারটি শর্ত সাপেক্ষে জায়েয আছে:
১. (যার নিকট শাফা'আত কামনা করা হবে) সে উপস্থিত থাকা
২. জীবিত থাকা
৩. (শাফা'আত করতে) সক্ষম থাকা
৪. (শাফাআ'তের) মাধ্যম হওয়া।
(৩) অস্বীকৃত শাফা'আত। যে শাফা'আতকে কুরআন অস্বীকার করেছে।আর তা হলো: যে সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা রাখেন তা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা। এটা বড় শিরক।
১. একমাত্র রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য নির্দিষ্ট। যেমন:
২. সকল রাসূল, নাবী, ফেরেশতা, এককত্ব ঘোষণাকারী ও শিশুদের জন্য। যেমন:
বড় শাফা'আত (হাশরের মাঠে)
তাঁর চাচা আবু তালেবের শাস্তি কমানোর শাফা'আত।
জান্নাতের দরজা খোলার শাফা'আত।
এককত্ব ঘোষণাকারীর মর্যাদা বৃদ্ধির শাফা'আত।
যে সকল এককত্ব ঘোষণাকারীর জাহান্নামে যাওয়া আবশ্যক হবে তাদের জাহান্নামে না যাওয়ার শাফা'আত।
যে সকল এককত্ব ঘোষণাকারী জাহান্নামে যাবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার শাফা'আত।

সুতরাং অস্বীকৃত সুপারিশ হচ্ছে, যে সকল ক্ষেত্রে কেবল মহান আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা রাখেন তা তিনি ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ [البقرة: ٢٥٤]

অর্থ: ''হে যারা ঈমান এনেছ! আমরা তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি, তা হতে সে দিন আসার পূর্বেই ব্যয় কর; যাতে থাকবে না কোনো ক্রয়-বিক্রয়, কিংবা বন্ধুত্ব অথবা সুপারিশ, আর কাফেররাই তো অত্যাচারী।"[সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৪]

স্বীকৃত সুপারিশ হচ্ছে, যা কেবল আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়। বস্তুত সুপারিশকারীর কাছে সুপারিশ চাওয়ার মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করা হয়। আর যার জন্য সুপারিশ করা হবে সে তো হতে হবে এমন ব্যক্তি যার কথা ও কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট। আর তার সুপারিশ হবে অনুমতি পাওয়ার পরে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ [البقرة: ٢٥٥]

অর্থ: ''এমন কে আছে যে অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?'' [সূরা আল-বাক্বারাহ/২৫৫]

তৃতীয় নীতি: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমন ঘটে এমন লোকদের মাঝে যারা তাদের ইবাদতে শতধা বিভক্ত ছিল; তাদের মধ্যে কেউ ফেরেশতার ইবাদত করতো, কেউ নাবী ও সৎ লোকদের ইবাদত করতো, কেউ গাছ-পালা ও পাথরের পূজা করতো এবং কেউ সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদত করতো। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মধ্যে কোনো প্রকার তারতম্য বা পার্থক্য করা ছাড়াই এদের সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী:

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ [الانفال: ٣٩]

অর্থ: ''আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যেই হয়ে যায়।'' [সূরা আল-আনফাল/৩৯]

তারা যে সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদত করত তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ [فصلت: ٣٧]

অর্থ: ''তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না; সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।'' [সূরা ফুসসিলাত-৩৭]

তারা যে ফেরেশতার ইবাদত করত তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَلَا يَأۡمُرَكُمۡ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرۡبَابًاۚ [ال عمران: ٨٠]

অর্থ: ''আর তিনি আদেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশতাগণ ও নাবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবে।''[সূরা আলে ইমরান/৮০]

মাক্কার কাফেররা যে নাবীগণের ইবাদত করত তার দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ [المائدة: ١١٦]

অর্থ: ‘‘আর যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে মা,বূদ বানিয়ে নাও? ঈসা নিবেদন করবেন আমি তো আপনাকে পবিত্র মনে করি; আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিল না যে, আমি এমন কথা বলি যা বলবার আমার কোনই অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি, তবে অবশ্যই আপনার জানা আছে; আপনি তো আমার অন্তরের কথাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার অন্তরে যা রয়েছে আমি তা জানি না; সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত।’’ [সূরা আল-মায়েদা-১১৬]

মাক্কার লোকরা যে নেককার লোকদের ইবাদত করত তার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী :

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ [الاسراء: ٥٧]

অর্থ: ‘‘তারা যাদের আহ্বান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে বেড়ায় যে তাদের মধ্যে কে কত নিকটতর হতে পারে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।’’ [সূলা আল-ইসরা/৫৭]

তৎকালীন মক্কার লোকেরা যে গাছ-পালা ও পাথরের ইবাদতও করত তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ [النجم: ١٩، ٢٠]

অর্থ: ‘‘তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত, ও `উযযা, সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি `মানাত, সম্বন্ধে?’’ [সূরা আন-নাজম/১৯-২০]

অনুরূপভাবে আবু ওয়াকিদ আল-লায়সী (রাদিয়াল্লাহু আনহুর) হাদীসও এর প্রমাণ, তিনি বলেন:

خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط..... الحديث.

অর্থ: ‘‘আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে হুনাইনের যুদ্ধে বের হলাম, আমরা তখন নূতন মুসলিম ছিলাম। সেকালে মুশরিকদের একটি কুল-বৃক্ষ ছিল, যার পার্শ্বে তারা অবস্থান করতো এবং তাতে তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো। ওটাকে বলা হত যাতু আন্ওয়াৎ (বরকতের গাছ)। আমরা এ ধরনের এক কুল-গাছের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম তখন আমরা আল্লাহর রাসূলকে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্যও একটি ঝুলিয়ে রাখার বৃক্ষ নির্ধারণ করে দিন যেমন তাদের রয়েছে------। আল-হাদীস।

চতুর্থ নীতিঃ আমাদের যুগের শিরককারীদের শিরক পূর্বের যুগের শিরককারীদের থেকে অধিকতর বেশি অন্যায়। কারণ পূর্বের লোকেরা সুখ-সচ্ছলতার সময় শিরক করতো আর দুঃখের সময় একান্তভাবে আল্লাহকেই ডাকতো। কিন্তু আমাদের যুগের শিরককারীরা সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে শিরক করে।

এর দলীল আল্লাহর বাণী,

(فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ) [العنكبوت: ٦٥]

অর্থ: ''অতঃপর তারা যখন নৌকায় আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্তে খাঁটিভাবে আল্লাহকে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদের উদ্ধার করেন, তখনই তারা শিরক করতে থাকে।'' (১) [সূরা আল-আনকাবূত-৬৫]

আল্লাহই সর্বোজ্ঞ। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এ নীতিটিতে বর্তমান সময়ের মুশরিকদের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা তারা পূর্ববর্তী মুশরিকদের চেয়ে বেশি শিরক করছে। বর্তমান সময়ের মুশরিকরা সুখে-দুঃখে সর্বাস্থায় আল্লাহর সাথে শিরক করছে। আর পূর্ববর্তী মুশরিকরা সুখে-সমৃদ্ধিতে আল্লাহর সাথে শিরক করতো আর বিপদে আল্লাহকে আহ্বান করতো এবং তাঁর এককত্ব ঘোষণা করতো।

যে সকল কাফেরদের মাঝে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, যদি তাদের অল্প শিরক থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে কাফের বলেন, তাহলে যারা সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বস্থায় শিরক করছে তাদের কী অবস্থা হবে? সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে তারাই হবে প্রথম সারির কাফের।

চারটি নীতি: তা কাশফুশ শুবহাত (সন্দেহ উন্মোচন) কিতাবের সারাংশ।						
ভূমিকা ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।						
সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।						
যখন নিয়ামত দেয়া হয় তখন কৃতজ্ঞতা করে।						
নিয়ামত হচ্ছে পরীক্ষাস্বরূপ। এর প্রমাণ হলো, [الأنبياء: ٣٥] وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً অর্থ: আমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করি। (সূরা আল-আম্বিয়া:৩৫)						
	নিয়ামতের শুকরিয়া করা:	রুবুবিয়্যাহর সাথে সম্পৃক্ত:				আল্লাহর নিকট জান্নাত কামনা করা হয়। কেননা তিনিই জান্নাতের মালিক। অনুরূপভাবে রিযিকও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে। সুতরাং এটা শুধু আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। অন্য কারো সাথে নয়।
		তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর সাথে সম্পৃক্ত:				ক. অন্তরের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা করা: তা হলো পূর্ণ ঈমান রাখা, বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেয়া যে, প্রত্যেকটি নিয়ামত বান্দা আল্লাহর পক্ষ হতেই পায়।
						খ. জিহ্বার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা করা: قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ [النمل: ٤٠] অর্থ: "তিনি বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃজ্ঞ হই।" (সূরা আল-নামল:৪৫)
						গ. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা করা: নি'য়ামতদাতার কৃতজ্ঞতা করে নি'য়ামত ব্যবহার করা। প্রত্যেকটি নিয়া'মত যথাযথ ব্যবহার করা। সুতরাং ধন-সম্পদের কৃতজ্ঞতা করার অর্থ হলো, তা আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে ব্যয় করা। আর ইলম বা বিদ্যার কৃতজ্ঞতা করার অর্থ হলো, বিদ্যা সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদের কাছে তার বর্ণনা দেয়া। হয়তো সেটি মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে হবে কিংবা লিখনীর মাধ্যমে হবে।
	বিপদের সময় মানুষের অবস্থা:					অসন্তুষ্ট ব্যক্তি: এর হুকুম হলো কাবীরা গুনাহ। এটা কখনো কখনো শিরকে আছগার বা ছোট শিরক হয়ে যায়। অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে অন্তর, জিহ্বা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে।
						ধৈর্য ধারণকারী: সকল আলেমদের ঐকমত্যে অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক। ধৈর্য নামটি তিক্ত কিন্তু তার শেষ ফলাফল মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি।

				সন্তুষ্ট ব্যক্তি: এর হুকুম মুস্তাহাব। আর তার প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হলো, সে একথা বিশ্বাস করবে যে, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে আসে। আর আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তার প্রত্যেকটিতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।
				কৃতজ্ঞতা কারী: এটা সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক প্রিয় স্তর। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারীরাই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় বান্দা হয়।
	পাপ করার পর ক্ষমা প্রার্থনা করে।			
		আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করবো? ও শিরকের ভয়াবহতা		الحنيفية এর পরিচয়: একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করাই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর মিল্লাত। আল্লাহ তোমাকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাওহীদ ব্যতীত ইবাদতকে ইবাদত বলা যায় না। যখন ইবাদতের সাথে শিরক সংমিশ্রিত হয় তখন ইবাদতকে বাতিল করে দেয়, আমলকে বাতিল করে দেয় ও এ ধরণের আমলকারীকে চিরস্থায়ী জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। সুতরাং তোমার উপর করণীয় হলো, এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।
	চারটি নীতি	প্রথম নীতি: ঐ সমস্ত কাফের যাদের সাথে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করেছিলেন, তারা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ স্বীকার করত কিন্তু তারা তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ অস্বীকার করত। তবুও এ স্বীকারোক্তি তাদেরকে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করায়নি।		
		দ্বিতীয় নীতি: কাফের ও মুশরিকরা তাদের বাতিল মা'বুদদের আহ্বান করে শুধু নৈকট্য লাভ ও শাফাআ'তের আশায়।		
		তৃতীয় নীতি: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমন ঘটে এমন লোকদের মাঝে যারা তাদের ইবাদতে শতধা বিভক্ত ছিল, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মধ্যে কোনো প্রকার তারতম্য করেননি।		
		চতুর্থ নীতি: আমাদের যুগের শিরককারীদের শিরক পূর্বের যুগের শিরককারীদের থেকে অধিকতর বেশি অন্যায়।		

চারটি নীতির পরীক্ষা

ছাত্রের নাম---------- কিতাবুত তাওহীদ মুখস্থের পরিমাণ----------

তুমি কি চারটি নীতি মুখস্থ করেছ ----------

আমল	কুরআন ও হাদীস হতে দলীল
১. নিয়ামত পরীক্ষাস্বরূপ	
২. কাফেরদের তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ স্বীকারোক্তি	
৩. নৈকট্য লাভের প্রার্থনা	
৪. অস্বীকৃতি শাফা'আত	
৫. চন্দ্র-সূর্য ব্যাপারে দলীল	
৬. ফেরেশতাদের ব্যাপারে দলীল	
৭. নাবীদের ব্যাপারে দলীল	
৮. সৎ বান্দাদের ব্যাপারে দলীল	
৯. গাছ-পালা ও পাথরের ব্যাপারে দলীল	
১০. মুশরিকরা বিপদে আল্লাহকে আহ্বান করতো এবং সুখ-সচ্ছলতায় শিরক করতো	
১১. শিরকের দলীল	

নিম্নে বর্ণিত প্রশ্ন সম্পর্কে তুমি যা জান লিখ

১. আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করবো?	১. ২. ৩. ৪.
৫. ৬. ৭. ৮. ৯.	
২. আমরা কেন চারটি নীতি অধ্যয়ন করবো?	১. ২.
৩. ৪.	
৩. চারটি নীতির প্রকারভেদ সমূহ	১. ২. ৩.
৪. চারটি নীতি একটি কিতাবের সারাংশ	
৫. আমরা কেন কাশফুশ শুবহাত বইটি অধ্যয়ন করবো?	
৬. সৌভাগ্যের চাবিকাঠি	
৭. الحنيفية এর পরিচয়:	১. ২. ৩.
৮. চারটি নীতি অধ্যয়নের উপকারিতা	
৯. আল্লাহর অলী কারা:	শাইখুল ইসলাম বলেছেন:
১০. আল্লাহর অলীদের ব্যাপারে দলীল	এবং কেন:
১১. নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা উদাহরণসহ বল	১.
২.	
৩.	
১২. আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক কেমন হবে?	
১৩. বিপদের সময় মানুষের অবস্থাসমূহ হুকুমসহ উল্লেখ কর	১.
	২.
৩. ৪.	
১৪. শাফাআ'তের শাব্দিক পরিচয়:	শাফাআ'তের পারিভাষিক পরিচয়:
১৫. শাফা'আতের প্রকার	১. ২.
১৬. স্বীকৃত শাফাআ'তের শর্ত সমূহ	১. ২. ৩.
স্বীকৃত শাফাআ'তের প্রকার: ১.	এর প্রকারভেদ: ক. খ.
২. এর প্রকারভেদ:	ক. খ.
১৭. প্রথম নীতি	
১৮. দ্বিতীয় নীতি	
১৯. তৃতীয় নীতি	
২০. চতুর্থ নীতি	
২১. কোনো আমলের সাথে যখন শিরক সংমিশ্রিত হয় তখন তার হুকুম কী?	দলীল:

সূচিপত্র

তিনটি মূলনীতি ও তার প্রমাণপঞ্জি		
১	ভূমিকা	৩-৭
২	চারটি মাসআলা	৮-১২
৩	তিনটি মাসআলা	১২-১৫
৪	তাওহীদ অধ্যয়নের গুরুত্ব	১৬
৫	তিনটি মূলনীতি	১৭-৫১
৬	শেষ কথা	৫১
৭	ছক আকারে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী	৫২-৫৪
৮	তিনটি মূলনীতির পরীক্ষা	৫৫-৫৮

চারটি নীতি:		
১	ভূমিকা	৫৯-৬৫
২	প্রথম নীতি	৬৬
৩	দ্বিতীয় নীতি	৬৭-৬৯
৪	তৃতীয় নীতি	৬৯-৭০
৫	চতুর্থ নীতি	৭১
৬	ছক আকারে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী	৭২-৭৩
৭	চারটি নীতির পরীক্ষা	৭৪-৭৫
৮	সূচিপত্র	৭৬-৭৭

التقسيم و التقعيد للقول المفيد
على كتاب التوحيد

আত-তাক্বসীম
ওয়াত-তাক্ব`য়ীদ লিল
ক্বওলিল মুফীদ

শাইখ হাইছাম বিন জামিল সারহান

শিক্ষকঃ মা’হাদুল হারাম, মসজিদ নাববী- সৌদী আরব

http//attasseel-alelmi.com

অনুবাদক:

ড. কাওসার এরশাদ মুহাম্মাদ

পি.এইচ.ডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা ভাষা - اللغة البنغالية

আত-তাক্বসীম ওয়াত-তাক্বু'ঈদ লিল ক্বওলিল মুফীদ

শাইখ হাইছাম বিন জামীল সার্‌হান (হাফিযাহুল্লাহ)
শিক্ষক: মা'হাদুল হারাম, মাসজিদ নাববী- সৌদী আরব।
http://attasseel-aleilmi.com

অনুবাদক: ড. কাওসার এরশাদ মুহাম্মাদ
পি.এইচ.ডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইবনু উছাইমিন (রহঃ) রচিত ‘কাওলুল মুফীদ’ গ্রন্থের

তাকসীম ও তাকঈদ

মূলঃ
রবের ক্ষমার মুখাপেক্ষী
হায়ছাম বিন মুহাম্মদ জামিল সারহান
প্রাক্তন শিক্ষকঃ মসজিদে নববীস্থ হারাম ইন্সটিটিউট
তত্ত্বাবধায়কঃ আত-তাসীল আল-ইলমী ওয়েবসাইট

মহান আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত লেখক, লেখকের পিতা মহোদয় ও এই গ্রন্থ প্রকাশনায় সার্বিক সহায়তাকারী সকলকে মার্জনার বারিধারা বর্ষণ করুন। আমীন।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, তার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি এবং সকল প্রকার আত্মিক অনিষ্টসমূহ ও মন্দ কর্মসমূহ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না এবং তিনি যাকে বিপথগামী করেন, কেউ তাকে হিদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশিদার নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

গ্রন্থ পাঠের পূর্বে যে বিষয়গুলি জানা বাঞ্চনীয়

[১] এই গ্রন্থ পাঠের পূর্বে শিক্ষার্থীদের কিতাবুত তাওহীদের মতন (মূল বই) মুখস্ত করা একান্ত জরুরী। (মুখস্ত করো, প্রত্যেক হাফেযই ইমাম ছিলেন)

[২] প্রত্যেক আয়াতের দলীল সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এবং অধ্যায়ের মধ্যে তা উল্লেখিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া।

[৩] কিতাবুত তাওহীদের সাথে প্রত্যেক অধ্যায়ের সামঞ্জস্যতা ও গ্রন্থের মধ্যে অধ্যায়টি সংযুক্ত করণের কারন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। যাতে করে সে গ্রন্থের সাথে ভালোভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে।

[৪] আমরা একটি ব্যাখ্যার উপর কেন্দ্রীভূত হবো। আর আমাদের নিকট নির্ভরশীল ব্যাখ্যা হচ্ছে: শায়খ ইবনু উছাইমিন (রহঃ) রচিত 'কওলুল মুফিদ' গ্রন্থটি। অতঃপর যখন এর ব্যাখ্যা থেকে গ্রহণ করা শেষ হবে, তখন আমরা অন্য ব্যাখ্যা গ্রহণ করব। এভাবেই আমরা এই গ্রন্থটি রচনার প্রয়াস চালাবো। যাতে করে মূল বিষয়গুলি ব্যাখ্যার মধ্যে অনুপ্রবেশ না ঘটে।

[১] কেননা আল্লাহওয়ালা ওলামায়ে কেরামরা এই গ্রন্থ পাঠের ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন।

[২] কেননা এই প্রসঙ্গে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠতর গ্রন্থ।

[৩] কেননা গ্রন্থ রচিয়তা (রহঃ) বিরোধীদের যুক্তিকে খুব সুন্দর ভাবে খন্ডন করেছেন এবং দলীলের মাধ্যমে সংশয়ের নিরসন করেছেন।

[৪] কেননা আল্লাহ তায়ালা তার জন্য যমীনে গ্রহনযোগ্যতা প্রনয়ণ করেছেন।

[৫] এটি মুখস্ত ও অনুধাবনের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে।

[৬] অধ্যায় সন্নিবেশ ও ক্রমধারা উৎকৃষ্টতা সমৃদ্ধ।

[৭] এটি পাঠদানের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বিশেষ মনোযোগ পরিলক্ষিত হয়েছে ও এর ব্যখ্যা গ্রন্থের আধিক্যতাও রয়েছে।

[৮] কেননা এই গ্রন্থটি কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা সমৃদ্ধ।

[৯] এর এবারাত (অর্থপূর্ণ শব্দসমষ্টি) সহজসাধ্যতা।

[১০] গ্রন্থ প্রণেতা প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরাম সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি জ্ঞানের ব্যাপারে যথেষ্ঠ যোগ্য ও সঠিক আকিদাধারী।

[১১] কেননা এই গ্রন্থটি বিশেষ যত্নের সহিত তাওহীদুর উবুদিয়্যাহ (ইবাদাত সংক্রান্ত) এর আলোচনা ধারণ করেছে, যে তাওহীদের মধ্যে বড় ধরনের ত্রুটি/ বিকৃতি সংঘটিত হয়েছে। এর পাশাপাশি তাওহীদুল রুবুবিয়্যাহ এবং আসমা ওয়াস সিফাত এর আলোচনাও উল্লেখিত হয়েছে।

[১২] কেননা গ্রন্থ প্রণেতা (রহঃ) সালাফদের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এমনকি তিনি তার গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মতো স্বীয় মতামত উল্লেখ করেন নি।

কিতাবুত তাওহীদের অধ্যায়সমূহের সারসংক্ষেপ (৬৭টি অধ্যায়)

যে কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন আরম্ভ করার পূর্বে সেই গ্রন্থের ভূমিকা ও সূচীপত্র পাঠ করা বাঞ্চনীয়। যাতে সে গ্রন্থের বিষয়বস্তু, সংকলন পদ্ধতি ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের চিত্র সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এর উপর ভিত্তি করে আমরা এই গ্রন্থটিকে ১০টি বিভাজনে বিভাজিত করার প্রয়াস পেয়েছি।

প্রথম:অবতরনিকা (৫টি অধ্যায়)

[১] (এই অধ্যায়ের শিরোনাম দেওয়া হয়নি, আর এটি হচ্ছে তাওহীদের অপরিহার্যতা প্রাসঙ্গিক অধ্যায়)

এই অধ্যায়টি এটি বর্ণনার জন্য উল্লেখিত হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তাওহীদ প্রথম ও ওয়াজিবসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ববহ ওয়াজিব। আর এটিই ছিল নবীগণের (আঃ) দাওয়াতের বিষয়বস্তু।

[২] তাওহীদের মর্যাদা ও তাওহীদের ফলে যে সকল পাপ মোচন হয়

আগ্রহান্বিতকরণের জন্য এই অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে, আর এটিও বর্ণনার জন্য এই অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে যে, কোন বিষয়ের ফযীলত উল্লেখ করা সে বিষয়ের ওয়াজিবের অস্তিত্বহীনতার প্রমাণ বহন করেনা।

[৩] যে ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে সে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে

এই অধ্যায়টি শিরক, বিদআত ও অবাধ্যতা থেকে তাওহীদকে রক্ষা করার নিমিত্তে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তাওহীদের অপরিহার্যতা ও তার ফযীলতের অধ্যায়দ্বয়ের পর এ অধ্যায়টি উল্লেখ করা যথোপযুক্ত হয়েছে।

[৪] শিরক সম্পর্কীয় ভীতি

এই অধ্যায়টি এই জন্যই বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, সে স্বয়ং ও অপরের ক্ষেত্রে শিরক থেকে ভয় করবে। কেননা সে হয়ত ধারণা করবে যে, সে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে, কিন্তু প্রকৃতার্থে সে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে নি। আর এই অধ্যায়ের পরে আগত সকল অধ্যায়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন, শিরক সম্পর্কীয় ভীতি অধ্যায়টি তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

[৫] লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর প্রতি সাক্ষ্যদানের আহ্বান

এই অধ্যায়টি ২ টি কারণে বর্ণিত হয়েছে (আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক জ্ঞাত):

১। যে ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, তার জন্য অবশ্য করণীয় হচ্ছে, সে রাসূল (সাঃ) এর কার্য ও তার ধারা অনুসারে মানুষদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করবে।

২। এবং যে ব্যক্তি বলে যে প্রথম আহুত বিষয় ছিল সালাত (নামাজ), তার উক্তি প্রত্যাখানের জন্য।

দ্বিতীয়: তাওহীদের ব্যাখ্যা (৯টি অধ্যায়)

[৬] তাওহীদ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দানের ব্যাখ্যা

তাওহীদের অপরিহার্যতা, তাওহীদের দিকে মানুষদেরকে আগ্রহী করা, তাওহীদ প্রতিষ্টাকরণের আবশ্যকতা, তাওহীদ এর বিবপরীত বিষয় (শিরক) থেকে ভয় করা, তাওহীদের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করা- এ সমস্ত বিষয়গুলি আলোচনা করার পর আমাদের জন্য যথাযোগ্য হচ্ছে, এই অধ্যায়ের শুরু থেকে কিতাবের শেষ পর্যন্ত তাওহীদের প্রকৃতার্থ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা।

[৭] বালা মসিবত দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রিং, সূতা প্রভৃতি ব্যবহার করা শিরক

এই অধ্যায় তাওহীদের বিপরীত বিষয় (শিরক) জানার মাধ্যমে তাওহীদকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়টি তাওহীদ বিরোধী শিরকি ঝাড়-ফুক ও তাবিজ কবজের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

[৯] যে ব্যক্তি গাছ, পাথর প্রভৃতির দ্বারা বরকত অর্জন করতে চায়

উল্লেখিত অধ্যায়টি তাওহীদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নিষিদ্ধ বরকত হাসিলের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে।

[১০] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করা প্রসঙ্গে

সম্মানিত গ্রন্থ প্রণেতা আলোচ্য অধ্যায়ে তাওহীদ বিরোধী, ভালবাসা ও সম্মানের সহিত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ সম্পাদিত হওয়ার বিশ্লেষণের মনস্থ করেছেন।

[১১] যে স্থানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা হয়, সে স্থানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা যাবেনা

কতিপয় মূর্খ লোক মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য ও তাদের শিরকি কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের নিমিত্তে তাদের উৎসবে ও তাদের ইবাদাতস্থলে পশু যবেহ করে থাকে, যা তাওহীদের সাথে পূর্ণাঙ্গরুপে অসঙ্গতিপূর্ণ। সম্মানিত লেখক এই অধ্যায়ে এই সকল কর্মকান্ডের বিশ্লেষণের ইচ্ছা করেছেন।

[১২] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে মানত করা শিরক

তাওহীদ বিরোধী নিষিদ্ধ মানতের ব্যাখ্যার জন্য উল্লেখিত অধ্যায়টি আনিত হয়েছে।

[১৩] আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা শিরক

সম্মানীত গ্রন্থ রচয়িতা এই অধ্যায়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা প্রসঙ্গে বিশ্লেষণের মনস্থ করেছেন, আর যেটি আল্লাহ ছাড়া কেউ প্রদান করতে সক্ষম নন এবং তা তাওহীদের বিপরীত।

[১৪] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া অথবা দুআ করা শিরক

সম্মানীত গ্রন্থ প্রণেতা আলোচ্য অধ্যায়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া ও দুআ করা প্রসঙ্গে বিশ্লেষণের মনস্থ করেছেন, আর যেটি আল্লাহ ব্যতীত কেউ প্রদান করতে সক্ষম নন এবং তা তাওহীদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

তৃতীয়: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত বাতিল (৪ অধ্যায়)

[১৫] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿তারা কি আল্লাহর সাথে এমন সব বস্তুকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা। বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট হয়।﴾

উল্লেখিত অধ্যায়টির অবতারণা হয়েছে এই জন্য যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত নিষিদ্ধ, হোক না সে নবী অথবা প্রতিমা অথবা অন্য কেউ।

[১৬] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন লোকদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে তখন তারা সুপারিশকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন? তারা বলবে, সঠিক জবাবই পাওয়া গিয়েছে আর তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠ।﴾

সম্মানীত ফেরেশতামন্ডলীর জন্য ইবাদাত নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[১৭] শাফা'আত (সুপারিশ)

শাফায়াাতের ক্ষেত্রে কাফেরদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ইলাহ বাতিল প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে।

[১৮] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়াত করতে পারবেন না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন।﴾

আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ হেদায়াতের তাওফীকদাতা বিশ্বাস সম্পূর্ণরুপে বাতিল প্রসঙ্গে এই অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ: বনী আদমের কুফরীর কারন (৪টি অধ্যায়)

তাওহীদের ব্যাখ্যা ও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত বাতিল মর্মে আলোচনা উপস্থাপন করার পর মানুষদের কুফুরীতে পতিত হওয়ার কারণ ও ফলাফল প্রসঙ্গে আলোচনা উল্লেখ করা উপযোগী হয়েছে।

[১৯] নেককার পীর-বুযুর্গ লোকদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা বনী আদমের কুফরী এবং তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করার অন্যতম কারণ

বনী আদমের কুফুরীতে পতিত হওয়ার সর্বাধিক বিপজ্জনক কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম; আর তা হলো,জমীনে সংঘটিত প্রথম শিরক প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি বর্নিত হয়েছে।

[২০] নেককার বুযুর্গ ব্যক্তির কবরের পাশে ইবাদাত করার ব্যাপারে যেখানে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেখানে ঐ নেককার ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ইবাদাত কিভাবে জায়েজ হতে পারে?

শিরকে পতিত হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে আরো উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, সাদৃশ্য স্থাপন করা, চিত্রাঙ্কন/ ভাস্কর্য ও কবরকে মসজিদরুপে গ্রহণ করা।

[২১] নেককার বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করলে তা তাকে মূর্তি পূজা তথা গাইরুল্লাহর ইবাদাতে পরিণত করে

কুফরীর কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, নেককার বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা।

[২২] তাওহীদের সংরক্ষণ ও শিরকের সকল পথ রুদ্ধ করার ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ) এর অবদান

বিশ্বাস ও কর্মে শিরক সংঘটিত হওয়ার পদ্ধতিসমূহে রাসূল (সাঃ) এর প্রতিবন্ধকতা। এবং শিরকের নিকট পৌঁছে দেয় এমন কথা যা হতে রাসূল (সাঃ) বাঁধা দিয়েছেন মর্মে অধ্যায় সামনে উল্লেখিত হবে।

পঞ্চম: যে বলে এই উম্মাতের মধ্যে অথবা আরব ভূখন্ডে শিরক প্রবেশ করবে না, তার যুক্তির খন্ডন (১টি অধ্যায়)

[২৩] এই উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোক মূর্তিপূজা করবে

ষষ্ঠ: শয়তানী আমলসমূহ (৭টি অধ্যায়)

[২৪] যাদু

নিশ্চয়ই যাদু আল্লাহর সাথে কুফুরী ছাড়া অন্য কোন উপায়ে উদ্ভূত হয়না। আর এটিই হচ্ছে মানুষদেরকে কুফুরীর দিকে আহ্বান করার অন্যতম বৃহত্তর পন্থা মর্মে আলোচ্য অধ্যায়টির অবতারণা হয়েছে।

[২৫] যাদুর শ্রেণীভূক্ত বিষয়

'নিশ্চয়ই যাদুর বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, যার সবগুলি থেকে এড়িয়ে চলা আবশ্যক' নির্দেশনাটি আমাদেরকে জ্ঞাত করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[২৬] গণক ও ভবিষ্যতদ্বক্তাদের বিবরণ

তাদের (গণক ও ভবিষ্যতদ্বক্তাদের) বিবরণ আমাদের নিকট উপস্থাপন করার জন্য ও তাদের নিকট যাওয়ার বিধান এবং তাদের নিকট যাওয়ার চিত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[২৭] নুশরাহ বা প্রতিরোধমূলক যাদু

আলোচ্য অধ্যায়টি নুশরাহ বা প্রতিরোধমূলক যাদুর নিষেধাজ্ঞা ও অনুমতির ব্যাপারে জটিলতা নিরসনের জন্য উল্লেখিত হয়েছে।

[২৮] কুলক্ষণ সম্পর্কীয় বিবরণ

জাহেলীযুগর লোকেরা অশুভ লক্ষণের যে বিশ্বাসের উপর প্রবহমান ছিল, তার অবিদ্যমানতা বর্ণনার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টির অবতারণা হয়েছে।

[২৯] জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কীয় শরীয়াতের বিধান

তথাকথিত জ্যোতিষশাস্ত্র বাতিল বর্ণনার জন্য এই অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

[৩০] নক্ষত্রের ওসীলায় বৃষ্টি কামনা করা

শিরকি কারণসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকান্ড বাতিলকরণের জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি উপস্থাপিত হয়েছে।

সপ্তম: অন্তরের আমলসমূহ (৯টি অধ্যায়)

[৩১] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿মানুষের মধ্যে এমনও মানুষ আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে শরীক সাব্যস্ত করে, আল্লাহকে ভালবাসার মতই তাদেরকে ভালবাসে﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসার মতো সৃষ্টিকুলকে ভালবাসবে বা তার চেয়ে বেশি ভালবাসবে, তার তাওহীদের অস্তিত্বহীনতা প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে।

[৩২] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿নিশ্চয়ই এরা হলো শয়তান, যারা তোমাদেরকে তার বন্ধুদের (কাফের বেঈমান) দ্বারা ভয় দেখায়﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করার মতো সৃষ্টিকুলকে ভয় করবে বা তার চেয়ে বেশি ভয় করবে, তার তাওহীদের অবিদ্যমানতা প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায় আনিত হয়েছে।

[৩৩] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা মুমিন হও﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর ভরসা করবে, তার তাওহীদের অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

[৩৪] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে﴾

তাওহীদপন্থী ব্যক্তি তার জীবন-চরিতে আল্লাহর দিকে ভয় ও প্রত্যাশার মাঝামাঝি অবস্থানের সন্নিবেশ ঘটাবে, এই মর্মে উক্ত অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৩৫] তাকদীরের উপর ধৈর্যধারণ করা ঈমানের অঙ্গ

বালা-মসিবতের সময় তাওহীদপন্থী ব্যক্তির অবস্থা প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৩৬] রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) প্রসঙ্গে শরীয়াতের বিধান

তাওহীদপন্থী ব্যক্তির উপর রিয়ার (প্রদর্শনেচ্ছা) বড় ভয়াবহতা বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে। আর সৎ ব্যক্তিদের উপর সর্বাধিক আশঙ্কিত বিষয় হচ্ছে রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা)।

[৩৭] নিছক পার্থিব স্বার্থে কোনো কাজ করা শিরক (ছোট শিরক)

যে ব্যক্তি দুনিয়া প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আখিরাতের আমল করবে, সে শিরক এর মধ্যে পতিত হবে প্রসঙ্গে এই অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে। আর এর বিশ্লেষণ হচ্ছে, সে দুনিয়া প্রপ্তির জন্যই কোন কাজে সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হবে।

[৩৮] যে ব্যক্তি আল্লাহর হালালকৃত জিনিস হারাম এবং হারামকৃত জিনিসকে হালাল করার ব্যাপারে (অন্ধভাবে) আলেম বুযুর্গ ও নেতাদের আনুগত্য করল, সে মূলত তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহন করল (আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিমিত্তে বিচারকার্য ফায়সালা করা তাওহীদকে বিনষ্ট করে প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

[৩৮] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿তারা বিরোধীয় বিষয়কে তাগুত (খোদাদ্রোহী শক্তি) এর দিকে নিয়ে ফয়সালা করতে চায়﴾

তাওহীদপন্থী ব্যক্তিকে তাগুতের মাধ্যমে কুফুরের অর্থকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি বর্নিত হয়েছে এবং খাঁটি ও ভেজালযুক্ত ঈমানের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেও আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

অষ্টম: তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত (১টি অধ্যায়)

[৪০] আল্লাহর 'আসমা ও সিফাত' (নাম ও গুনাবলী) অস্বীকারকারীর পরিনাম

যে ব্যক্তি আল্লাহর আসমা ও সিফাতের মধ্য থেকে কোন কিছুকে অস্বীকার করবে, তার তাওহীদের অস্তিত্বহীনতা প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

নবম: শাব্দিকী ও শিরকি নিষেধসমূহ (২৯টি অধ্যায়)

[৪১] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿তারা আল্লাহর নিয়ামত চিনতে পেরেছে, অতঃপর তা অস্বীকার করে﴾

নিয়ামতরাজীর বিপরীতে একজন তাওহীদপন্থী ব্যক্তির উপর যা ওয়াজিব, তা বর্ণনার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৪২] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿অতএব জেনে শুনে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না﴾

আল্লাহর নামে শপথ করা, অন্য কারো নামে শপথ করা নয় প্রসঙ্গিক তাওহীদপন্থী ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টির অবতারণা হয়েছে এবং 'ওয়াও' ও 'ছুম্মার' মাঝে পার্থক্য প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

[৪৩] আল্লাহর নামে কসম করে সন্তুষ্ট না থাকার পরিণাম

আল্লাহর নামে শপথ করার সময় তাওহীদপন্থী ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর মর্যাদা/মহত্ত্ব এর অবস্থানের বিবরণ প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৪৪] আল্লাহ ও আপনি যা চেয়েছেন বলার হুকুম

'মাশিয়াহ' (ইচ্ছা) এর ক্ষেত্রে অংশীদার স্থাপন থেকে তাওহীদপন্থী ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য এই অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৪৫] যে ব্যক্তি যামানাকে গালি দেয় সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়

উল্লেখিত অধ্যায়টি তাওহীদপন্থী ব্যক্তিকে কোন কিছুকে গালি দেয়া থেকে সতর্ক করার জন্য বর্ণিত হয়েছে। কেননা যখন কোন কিছুকে গালি দেয়া হয়, তখন সেই গালিটা যিনি সেই বিষয়ের নির্দেশদাতা ও পরিচালক তার উপর আরোপিত হয়।

[৪৬] কাযীউল কুযাত (মহা বিচারক) প্রভৃতি নামকরণ প্রসঙ্গে

আলোচ্য অধ্যায়টি মুআহ্হিদ (আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী) ব্যক্তিকে রুবুবিয়্যাহ এর পারিপার্শ্বিক বিষয়ে সীমালঙ্ঘন থেকে সতর্ক করার জন্য উল্লেখিত হয়েছে।

[৪৭] আল্লাহর নামসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সম্মানার্থে নামের পরিবর্তন করা

আল্লাহ, তাঁর আসমা ও সিফাত, তাঁর দ্বীন ও তাঁর নবীদের সাথে আদব রক্ষার্থে মুআহ্হিদ ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৪৮] আল্লাহর যিকির, কুরআন এবং রাসূল সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে খেল তামাশা করা প্রসঙ্গে

বিদ্রুপকারী/ ঠাট্টাকারী ব্যক্তি তাওহীদের মূল বিষয় থেকে অস্তিত্বহীন হয়ে যায়, এবং এমন ব্যক্তির সাথে পারস্পরিক আচরণ পদ্ধতি ও জিহ্বাকে সংবরণ করার আবশ্যকতা প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

[৪৯] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿দুঃখ-দুর্দশার পর যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলে, এ নিয়ামত আমারই জন্য হয়েছে﴾

নিয়ামতপ্রাপ্তির পূর্বে ও পরে তাওহীদপন্থী ব্যক্তির উপর যা ওয়াজিব, সে প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে।

[৫০] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿অতঃপর আল্লাহ যখন উভয়কে একটি সুস্থ ও নিঁখুত সন্তান দান করলেন, তখন তারা তাঁর দানের ব্যাপারে অন্যকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত গণ্য করতে শুরু করল﴾

নিয়ামতরাজি আসার পূর্বে তাওহীদপন্থী ব্যক্তির উপর যা ওয়াজিব ও আল্লাহ ছাড়া প্রত্যেক বশীভূত/অনুগত ব্যক্তির নাম নেওয়া হারাম।

[৫১] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿আল্লাহ তায়ালার সুন্দর সুন্দর অনেক নাম রয়েছে, তোমরা এসব নামে তাঁকে ডাক।﴾

আল্লাহ তায়ালার আসমা ও সিফাতের ক্ষেত্রে মুআহ্হিদ (তাওহীদপন্থী) ব্যক্তিকে অবিশ্বাস থেকে সতর্ক করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে।

[৫২] আসসালামু আলাল্লাহ (আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলা যাবে না

আল্লাহর সাথে আদবের ক্ষেত্রে অসঙ্গতিপূর্ণ শব্দাবলী ব্যবহার থেকে সতর্ক করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৫৩] 'হে আল্লাহ তোমার মর্জি হলে আমাকে মাফ করো' বলা প্রসঙ্গে

মুআহ্হিদ ব্যক্তি দুআর ক্ষেত্রে ব্যত্যয় অবলম্বন করা, ও আল্লাহর ক্ষমতা অনুভব করা থেকে সতর্ক করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

[৫৪] আমার দাস-দাসী ও আমার উম্মাত বলা যাবে না

উত্তম শব্দাবলী ব্যবহারের জন্য মৃআহ্হিদ ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার নিমিত্তে আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে।

[৫৫] আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চাইলে বিমুখ না করা

মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে যখন আল্লাহ প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন সে আল্লাহর সম্বানার্থে উত্তর প্রদান করবে মর্মে এই অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৫৬] 'বি ওয়াজহিল্লাহ' বলে একমাত্র জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করা যায়না

আল্লাহর সম্মান/মর্যাদা ও আল্লাহর সাথে পরিপূর্ণ আদবের ক্ষেত্রে মুআহ্হিদ ব্যক্তির অবস্থা প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

[৫৭] বাক্যের মধ্যে 'যদি' শব্দ ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা

সুন্দর বাক্যাবলী/কথা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুআহ্হিদ ব্যক্তির আদব এবং শরীয়াত ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিকতার অনুপস্থিতি বর্ণনার নিমিত্তে আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে।

[৫৮] বাতাসকে গালি দেওয়া নিষেধ

অপছন্দনীয় কিছু দেখলে মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে হিতকর কথা ব্যবহারের দিকে পথনির্দেশের জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৫৯] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿তারা জাহেলী যুগের ধারণার মতো আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা পোষণ করে﴾

জাহেলীযুগের ব্যক্তিদের মতো আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে মন্দ ধারণা থেকে মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে সাবধান করার জন্য উল্লেখিত অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৬০] তাকদীর অস্বীকারকারীদের পরিণতি

ফায়সালা ও তাকদীরের ক্ষেত্রে মুআহ্হিদ ব্যক্তির ঈমানের অবস্থা বর্ণনার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

[৬১] ছবি অঙ্কনকারী বা চিত্র শিল্পীদের পরিণাম

রুবুবিয়্যাতের সান্নিধের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর সীমালঙ্ঘন থেকে মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

[৬১] অধিক কসম সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান

মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে ঈমান সংরক্ষণ ও মানুষের সাথে পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা রক্ষার উপদেশ প্রদানের জন্য আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে।

[৬২] আল্লাহ ও তার রাসূলের জিম্মাদারী সম্পর্কিত বিবরণ

'সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর নবীর জিম্মার প্রতি মুআহ্হিদ ব্যক্তি যেন সম্মান প্রদর্শন করে' মর্মে আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৬৪] আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম করার পরিণতি

বান্দার প্রতি রহমতের দরজা বন্ধের মাধ্যমে রুবুবিয়্যাতের সান্নিধ্যের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন থেকে মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৬৫] আল্লাহর মাধ্যমে তার সৃষ্টির নিকটে সুপারিশ কামনা করা যায় না

সৃষ্টির পদ/মান/মর্যাদা কে স্রষ্টার থেকে উচ্চতর স্থাপন করার ক্ষেত্রে মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে সাবধান করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৬৬] রাসূল (সাঃ) কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ এবং শিরকের মূলোৎপাটন

শিরকের দিকে পৌঁছে দেয় প্রত্যেক এমন কথা/বাক্যাবলী থেকে মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য এই অধ্যায়টি আনিত হয়েছে।

দশম: পরিশিষ্ট (১টি অধ্যায়)

[৬৭] আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿তারা আল্লাহর যথার্য মর্যাদা নিরুপণ করতে পারেনি।﴾

আলোচ্য অধ্যায়টি মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে এটি অবগত করার জন্য বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয়ই মুশরিকরা যারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরুপন করতে পারেনি, তারা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি। সুতরাং, হে মুআহ্হিদ! তাদের পথ ও পন্থা থেকে সতর্ক থাক।

প্রথম: কিতাবুত তাওহীদের ভূমিকা (৫টি অধ্যায়)

এই গ্রন্থের ভূমিকা কেন উল্লেখিত হয়নি?

[১] কতিপয় অনুলিপি লেখকের নিকট থেকে ছুটে গেছে। তবে কিছু কিছু অনুলিপিতে বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও রাসূলের প্রতি দরুদ দৃশ্যিত হয়েছে।

[২] শিরোনাম দ্বারা প্রারম্ভই যথেষ্ঠ মনে করা হয়েছে। কেননা গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উপর শিরোনাম রচিত হয়েছে, আর তা হলো তাওহীদ।

[৩] ইমাম বুখারী (রহঃ) এর অনুসরণে কেননা তিনিও তার গ্রন্থে ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেননি, এবং তিনি মানুষদেরকে কুরআন ও হাদীসের সাথে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন।

[৪] গ্রন্থের প্রথম ৫ অধ্যায় ভূমিকার সাথে সংশ্লিষ্টপূর্ণ।

তাওহীদের সংজ্ঞা

আভিধানিক:তাওহীদ শব্দটি শব্দমূল, অর্থ:কোন বস্তুকে একক করা যখন তা একক এর জন্যই সৃষ্ট হয়।

শারয়ী: রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত ও আসমা ও সিফাত এর ক্ষেত্রে যা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট তা একক্রুপে তার জন্য সাব্যস্ত করা।

[১] তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ:

সৃষ্টি, রাজত্ব ও কর্তৃত্ব পরিচালনায় আল্লাহকে একক হিসেবে বিশ্বাস করা অথবা কার্যাবলিতে আল্লাহকে একক হিসেবে বিশ্বাস করা।

[২] তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ (এবাদত):

এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা অথবা ইবাদাত জাতীয় কার্যাবলিতে আল্লাহকে একক হিসেবে সাব্যস্ত করা।

[৩] তাওহীদুল আসমা ও সিফাত:

আল্লাহ তার কিতাবে অথবা রাসূলের ভাষ্য দ্বারা নিজেকে যে সমস্ত নামে নামকরন করেছেন এবং সমস্ত গুণাবলিতে বিশেষিত করেছেন, সে সমস্ত নাম ও গুণাবলিতে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে নেওয়া। আর তা হলো আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন তা কোন ধরনের পরিবর্তন,পরিবর্ধন, রুপদান, সাদৃশ্য ছাড়াই তার জন্য সাব্যস্ত করা এবং নিজের থেকে যা প্রত্যাখ্যান করেছেন তাকোন ধরনের পরিবর্তন,পরিবর্ধন, রুপদান, সাদৃশ্য ছাড়াই তার জন্য প্রত্যাখ্যান করা।

তাওহীদ ব্যতীত আমলসমূহ গৃহিত হবে না। এবং আমাদেরকে তাওহীদপন্থী হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাওহীদপন্থী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর এটিই ছিল সকল নবীদের দাওয়াতের বিষয়বস্তু। তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণের অর্থ হচ্ছে, শিরকে পতিত হওয়া থেকে বাঁধা দেওয়া এবং এটিই হচ্ছে অধিক ছওয়াব অর্জনের অন্যতম কারণ।

ইবাদাত ২টি বিষয়ের উপর প্রায়গিক:

[১] আমেল (কর্তা):তাআব্বুদ (ইবাদাত করা) এর অর্থ হলো,ভালবাসা ও সম্মানের সহিত নির্দেশসমূহ পালন এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট অবনত হওয়া।

[২] আমল: যার দ্বারা ইবাদাত করা হয়; ইবাদাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক নাম যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ। (ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) এর বানী)

[১] তাওহীদের অপরিহার্যতা

মানুষদেরকে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য সম্মানীত গ্রন্থকার (রহঃ) এই অধ্যায়ের নামকরণ করেননি। এবং যে সমস্ত দলীলগুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলি তাওহীদের অপরিহার্যতার উপর প্রমান বহন করে। সুতরাং আমরা তাওহীদের অপরহির্যতা নামে এই অধ্যায়ের নামকরণ করতে পারি।

প্রথম দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

আমি জ্বীন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সূরা আয যারিয়াত-৫৬)

● **لِيَعْبُدُونِ**: যেন তারা তাওহীদপন্থী হয় অথবা আদিষ্ট বিষয় পালন এবং বারণকৃত বিষয়কে পরিত্যাগ মাধ্যমে আমার (আল্লাহর) নিকট আনুত্যের সহিত অবনত হয়। (কুরআনে বর্নিত সকল ইবাদাত এর অর্থই হচ্ছে তাওহীদ, আর এটি হচ্ছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তি)

● আয়াতের অর্থ: আমি মানুষ ও জ্বীনকে একমাত্র আমার ইবাদাত ছাড়া আর অন্য কোন জিনিসের জন্য সৃষ্টি করিনি।

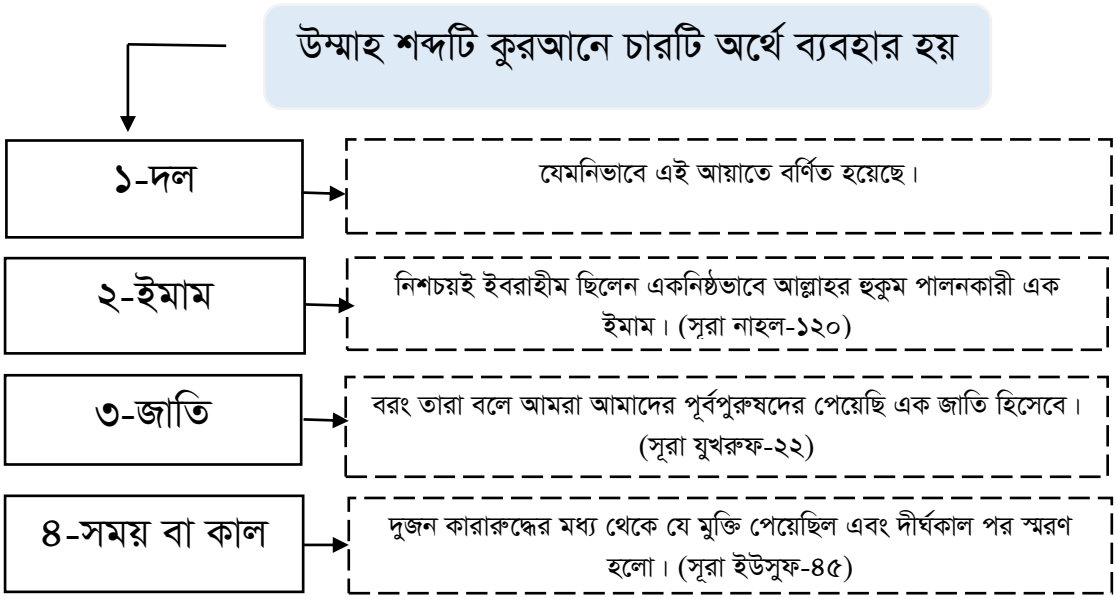
দ্বিতীয় দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে এই মর্মে রাসূল প্রেরন করেছি যে,তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুতকে বর্জন করো। (সূরা আন নাহল-৩৬)

● এই আয়াতে তিনটি তা'কীদবহ (দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্নকরণ) শব্দ দ্বারা তা'কীদ করা হয়েছে: [১] উহ্য শপথ, [২] লাম, [৩] ক্বদ।

● আলোচ্য আয়াতে তাওহীদের দিকে দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে সকল রাসূলকে মতৈক্য করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এই কারণেই তাদেরকে প্রেরণ করেছিলেন।



● **وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ:** অর্থ্যাৎ তাগুত থেকে এমনভাবে দূরে থাক যেন তোমরা এক প্রান্তে আর তাগুত আরেক প্রান্তে।

● তাগুত এর সংজ্ঞায় যা বলা হয়েছে তার সমন্বিতরুপ যা ইবনুল কাইয়ূম (রহঃ) উল্লেখ করেছেন,**বান্দা মাতবু অথবা মাবুদ অথবা মুতা' এর ক্ষেত্রে তার পরিসীমাকে অতিক্রম করা।** আর এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছে, যে ব্যক্তি এর উপর সন্তুষ্টি থাকবে।

[১] **মাতবু':** যেমন, গণক, যাদুকর, মন্দ বিষয়ে জ্ঞানী।

[২] **মাবুদ:** যেমন,প্রতিমা।

[৩] **মুতা':** যেমন, আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া শাসকগণ।

●আলোচ্য আয়াত তাওহীদের উপর প্রমান বহন করে। নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া যে সমস্ত মূর্তির ইবাদাত করা হয়,সব তাগুতের অন্তর্ভূক্ত।

●দুটি রুকন ছাড়া তাওহীদ পূর্ণ হয়না, আর তা হলো নাফী (না বোধক) ও ইছবাত(হ্যাঁ বোধক): যেহেতু নাফি (না সূচক) সম্পূর্ণরুপে না বোধক এর উপর প্রমাণ কওে পক্ষান্তরে ইছবাত (হ্যাঁ সূচক) তার মধ্যে কাউকে সংযুক্ত হতে বাঁধা দেয় না। যেমন; (যায়েদ দন্ডায়মান) বাক্যটি যায়েদের দাড়ানো সাব্যস্ত হওয়ার প্রতি প্রমাণ করে। তবে তা একক দাড়ানোর উপর প্রমাণ করে না। (কেউ দন্ডায়মান হয়নি) এটি নিখাদ না বোধক। সুতরাং যায়েদ ছাড়া কেউ দন্ডায়মান হয়নি এটিই হচ্ছে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তাওহীদ। কেননা এটি হ্যাঁ বোধক ও না বোধক উভয়কেই শামিল করেছে।

রাসূলগণ প্রেরণের হিকমত (রহস্য):

[১] দলীল প্রতিষ্ঠাকরণ: সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি,যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। (সূরা নিসা-১৬৫)

[২] রহমত: আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরুপই প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া-১০৭)

[৩] আল্লাহর দিকে পৌঁছার রাস্তার বর্ণনা দেওয়া।

তৃতীয় দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾

আর তোমার প্রতিপালক এ নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে, আর পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে উহ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বলো তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। (সূরা বানী ইসরাইল-২৩)

- **أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ** :(তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবেনা): এটিই নাফী (না-সূচক) ও ইছবাত (হ্যাঁ-সূচক) অন্তর্ভূক্তকরণের মাধ্যমে তাওহীদের পরিচায়ক।

আল্লাহর ফয়সালা ২ ধরণের:

[১] শারয়ী ফয়সালা:

শুধুমাত্র আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে।

সংঘটন হওয়া ও না হওয়া উভয়টিই বৈধ রয়েছে। ﴿আর তোমার প্রতিপালক এ নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে। সূরা বানী ইসরাইল-২৩﴾ আলোচ্য আয়াতে কাযা শব্দের অর্থ, বিধান প্রবর্তন করেছেন অথবা ওসিয়ত করেছেন।

[২] কাওনী ফয়সালা:

আল্লাহর পছন্দ ও অপছন্দ উভয় বিষয়ের মধ্যেই বিদ্যমান থাকবে।

এবং এটি সংঘটন হওয়া আবশ্যক। ﴿আমি বনী ইসরাইলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দু'বার অনর্থ সৃষ্টি করবে। সূরা বানী ঈসরাইল-৪﴾ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ফাসাদ আল্লাহ শরীয়াত সিদ্ধ করেননি এবং পছন্দও করেন না।

যা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তার ফয়সালা তিনি কিভাবে করতে পারেন?

অন্যের জন্য পছন্দনীয় বস্তু কখনও কখনও নিজের জন্য অপছন্দনীয় হয়। তবুও হিকমত ও কল্যাণের জন্য অন্যের জন্য পছন্দ করতে হয়। তখন এক দৃষ্টিকোন থেকে তা পছন্দনীয় হয় ও অন্য দৃষ্টিকোন থেকে তা অপছন্দনীয় হয়।

উদাহরণস্বরুপ: বনী ইসরাইলের যমীনের মধ্যে ফাসাদ (কলহ-বিবাদ) সৃষ্টি করা আল্লাহর নিকট তার সত্ত্বাগত দৃষ্টিকোন থেকে অপছন্দনীয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা ফাসাদ (কলহ) ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না। কিন্তু এর মধ্যে হিকমত নিহিত থাকার কারনে আল্লাহ তায়ালার নিকটে অন্য দৃষ্টিকোন থেকে পছন্দনীয় হয়েছে। অনরুপভাবে দর্ভিক্ষ. অনর্বরতা. অসস্থতা. দরিদ্রতা।

পছন্দনীয় বস্তু ২ ভাগে বিভক্ত:

[১] নিজের জন্য পছন্দনীয়: আর তা হলেন আল্লাহ।

[২] অপরের জন্য পছন্দনীয়: ঔষধ, যা আরোগ্য লাভের জন্য পছন্দনীয়।

উবুদিয়্যাহ (ইবাদাত) ৩ ভাগে বিভক্ত:

আম্মাহ (সাধারণ/ব্যাপক):

আর তা হলো রুবুবিয়্যাতের (প্রভুত্ব) ইবাদাত/দাসত্ব, (বশীভূত ইবাদাত/দাসত্ব) আর এটি হচ্ছে সকল সৃষ্টির জন্য, আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। (সূরা মারয়াম-৯৩)﴾

এর মধ্যে কাফেররাও অন্তর্ভূক্ত।

খাস্সাহ (নির্দিষ্ট):

এটি হলো সাধারণ আনুগত্যের মাধ্যমে ইবাদাত/দাসত্ব করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿রহমান এর বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। সূরা ফুরক্বান-৬৩)﴾ প্রত্যেক যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়াত অনুযায়ী তার ইবাদাত করবে তারা এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

খাস্সাতুল খাস্সাহ (নির্দিষ্টর মধ্যে বিশেষতর):

রাসূলগণের (আঃ) ইবাদাত/ দাসত্ব (আর এটি হচ্ছে ইবাদাতের অধিক পূর্ণতর স্তর), আল্লাহ তায়ালা বলেন:﴿ পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তার বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতির্ণ করেছেন। সূরা ফুরক্বান-১)﴾ কেননা ইবাদাতের ক্ষেত্রে রাসূলদের সাথে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

চতুর্থ দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾

আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না। (সূরা আন নিসা-৩৬)

● **شَيْئًا** : শব্দটি না বোধকের ধারা অনুসারে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য, আর এটি প্রতিটি বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করেছে: কোন নবী, কোন ফেরেশতা, কোন ওলী এমনকি দুনিয়াবী কোন বিষয়ের ক্ষেত্রেও: আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করো না।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ দলীল:

[৫] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾

বলুন তোমরা এসো, তোমাদেও রব তোমদের জন্য যা হারাম করেছেন তা পড়ে শুনাই ।(তা হচ্ছে) তোমরা কোন কিছুকে তার সাথে অংশীদার করবে না। (সূরা আনআম-১৫১-১৫৩)

[৬] ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, (من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا } [الأنعام:١٥١] إلى قوله: { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا } [الأنعام:١٥٣]) الآية

যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ) -এর মোহরাঙ্কিত অসিয়ত দেখতে চায়, সে যেন আল্লাহ তায়ালার এ বানী পড়ে নেয়, বলুন! তোমরা এসো, তোমাদের রব তোমদের জন্য যা হারাম করেছেন তা পড়ে শুনাই ।(তা হচ্ছে) তোমরা কোন কিছুকে তার সাথে অংশীদার করবে না । আর এটাই হচ্ছে আমার সরল, সোজা পথ ।(সূরা আনআম-১৫১-১৫৩)

● সিরাত (পথ) নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সাথে সম্পৃক্ত:

১.আল্লাহ; কেননা তার দিকেই গন্তব্যস্থল, আর তিনিই তো সেই যিনি এই সিরাতকে (পথ) বান্দাদের জন্য বানিয়েছেন;(আর এটাই হচ্ছে আমার সরল, সোজা পথ)

২.তার পথ অবলম্বনকারী; কেননা তারাই তো তার পথ অনুসরণকারী। আর মুক্তিপ্রাপ্ত দল একটিই,অসংখ্য নয়। আর অবশিষ্ট সকল দল বিভক্ত/ছিন্নভিন্ন; ﴿ সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। সূরা ফাতিহা-৬﴾

আলোচ্য আয়াগুলিতে ১০ টি ওসিয়ত অন্তর্ভূক্ত রয়েছে:

প্রথম আয়াত (৫টি ওসিয়ত)

[১] আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ।

[২] পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যহার।

[৩] আমরা আমাদের সন্তানকে হত্যা করব না।

[৪] আমরা অশ্লীলতার নিকটবর্তী হবো না।

[৫] অন্যায়ভাবে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করব না।

দ্বিতীয় আয়াত (৪টি ওসিয়ত)

[৬] আমরা এতিমের মালের নিকটবর্তী হবোনা; তবে উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। (সাবালক হওয়ার পূর্বেই যার বাবা মারা গেছে তাকে এতিম বলা হয়)।

[৭] যখন কথা বলব তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে কথা বলব।

[৮] আমরা ওজন ও মাপ পূর্ণ করব ন্যায়সহকারে।

[৯] আমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করব।

তৃতীয় আয়াত (১টি ওসিয়ত):

[১০] ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِ﴾:হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সাঃ) একটি সরল সোজা রেখা অঙ্কন করলেন। অতঃপর বললেন, এটা হলো আল্লাহর পথ। অতঃপর ঐ রেখার ডানে ও বামে কিছু রেখা অঙ্কন করলেন, অতঃপর বললেন: এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন পথ। আর প্রত্যেক পথেই শয়তান তার দিকে আহ্বান করছে। অতঃপর আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করলেন।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক সংযোজন

আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন (নিরপরাধ)

[১] মুসলিম

[২] জিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রে জিযিয়া করদাতা অমুসলিম নাগরিক)।

[৩] মৈত্রী-চুক্তিবদ্ধ (আমাদের ও তাদের মাঝে মৈত্রী-চুক্তি)।

[৪] নিরাপত্তাকামী (যাকে আমরা নিরাপত্তা প্রদান করব)।

﴿আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার্য দেই। সূরা আনআম-১৫১)﴾ পিতামাতার রিযিকের আলোচনা দিয়ে আলোচ্য আয়াতে রিযিকের কথা আরম্ভ করা হয়েছে। কেননা দরিদ্রতা তাদের জন্য লব্ধ হয়। এবং সূরা বনী-ঈসরাইলের মধ্যে পিতা-মাতার রিযিকের পূর্বে সন্তানদের রিযিক এর কথা দ্বারা রিযিকের আলোচনা শুরু করা হয়েছে। ﴿আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে আহার্য দেই।﴾ কেননা তারা ধনী কিন্তু দরিদ্র হয়ে যাবার ভয় করে।

যাকে হত্যা করা শরীয়াত সিদ্ধ:

[১] হত্যার বিনিময়ে হত্যা।

[২] বৃদ্ধ যিনাকারী।

[৩] জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বীন পরিত্যাগকারী।

পূর্ণ সাবালকের লক্ষণ, যখন তার উপর ইসলামের বিধিবিধান আরোপিত হয়:

[১] পনের বছর পূর্ণ হওয়া।

[২] নাভীর নিচের চুল উদগত হওয়া।

[৩] বীর্য বের হওয়া

মেয়েদের ক্ষেত্রে ঋতুবর্তী হওয়া সংযোজিত হবে।

وصية: অর্থ, অঙ্গীকার। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যতীত অঙ্গীকার কখনও ওসীয়ত হয় না।

রাসূল (সাঃ) ওসিয়ত না করা সত্ত্বেও ইবনে মাসউদ (রাঃ) কেন বললেন এই আয়াত রাসূল (সাঃ) এর ওসিয়ত?

[১] কেননা তিনি পর্যবেক্ষন করেছেন, নিশ্চয়ই এই আয়াতগুলির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন অন্তর্ভূক্ত আছে। আর এগুলি হচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত

[২] কেননা এটি আল্লাহর ওসিয়ত ﴿তোমাদেরকে এ ওসিয়ত করেছেন। সূরা আনআম-১৫৩)﴾ আর রাসূল (সাঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রচারকারী।

চতুর্থ দলীল:

عَنْ مُعَاذٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ " يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ". قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ " فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ " لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا ".

মুয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উফাইর নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মুয়ায, তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহর হক কি? এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হল, বান্দা তার ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হল, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাঁকে শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন, তুমি তাদের সুসংবাদটি দিও না, তাহলে লোকেরা (এর উপরই) নির্ভর করে বসবে।

● أَ تَدْرِي :আগ্রহ বাড়ানোর জন্য প্রশ্ন, যাতে অন্তর আরো বেশি মনোযোগী হয়। আর এটি হচ্ছে শিক্ষা দেওয়ার সর্বোত্তম পন্থা।

● حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ : বান্দা কখনই কোন কিছুকে আবশ্যক করতে পারে না।বরং আল্লাহ তায়ালা এর অনুগ্রহ স্বরুপ স্বয়ং আবশ্যক করে নেন।

● أَبَشِّرُ : আল বাশারাহ: আনন্দদায়ক সংবাদ প্রদান করা। তবে কখনও কখনও কষ্টদায়ক সংবাদ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

● لاَ تُبَشِّرْهُمْ : অর্থ্যাৎ, তাদেরকে সংবাদ দিও না।

● হাদীসে তাওহীদের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, আর তা হলো আল্লাহর আযাব থেকে প্রতিবন্ধকতা।

● এর মধ্যে আরো উল্লেখিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থাপন করবে না, তাকে আল্লাহ তায়ালা শাস্তি দিবেন না। আর পাপিষ্ট ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্টা করার মাধ্যমে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। আর রাসূল (সাঃ) এই সংবাদ মানুষকে দিতে নিষেধ করেছেন। যাতে মানুষেরা কাম্য বিষয় প্রতিষ্টা করা ছেড়ে দিয়ে এই সুসংবাদ এর উপর নির্ভর না করে। কেননা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকাকে আবশ্যক করে। কারণ পাপপচার প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত হয়,আর এটিই হচ্ছে শিরক এর একটি প্রকার।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলাসমূহ জানা যায়:

(এই মাসআলাগুলি কিতাবুত তাওহীদের অন্তর্গত নয়। গ্রন্থকার এগুলিকে গ্রন্থের ব্যাখার মত রচনা করেছেন। এবং ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ট, কেননা তিনি এগুলির উদ্দেশ্যে সম্পর্কে ভাল অবগত থাকবেন। সুতরাং এগুলির প্রতি গভীর মনোযোগ একান্ত কাম্য।

১। জ্বীন ও মানবজাতি সৃষ্টির রহস্য। (তাওহীদ খাদ্যদ্রব্য ও সম্ভোগ এর মাধ্যমে উপভোগের বিষয় নয়।)

২। ইবাদতই হচ্ছে তাওহীদ। কারন এটা নিয়েই বিবাদ ও দ্বন্দ্ব। (অর্থ্যাৎ কুরাইশ ও রাসূল (সাঃ) এর মাঝে দ্বন্দ, যে ইবাদাত তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা বাতিল।)

৩। যার তাওহীদ ঠিক নেই, তার ইবাদাতও ঠিক নেই। এ কথার মধ্যে ﴿আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাত করো না﴾ -এর অর্থ নিহিত আছে।

৪। রাসূলগণকে প্রেরণ করার রহস্য। (একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা ও তাগুতের ইবাদাত থেকে বেঁচে থাকা)।

৫। সকল উম্মাতই রিসালাতের আওতাধীন ছিল। (অর্থ্যাৎ দল)

৬। সকল নবীর দ্বীন এক ও অভিন্ন। (মূল দ্বীন এক, তবে আমলী শরীয়াত স্থান, কাল ও উম্মাতের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন রকম)।

৭। মূল কথা হচ্ছে,তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদাত সম্পন্ন হবে না এতেই রয়েছে আল্লাহর বাণী, ﴿ অতঃপর যে তাগুতকে অস্বীকার করল﴾ (এবং একে বড় করল; কেননা অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে অজ্ঞ। যে শিরক কুফর ও লানত এর মধ্যে কিছু সম্পাদন করবে তার উপর ঢালাওভাবে এ ধরনের পরিভাষা ব্যবহার বৈধ নয়। কেননা এ ব্যাপারে এই হুকুম ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কারন ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।)

৮। আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদাত করা হয় তাকেই তাগুত বলা হয়।

৯। সালাফে সালেহীনের নিকট সূরায়ে আনআমের তিনটি সুস্পষ্ট আয়াতের উচ্চ মর্যাদা কথা জানা যায়, যাতে রয়েছে দশটি বিষয়। প্রথমটি হলো শিরকের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা।

১০। সূরা ইসরার কতগুলো মুহকাম আয়াত রয়েছে এবং তাতে আঠারটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, যা আল্লাহ শুরু করেছেন- ﴿আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে উপাস্য সাব্যস্ত করোনা, নইলে তুমি নিন্দিত লাঞ্চিত হয়ে বসে থাকবে।﴾ আর শেষ করেছেন- ﴿আর তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে উপাস্য স্থির করো না, করলে তুমি নিন্দিত ও আল্লাহর অনুগ্রহ হতে দূরীভূত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।﴾ দিয়ে এ বিষয়গুলির উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ বলেছেন। ﴿এটি এমন হিকমতের অন্তর্ভূক্ত যা আপনার প্রভূ আপনার নিকট প্রত্যাদেশ করেছেন।﴾

১১। সূরা নিসার 'আল হুকুকুল আশারা'(বা দশটি হক) নামক আয়াতে কথা জানা গেল। যার সূচনা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার বাণী, ﴿ তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো , আর তার সাথে কাউকে শরীক করো না।﴾ (হক্বসমূহের মধ্য থেকে অধিকতর হকদার হচ্ছে আল্লাহর হক।)

১২। রাসূল (সাঃ) এর অন্তিমকালের অসিয়তের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন। (তবে বাস্তবিকপক্ষে তিনি ওসিয়ত করেননি,বরং তিনি এই দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমরা যখন আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরব, তখন আমরা আর পথভ্রষ্ট হবো না)

১৩। আমাদের উপর আল্লাহর হক্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া । (আর তা হলো, আমরা একমাত্র তার ইবাদাত করব ও তার সাথে আর কাউকে শরিক করব না।)

১৪। বান্দা আল্লাহর হক্ব আদায় করেলে সে কি হক্ব বা অধিকার লাভ করবে তা জানা। (যখন তার মর্যাদার হক আদায় করবে।)

১৫। অধিকাংশ সাহাবীই এ বিষয়টি জানতেন না। (আর এই কারনেই অধিকাংশ সাহাবীর মৃত্যুর পর মুআয (রাঃ) তার মৃত্যুর সময় তিনি ইলম গোপন থেকে বাঁচার জন্য এই সংবাদটি/হাদীসটি প্রকাশ করেন। আর মানুষেরা এর উপরেই নির্ভর করে আমল থেকে বিরত থাকবে মর্মে রাসূল (সাঃ) ভয় করেছিলেন এবং রাসূল (সাঃ) থেকে সাধারনার্থে গোপন রাখার ব্যাপারটি বর্নিত হয়নি, কেননা রাসূল (সাঃ) যদি গোপন রাখার ইচ্ছা করতেন তাহলে মুআয (রাঃ) ও অন্যান্যদেরকে এ ব্যাপারে অবহিত করতেন না।।

১৬। কল্যাণের স্বার্থে ইলম (জ্ঞান) গোপন রাখার বৈধতা। (তবে এটা ব্যাপকার্থে বৈধ নয়)।

১৭। মুসলমানকে আনন্দদায়ক সুসংবাদ দেয়া মুস্তাহাব। (এটি হচ্ছে সর্বোত্তম উপকারিতা)।

১৮। আল্লাহর দয়ার ব্যাপকতার কথা শুনে আমল বিমুখ হয়ে পড়ার আশংকা। (অনুরুপভাবে আল্লাহর কঠোরতার কথা শুনে হতাশা হয়ে যাওয়া)।

১৯। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যে বিষয়ে জানে না সে বিষয়ে (আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিক জানেন) বলা। (রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় ও রাসূল (সাঃ) কর্তৃক কৃত শারয়ী নির্দেশনার ক্ষেত্রে এমন বলা হতো।)

২০। ঢালাওভাবে সকলকে ইলম না শিখিয়ে বিশেষভাবে কতিপয় লোক কে শেখানোর বৈধতা।

২১। গাধার পিঠে সফরসঙ্গী করার মাধ্যমে মহানবী (সাঃ) এর বিনয় প্রকাশ।

২২। একই পশুর পিঠে একাধিক ব্যক্তি আরোহণের বৈধতা। (তবে শর্ত হচ্ছে যে, গাধার উপর যেন কষ্টকর না হয়ে যায়।)

২৩। মুয়ায বিন জাবালের মর্যাদা।

২৪। আলোচিত বিষয়টির মর্যাদা ও মহাত্ম্য।

[২] তাওহীদের মর্যাদা ও তাওহীদের ফলে যে সকল পাপ মোচন হয়

শয়তান অন্তরে যা ঢুকিয়ে দেয় তার বিপরীতে আগ্রহান্বিতকরণের জন্য গ্রন্থকার (রহঃ) এই অধ্যায়টি উল্লেখ করেছেন। ওয়াজিব অবিদ্যমানতায় কোন বিষয়ের ফযীলত সাব্যস্ত করা আবশ্যক নয়। বরং ফযীলত হচ্ছে তার ফলাফল ও পরিণাম। যেমন,জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা।

প্রথম দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾

﴿যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে যুলুম (শিরক)-এর সাথে মিশ্রিত করেনি তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা। তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। সূরা আনআম-৮২﴾

- **وَلَمْ يَلْبِسُوا**:তারা মিশ্রিত করে নি। **بِظُلْمٍ**: এই স্থানে যুলম হচ্ছে, যা ঈমানের বিপরীত। আর তা হলো শিরক।
- مُّهْتَدُونَ হেদায়াতপ্রাপ্ত): ২ স্থানে: [১] দুনিয়ায়: ইলম ও আমল দ্বারা আল্লাহর শরীয়াতের দিকে [২] আখিরাতে: জান্নাতের দিকে।
- তাওহীদের ফযীলত সমূহের অন্যতম ফযীলত হচ্ছে, দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তার স্থায়িত্ব।

দ্বিতীয় দলীল:

وَعَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ورُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وفي رواية لمسلم: مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ

উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, আর তাঁর বাণী যা তিনি মারয়্যামের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর (পক্ষ থেকে সৃষ্ট) রূহ। আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য। তাকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; তাতে সে যে কর্মই করে থাকুক না কেন।(বুখারী ও মুসলিম)

তৃতীয় দলীল:

সাহাবী ইতবানের হাদীসে বর্ণিত আছে, ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি সংকলন করেছেন,

فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ "

আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে বলে: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ কামনা করে।

- **شَهِدَ**: আশ শাহাদাত (সাক্ষ্য): মুখে স্বীকৃতি দেওয়া, অন্তরে বিশ্বাস করা ও অঙ্গ প্রতঙ্গের মাধ্যমে সত্যায়ন করা।
- أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ : আল্লাহ ছাড়া এমন কোন মা'বুদ নেই যে ইবাদাত পাওয়ার হকদার।
- **وَحْدَه** : হ্যাঁ-সূচককে দৃঢ়করণের জন্য। **لاَ شَرِيكَ لَهُ**: আল্লাহর জন্য যা নির্দিষ্ট তা অন্য কারো জন্য না-সূচককে দৃঢ় করণের জন্য।

● وَأَنَّ مُحَمداً : শেষ নবী মহাম্মদ বিন আব্দুল মুত্তালিব আল কুরশী আল হাশেমী।

● عَبْدُهُ : অর্থ্যাৎ, [১] আল্লাহর সাথে শরীক নয়। [২] সৃষ্ঠির মধ্যে সর্বোত্তম বান্দা।

● ورَسُولُه :তার নিকট যা ওহী করা হয়েছে তা নিয়ে প্রেরিত। আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী নন। এই শাহাদাত (সাক্ষ্যবাণী) এর বাস্তবায়নের অবসান ঘটবে নিম্নোক্ত কার্যাদির মাধ্যমে: [১] অবাধ্য কর্ম সম্পাদন করা বা পাপচার করা। [২] দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা।

● 'মাআসি' তথা অবাধ্য কর্ম ব্যাপাকার্থে বর্ণিত হলে আমরা তাকে শিরক হিসেবে গণ্য করব, আর খাস (নির্দিষ্ট সংখ্যক) অর্থে ব্যবহৃত হলে নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত হবে: [১] শিরকে আকবার [২] শিরকে আসগার [৩] বড় পাপ [৪] ছোট পাপ।

● عِيسَى عَبْدُ اللهِ : নাসারাদের বিশ্বাস ও উক্তিকে খন্ডন। وَرَسُولُهُ : ইয়াহুদিদের বিশ্বাস ও উক্তিকে খন্ডন। আমরা তার রিসালাতের এর উপর ঈমান আনব। তবে যেহেতু তার শরীয়াতের সাথে আমাদের শরীয়াত ভিন্নতর হয়েছে, তাই তার আনুগত্য করা আমাদের জন্য আবশ্যক নয়। আমাদের পূর্ববর্তীদের শরীয়াতের অবস্থাসমূহ:

১- তাদের শরীয়াত আমাদের শরীয়াতের বিপরীত হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের শরীয়াতের উপর আমল করব।
২- তাদের শরীয়াত আমাদের শরীয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। তখন আমরা আমাদের শরীয়াতের অনুসারী।
৩- আমাদের শরীয়াতে তাদের শরীয়াতের কিছু অংশ উহ্য থাকতে পারে। আর এটাই আমাদের জন্য শরীয়াত।

● ঈসা (আঃ) কে কেন্দ্র করে মানুষেরা ৩ ভাগে বিভক্ত:

১- চরমপন্থী: যেমন: ইযাহুদিরা, তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এবং তাকে ও তার মাকে তিরষ্কার করে। তার নবুওতকে অস্বীকার করে। এমনকি তাকে হত্যার সিদ্বান্ত দেয়।
২- আতিশয্য পন্থী :যেমন: নাসারারা, তারা তাকে আল্লাহর সন্তান বলে ও তাকে তিন জনের তৃতীয় জন মনে করে এবং তাকে ইলাহরুপে গ্রহণ করেছে।
৩- মধ্যমপন্থী : আমরা সাক্ষ্য দেই যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তার মা সত্যবাদী, তিনি সতীত্ব রক্ষাকারিনী কুমারী নারী, তিনি (ঈসা আঃ) আল্লাহর নিকটে আদম (আঃ) এর মত, তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে,অতঃপর বলা হয়েছে, হও! তিনি হয়ে গেছেন।

● وَكَلِمَتُهُ :তিনি কালিমা (কথা) দ্বারা সৃষ্ট হয়েছেন। তবে ঈসা (আঃ) আল্লাহর কালিমা নয়। কেননা কালাম হচ্ছে আল্লাহর সিফাত (গুণ)।

● وَرُوحٌ مِنْهُ : আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে একটি সৃষ্টি। সম্মান ও মর্যাদার জন্য আল্লাহর দিকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

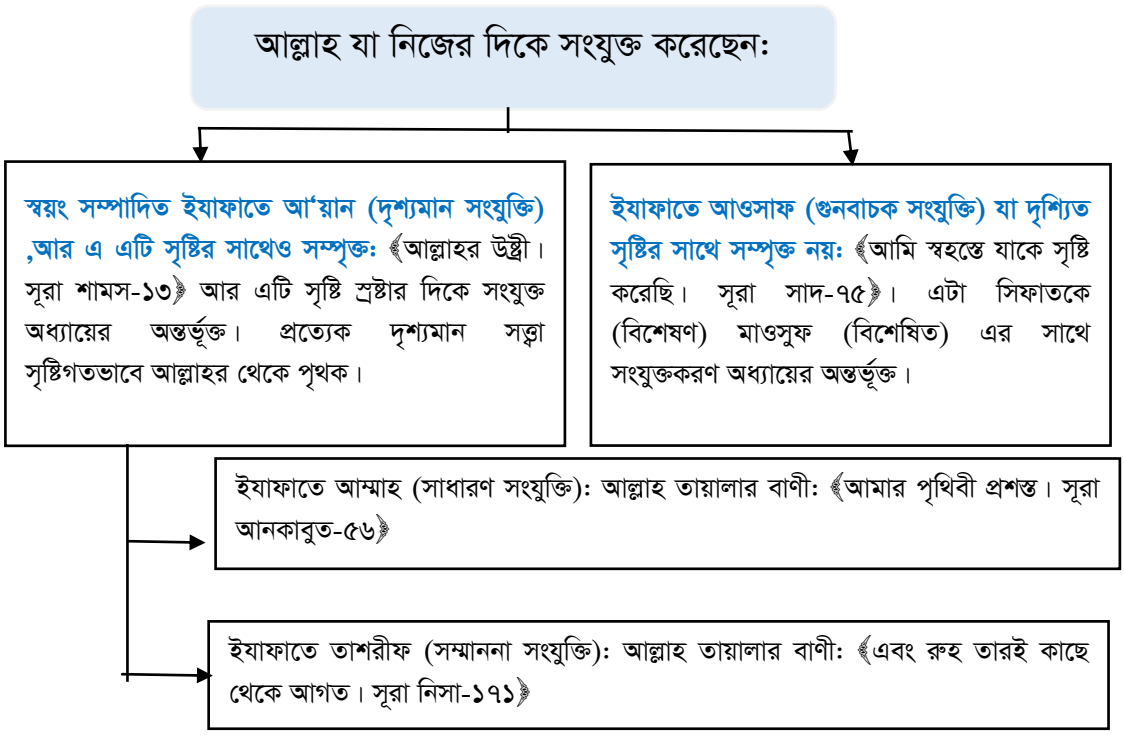
● أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ : জান্নাতে প্রবেশ ২ ধরনের:

১- যে ব্যক্তি আমল পরিপূর্ণ করবে সে কোন শাস্তির সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই পরিপূর্ণরুপে জান্নাতে প্রবেশ।
২- যে ব্যক্তি আমল অপূর্ণ করবে সে শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার পর অসম্পূর্ণরুপে জান্নাতে প্রবেশ।

● قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ : নিম্নোক্ত দলীল দ্বারা ইখলাসকে শর্ত করা হয়েছে يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ .

● আলোচ্য হাদীসে ২ দলকে সমুচিত জবাব দেওয়া হয়েছে:

১- মুরজিয়াহ: যারা আমল ও ইখলাস ছাড়া শধুমাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে বলাকেই যথেষ্ঠ মনে করে।
২- খাওয়ারেজ: যারা বলে যে, কবীরা গুনাহকারী কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী ।



চতুর্থ ও পঞ্চম দলীল:

عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم :"قال موسى صلّى الله عليه و سلّم : يا رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع و عامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله" (صحّحه الحاكم و ضعّفه الألباني)

[৪] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন: মূসা (আঃ) বলেছিলেন, হে আমার রব! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করব এবং আপনাকে ডাকব। আল্লাহ বললেন হে মূসা! তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল। মূসা (আঃ) বললেন, আপনার সকল বান্দাই তো এটা বলে। তিনি বললেন,আমি ব্যতীত সপ্তাকাশে যা কিছু আছে তা, আর সাত জমিনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এ পাল্লাই বেশি ভারী হবে।(ইবনে হিব্বান ও হাকেম। ইমাম হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন)

[৫] তিরমিযীতে বর্নিত হয়েছে। তিনি এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً "

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে আদম সন্তান! তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার নিকট আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে অংশীদার না করে থাক, তাহলে তোমার কাছে আমিও পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাযির হব।

● لا إله إلا الله : এই বাক্যটি দুআকে অন্তর্ভূক্তকারী জিকর। কেননা যিকিরকারী যিকির এমাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর এটিই হলো জান্নাতের চাবি। কিন্ত যে ব্যক্তি এমন চাবি নিয়ে আসবে যার খাঁজ নেই, সে খুলতে সক্ষম হবে না। সুতরাং চাবির জন্য শর্ত হচ্ছে চাবির খাঁজ বিদ্যমান থাকা।

● بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً : উত্তম তাওহীদের প্রতিদান হচ্ছে, যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শিরক মুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তিনি তার বড় বড় পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর ক্ষমা হচ্ছে পাপের আবরণ ও পাপের মার্জনা।

মাসআলা সমূহ:

১। আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপকতা।

২। আল্লাহর নিকট তাওহীদের অপরিসীম সওয়াব।

৩। তাওহীদের কারনে অন্যান্য পাপরাশি মোচন হয়।

৪। সূরা আনআম এর উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর ।﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾

৫। উবাদার (রাঃ) হাদীসে বর্নিত পাঁচটি বিষয় অনুধাবন করা।

৬। উবাদা বিন সামেত (রাঃ) ও ইতবানের (রাঃ) হাদীসকে একত্র করলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং ধোকায় নিপতিত লোকদের ভুল সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। (কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা আবশ্যক, যদি এমনটিই হয়, তাই একজন মানুষের সৎ আমলের প্রতি উৎসাহিত হওয়া আবশ্যক।

৭। ইতবান (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত শর্তের ব্যাপারে সতর্কীকরণ। (সাতন্ত্রিক বক্তব্য যথেষ্ঠ নয়)।

৮। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ফযীলতের ব্যাপারে সতর্কীকরণের প্রয়োজনীয়তা নবীগণের জীবনেও ছিল। (তারা ছাড়া অন্যদের জন্য বেশি উপযুক্ত)।

৯। সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় এ কালেমার পাল্লা ভারী হওয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ, যদিও এ কালেমার অনেক পাঠকের পাল্লা ইখলাসের সাথে পাঠ না করার কারণে হালকা হয়ে যাবে। (শর্তের ক্ষেত্রে ত্রুটি ও প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হওয়ায় বিপদ আপতিত হবে পাঠকের পক্ষ থেকে, বাণীর পক্ষ থেকে নয়।)

১০। সপ্তাকাশের মতো সপ্ত যমীন বিদ্যমান থাকার প্রমাণ। (সংখ্যার ক্ষেত্রে সদৃশ)।

১১। যমীনের মতো তাতেও বসবাসকারীর অস্তিত্ব আছে । (অর্থ্যাৎ আসমানে, আর তার বসবাসকারীরা হচ্ছে ফেরেশতারা)।

১২। আল্লাহর গুনাবলীকে সাব্যস্ত করা যা আশয়ারী সম্প্রদায়ের বিপরীত। (আর মুআত্তিলাহ, তারা আল্লাহর ওজহ [চেহারা] কে সাব্যস্ত করে।)

১৩। আনাস (রাঃ) এর হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া পর ইতবান (রাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) এর বাণী,(فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ ") এর মর্মার্থ হচ্ছে শিরক পরিত্যাগ করা। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শুধু মুখে বলা নয়।

১৪। ঈসা ও মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়েই আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করা।

১৫। ঈসা (আঃ) 'কালিমাতুল্লাহ' অভিধায় নির্দিষ্ট- এ কথা জানা। (তিনি পিতাবিহীন সৃষ্ট হয়েছেন)।

১৬। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে 'রুহ' হওয়া সম্পর্কে জানা। (সৃষ্টিজীবের সমুদয় রুহসমূহের মধ্য থেকে)।

১৭। জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনয়নের ফযীলত সম্পর্কে অবগত হওয়া। (আর এটিই হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশের কারন)।

১৮। "আমল যাই হোক না কেন" এ কথার মর্মার্থ অনুধাবন করা।

১৯। দাড়িপাল্লায় ২ টি পাল্লা আছে- এ কথা জানা।

২০। আল্লাহর চেহারার উল্লেখ আছে বিষয়টি সম্পর্কে অবগহত হওয়া। (এটি হচ্ছে আল্লাহর সিফাতসমূহের মধ্যে একটি সিফাত)

[৩] যে ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে সে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে

এই অধ্যায় এই জন্য আনিত হয়েছে, যাতে আমরা আমাদের উপর আবশ্যকীয় তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে পারি ও তার দিকে গভীরভাবে মনোযোগী হতে পারি। আর শিরক, বিদআত ও পাপাচার থেকে নিষ্কলুষ থাকা এবং ইলম, বিশ্বাস ও আত্মসমর্পন হাসিল করাই হচ্ছে তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ।

গ্রন্থকার (রহঃ) এর নিকটে তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আকারে আলোচ্য অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে জ্ঞাত হওয়া যাবে, তবে তার সারাংশ হচ্ছে,

[১] আল্লাহর নবী ইবরাহীম (আঃ) এর অনুসরণ।

[২] ওলীদের নেতাদের অনুসরণ করা (সাহাবায়ে কেরাম)।

[৩] একজন হলেও তাওহীদ এর উপর অটল থাকা।

[৪] আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং ঝাড়ফুঁক করা, সেক দেওয়া ও পাখি উড়ানোর মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করা থেকে বিরত থাকা।

প্রথম দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর হুকুম পালনকারী এক ইমাম/উম্মতবিশেষ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। (সূরা নাহল-১২০)

আলোচ্য আয়াতে আমাদের সর্দার ইবরাহিম এর স্তুতি করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে, তাকে ভালবাসা ও তার অনুসরণ করা। আমাদের জন্য আরো কর্তব্য হচ্ছে, আমাদের অনুসরণ অনুপাতে আমরা তার প্রশংসা করব। কেননা আয়াতে উল্লেখিত ৬ টি বিষয়ের মাধ্যমে তিনি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১।﴿ أُمَّةً﴾: এমন ইমাম, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা সহকারে আমল, কার্যাদি ও জিহাদের ক্ষেত্রে যার অনুসরণ করা হয়।

২।﴿ قَانِتًا ﴾; সর্বাবস্থায় আনুগত্যের উপর অটল ও অবিচল। তিনি হচ্ছেন আনুগত্যশীল, স্থির ও অবিচল।

৩।﴿لِّلَّهِ ﴾: ইখলাসকে প্রমাণ/নির্দেশনা করছে।

না।

৪।﴿ حَنِيفًا ﴾: আল্লাহর দিকে অভিমূখী ও শিরক থেকে পশ্চাপদগামী এবং যা কিছু আনুগত্যের বিপরীত তা থেকে দূরে অবস্থানকারী।

৫।﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾: শিরক ও শিরকজাতীয় পাপ থেকে মুক্ত হওয়া (অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রতঙ্গের দ্বারা)

৬।﴿ شاكرا لأنعمه ﴾: (নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়কারী): কেননা নিয়ামত হচ্ছে পরীক্ষা ও নিয়ামত শুকরিয়া এর মুখাপেক্ষী

প্রাসঙ্গিক সংযোজন:

১। ইবরাহীম (আঃ) এর পিতা আযর কাফের অবস্থায় মৃত্যবরণ করেন । ﴿ অতঃপর যখন তার কাছে এ কথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তার সাথে সমপর্ক ছিন্ন করে নিলেন। সূরা তাওবাহ-১১৪)﴾

২। নূহ (আঃ) এর পিতা-মাতা উভয়েই মুমিন ছিলেন। ﴿হে আমাদের পালনকর্তা! আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনদের ক্ষমা করুন। সূরা ইবরাহিম-৪১ ﴾

৩। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, তিন বস্তুর কোন ভিত্তি নেই; যুদ্ধ,কাব্য ও তাফসীর। সাধারণত এগুলো সূত্র ছাড়াই বর্ণনা করা হয়। সুতরাং ওহীর মাধ্যম কুরআন ও হাদীস ছাড়া পূর্ববর্তী উম্মত প্রসঙ্গে কেউ জানতে পারবে

দ্বিতীয় দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾

আর যারা তার রবের সাথে শরীক করে না। (সূরা আল মুমিনূন-৫৯)

لَا يُشْرِكُونَ : শিরক ব্যাপকার্থে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ এর অর্থ হচ্ছে, ব্যাপকার্থে বর্ণিত সামগ্রিক শিরক থেকে বেঁচে থাকা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, কোন ধরণের পাপাচারে পতিত হওয়া যাবে না। কেননা প্রত্যেক বনী আদমই ভুলকারী, কেউ নিষ্পাপ নয়। তবে যখন তারা অপরাধে জরিয়ে পড়বে, তখন তাদের জন্য করনীয় হচ্ছে, সেই পাপ চলমান না রাখা এবং তাওবা করা।

তৃতীয় দলীলঃ

عن حصين بن عبد الرحمن قال: " كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الخصيب أنه قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة". قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي □ أنه قال: عُرضت عليّ الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منْزله، فخاض الناس في أولئك؛ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله □. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله □ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يَسْتَرقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام جل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

হুসাইন বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্নিত আছে, তিনি বলেন, ইম সাঈদ বিন জুবাইর এর নিকটে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদেও মধ্যে কে গতরাতে তারকা ছিটকে পড়তে দেখেছে? আমি বললাম আমি দেখেছি, তারপর বললাম, বিষাক্ত প্রাণী দ্বারা দংশিত হওয়ার কারণে আমি তো গত রাতে সালাতে উপস্থিত থাকতে পারিনি। তিনি বললেন, তারপর তুমি কি করলে? আমি বললাম ঝাড়ফুঁক করলাম। তিনি বললেন, কিসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি বললাম, শাবী থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বললেন, হাদীসটি কি? আমি বললা, বুরাইদা বিন হুসাইব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, চোখ লাগা অথবা জ্বও ছাড়া আর কোন কিছুতে ঝাড়ঁফুক নেই। তিনি বললেন, সে ব্যক্তিই উত্তম কাজ করেছে, যে শ্রুত জিনিস শেষ পর্যন্ত আমল করতে পেরেছে। কিন্তু ইবনে আব্বাস রাসূল (সাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ নেই। ইতোমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল যে, এটি হল মূসা ও তাঁর উম্মতের জামাআত। অতঃপর আরও একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হল যে, এটি হলো আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ কথা বলে তিনি উঠে নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। এদিকে লোকেরা ঐ জান্নাতী লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু করে দিল, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে জান্নাত প্রবেশ করবে। কেউ কেউ বলল, সম্ভবত ঐ লোকেরা হল তারা, যারা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সাহাবা। কিছু লোক বলল, বরং সম্ভবত ওরা হল তারা, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি। আরো অনেকে অনেক কিছু বলল। কিছু পরে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের নিকট বের হয়ে আসলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ওরা হল তারা, যারা ঝাড়ফুঁক করে না, শরীরে সেক বা দাগ দেয় না এবং কোন জিনিসকে অশুভ লক্ষণ মনে করে না, বরং তারা কেবল আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে।

এ কথা শুনে উক্কাশাহ ইবনে মিহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে তাদের দলভুক্ত করে দেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে একজন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আমার জন্যও দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে দেন। তিনি বললেন, উক্কাশাহ (এ ব্যাপারে) তোমার অগ্রগমন করেছে।

● **انقض** : পড়ে গিয়েছে। **ارتقيت:** আমি ঝাড়ফুঁক কামনা করেছিলাম। **عين;** হিংসুকের নজর।

● **فما حملك على ذلك** : দলীল ও প্রমাণ কামনা করা যায়েজ তবে তা আদবের সাথে হতে হবে।

● **لا رقية إلا من عين أو حمة** : শর্তসাপেক্ষে ঝাড়ফুঁক ছাড়া হিংসা ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের কোন চিকিৎসা ও কোন ঔষধ নেই। যদিও এগুলো ছাড়া অন্যান্যগুলোর ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক এর কথা সাব্যস্ত আছে।

● **حمة** : প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণীর দংশন। আর 'হুমা' বলা হয় শরীরের প্রখরতা/তাপমাত্রা কে প্রশমন করা।

● **الرهط** ; তিনজন থেকে নয়জন বিশিষ্ট মাঝামাঝি দলকে 'রহত' বলা হয়।

● **لا يَسْتَرقُون** ; যারা কারো থেকে তাদের উপর ঝাড়ফুঁক করা কামনা করে না। যথা।-

১। আল্লাহর উপর পূর্ণ আচ্ছা।

২। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে আত্মমর্যাদা রক্ষা করা।

৩। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাথে এ ব্যাপারে কোন সম্পর্ক নেই।

● **لاَ يَرْقُونَ** এর বর্ণনা ভূল। শায়খুল ইষলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন, কেননা রাসূল (সাঃ) ঝাড়ফুঁক করেছেন ও রাসূল (সাঃ) কে জিবরাইল ও আয়েশা (রাঃ) ঝাড়ফুঁক করেছেন। অনুরুপভাবে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ঝাড়ফুঁক করেছেন।

● ঝাড়ফুঁক কামনা করার ক্ষেত্রে মানুষের প্রকারভেদ:

[১] যে ঝাড়ফুঁক করে তার থেকে ঝাড়ফুঁক কামনা করা। এটার ফলে পূর্ণতা/উৎকর্ষতা হারিয়ে যাবে (এবং সত্তর হাজার বিনা হিসেবে জান্নাতী ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বের হয়ে যাবে।

[২] যে ঝাড়ফূঁক করে তাকে ঝাড়ফুঁক করা থেকে বাঁধা দিবে না। এটার ফলে পূর্ণতা/উৎকর্ষতা হারিয়ে যাবে না। কেননা সে ঝাড়ফুঁক করায় নি ও কামনাও করে নি।

[৩] যে ঝাড়ফুঁক করে তাকে ঝাড়ফুঁক করতে বাঁধা দিবে। এটা সুন্নাতের বিপরীত। কেননা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আয়েশা (রাঃ) কে ঝাড়ফুঁক করতে বাঁধা দেন নি।

● **ولا يكتوون** : অন্য কারো থেকে সেক দেওয়া কামনা করবে না।

● **ولا يتطيرون** :'তাতায়য়ূর' হচ্ছে কোন সময় অথবা স্থান সম্পর্কে জানা, দেখা ও শোনার পরে অশুভ লক্ষন মনে করা। এর হুকুম: শিরকে আসগার।

● এই তিন ধরনের ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্যদেরকে বিনা হিসেবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে বাঁধা দেওয়া হবে না। কেননা চিকিৎসা গ্রহনের নির্দেশ এবং কতিপয় ঔষধের স্তুতি প্রসঙ্গে দলীল বর্ণিত হয়েছে। যেমন: মধু ও কালজিরা।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলাসমূহ জানা যায়:

১। তাওহীদের ব্যাপারে মানুষের স্তর সম্পর্কে অবগত হওয়া।

২। তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অর্থ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। (শিরক, বিদআত ও অবাধ্যতা থেকে নিষ্কলুষ হওয়া)

৩। ইবরাহীম (আঃ) মুশরিক ছিলেন না বলে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তার প্রশংসা।

৪। বড় বড় বুযুর্গ ব্যক্তিগণ শিরকমুক্ত ছিলেন মর্মে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা।

৫। ঝাড়ফুঁক ও আগুনর দাগ দেওয়া বর্জন করা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভূক্ত। (ঝাড়ফুঁক করানো ও সেক দেওয়া)

৬। তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা করাই বান্দার মধ্যে উক্ত স্বভাবসমূহের সমাবেশ ঘটায়। (তাওয়াক্কুল এর শক্তিতে ওগুলো ছেড়ে দেয়।)

৭। সাহাবীগণের জ্ঞানের গভীরতা যে, তারা (সৎ) আমল ছাড়া এটি (জান্নাত) অর্জন করতে পারবেনা।

৮। কল্যাণের প্রতি তাদের আগ্রহ। (কেননা তারা উত্তম ফলাফলের দিকে পৌঁছতে চায়)

৯। পরিমাণ (সংখ্যা) ও গুনাবলীর (আমল) দিক থেকে উম্মাতে মহাম্মদীর ফযীলত।

১০। মূসা আঃ এর সাহাবীদের (অনুসারীদের) মর্যাদা।

১১। রাসূল (সাঃ) এর সামনে সব উম্মতের উপস্থিতি। [১] তাদেরকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য, [২] তার ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনার জন্য।

১২। প্রত্যেক উম্মাতই নিজ নিজ নবীর সাথে পৃথকভাবে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে।

১৩। নবীদের ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো লোকের সংখ্যা কম।

১৪। যে নবীর ডাকে কেউ সাড়া দেয়নি তিনি একাই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেন।

১৫। এই জ্ঞানের শিক্ষা হচ্ছে, [১] সংখ্যাধিক্যের দ্বারা ধোকা না খাওয়া (নচেৎ আমরা তাদের সাথে ধ্বংশ হয়ে যাব) [২] আবার সংখ্যাল্পতার কারনে অবহেলা না করা (কখনও কখনও আধিক্যের চেয়ে স্বল্পতা উত্তম)।

১৬। চোখ লাগা ও জ্বরের (ও অন্যান্য) চিকিৎসার জন্য (শারয়ী) ঝাড়ফুঁকের অনুমতি।

১৭। সালাফে সালেহীনদের জ্ঞানের গভীরতা।

এই বাণী দ্বারা 'সে ব্যক্তিই ভালো কাজ করেছে যে নবী করীম (সাঃ) থেকে যা শুনেছে তাই আমল করেছে।' এ কথাই এর প্রমাণ পেশ করে। তাই প্রথম হাদীস দ্বিতীয় হাদীসের বিরোধী নয়।

১৮। (তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত) এটি রাসূল (সাঃ) এর নবুয়তী নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন।

১৯। উকাশা এর ফযীলত। (যারা বিনা হিসেবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার ফলে)।

উম্মাতের প্রকারভেদ:

উম্মাতুদ দাওয়াহ (দাওয়াতকৃত উম্মত):

যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় ও দেয় না (কাফের), উভয়েই এর মধ্যে শামিল।

২০। আকার ইঙ্গিত ও চাতুর্যের প্রয়োগ। [১] হয় সে মুনাফিক হওয়ার জন্য, [২] অথবা দরজা উন্মুক্ত হওয়ার ভয়ে; ফলে সে এই মর্যাদা এমন জনের থেকে কামনা করে যে তার অধিকারী নয়।

২১। রাসূল (সাঃ) এর অনুপম চরিত্র।

[৪] শিরক সম্পর্কীয় ভীতি

তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ অধ্যায়ের পর গ্রন্থকার (রহঃ) এই অধ্যায় কেন উল্লেখ করেছেন?

- কেননা তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ অধ্যায়ের পরের সকল অধ্যায় তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণের অন্তর্ভূক্ত। অনন্তর শিরক সম্পর্কীয় ভীতি, তাওহীদের দিকে দাওয়াত প্রদান, অনুরুপভাবে গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত সকল অধ্যায় তাওহীদ প্রতিষ্টাকরণের অন্তর্ভূক্ত।
- কেননা মানুষ নিজে নিজে মনে করে সে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে, কিন্তু প্রকৃতার্থে সে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং সে যেন নিজে নিজেই ধোঁকা না খায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় দলীল:

[১] আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তার সাথে অংশীদার করার পাপ ক্ষমা করবেন না তা ব্যতীত যাকে ইচছা ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা-৪৮)

[২] ইবরাহীম খলিল (আঃ) বলেছিলেন :﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾

আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করুন। (সূরা ইবরাহিম-৩৫)

কিভাবে আমরা শিরক থেকে ভয় করব?

- তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, তাওহীদ অনুযায়ী আমল করা, তাওহীদেও দিকে দাওয়াত দেওয়া এবং ধৈর্যধারণ করা।
- শিরক সম্পর্কে অধ্যয়ন করা এবং তার মাধ্যম ও কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া, আর এগুলো শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য হাসিল করা।
- আল্লাহর নিকটে দুআ ও সাহায্য প্রার্থনা করা।
- শিরক ও মুশরিকদের থেকে সম্পর্কহীন থাকা এবং তাদের থেকে দূরে অবস্থান নেওয়া যাতে করে তাদের মতো না হয়ে যায়।

● শিরকরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে, এর পাপ আল্লাহ কখনই ক্ষমা করবেন না। কেননা আল্লাহর নির্দিষ্ট হক 'তাওহীদ' এর উপরে অন্যায় করা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি শিরকে আকবাররত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে চিরস্থায়ী চিরন্তন জাহান্নামে থাকবে। আর যদি শিরকে আসগার এর উপর মৃত্যুবরণ করে, তাহলে শিরক সমপরিমান শাস্তি প্রদানের পর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, কেননা সে ঈমানের অধিবাসিদের অন্তর্ভূক্ত।

● وَاجْنُبْنِي : আমাকে একপ্রান্তে ও মূর্তিপূজকদেরকে অন্যপ্রান্তে স্থাপন করেন। যাতে তিনি তাদের থেকে দূরে থাকতে পারেন।

● الْأَصْنَام :'সানামুন' এমন বস্তু যা মানুষ ও অন্য জিনিসের আকৃতির আকারে গঠিত হয় এবং আল্লাহ ছাড়া তার ইবাদাত করা হয়। আর 'ওছানুন' হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারো যে কোন পদ্ধতিতে ইবাদাত করা। অধিকন্তু 'সানামুন' এর চেয়ে 'ওছানুন' ব্যাপক।

● ইবরাহীম (আঃ) স্বয়ং নিজের প্রতি ভয় করতেন। অথচ তিনি ছিলেন আল্লাহর বন্ধু ও একনিষ্টদের ইমাম। তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে? সুতরাং শিরক ও নেফাকিকে প্রশয় দেওয়া নিরাপদ নয়। যেহেতু নেফাকি শুধুমাত্র মুনাফিকদের নিকটই নিরাপদ।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দলীল:

[৩] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে«الرِّيَاءُ», فسئل عنه؟ قَالَ: «أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ»

আমি তোমাদের জন্য যে জিনিস সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো শিরকে আসগার তথা ছোট শিরক। অতঃপর তাকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা হচ্ছে রিয়া বা প্রদর্শন ইচ্ছা।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ

[٤] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন: যে ব্যি[3] আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন অংশীদারকে ডাকা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (বুখারী)

عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ

[৫] যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকেও শারীক না করে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সম্মুখে উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহর সাথে শারীক স্থির করে, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

● **الرِّيَاءُ** : রিয়া: মানুষকে দেখানো বা শোনানোর জন্য আল্লাহর ইবাদত করা যাতে মানুষ তাকে আবেদ হিসাবে প্রশংসা করে। তবে সে মানুষের জন্য ইবাদাত করার ইচ্ছা করে না। যদি মানুষের জন্য ইবাদাত করা হয় তাহলে সেটা শিরকে আকবার হয়ে যাবে। আর যদি মানুষকে অনুসরণ করানোর উদ্দেশ্যে উবাদাত করার মনস্থ করা হয়, তাহলে সেটি রিয়া হবে না। বরং সেটি আল্লাহর দিকে দাওয়াতের অন্তর্ভূক্ত হবে।

রিয়া থেকে আরোগ্য লাভের মাধ্যম হচ্ছে,

[১] তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা; কেননা তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার ফলে আল্লাহকে মর্যাদায় অধূষিত করবে, আর আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে কাউকে মান্য করবে না।

[২] দুআ করা (রিয়া থেকে বাঁচার জন্য)।

[৩] আমল যেন বান্দা ও রবের মাঝে গোপনে হয় মর্মে ব্যয়কুণ্ঠ হওয়া (চেষ্টা করা)।

[৪] রিয়ায় পতিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকার দলীলের আলোকে আমল না ছেড়ে দেওয়া।

{৫] যে সৎ আমলগুলি আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সেগুলি বোশ বেশি করা; শর্তসাপেক্ষে কবর যিয়ারত করা।

রাসূল (সাঃ) কেন তার উম্মাতের উপর মাসিহ দাজ্জালের চেয়ে রিয়াকে অধিক পরিমাণে ভয় করেছেন?

- কেননা দাজ্জালের ফেতনা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য, আর রিয়ার ফেতনা অপ্রকাশ্য/গোপনীয়।
- কেননা দাজ্জালের ফেতনা নির্ধারিত সময়ের সাথে নির্দিষ্ট (আর তা হলো শেষ যামানা), আর রিয়া সর্বসময়ে বিদ্যমান।

রিয়ার প্রকারভেদ:

মূল ইবাদাতের ক্ষেত্রে:

রিয়া দ্বারা যে ইবাদাত প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই ইবাদাত বাতিল।

আকস্মিকভাবে সংঘটিত:

মূলত ইবাদাত আল্লাহর জন্য কিন্তু আকস্মিকভাবে ইবাদাতের উপর রিয়া আপতিত হয়েছে।

ইবাদাত সম্পন্ন হওয়ার পর:

সীমালঙ্ঘন এর মাধ্যমে এতে প্রভাব পড়ে; যেমন সাদকাহ প্রদানের পরে অনুগ্রহ প্রকাশ ও কষ্ট দেওয়া।

আকস্মিক সংঘটিত হওয়া থেকে প্রতিরক্ষা করা:

এতে কোন সমস্যা নেই কেননা এটি প্রচেষ্ট করার পরেও সম্পন্ন হয়েছে।

আকস্মিক সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে শিথিলতা করা:

এই ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ রয়েছে।

যখন ইবাদাতের প্রথমাংশ শেষাংশের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। যেমন, সালাত (নামায):

সেই ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ইবাদাত বাতিল বলে গণ্য হবে।

যখন ইবাদাতের প্রথমাংশ শেষাংশের সাথে সম্পৃক্ত হবে না, পৃথক থাকবে। যেমন, যাকাত:

এক্ষেত্রে যে অংশের সাথে রিয়া সম্পৃক্ত আছে, সেই অংশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

- **نِدًّا** : 'আন নিদ' হচ্ছে, সদৃশ,সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ।
- **دَخَلَ النَّارَ** : (সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে): এটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানানোর শাস্তি।
- **شَيْئًا** : সব ধরনের শিরক ব্যাপকভাবে অন্তর্ভূক্ত। এমনকি যদি আল্লাহর সাথে সর্বোত্তম সৃষ্টিজীবকে অংশীদার স্থাপন করা হয়, তবুও জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
- **مَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ** : যদি শিরকে আসগার হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকাটা বাধ্যতামূলক না। আর যদি শিরকে আকবার হয়, তাহলে তার জন্য জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকাটা বাধ্যতামূলক।

● শিরক অত্যন্ত কঠিন বিষয়,সহজ বিষয় নয়। তবে আল্লাহ তায়ালা ইখলাসকে তার বান্দার উপর সহজ করেছেন। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর চোখের সামনে তার জন্য কিছু প্রতিষ্ঠিত করবে। সুতরাং সে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করার ইচ্ছা করবে; মানুষের প্রশংসা, নিন্দা ও স্তুতির জন্য না। কারন মানুষ কখনই তার উপকার করবে না।

● অনুরুপভাবে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, মানুষ কখনো তার কথা দ্বারা মানুষকে অগ্রগামী করণের মাধ্যমে তাকে খুশী করতে পারবে না। কেননা, এটি তার কথা। তবে সে তার কথা দ্বারা মানুষের অগ্রগামী করণের মাধ্যমে খুশী করতে পারবে যখন সে দেখবে নিশ্চয় এটি সঠিক। অনুরুপভাবে বিপরীত বিষয়, ইখলাস অত্যন্ত কঠিন বিষয়, তবে মানুষ যখন সরল পথে (সিরাতে মুস্তাকিম) আল্লাহর দিকে সত্য ও উত্তমরুপে অভিমুখী হবে, তখন আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন, তাকে সহজ করে দিবেন।

দুআ (প্রার্থনা/ডাকা) দু'ভাগে বিভক্ত:

ইবাদতের দুআ: যেমন কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে সালাত, সিয়াম ও হজ্ব পালন করল, সে বড় কুফুরী করল।

যাচনার (চাওয়া) দুআ:

এটা আবার দু'ভাগে বিভক্ত:

যে ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সক্ষম নয়:

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে এই ক্ষমতা প্রদানেচ্ছা করা শিরকে আকবার। যেমন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সন্তান কামনা করা অথবা বৃষ্টি বর্ষণ কামনা করা।

যে ব্যাপারে সৃষ্টিজীব সক্ষমতা রাখে:

এই দুআ (প্রার্থনা) চারটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ আছে।

চায়িত (যার কাছে চাওয়া হয়) ব্যক্তি জীবিত, উপস্থিত ও সক্ষম হতে হবে, এবং চাওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকতে হবে।

শিরকে আকবার ও শিরকে আসগার এর মধ্যে পার্থক্য:

শিরকে আকবার:

- মিল্লাত (ধর্ম) থেকে বের হয়ে যায়।
- সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যায়।
- শিরকে আকবার কারী চিরস্থায়ী জাহান্নামে অবস্থান করবে।
- তার রক্ত ও সম্পদ শাসক থেকে বৈধ হয়ে যায়।
- এটি যে শিরকে আকবার সে প্রসঙ্গে দলীল বর্ণিত রয়েছে।
- কোন কিছু সংঘটনের ক্ষেত্রে গোপনীয়ভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করে বলে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হাতে উপকার সাধন ও উপকার নির্মূল করার ক্ষমতা রয়েছে মর্মে বিশ্বাস করা।

শিরকে আসগার:

- মিল্লাত থেকে বের হয়ে যায় না।
- নির্দিষ্ট আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।
- চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী হবে না।
- সম্পদ ও রক্ত বৈধ হয়ে যায় না।
- এটি যে শিরকে আসগার সে প্রসঙ্গে দলীল বর্ণিত রয়েছে।
- আল্লাহ যা কিছু করেননি তার মধ্যে কোন হেতু রয়েছে মর্মে বিশ্বাস করা।
- প্রত্যেক যে জিনিস শিরকে আকবার এর দিকে নিয়ে যায়, সেটাই শিরকে আসগার।
- শরীয়াতের মধ্যে যেটা সাধারণভাবে শিরক অথবা কুফর বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আলিফ ও লাম দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়নি, মূলত এটি হচ্ছে শিরকে আসগার।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলাসমূহ জানা যায়:

১। শিরককে ভয় করা।

২। রিয়া শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

৩। রিয়া ছোট শিরকের অন্তর্ভূক্ত। (ছোট রিয়া)

৪। সৎব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে বড় আশংকা। (কেননা রিয়া উপলব্ধি অত্যন্ত গোপনে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, এবং মানুষকে সেই দিকে ধাপিত করে। নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ তার ইবাদাতের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করে।)

৫। জান্নাত ও জাহান্নাম কাছাকাছি হওয়া।

৬। একই হাদীসে উভয়ের কাছাকাছি হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

৭। যে ব্যক্তি শিরক না করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি শিরক করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে যত বড়ই আবেদই হোক না কেন। (যদি শিরকে আকবার করে, তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর যদি শিরকে আসগার করে, তবে পাপ অনুযায়ী শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে।)

৮। গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো ইবরাহীম (আঃ) নিজের জন্য ও বংশধরদের জন্য মূর্তিপূজা থেকে মুক্তিলাভের জন্য দুআ করেন।

৯। অধিকাংশ লোকের অবস্থা এরুপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ((হে আমার রব! মূর্তিগুলো বহুলোককে পথভ্রষ্ট করেছে।))

১০। এখানে 'লা ইলাহা ইল্লাহ' এর তাফসীর রয়েছে যা ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

১১। শিরক থেকে মুক্ত ব্যক্তির ফযীলত (সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।)

[৫] 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর প্রতি সাক্ষদানের আহ্বান

কেন গ্রন্থকার (রহঃ) এই অধ্যায় আনয়ন করেছেন?

১। গ্রন্থকার (রহঃ) মানুষের তাওহীদ প্রসঙ্গে আলাচনা উপস্থাপন করার পর অন্যের নিকট এর দাওয়াত প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। কেননা অন্যকে তাওহীদেও দিকে আহ্বান না করা পর্যন্ত ঈমান পূর্ণ হয় না। সুতরাং নিজে তাওহীদপন্থী হওয়ার পাশাপাশি অন্যকে এর দিকে আহ্বান করতে হবে। অন্যথায় তাওহীদ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

২। আর যে ব্যক্তি বলে যে, প্রথম দাওয়াত দানের বিষয় হলো সালাত, তাওহীদ নয়; তার মন্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য।

প্রথম দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾

বলুন! এটি আমার পথ। পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই।

- **سَبِيلِي** : আমার পথ, আর এ কথার মাঝে শরীয়াতে বিদ্যমান রাসূল (সাঃ) কর্তৃক আনিত ইবাদাত ও আল্লাহর দিকে দাওয়াত শামিল রয়েছে।

- **إِلَى اللَّهِ** : দায়ীরা নিম্নোক্ত বিভাগে বিভক্ত: [১] আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী, [২] আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে আহ্বানকারী

- **عَلَىٰ بَصِيرَةٍ** : এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত: [১] শারয়ী জ্ঞান, [২] আহুত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, [৩] হিকমাহ (প্রজ্ঞা)।

- আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানের শর্ত:

[১] ইখলাস (একনিষ্ঠতা), [২] শারয়ী জ্ঞান, [৩] আহুত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া, [৪] ধৈর্য।

দ্বিতীয় দলীল:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلَ كِتَابٍ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وفي رواية إلى أن يوحدوا الل فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فأعلمهم أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فأعلمهم أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ واتق وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بينها وبين اللَّهِ حِجَابٌ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাঃ) মুআয (রাঃ) কে (শাসকরূপে) ইয়ামান অভিমুখে প্রেরণকালে বলেন, "তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো। ফলে তুমি তাদেরকে আল্লাহ ব্যতিত কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) (সাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এ কথার সাক্ষ্যদানের জন্য আহবান করবে। তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের সম্পদে সাদাকা (যাকাত) ফরয করেছেন। তা (যাকাত) তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পদশালীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তুমি তাদের ভাল ভাল মাল গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে। আর তুমি আত্মরক্ষা করবে মাযলুমের দুআ থেকে। কেননা, তা এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।

আলোচ্য হাদীসে:

১। আল্লাহর দিকে দায়ী প্রেরণের আইনানুগতা ও তাদের শিক্ষাদান।

২। রাসূল (সাঃ) এর একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ, এবং তার কথাই গ্রহনযোগ্য যদি তার মাঝে আক্বিদা বিদ্যমান থাকে।

৩। দাওয়াত প্রদানের জন্য কোন নির্ধারিত সময়কে শর্তারোপ করা হয়নি। প্রয়োজনের আলোকে তাদের নিকটে অবস্থান করবে।

৪। বিরোধীদেরকে দাওয়াত দানের পদ্ধতি। আর এর সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে তাদেরকে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়া, তাদের সাথে বাক-বিতন্ডা নয়।

৫। শুধুমাত্র ইসলামের দিকে দাওয়াত প্রদান যথেষ্ঠ নয়। বরং তাদেরকে তাদের উপর আবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিতে হবে, যাতে তারা তা গ্রহণ করতে পারে ও পরিতুষ্ট হতে পারে। তবে দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে

তৃতীয় দলীলঃ

وَعَنْ سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيْ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ يَومَ خَيبَر: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجلاً ، يُحبُّ اللهَ وَرَسولَهُ، ويُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيهِ »، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا . فَلَمَّا أصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَرْجُو أنْ يُعْطَاهَا. فَقَالَ: «أينَ عَلِيُّ ابنُ أَبي طالب ؟»فقيلَ: يَا رسولَ الله، هُوَ يَشْتَكي عَيْنَيهِ . قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْه»فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرِىءَ حَتَّى كأنْ لَمْ يكُن بِهِ وَجَعٌ، فأعْطاهُ الرَّايَةَ . فقَالَ عَليٌّ رضي الله عنه: يَا رَسُول اللهِ، أقاتِلُهمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

আবূল আব্বাস সাহ্‌ল ইবনু সাদ সায়েদী (রাঃ) আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খায়বার (যুদ্ধের) দিন বললেন, নিশ্চয় আমি আগামীকাল যুদ্ধ-পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন, আর সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন। অতঃপর লোকেরা এই আলোচনা করতে করতে রাত কাটিয়ে দিল যে, তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এটা দেওয়া হবে। অতঃপর সকালে তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট গেল। তাদের প্রত্যেকেরই এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, পতাকা তাকে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আলী ইবনু আবী ত্বালেব কোথায়? তাঁকে বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ব্যথা হচ্ছে। তিনি বললেন, তাকে ডেকে পাঠাও।

সুতরাং তাঁকে ডেকে আনা হল। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার চক্ষুদ্বয়ে থুতু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দোআ করলেন। ফলে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন; যেন তাঁর কোন ব্যাথাই ছিল না। অতঃপর তিনি তাঁকে যুদ্ধ-পতাকা দিলেন। আলী (রাঃ) হে আল্লাহর রাসূল! তারা আমাদের মত (মুসলিম) না হওয়া পর্যন্ত কি আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকব? তিনি বললেন, তুমি প্রশান্ত হয়ে চলতে থাক; যতক্ষণ না তাদের নগর-প্রাঙ্গনে অবতরণ করেছ।

অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের উপর ইসলামে আল্লাহর যে জরুরী হক রয়েছে তাদেরকে সে ব্যাপারে অবগত করাও। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তায়ালা তোমার দ্বারা একটি মানুষকে

- আল্লাহকে ভালবাসার পদ্ধতি সত্যায়ন এবং আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন ও ভালবাসাপ্রাপ্ত হন। তবে এই ভালবাসা সাধারণ মানবিক ভালবাসার মতো নয়।

- নির্দিষ্ট ফযীলত সাব্যস্ত করা ব্যাপক ফযীলত সাব্যস্ত করাকে প্রয়োজনীয় করে না। যেমনিভাবে আবু উবাইদা প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর বাণী: (এই উম্মতের আমানতদার)। তবে এটার অর্থ এটা নয় যে, তিনি সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর। ঠিক তেমনিভাবে মুআয (রাঃ)।

- حُمْرِ النَّعَم : তা হলো লাল উটনী, আলোচ্য হাদীসে লাল উটনীর কথা বলা হয়েছে, কেননা আরবরা লাল উটনীর প্রতি ইপ্সিত/আকাংক্ষিত।

অলৌকিক প্রকৃতি/স্বভাব চারটি: আর তা হলো মানুষের স্বভাবজাত কর্মের বিপরীত কিছু। যেমন, বাতাসে উড়ে বেড়ানো, পানির উপর চলা:

১। আয়াত: যা নবীদের ছিল, তবে এটিকে মুযিজা বলা যাবে না। কেননা তা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর মুযিজা বলা হয়, যা থেকে কতিপয় মানুষ অপারগ হবে এবং সেটি নবী ছাড়া অন্য কেউ সক্ষম হতে পারে। আর রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর পরে কারো আয়াত এর দাবী করা সম্ভব নয়।

২। কারামাত: এটি আল্লাহর ওলীদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। আর আল্লাহর ওলী বলা হয় তাদেরকে যাদের মধ্যে ঈমান ও তাকওয়ার সমন্বয় থাকে। কারামাতের উদাহরণ; আসহাবে কাহাফ এর ঘটনা।

৩। মুযিজা ও ফিতনা: এটি শয়তানের বন্ধুদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। আর এটি আমরা ব্যক্তির অবস্থা দেখেই বুঝতে পারব, তার মাঝে থাকবেনা কোন ঈমান ,থাকবে না কোন তাকওয়া। মুযিজার উদাহরণ; দাজ্জালের কর্মকান্ডসমূহ।

৪। ফাযিহাহ: প্রত্যেক যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, তাকে আল্লাহ তায়ালা আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত করেন। ফাযিহাহ এর উদাহরণ; মুসাইলামাতুল কায্যাব এর ঘটনা। তার অসুস্থ চোখে ফূঁ দিয়ে দেন, অতঃপর সে অন্ধ হয়ে যায়।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলাসমূহ জানা যায়:

১। রাসুল (সাঃ) এর অনুসরণকারীর নীতি ও পথ হচ্ছে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা। (রাসূলগণ ও তাদের অনুসারীদের পথ ও পন্থা)

২। ইখলাসের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। কেননা অনেক মানুষ হকের দিকে দাওয়াত দিলেও প্রকৃতার্থে তারা নিজের নফসের দিকেই দাওয়াত দেয়।

৩। জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসহ তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া অপরিহার্য। (দাওয়াত প্রদান ফরয, সুতরাং তার জন্য ইলম অর্জন করাও ফরয)

৪। উত্তম তাওহীদের প্রমাণ হচ্ছে,আল্লাহ তায়ালার প্রতি গাল-মন্দ করা থেকে মুক্ত থাকা।

৫। আল্লাহ তায়ালার প্রতি গালমন্দ করা নিকৃষ্ট শিরকের অন্তর্ভূক্ত। (তাওহীদপন্থী ব্যক্তি আল্লাহকে দোষ/কুৎসা থেকে পবিত্র রাখবে)

৬। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন দাওয়াতের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মুসলমানকে মুশরিকদের থেকে দূরে সরে রাখা যাতে তাদের অন্তর্ভূক্ত না হয়। যদিও সে শিরক না করে। (কেননা যখন সে তাদের মধ্যে থাকবে, যদিও সে শিরককারী না হয়, তবু সে ব্যাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের অন্তর্ভূক্ত।)

৭। তাওহীদই হচ্ছে সর্বপ্রথম ওয়াজিব।

৮। সর্বাগ্রে এমনকি সালাতের পূর্বেও তাওহীদ দিয়ে দাওয়াত শুরু করতে হবে।

৯। 'তারা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে' এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উভয়ের একই অর্থ।

১০। কতিপয় মানুষ আহলে কিতাব হওয়া সত্বেও তাওহীদের যথাযথ জ্ঞান রাখে না অথবা রাখে কিন্ত সে অনুযায়ী আমল করেনা।

১১। ক্রমান্বয়ে শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্বারোপ।

১২। অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগে শুরু করা। (প্রথমত তাওহীদ, অতঃপর সালাত, অতঃপর যাকাত)

১৩। যাকাত প্রদানের খাতসমূহ। (৮টি খাত)

১৪। শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সংশয় নিরসন। (শিক্ষাদান ও মূর্খতা উন্মোচনের মাধ্যমে।)

১৫। যাকাত আদায়ের সময় উৎকৃষ্ট সম্পদ জোরপূর্বক গ্রহণ করা থেকে নিষেধাজ্ঞা।

১৬। মাযলুমের বদ দুআ থেকে বেঁচে থাকা।

১৭। মাযলুমের ফরীয়াদ ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না। (আগ্রাহান্বিতকরণ ও ভীতিপ্রদর্শন করণের মাঝে সমন্বয়)

১৮। তাওহীদের একটি বড় প্রমাণ হলো সাইয়িদুল মুরসালিন ও বড় বড় ওলী আউলিয়াদের জীবনে আপতিত দুঃখ-কষ্ট ক্ষুধা ও কঠিন বিপদাপদ। (খায়বারের ঘটনা থেকে গৃহিত)

১৯। নবীর বানী: 'অবশ্যই আমি পতাকা দিব' এটি হলো নবুওয়াতের আলামত।

২০। চোখে থুতু দেওয়া এটিও একটি নবুওয়াতের আলামত।

২১। আলী (রাঃ) এর ফযীলত। (আর এটাই হচ্ছে আমীরুল মুমিনীন (রাঃ) এর গুণ)

২২। অন্য সাহাবীদের ফযীলত যারা বিজয়ের সংবাদে আশ্বস্ত হয়ে ঐ রাত পতাকা প্রাপ্তির জল্পনা-কল্পনা করে কাটিয়ে দেন।

২৩। বিনা প্রচেষ্টায় ইসলামের পতাকা তথা নেতৃত্ব লাভ করা আর চেষ্টা করেও তা লাভে ব্যর্থ হওয়া, উভয় অবস্থাতেই তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখা।

২৪। বীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাও রাসূল (সাঃ) এর আলীর প্রতি এ নির্দেশের মধ্যে শিষ্টাচার নিহিত রয়েছে। (ধীরে ধীরে অগ্রসর হওযার নির্দেশ, দ্রুতগতিতে নয়।)

২৫। যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া।

২৬। ইতিপূর্বে যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে ও যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে তাদেরকেও যুদ্ধের পূর্বে দাওয়াত দেওয়া শরীয়াত বিধিবদ্ধ।

২৭। রাসূল (সাঃ) এর বাণী অনুযায়ী হিকমত এর সাথে দাওয়াত দেওয়া। আর বাণীটি হলো وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ অর্থ্যাৎ, তাদের উপর ইসলামে আল্লাহর যে জরুরী হক রয়েছে তাদেরকে সে ব্যাপারে অবগত করাও (কেননা কখনও ইসলাম তার সথে সামঞ্জস্যপূর্ন হবে কখনও হবে না, সুতরাং আবশ্যক হচ্ছে, তার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। যাতে সে পুনরায় কুফুরী অবস্থায় ফিরে না আসে।)

২৮। ইসলামে আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে অবগত হওয়া।

২৯। যার হাতে একজন হেদায়াত পেয়েছে তার সওয়াব। (দুনিয়াতে সে যত ভাল কাজ করবে তার মধ্যে উত্তম কাজ)

৩০। ফতোয়ার ব্যাপারে কসম করা। (ফতোয়ার ক্ষেত্রে কসম করা উচিৎ নয়, তবে কল্যাণ ও উপকারার্থে বৈধ আছে।)

প্রথম বিভাজনের প্রশ্নপত্র (৫টি অধ্যায়)

প্রথম প্রশ্ন: কিতাবুত তাওহীদের প্রথম ৫ অধ্যায় ও অধ্যায়ের সাথে গ্রন্থের সামঞ্জস্যতা উল্লেখ কর

	অধ্যায়ের শিরোনাম	গ্রন্থকার অধ্যায় উল্লেখের কারন
১	.....	.....
২	.....	.....
৩	.....	.....
৪	.....	.....
৫	.....	.....

দ্বিতীয় প্রশ্ন: সামঞ্জস্যপূর্ণ বাক্যাবলী শূন্যস্থান পূরন কর:

১- আমরা নিম্নোক্ত কারনে কিতাবুত তাওহীদ অধ্যয়ন করব: ১-. . . . . ২-. . . . . ৩-. . . . . ৪-. . . . . ৫-. . . . . .

২- গ্রন্থকার (রহঃ) গ্রন্থের ভূমিকা উল্লেখ করেননি,কারণ: ১-. . . . . ২-. . . . . ৩-. . . . . .

৩- আমরা কিতাবুত তাওহীদকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করতে পারি:১-. . . . . ২-. . . . . ৩-. . . . . ৪-. . . . . ৫-. . . . . ৬-. . . . . ৭-. . . . . ৮-. . . . . ৯-. . . . . .১০-. . . . . .

৪- যারা বলে কিতাবুত তাওহীদ এর মধ্যে শুধু উলুহিয়্যাত এর আলোচনা রয়েছে, আমরা তাদের কথার প্রত্যাখ্যান করব নিম্নোক্ত অধ্যায় দ্বারা: ১ম অধ্যায়. . . . . ২য় অধ্যায় . . . . . ৩য় অধ্যায়. . . . . .

৩- উবুদিয়্যাহ নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত: ১- উবুদিয়্যাহ. . . . . অর্থ. . . . . এর দলীল. . . . . ২- উবুদিয়্যাহ. . . . . .অর্থ. . . . . দলীল. . . . . ৩- উবুদিয়্যাহ. . . . . অর্থ. . . . . .দলীল. . . . . .

৬- যে চার ধরনের ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম :. . . . . , ... , ...

৭- ইবনে মাসউদ (রাঃ) আয়াতকে রাসূল (সাঃ) এর ওসিয়ত অভিধায় অভিহিত করেছেন,কারন:. . . . . .

৮- উম্মত শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে:. . . . . অথবা. . . . . .

.অথবা. . . . . অথবা. . . . . .

৭- ৯-তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ অর্থ্যাৎ:.. . . . . হতে. . . . . .

এবং. . . . . এবং. . . . . .

১০- এই উম্মত অধিকাংশ উম্মতের মধ্যে. . . . . এবং. . . . . .

১১-নির্দিষ্ট ফযীলত সাব্যস্ত করা. . . . . ফযীলত সাব্যস্ত করাকে প্রয়জনীয় করে না।

১২-'নজর লাগা ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক নেই, অর্থ্যাৎ:. . . . . .

১৩-ডাক্তারের নিকট যাওয়া ব্যতীত ঝাড়ফুঁক ও সেক দেওয়া কামনা করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বর্নিত হয়েছে,কারণ. . . . . .

১৪-﴿ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ অর্থ্যাৎ:. . . . . .

﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ অর্থ্যাৎ. . . . . .

১৫-﴿ ورُوحٌ مِنْهُ، ﴾ অর্থ্যাৎ. . . . . .

﴿ وَكَلِمَتُهُ ﴾ অর্থ্যাৎ. . . . . .

১৬-আল্লাহ তায়ালা যা নিজের দিকে সংযুক্ত করেছেন তা নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত:১-ইযাফাতে. . . . . .

. . . . . আর তা . . . . . .ইযাফাহ অধ্যায় এর অন্তর্ভূক্ত,

২-ইযাফাতে. . . . . আর তা . . . . . ইযাফাহ অধ্যায় এর অন্তর্ভূক্ত।

১৭-তার বাণী ﴿سبقك بها عكاشة﴾ এমনকি. . . . . .

অথবা . . . . . .

১৮-﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا﴾ অর্থ্যাৎ. . . . . ﴿

بِظُلْمٍ﴾ অর্থ্যাৎ. . . . . .

১৯-আমরা শিরক থেকে ভয় করব:১-. . . . . ২-. . . . . .

৩. . . . . ৪-. . . . . .

২০-﴿يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ﴾অর্থ্যাৎ. . . . . এর মধ্যে সিফাত সাব্যস্ত আছে. . . . . .
. . . . . .

২১-দাওয়াত প্রদানের শর্তসমূহ:১-. . . . . .২-. . . . . .
৩- . . . . . .৪- . . . . . ৫-. . . . . .

২২-অলৌকিক স্বভাবসমূহ:১-. . . . . .আর তা হবে . . . . . .
২-. . . . . আর তা হবে. . . . . .
৩-. . . . . .আর তা হবে . . . . . .
৪-. . . . . .আর তা হবে . . . . . .

২৩-গ্রন্থকার বলেছেন:ঝাড়ফুঁক ও সেক দেওয়া ছেড়ে দেওয়া তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণের অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু তিনি পাখি উড়ানোর মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারনকে উল্লেখ করেন নি। তার কারন, কেননা. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

তৃতীয় প্রশ্ন: নিম্নোক্ত ছকে রিয়ার প্রকারসমূহের শূন্যস্থার পূরণ কর:

মূল ইবাদাতের ক্ষেত্রে: অর্থ্যাৎ, ...	আকস্মিকভাবে সংঘটিত: অর্থ্যাৎ:	ইবাদাত সম্পন্ন হওয়ার পর: . . . . .
. . . . . এতে কোন সমস্যা নেই এবং ইবাদাত সহীহ হয়ে যাবে।	. . . . . এই ক্ষেত্রে বিশ্লেষন রয়েছে।	

চতুর্থ প্রশ্ন: সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘরে ☑ দাও অথবা এবারাত পূর্ণ করো:

. . . . . হুকুম:	. . . . . হুকুম: . . . . .

১-কিতাবুত তাওহীদের গ্রন্থকার: ☐ইবনে উছাইমিন ☐মহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব আল তামীমি

২-ওলামায়ে কেরামের উপদেশ: ☐অধ্যয়নের পূর্বে মতন মূখস্ত করো ☐মুখস্ত করায় কোন উপকার নেই,গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উপলব্ধি করা

৩-﴿আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা যথাযথভাবে পাঠ করে﴾ এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একজন ছাত্র দৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত ইলম অর্জন ছেড়ে দিবে না: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৪-ওলামায়ে কেরাম কিতাবুত তাওহীদ অনুসন্ধানের পর এর মধ্যে কোন মুনকার হাদীস পান নি: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৫-ওলামায়ে কেরামের পরিচিতি/জ্ঞান অনেক বেশি হওয়ার ফলে তাকে পাপমুক্ত সাব্যস্ত করা যাবে না: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৬-শায়খ মহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রচিত গ্রন্থাবলী: ☐কাশফুশ শুবহাত ☐মাসাইলুল জাহিলিয়্যাহ ☐মুখতাসারুস সিরাহ ☐উসুলুল ঈমান ☐প্রাগুক্ত সবকটি।

৭-কিতাবুত তাওহীদের অধ্যায়সমূহ: ☐৬৭ অধ্যায় ☐৭৬ অধ্যায় ☐১০ অধ্যায়

৮-যখন তুমি কোন গ্রন্থ পাঠ করবে, তখন গ্রন্থের মূল পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে সেই প্রন্থের গিলাফ, ভূমিকা, সূচীপত্র বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করবে: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৯-কিতাবুত তাওহীদকে নিম্নোক্ত কোন বিভাজনে বিভাজিত করা যেতে পারে: ☐১১ ☐৯ ☐১০

১০-সর্বাধিক উপকারসমৃদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে, যে গ্রন্থগুলি কিতাবুত তাওহীদের মতো দলীলের আলোকে সজ্জিত থাকে ও হুকুমসমূহের কারন বোধগম্য হয় এবং সুক্ষ্ম মাসআলাগুলি অবগাহিত থাকে: ☐সত্য ☐মিথ্যা

১১-ইলম হচ্ছে অন্তর্ভূক্তকরণ, বিচ্ছিন্নকরণ, পরীক্ষাকরণ, বিভক্তকরণ: ☐সত্য ☐মিথ্যা

১২-ওলামায়ে কেরামের সংজ্ঞা, তাদের বিভাজন ও তাদের দল সম্পর্কে আয়ত্ব করা আবশ্যক: ☐সত্য ☐মিথ্যা

১৩-কিতাবুত তাওহীদের প্রথম বিভাজন: ☐ভূমিকা ☐তাওহীদের ব্যাখ্যা ☐তাওহীদের অপরিহার্যতা

১৪-গ্রন্থকার (রহঃ) ভূমিকা ও উপসংহারের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ) কে অনুসরণ করেছেন: ☐সত্য ☐মিথ্যা

১৫-গ্রন্থকার (রহঃ) প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম দেননি, আমরা বাবুল মুকাদ্দিমাহ (ভূমিকার অধ্যায়) শিরোনামে নামকরণ করতে পারি: ☐সত্য ☐মিথ্যা

১৬-গ্রন্থের প্রথম বিভাজনে কতটি অধ্যায় ধারণ করে আছে:☐৫ অধ্যায় ☐৬ অধ্যায় ☐৭ অধ্যায়

১৭-তাওহীদ এর প্রকারসমূহ: ☐রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত, আসমা ওয়াস সিফাত ☐মারিফাহ ,ইছবাত, ইরাদাহ ,কসদ ☐প্রাগুক্ত সবকটি

১৮-যে ব্যক্তি শুধুমাত্র একটি তাওহীদ এর উপর ঈমান আনল সে মুআহ্হিদ (তাওহীদপন্থী) নয়: ☐সত্য ☐মিথ্যা

১৯-দলীল অবিদ্যমানতায় তাওহীদের বিভাজন বিদআতের বিভাজনের সাথে সম্পৃক্ত: ☐সত্য ☐মিথ্যা

২০-তাওহীদের সম্পর্ক ঈমানের সাথে, ঈমান হচ্ছে ব্যাপক আর তাওহীদ তার একটি অংশ: ☐সত্য ☐মিথ্যা

২১-'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্য এর: ☐দুটি রুকন ☐আটটি রুকন ☐৭টি রুকন

২২-বৃষ্টি বর্ষণ ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে একক সাব্যস্ত করা, কোন তাওহীদ: ☐উলুহিয়্যাহ ☐রুবুবিয়্যাহ ☐আসমা ওয়াস সিফাত

২৩-তাওহীদের মূল বিষয়ের সাথে কোনটি সাংঘর্ষিক: ☐শিরকে আকবার ☐শিরক আসগার ☐বিদআত

২৪-ওয়াজিবসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হচ্ছে পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যহার করা: ☐সত্য ☐মিথ্যা

২৫-হারাম সমূহের সবচেয়ে বড় হারাম হচ্ছে যিনা করা ও অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা: ☐সত্য ☐মিথ্যা

২৬-ইবাদাত কয়টি বিষয়ের উপর প্রায়গিক: ☐২টি ☐১ টি

২৭-ইবাদাত বলা হয় (ইবাদাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক নাম যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ) ।এটা কার প্রদত্ত সংজ্ঞা: ☐ইবনুল কাইয়ূম ☐ইবনে তাইমিয়্যাহ

২৮-সঠিক: [গাইর (ছাড়া). . .]: ☐রুপদান ও সমকক্ষ ☐রুপদান ও সদৃশ ☐কোন পার্থক্য নেই।

২৯-কুআন মাজীদের সবগুলো আয়াত তাওহীদকে শামিলকারী: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৩০-মানুষ ও জ্বীন জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মতই: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৩১-﴿আমি মানুষকে ও জ্বীনকে সৃষ্টি করেছি﴾ সাধারণত এখানে শংসয় সৃষ্টি হয়: ☐বোঝার ক্ষেত্রে ☐আমলের ক্ষেত্রে

৩২-জ্বীনরা নিম্নোক্ত কোনটির মুকাল্লাফ (যার উপর শরীয়াত ভারার্পিত হয়): ☐ঈমানের ☐ঈমান ও শরীয়াতের বিষয়ের

৩৩-উম্মত শব্দটি ব্যবহার হয়: ☐ইমাম ☐জাতি ☐সময় ☐দল ☐প্রাগুক্ত সবগুলো

৩৪-﴿আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি﴾ কোন যুগ থেকে শুরু: ☐আদম ☐নুহ; কোন যুগ পর্যন্ত ☐ঈসা ☐মহাম্মদ, আর রাসূল প্রেরণের হিকমত : ☐দলীল প্রতিষ্ঠকরণ ☐রহমত ☐আল্লাহর পথের রাস্তা বর্ণনা ☐উপরের সবগুলো

৩৫-আল্লাহ ব্যতীত যে সমস্ত মূর্তির ইবাদাত করা তা তাগুত এর অন্তর্ভূক্ত: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৩৬-তাগুতের এর অনুসরণ,যেমন: আল্লাহর আনুগত্য থেকে বহির্ভূত শাসকগণ: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৩৭-আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারো ইবাদাত করা হয়, আর সে অসন্তুষ্ট; ☐তাগুত ☐তাগুত নয়

৩৮-কিতাবুত তাওহীদের দ্বিতীয় আয়াত তাওহীদের দিকে দাওয়াত প্রেরণের জন্য রাসূলগণের একীভূতকরণ বুঝানোর জন্য উল্লেখিত হয়েছে: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৩৯-গ্রন্থকারের উক্তি﴿ أكمل الآية أو الآيات﴾ অর্থ্যাৎ﴿آية أو آيات﴾: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৪০-কাযা, হুকুম ও ইরাদাহ শারয়ী ও কাওনী বিভাগে বিভক্ত: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৪১- যা আল্লাহর নিকটে এক দৃষ্টিকোন থেকে পছন্দনীয় ও অন্য দৃষ্টিকোন থেকে অপছন্দনীয়, তা কোন ধরনের কাযা (ফয়সালা); ☐শারয়ী ☐কাওনী

৪২-﴿আমি বনী ইসরাইলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দু'বার অনর্থ সৃষ্টি করবে। সূরা বানী ঈসরাইল-৪﴾ কোন কাযা (ফয়সালা); ☐শারয়ী ☐কাওনী

৪৩- গিরগিটি ছাড়া সকল প্রাণীই আল্লাহর তাসবীহ করে: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৪৪-উবুদিয়্যাহ কয় ভাগে বিভক্ত: ☐২ ☐৩ ;পাখিদের তাসবীহ কোন উবুদিয়্যাহ: ☐কাহর ☐তায়াহ

৪৫-আল্লাহর ইবাদাতের মধ্য থেকে কিছু অংশ মুশরিকদের জন্য রয়েছে: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৪৬- জিহ্বা ও অঙ্গপ্রতঙ্গ ছাড়া ইবাদাত সম্পন্ন হয় না: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৪৭- ﴿তার সাথে কাউকে শরীক স্থাপন করো না﴾ এর মধ্যে সকল জিনিস ব্যাপৃত: কোন নবী, ফেরেশতা, ওলী এমনকি দুনিয়াবী কোন বিষয়েও তার সাথে শরীক স্থাপন করা যাবে না: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৪৮- আল বাশারাহ; আনন্দদায়ক সংবাদ, তবে কষ্টদায়ক সংবাদ অন্তর্ভূক্ত নয়: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৪৯-যে নিষ্পাপ আত্মাকে আল্লাহ তায়ালা হত্যা করা হারাম করেছেন, সেই আত্মাটি হলো: ☐মুসলিম ☐যিম্মী ☐মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ ☐নিরাপত্তাকামী

৫০-নবী (সাঃ) কি ওসিয়ত করেছিলেন? ☐হ্যাঁ ☐না

৫১-ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর উক্তি: (তার ওসিয়ত); কারণ: ☐পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শামিল ☐আল্লাহর ওসিয়ত ☐প্রাগুক্ত সবগুলো

৫২-আল্লাহর উপর বান্দার হক: ☐ওয়াজিব হক ☐অনুগ্রহের হক

৫৩-(আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন) বলা হয়: ☐রাসূলের জীবদ্দশায় ☐সর্বসময়

৫৪-রাসূল (সাঃ) মুআয (রাঃ) কে সুসংবাদ প্রদান করতে নিষেধ করেছেন, যাতে তারা না করে: ☐ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ☐নির্ভর করে থাকা , মুআয (রাঃ) কি এই নির্দেশ অমান্য করেছিলেন? ☐হ্যাঁ ☐ না, কেননা সর্বাবস্থায় ইলম গোপন করা হারাম: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৫৬- কোন বিষয়ের ফযীলত সাব্যস্ত করা, সেই বিষয় ওয়াজিব না হওয়াকে আবশ্যক করে: ☐সত্য ☐ মিথ্যা

৫৭-﴿যখন এককভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লাসিত হয়ে ওঠে। সূরা যুমার-৪৫﴾ আলোচ্য আয়াতটি কত নং অধ্যায়ের সম্পূর্ণরুপে সামঞ্জস্যপূর্ন: ☐২ ☐৫ ☐৪

৫৮-যা আল্লাহ নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন তা কয়ভাগে বিভক্ত: ☐২ ভাগে ☐৩ ভাগে

৫৯-সবচেয়ে বড় যুলুম হচ্ছে, মানুষ অপরের মানুষের সাথে নফস, সম্পদ ও সামগ্রী এর ব্যাপারে যুলুম করা: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৬০-কেউ যদি শিরক ছাড়া পাপিষ্ট অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হয়, তবে সে কি প্রাপ্ত হবে: ☐আযাব ☐আল্লাহর ইচ্ছাধীনে

৬১- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হলো যিকির, দুআ নয়: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৬২-এমন ব্যক্তি পাওয়া গেল যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, আল্লাহর কাছে তার কোন কিছুই ওজন/পরিমাপ করা হবে না: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৬৩- 'নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল' সাক্ষ্যবাণী যে বিষয়কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে: ☐পাপ কর্ম ☐বিদআত ☐প্রাগুক্ত সবগুলো

৬৪- 'ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা' দ্বারা ইয়াহুদিদেরকে ও 'তার রাসূল' দ্বারা নাসারাদেরকে খন্ডন করা হয়েছে: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৬৫-﴿তার পক্ষ থেকে সৃষ্ট রুহ﴾ এটি কোন ধরনের সংযুক্তি: ☐আ'য়ান ☐আওসাফ

৬৬- আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন: ☐সম্পূর্ন প্রবেশ ☐অসম্পূর্ণ প্রবেশ ☐প্রাগুক্ত সবগুলো

৬৭-তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ এর অর্থ হচ্ছে, মুক্ত থাকা: ☐শিরক থেকে ☐বিদআত থেকে ☐পাপাচার থেকে ☐উপরের সবগুলো

৬৮-﴿নিশ্চয় ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন উম্মত ﴾ উম্মত অর্থ: ☐আদর্শ ☐ইমাম ☐কল্যানের শিক্ষক ☐উপরের সবগুলো

৬৯-নজর লাগা ও জ্বর ছাড়া ব্যাহ্যিক ও অভ্যন্তরিন কোন অসুস্থতায় ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক করা শরীয়াত সম্মত নয়: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৭০-لا يَسْتَرقون এর হাদীস, ইমাম মুসলিম (রহঃ) لاَ يَرْقُونَ বৃদ্ধি করেছেন, এই বৃদ্ধিটা: ☐সঠিক ☐ভুল

৭১- যিম্মী ও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি যে কেউ শিরকে আকবার করলে তার রক্ত ও ধনসম্পদ বৈধ: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৭২-'রাকী' ও 'মুসতারকী' এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, মুসতারকী হচ্ছে, যে অন্তর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে প্রার্থনাকারী, মিনতি কারী, ভ্রুক্ষেপকারী, আর রাকী হচ্ছে নেককার: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৭৩-আল্লাহর বৈশিষ্টাবলীর সাথে অন্য কাউকে সমানকরণ, কোন ধরনের শিরক: ☐আকবার ☐আসগার

৭৪-নিজস্ব আকৃতিতে ভাস্কর্য, একে কি বলা হয়: ☐সানামুন ☐ওছানুন

৭৫-উত্তম সম্পদ: ☐উৎকৃষ্টতর ☐মধ্যমতর ☐স্বল্পতর

৭৬-ইলম ও আমল দ্বারা বান্দা তার নফসকে পূর্ণ করবে, আর দাওয়াত ও ধৈর্য দিয়ে অন্যকে পূর্ণ করবে: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৭৭-রাসূল (সাঃ) তার উম্মতের উপর দাজ্জালের চেয়েও রিয়াকে বেশি ভয় করেছেন। কেননা রিয়া হচ্ছে শিরকে আসগার: ☐সত্য ☐ মিথ্যা

৭৮-বান্দা যখন তার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সত্যবাদী হবে, তখন তার জন্য অবশ্য করণীয় হচ্ছে আকীদার দিকে মানুষকে আহ্বান করা: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৭৯-আল বাসীরাহ: ☐শারয়ী জ্ঞান ☐হিকমত ☐আহুত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ☐প্রাগুক্ত সবকটি

৮০-দাওয়াত প্রদানের শর্তের সংখ্যাসমূহ: ☐পাঁচ ☐চার ☐তিন

৮১-শিরকে আকবার ও শিরকে আসগার এর মধ্যে পার্থক্য:

....
....
....
....

পঞ্চম প্রশ্ন: 'ক' সারি এর সথে 'খ' সারিকে যথোচিতভাবে মেলাও:

১	আল হুমাহ	☞ভালবাসা ও সম্মানের সহিত নির্দেশসমূহ পালন এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট অবনত হওয়া।
২	আল উলুহিয়্যাহ	☞তা হলো লাল উটনী, আলোচ্য হাদীসে লাল উটনীর কথা বলা হয়েছে, কেননা আরবরা লাল উটনীর প্রতি ইপ্সিত/আকাংক্ষিত।
৩	আল ইবাদাত	☞কোন সময় অথবা স্থান সম্পর্কে জানা, দেখা ও শোনার পরে অশুভ লক্ষন মনে করা।
৪	আত তাগুত	☞সদৃশ,সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ।
৫	আর রিয়া	☞এমন বস্তু যা মানুষ ও অন্য জিনিসের আকৃতির আকারে গঠিত হয় এবং আল্লাহ ছাড়া তার ইবাদাত করা হয়।
৬	আত তাতায়য়ূর	☞আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারো যে কোন পদ্ধতিতে ইবাদাত করা।
৭	আন নিদ	☞বান্দা মাতবু অথবা মাবুদ অথবা মুতা' এর ক্ষেত্রে তার পরিসীমাকে অতিক্রম করা।
৮	আস সানামু	☞মানুষকে দেখানো বা শোনানোর জন্য আল্লাহর ইবাদত করা যাতে মানুষ তাকে আবেদ হিসাবে প্রশংসা করে।
৯	আত তাওহীদ	☞সৃষ্টি, রাজত্ব ও কর্তৃত্ব পরিচালনায় আল্লাহকে একক হিসেবে বিশ্বাস করা অথবা কার্যাবলিতে আল্লাহকে একক হিসেবে বিশ্বাস করা।
১০	আল ইবাদাত	☞এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা অথবা ইবাদাত জাতীয় কার্যাবলিতে আল্লাহকে একক হিসেবে সাব্যস্ত করা।
১১	আল খাওয়ারেজ	☞ইবাদাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক নাম যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ।
১২	আল ওছানু	☞যারা বলে যে, কবীরা গুনাহ কারী কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী।
১৩	আর রুবুবিয়্যাহ	☞রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত ও আসমা ও সিফাত এর ক্ষেত্রে যা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট তা এককরুপে তার জন্য সাব্যস্ত করা।
----		☞আল্লাহর দিকে অভিমূখী ও শিরক থেকে পশ্চাপদগামী এবং যা কিছু আনুগত্যের বিপরীত তা থেকে দূরে অবস্থানকারী।
১৪	হুমুরুন নায়াম	☞প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণীর দংশন।
১৫	হানিফা	

তাওহীদ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য দানের ব্যাখ্যা

যেহেতু পূর্বের অধ্যায়গুলোতে তাওহীদ প্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। তাই তাওহীদ কি, যে প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়গুলি উল্লেখিত হয়েছে (তাওহীদের অপরিহার্যতা, ফযীলত, প্রতিষ্ঠাকরণ, তার বিপরীত জিনিস থেকে ভয় করা, এবং তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়া) সেটার বিবরণ জানার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে আছে।

সুতরাং এ অধ্যায় উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে সেই বাসনা পূরণ, আর তা হলো তাওহীদের ব্যাখ্যা অধ্যায় থেকে শুরু করে গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত।

প্রথম দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী :﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾

যাদেরকে তারা আহ্বান করে তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য অবলম্বন তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। (সূরা বানী ইসরাইল- ৫৭)

● يَدْعُونَ : ঐ সমস্ত লোকেরা যাদেরকে আহ্বান করে তারা তাদের পালনকর্তার নেকট্য লাভ তালাশ করে, কে তাদের মধ্যে নৈকট্যশীল; তাহলে কিভাবে তোমরা তাদেরকে ডাক অথচ তারাই মুখাপেক্ষী ও অভাবী (এটা হচ্ছে আহ্বান এর ক্ষেত্রে শিরক)

দ্বিতীয় দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ﴾

যখন তার ইবরাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন: তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তবে আমার সম্পর্ক তার সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা যুখরুফ-২৬)

● إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي : এখানে নাফী ও ইছবাত উভয়ের মাঝে মিলন হয়েছে। এবং (إِلاَّ الله) বলা হয়নি ২ টি উপকারার্থে:

১- ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার একাত্বতার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে। কেননা যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির ক্ষেত্রে একক। সুতরাং ওয়াজিব হচ্ছে ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাকে একক সাব্যস্ত করা।

২- প্রতিমা এর ইবাদাত বাতিল বর্ণনা করার জন্য। কেননা তোমরা তার ইবাদাত করলেও তারা তোমাদেরকে সৃষ্টি করে নি।

● আল্লাহকে অন্যের সাথে সংযুক্ত করণের মাধ্যমে ইবাদাত কখনও হাসিল হবে না। বরং একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে। কিছু কিছু ইসলামী রাষ্ট্রে এমনও কিছু ব্যক্তি আছে, যারা সালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে, সিয়াম পালন করে এবং হজ্ব আদায় করে অথচ এগুলোর পাশাপাশি কবরে গিয়ে সিজদাও করে।

তৃতীয় ও চতুর্থ দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾

তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তা রুপে গ্রহণ করেছে । (সূরা তাওবা-৩১)

আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾

মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে অংশীদাররুপে গ্রহণ করে। এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালবাসার মতই ভালবাসে। (সূরা বাকারা-২৬৫)

● أَحْبَارَهُمْ : তাদের আলেমগণ, এবং তাদের অধিক জ্ঞানের কারনে তাদেরকে বাহর তথা সমুদ্র বলা হয়।

● وَرُهْبَانَهُمْ : তাদের উপাসক/পূজারী।

● أَرْبَابًا : তারা আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে আলেমদের অনুসরণ করে। এবং তাদের উপাসকের পূজা করে (আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক)।

● يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ : তারা তাদের শরীককে আল্লাহকে ভালবাসার সমপরিমাণ ভালবাসে।

মহাব্বত (ভালবাসা) এর প্রকারভেদঃ

আল্লাহর সাথে অন্যকে ভালবাসাঃ

(শিরকে আকবার) আল্লাহকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সমান বা তার চেয়ে বেশি ভালবাসা আল্লাহকে ভালবাসার সাথে সম্পূর্ণ বিরোধী।

আল্লাহর জন্য অথবা আল্লাহর রাস্তায় ভালবাসাঃ

(ওয়াজিব) ((ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হলো, আল্লাহর সাথে সম্প্রীতি স্থাপন করা।. . .)

স্বভাবজাত ভালবাসাঃ

(জায়েয/বৈধ) তবে শর্ত হচ্ছে যে, আল্লাহর ভালবাসার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। যেমন, স্ত্রী ও সন্তানকে ভালবাসা।

অনুরুপভাবে আল্লাহর ক্ষেত্রে ভালবাসা আমল, আমেল (কর্তা), সময় ও স্থান কে ভালবাসার বিভাগে বিভক্ত।

পঞ্চম দলীলঃ

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন-

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَكَفَرَ بما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله تَعَالَى ».

যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করল, তার মাল ও রক্ত হারাম হয়ে গেল ও তার (অন্তরের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

● **وَكَفَرَ بما يُعْبَد:** আল্লাহ ছাড়া আর অন্য যে কারো ইবাদাত করা হয়, তাকে অস্বীকার করা আবশ্যক। এমনকি সব ধরনের কুফুরীকে অস্বীকার করতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুখে শাহাদাত (সাক্ষ্যবাণী) পাঠ করবে ও পাশাপাশি মনে করবে যে, ইয়াহুদি ও নাসারারা সঠিক দ্বীনে আছে, তবে সে মুসলিম নয়। অনুরুপভাবে যে সকল দ্বীনকে বিবেচনাধীন মনে করবে, এবং তার মধ্য থেকে যা ইচ্ছা সেটা গ্রহণ করবে সেও মুসলিম নয়।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলাসমূহ জানা যায়।

আলোচ্য অধ্যায়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্ববৃহৎ বিষয় আলোচনা করা হযেছে। আর তা হচ্ছে তাওহীদ এবং শাহাদাতের তাফসীর। কয়েকটি সুস্পষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে (যা অবশ্যই নাফী [না বোধক] ও ইছবাত [হ্যাঁ বোধক] হতে হবে।)। যেমন-

ক. সূরা ইসরার আয়াত, এ আয়াতে সে সব মুশরিকদের সমুচিত জওয়াব দেয়া হয়েছে যারা বুযুর্গ ও নেক বান্দাদেরকে (আল্লাহকে ডাকার মতো) ডাকে। আর এটা যে 'শিরকে আকবার' এ কথার বর্ণনাও এখানে রয়েছে। (দুআ তথা আহ্বান করার ক্ষেত্রে শিরক)

খ. সূরা তাওবার আয়াত। এতে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও দরবেশ ব্যক্তিদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অন্যায় ও পাপ কাজের আলেম ও আবেদদের আনুগত্য করা যাবে না। তাদের কাছে দোয়াও করা যাবে না। (আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক)

গ. কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে ইবরাহীম খলীল (আ)- এর কথা ✡ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ✡ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ দ্বারা তার রবকে যাবতীয় মা'বুদ থেকে আলাদা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এখানে এটাই বর্ণনা করেছেন যে (বাতিল মা'বুদ থেকে) পবিত্র থাকা আর প্রকৃত মা'বুদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাই হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ - এর ব্যাখ্যা। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,.....

"আর ইবরাহীম এ কথাটি পরবর্তীতে তার সন্তানের মধ্যে রেখে গেল, যেন তারা তার দিকে ফিরে আসে।" (সূরা যুখরুফঃ আয়াত-২৮)

ঘ. সূরা বাকারা কাফেরদের বিষয় সম্পর্কিত আয়াত। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-....." তারা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।"(সূরা বাকারাঃ আয়াত ১৬৭) এখানে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন যে, মুশরিকরা তাদের শরীকদেরকে (যাদেরকে তারা আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার মনে করে) আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই ভালোবাসে। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা আল্লাহকে ভালোবাসে, কিন্তু এ ভালোবাসা তাদেরকে ইসলামে দাখিল করতে পারেনি। তাহলে আল্লাহর শরীককে যে ব্যক্তি আল্লাহর চেয়েও বেশি ভালোবাসে সে কিভাবে ইসলামকে গ্রহণ করবে। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র শরীককেই ভালোবাসে। আল্লাহর প্রতি তার কোন ভালোবাসা নেই তার অবস্থাই বা কি হবে?

(ভালবাসার ক্ষেত্রে শিরক, সুতরাং তা ৪ ভাগে বিভক্ত:

[১] অন্য সকল কিছুর চেয়ে আল্লাহকে অকাট্যভাবে ভালবাসবে, আর এটাই হচ্ছে তাওহীদ।

[২] আল্লাহকে ভালবাসার মতই অন্যকে ভালবাসবে, এটা শিরক।

[৩] আল্লাহর চেয়ে অন্যকে বেশি ভালবাসবে, এটা পূর্বেরটার চেয়েও বড় শিরক।

[৪] আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভালবাসবে এবং তার অন্তরে আল্লাহর কোন ভালবাসা থাকবে না, এটা সবচেয়ে বড় ও ভয়ঙ্কর শিরক।)

ঙ. রাসূল (সাঃ) - এর বাণী - مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَكَفَرَ بما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله تَعَالَى. " যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে আর আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয় তাকেই অস্বীকার করবে, তার ধন-সম্পদ ও রক্ত পবিত্র। "অর্থাৎ জান, মাল, মুসলমানের কাছে নিরাপদ এ বাণী হচ্ছে- লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। কারণ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মাধ্যমে মৌখিক উচ্চারণ, শব্দসহ এর অর্থ জানা, এর স্বীকৃতি প্রদান, এমনকি শুধুমাত্র লা-শারীক আল্লাহকে ডাকলেই জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহর ইবাদত তথা মিথ্যা মাবুদগুলোকে অস্বীকার করার বিষয়টি সংযুক্ত না হবে। এতে যদি কোন প্রকার সন্দেহ, সংশয় কিংবা দ্বিধা সংকোচ পরিলক্ষিত হয় তাহলে জান-মাল ও নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অতএব,এটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, সুস্পষ্ট বর্ণনা ও অকাট্য দলীল।

বালা-মসিবত দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রিং, তাগা ইত্যাদি পরিধান করা শিরক।

- من الشرك (শিরকের অন্তর্ভূ[3]): অর্থ্যাৎ: কতিপয় শিরক, তন্মধ্যে কিছু রয়েছে বড় আর কিছু রয়েছে ছোট, আর এই জন্যই মুতলাক (ব্যাপক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।
- لرفع البلاء (বালা-মসিবত দূর করা): আসার পরে। أو دفعه (বালা-মসিবত প্রতিরোধ করা) :আসার পূর্বে

রিং, তাগা ইত্যাদি পরিধান করা শিরকে আসগার নাকি শিরকে আকবার?

শিরকে আকবার:

আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে রিং-তাগা নিজেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম এবং ও রিং-তাগার নিয়ন্ত্রনেই রয়েছে উপকার সাধন ও অপকার নির্মূল করার ক্ষমতা মর্মে যখন বিশ্বাস স্থাপন করা হবে, তখন তা শিরকে আকবার হবে।

শিরকে আসগার:

আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে রিং-তাগা একটি মাধ্যম মাত্র, তবে আল্লাহ তায়ালা একে শারয়ী ও বোধশক্তিসম্বন্ধীয়ভাবে মাধ্যম বানাননি মর্মে যখন বিশ্বাস স্থাপন করা হবে, তখন তা শিরকে আসগার হবে।

মাধ্যম গ্রহনের ব্যাপারে মানুষের বিশ্বাস ৩ ভাগে বিভক্ত:

সহীহ (সঠিক):

আল্লাহ যাকে মাধ্যম বানিয়েছেন তাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহন করা ও তা বিশ্বাস করা। অধিকন্তু এই মাধ্যম অনুভবযোগ্য হতে পারে। যেমন, ঔষধ। অথবা শারয়ী হতে পারে। যেমন, ঝাড়ফুঁক করা।

শিরকে আসগার:

আল্লাহ যাকে মাধ্যম বানান নি তাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহন করা ও তা বিশ্বাস করা। যেমন, নজর লাগা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ষাঁড়ের মাথায় কোন কিছু লটকানো। অথচ আল্লাহ একে মাধ্যম বানান নি।

শিরকে আকবার:

আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে রিং-তাগা নিজেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম এবং ও রিং-তাগার নিয়ন্ত্রনেই রয়েছে উপকার সাধন ও অপকার নির্মূল করার ক্ষমতা মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা।

মাধ্যম গ্রহণের ব্যাপারে মানুষেরা ৩ ভাগে বিভক্ত:

মাধ্যমকে অস্বীকার করে:

তারা আল্লাহর হিকমতকে অস্বীকার করে। যেমন, জাবারিয়্যাহ ও আশায়েরা।

মাধ্যম গ্রহণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে:

অমাধ্যমকে মাধ্যম হিসাবে সাব্যস্ত করে। যেমন, সুফীরা।

মাধ্যম গ্রহণের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে:

শুধুমাত্র অনুভবীয় ও শারয়ী মাধ্যমকে সাব্যস্ত করে,অন্যগুলিকে সাব্যস্ত করে না।

তাগা ও প্রভৃতি পরিধানকারীর বিধান ও তার অবস্থাসমূহ:

তার বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ হতে পারে।	এটি শিক্ষা প্রদানকৃত।
আল্লাহ যাকে মাধ্যম বানান নি তাকে মাধ্যম হিসেবে বিশ্বাস করা।	এটি শিরকে আসগার
আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে রিং-তাগা নিজেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম এবং ও রিং-তাগার নিয়ন্ত্রনেই রয়েছে উপকার সাধন ও অপকার নির্মূল করার ক্ষমতা মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা।	এটি শিরকে আকবার
এ ব্যাপারে কোন তার/তাদের কোন বিশ্বাস নেই তবে সৌন্দর্য বর্ধনের এগুলো পরিধান করে থাকে। যেমন, বর্তমান সময়ে কিছু যুবকের অবস্থা (আল্লাহ আমাদেরকে ও তাদেরকে হেদায়াত দান করুন)। এমনকি কোন কিছু ঝুলানো দেখলেই সেটাকে বৈধ মনে করে এবং এটার মাধ্যমে মানুষের মাঝে পাপের দরজা উন্মুক্ত হয়। এমনকি এটি নারী ও মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়।	এটি কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম কবীরা গুনাহ

প্রথম দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ﴾

বলুন! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি তাঁর ক্ষতি হতে আমাকে রক্ষা করতে পারবে? (সূরা যুমার-৩৮)

- এই প্রতিমাগুলো তার ধারক ও বাহকের কোন উপকার করতে পারে না। এমনকি কোন উপকার সাধন ও অপকার প্রতিরোধ করারও ক্ষমতা রাখেনা। এবং তারা এগুলোর মাধ্যমও নয়। এর উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক ঐ জিনিস যা শারয়ী ও অদৃষ্ট কোন মাধ্যম নয়, তাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহন করলে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনরুপে গণ্য হবে।
- قل حسبي الله: এখানে অনুমান ভিত্তিক মাধ্যম ব্যতীত যথেষ্টতা আল্লাহর দিকে সমর্পন করার বিষয় অন্তর্নিহিত আছে।

দ্বিতীয় দলীলঃ

عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً

ইমরান ইবনুল হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) এক ব্যক্তির হাতে পিতলের বালা পরিহিত দেখে জিজ্ঞেস করেন: এই বালাটা কী? সে বললো, এটা অবসন্নতা জনিত রোগের জন্য ধারণ করেছি। তিনি বলেন; এটা খুলে ফেলো। অন্যথায় তা তোমার অবসন্নতা বৃদ্ধিই করবে। (আহমাদ, তবে সনদের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই)

- **حلقة من صفر** : তামা বা তামাজাতীয় দ্রব্যের বালা, যদিও সেটা লোহা বা সূতা দ্বারা গঠিত হয়।
- **ما هذه؟ :** প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে নিশ্চিত হওয়া। কেননা কখনও কখনও যে জিনিসকে মন্দ বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়, প্রকৃতার্থে সেটা মন্দ নয়।
- **الواهنة** : এমন রোগ যা হাড্ডিকে আক্রান্ত করে ফেলে। যেমন, বাত-ব্যথা। এই বালা জাতীয় জিনিস দ্বারা এমন রোগ প্রতিরোধ বা রোগমুক্তির বাসনা করা হয়।
- **لا تزيدك إلا وهناً** : অর্থ্যাৎ শরীর ও বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়। এবং আমলের ধরণ অনুযায়ী প্রতিদানও প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় দলীলঃ

عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ، و في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك

উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি। যে ব্যি³ তাবীজ লটকাবে আল্লাহ তার (আশা) পূর্ণ করবেন না আর যে ব্যি³ কড়ি লটকাবে আল্লাহু কড়ি দিয়ে তার কোন উপকার করবেন না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যি³ তাবীজ ঝুলালো সে শিরক করল।

● **من تعلق تميمة** : তাবীজ ঝুলালো/লটকালো এবং অন্তরের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করল। আর এই জন্যই **تعلق** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে,. علق শব্দ ব্যবহার করা হয়নি।

● **فلا أتم الله له** : এটা হয়ত তার উপর দুআ অথবা শুধুমাত্র সংবাদ মাত্র।

● **ومن تعلق ودعة** : এমন জিনিস যা সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করা হয়। যেমন, ঝিনুক।

● **فلا ودع الله له** : অর্থ্যাৎ আল্লাহ তাকে স্থবিরতা তথা মৌনতা/স্থিরতার জন্য ছেড়ে দেন না। সুতরাং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কৃত হয়।।

● **فقد أشرك** : যদি এই বিশ্বাস করে যে, এই সমস্ত জিনিস আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া নিজে নিজেই আরোগ্য লাভ বা উপকার ও অপকারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে সে শিরকে আকবার করল। আর যদি এই বিশ্বাস না করে তাহলে তা শিরক আসগার এর অন্তর্ভূক্ত।

চতুর্থ দলীল:

ولابن أبي حاتم عن حذيفة: أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، فقطعه وتلا قوله: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ

ইবনে আবী হাতেম হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এক ব্যক্তির হাতে জ্বরের সূতা দেখতে পেয়ে সেটা কেটে ফেললেন এবং তেলোয়াত করলেন অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কিন্তু তারা মুশরিক।

● **من الحمى**: অর্থ্যাৎ জ্বর থেকে আরোগ্য লাভ অথবা জ্বরকে প্রশমন করার কারনে।

● فقطعه : হাত দ্বারা অপকর্মকে প্রতিহতকরণ, পূর্ববর্তীদের লোকদের মন্দ কাজকে প্রতিহত করার ক্ষমতা।

● কোন কিছু ঝুলানোর বিধান:

যে কোন কিছু ঝুলানো বা লটকানো হারাম: বালা, সূতা/তাগা, শঙ্খ, তাবীজ, নেকড়ে বাঘের চোখ, পশুর পায়ের খুর/ক্ষুর, পুরাতন জুতা, ছোট নীল দানা/পুঁতি, ঝালর (বস্ত্রেও মুড়ি সেলাই করা), লেন্স, ষাঁড়ের মাথা, সিংঘের প্রতিকৃতি, কতিপয় গাছ ও বস্ত্রখন্ড প্রভৃতি সবকিছুই হারাম।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা সমূহ জানা যায়ঃ

১। বালা ও সূতা প্রভৃতি পরিধান করার ব্যাপারে কঠোরতা।

২। স্বয়ং সাহাবী যদি এসব জিনিস পরিহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তবুও তিনি সফলকাম হতে পারবেন না। এতে প্রমাণ হয় যে, ছোট শিরক কবিরা গুনাহের চেয়েও মারাত্নক। (শিরক যদি শিরকে আসগারও হয়, তবুও ক্ষমা করা হয় না। তবে কবিরা গুনাহ এর বিপরীত তথা ক্ষমা করা হয়।)

৩। এক্ষেত্রে অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহনযোগ্য নয়। (রাসূল (সাঃ) বর্ণনা করার পর সেখানে আর কোন ওযর গ্রহনযোগ্য নয়। অজ্ঞতা ২ ধরনের:

[১] এমন অজ্ঞতা যেখানে কোন ওযর গ্রহনযোগ্য নয়। আর তা হলো জানার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যা অবহেলা ও অমনোযোগীতার কারনে উদ্ভূত হয়।। এই ক্ষেত্রে ওযর গ্রহনযোগ্য নয়। তাতে অজ্ঞতা কুফরী ও পাপচারের অন্তর্ভূক্ত কোন বিষয়ে হলেও।

[২] এমন অজ্ঞতা যেখানে ওযর গ্রহনযোগ্য। আর তা হলো যা পূর্বের নিয়মের বিপরীতে উদ্ভূত হয়। অর্থ্যাৎ সে অবহেলা করে নি, অমনোযোগীও হয় নি এবং তার জানার প্রয়োজনও পড়ে নি যে, এই জিনিসটি হারাম । এই ক্ষেত্রে ওযর গ্রহনযোগ্য। সে যদি ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে কোন সমস্যা নেই । আর যদি কুফুরীর সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে সে দুনিয়াতে কাফের। তবে আখেরাতের বিষয় আল্লাহর নিকট।)

৪। لا تزيدك إلا وهناً এ কথার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে,রিং বা তাগা পরিধান করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই বরং অকল্যাণ নিহিত আছে।

৫। যে ব্যক্তি এরুপ কাজ করবে তাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৬। এ কথা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে কোন কিছু শরীরে ঝুলাবে তার কুফল তার উপরেই আপতিত হবে।

৭। এ কথাও স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে তাবিজ ব্যবহার করল সে মূলত শিরক করল।

৮। জ্বর নিরাময়ের জন্য সুতা পরিধান করাও শিরক।

৯। হুযাইফা কর্তৃক কুরআনের আয়াত তেলোয়াত করার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে,সাহাবায়ে কিরাম শিরকে আসগারের দলীল হিসেবে উক্ত দলীল কেই উপস্থাপন করেছেন যার মধ্যে শিরকে আকবারের কথাও উল্লেখিত আছে। যেমনটি ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূরা বাকারার আয়াতে উল্লেখ করেছেন। (ভালবাসার ক্ষেত্রে)

১০। নজর লাগা থেকে মুক্তি লাভের জন্য কড়ি,শঙ্খ,শামুক ইত্যাদি লটকানো শিরক। (তাবীজ জাতীয় শিরক)

১১। যে ব্যক্তি তাবীজ ব্যবহার করে তার ওপর বদদোয়া করা হয়েছে, আল্লাহ যেন তাকে তার আশা পূরণ না করেন। আর যে ব্যক্তি শামুক, কড়ি বা শঙ্খ লটকায় তাকে যেন আল্লাহ রক্ষা না করেন। (এই বিবরণের ভিত্তিতে কোন তাবীজ পরিহিত ব্যক্তিকে আমরা সম্বাধন করে বলব না যে, আল্লাহ তোমার আশা পূরণ না করুন। কেননা আমাদের সম্বোধিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্টকরণ ও এই ঘোষনা দেওয়ার ফলে দ্বীনি ক্ষেত্রে অনীহার উদ্ভব হতে পারে। তাই আমরা বলব: তাবীজ অথবা শঙ্খ খুলে ফেল। অতঃপর আমরা তার নিকট এই হাদীস পাঠ করব।)

[৮] ঝাড়ফুঁক ও তাবীজ কবজ সম্পর্কে

লেখক বলেন: ঝাড়ফুককে কেন শিরক বলা হয়নি?

উত্তর: ১- কেননা ঝাড়ফুক দুই প্রকার: ক. বৈধ ঝাড়ফুক খ. অবৈধ ঝাড়ফুক

২- সমস্ত তাবিজ কবজ শিরক তবে যদি কোরআনের আয়াত থাকে তাহলে হারাম

প্রথম দলীল:

أَنَّ أَبَا بَشِيْرٍ الأَنْصَارِيَّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَسُوْلاً أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِيْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ.

আবূ বাশীর আল-আনসারী (রাঃ) আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) -এর সঙ্গে ছিলেন। এ সফওে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) একজন সংবাদ বহনকারী পাঠালেন যে, কোন উটের গলায় যেন ধনুকের রশির মালা কিংবা মালা লটকানো না থাকে, আর ঝুললে তা যেন কেটে ফেলা হয়। [সহিহ বুখারী]।

● **فَأَرْسَلَ** : শরীয়াতের চাহিদা অনুযায়ী তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

● **قِلَادَةٌ** : তারা বিশ্বাস করত যে, উটের গলায় রশি ঝুলানো নজর লাগা থেকে প্রতিরোধ করে। আর এটি নিতান্তই ভ্রান্ত বিশ্বাস।

দ্বিতীয় দলীল:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ .

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি- ঝাড়ফুঁকু, তাবীয ও অবৈধ প্রেম ঘটানোর মন্ত্র শির্ক-এর অন্তর্ভুক্ত। (আহমাদ ও আবু দাউদ)

তৃতীয় দলীল:

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ

আবদুল্লাহ ইবনু উকাইম থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, যে লোক কোনকিছু ঝুলিয়ে রাখে (তাবীজ-তুমার) তাকে তাঁর উপরই সোপর্দ করা হয়। (আহমাদ, তিরমিজি)

● **إِنَّ الرُّقَى :** অর্থ্যাৎ, শরীয়াতে বর্ণিত ছাড়া তাদের নিকট প্রচলিত ঝাড়ফুঁক শিরক এর অন্তর্ভূক্ত।

● **مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ :** রাসূল (সাঃ) আলোচ্য হাদীসে عَلَّقَ বলেন নি বরং বরং تَعَلَّقَ বলেছেন । কারণ কোন ব্যক্তি তা শরীরে ঝুলায় এবং অন্তরকেও তার সাথে লটকিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে কোন কিছু ঝুলায়, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ঠ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে ঝুলায়, তা ব্যর্থ/পরিতাজ্য।

● কোন মানুষের জন্য উচিৎ নয় যে, নিজে নিজেই কোন জিনিসকে মাধ্যম বানিয়ে শরীরে ঝুলাবে, বরং তা ঝুলাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি গাফেল হয়ে রোগমুক্তির জন্য কোন জিনিসের তার অন্তরকে পুরপূর্ণ রুপে সাথে সংযুক্ত করবে, সে শিরক এর মধ্যে পতিত হবে। আর যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করবে যে, ব্যবহৃত জিনিসটি মাধ্যম মাত্রআর এই মাধ্যমর দ্বারা মুক্তিদাতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তার ভরসা কখনো সঙ্গতিহীন হবে না।

শারঈ ঝাড়ফুঁকের শর্তসমূহ:

ঝাড়ফুঁক আল কুরআন বা সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। কিংবা মহান আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ দ্বারা আহ্বানের মাধ্যমে হতে হবে।	ঝাড়ফুঁক এমন কথার মাধ্যমে হতে হবে; যা বোধগম্য, শ্রবণযোগ্য, পরিচিত/জানা আরবী ভাষায়।	এই বিশ্বাস করতে হবে যে, নিশ্চয়ই ঝাড়ফুঁক শারঈ উপকরণ মাত্র যা মহান আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত উপকার করতে সক্ষম নয়।

যখন কোন ঝাড়ফুঁকের মাঝে উল্লেখিত শর্তসমূহের মাঝে কোন একটি শর্ত পাওয়া যাবে না তখন তা শারঈ ঝাড়ফুঁকের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর আরবী ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় কোন ঝাড়ফুঁক নেই। তবে দু'আ বাক্যের মাধ্যমে করা যেতে পাওে, তখন আরবী ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় সঠিক হবে। তবে শর্ত হচ্ছে যে, মহান আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ পরিবর্তন করা যাবে না। কেননা মহান আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ তাওফীকীয়্যাহ (যেমনিভাবে নামসমূহ প্রত্যেক ভাষাতে একইভাবে উচ্চারিত হয়।) ।

তামাইম- তাবীজ: ইহা এমন জিনিস যা মানুষ ব্যক্তির বদ নজর থেকে রক্ষা পেতে ঝুলিয়ে থাকে। কিন্তু যখন এই তাবীজ ঝুলানোটা আল কুরআনের কোন আয়াত দ্বারা হবে তখন কিছু সালাফ এটাকে অনুমতি দিয়েছেন। আবার অনেকেই অনুমতি দেন নি।

বরং তারা এটাকে নিষেধাজ্ঞার মাঝেই গণ্য করেছেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

রুকা- ঝাড়ফুঁক: আর এটাকে আযাঈম বলা হয়ে থাকে। আর দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে ইহা শিরক থেকে মুক্ত। রাসূলুল- াহ (সাঃ) বদ নজর ও জর থেকে মুক্তির জন্য ইহা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

তিওয়ালাহ- ইহা এমন জিনিস যা মানুষ এই বিশ্বাস করে ব্যবহার করে থাকে যে, এর মাধ্যমে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা বৃদ্ধি হবে কিংবা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা বৃদ্ধি হবে।

তিওলাহ এর অন্তর্ভূক্ত বিপদমুক্তি আংটির হুকুমঃ

শিরকে আকবারঃ

যদি ব্যবহারকারী এই বিশ্বাস রাখে যে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং এর হাতেই উপকার সাধন ও ক্ষতির আশঙ্কা দূরীকরণের ক্ষমতা রয়েছে।

শিরকে আসগারঃ

যদি সে বিশ্বাস করে যে, এর মাধ্যমেই স্বামী - স্ত্রীর মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট রয়েছে।

হারামঃ

এর অবস্থা- প্রকৃতি/চিত্র খুবই কম। কেননা এটি খৃষ্টানদের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই তারা এর উদ্ভাবনগতভাবেই ত্রিত্ববাদ আকীদায় বিশ্বাস করে। এবং পুরুষদের জন্য স্বর্ণের কোন কিছু হলে, তা আরো বেশি ভয়ানক।

চতুর্থ দলীলঃ

وَ روي الإمام أحمد عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ قَالَ قَالَ لي رَسُوْلُ اللهِ يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَه أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ.

ওয়াইফি ইবনু সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, হে রুওয়াইফি'! হয়তো তুমি আমার পরে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে, তুমি তখন মানুষকে এ সংবাদ দিবে যে, যে ব্যক্তি নিজের দাড়ি জট পাকাবে অথবা ধনুকের রশি গলায় কবচ হিসেবে বাঁধবে অথবা পশুর গোবর বা হাড় দিয়ে শৌচকর্ম করবে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না। (আহমাদ)

● **أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَه** : আর এটি সাধারণত অহংকার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কিংবা বদ নজর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য করা হয়ে থাকে।

● **تَقَلَّدَ وَتَرًا** : বিতর হলো সুঁতার বাঁধন যা বকরী থেকে নেওয়া হয়ে থাকে। যা বদ নজর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

● **أَوِ اسْتَنْجى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ** : পশুর গোবর বা হাড় দিয়ে শৌচকর্ম করা।

● **أَوْ عَظْمٍ** : ইহা জিনদের খাবার। আর গোবর হলো জিনদের শুকনা খাবার।

পঞ্চম দলীল:

وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة كان كعدل رقبة. رواه وكيع

সাঈদ বিন যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কারো ঝুলানো তাবীজ ছিঁড়ে দিবে সে দাস মুক্তি সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। ওয়াকি' হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠ দলীল:

ইব্রাহিম থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে যে, আল কুরআনের বাক্য দ্বারা হৌক বা অন্যান্য বাক্য দ্বারা হৌক তারা তাবীজ ঝুলানোটা অপছন্দীয় মনে করতেন।

● **كان كعدل رقبة** : কেননা এর ফলে সে শিরকযুক্ত শয়তানের ইবাদাত থেকে মুক্ত করল। এবং মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করণের মধ্যে সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে এটি। তবে তাবীজ কেটে ফেলে দেওয়া শ্রেষ্ঠতর।

কেন আমরা আল কুরআন দ্বারা তাবীজ ঝুলানোকে হারাম মনে করি?

কতিপয় সালাফ এটিকে অপছন্দীয় বলেছেন। আর সালাফদের নিকটে অপছন্দীয় হওয়াটাই হারাম সাব্যস্ত করে।	নবী (সাঃ) এর বাণী নিশ্চয়ই ঝাড়ফুঁক, তাবীজ ঝুলানো এবং তিওয়ালাহ শিরকের অন্তর্ভুক্ত।	এর মাধ্যমে আমরা শিরকের দরজা উন্মুক্ত করে দিব। কেননা কতক মানুষ ধারণা করে যে, কুরআনের আয়াত ও কুরআন আয়াত ছাড়াও তাবীজ বৈধ ।	এর মাধ্যমে আল কুরআনকে অপমান করা হয়। কেননা তাবীজ ব্যবহারকারী ইহা পরেই বাথরুমে যায় এবং তার হাজত কার্য সমাপ্ত করে কিংবা অপবিত্র হয়ে যায়।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা জানা যায়:

১. ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ-কবজের ব্যাখ্যা।

২. (تولة) তিওয়ালাহ এর ব্যাখ্যা।

৩. কোন ব্যাতিক্রম ছাড়াই উপরোক্ত তিনটি বিষয় শিরক এর অন্তর্ভূক্ত।

৪. সত্যবাণী তথা আল কুরআনের সাহায্যে [চোখের] দৃষ্টি লাগা এবং সাপ বিচ্ছুর বিষ নিরাময়ের জন্য ঝাড়-ফুঁক করা শিরকের অন্তর্ভূক্ত নয়। (অনুরুপভাবে এই দুটি ছাড়া অন্যান্যগুলোও এগুলোর অন্তর্ভূক্ত। যেমন, যাদু)

৫. তাবীজ- কবজ আল কুরআন থেকে হলে তা শিরক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। (তবে ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর মতটি সর্বাধিক সমৃদ্ধ, কেননা মূল বিষয় হচ্ছে শরীয়াত অবিদ্যমানতা)

৬. খারাপ দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য পশুর রশি বা অন্য কিছু বুঝলানো তার অন্তর্ভূক্ত। (শিরকের অন্তর্ভূক্ত)

৭. যে ব্যক্তি ধনুকের রজ্জু গলায় ঝুলায় তার উপর কঠিন অভিসম্পাত।

৮. কোন মানুষের তাবীজ- কবজ ছিড়ে ফেলা কিংবা কেটে ফেলার ফযীলত।

৯. ইব্রাহীমের কথা পূর্বোক্ত মতভেদের বিরোধী নয়। কারণ এর দ্বারা আব্দুল্লাহর সঙ্গী- সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে। (এর দ্বারা সাহাবীরা (রাঃ) ও তাবীঈরা ব্যাপকভাবে উদ্দেশ্য নয়)

[৯] যে ব্যক্তি গাছ বা পাথর প্রভৃতির দ্বারা বরকত অর্জন করতে চায়

তাবাররুক: তা হলো বরকতের আশা করা। যেমন:

বৈধ তাবাররুক:

ক. শারঈ বিষয়। যেমন, মসজিদে হারামে সালাত আদায় করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।

খ. ইন্দ্রীয় বা অনূভুতি কেন্দ্রীক তাবাররুক: যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) এর গ্রন্থসমূহ পড়ার মাধ্যমে বরকতের আশা করা।

নিষিদ্ধ বরকত: যে সকল তাবাররুক শরীয়ত কর্তৃক সাব্যস্ত না এবং অনূভুতি এর মাঝেও অন্তর্ভুক্ত না সেগুলো হারাম বরকত। যেমন, নবী (সাঃ) এর হুজরাহ স্পর্শ করার মাধ্যমে বরকতের আশা করা।

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী,أَفَرَءَيْتُمُ اللَّٰتَ والعزى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى

তোমরা কি লাত ও উযযা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? আর তৃতীয় আরেকটি মানাৎ সম্পর্কে? [নাজম: ৫২-৫৩।]

দ্বিতীয় দলীল:

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى : اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:হুনাইনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যাত্রা শুরু করলেন। তিনি মুশরিকদের একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই গাছটিকে যাতু আনওয়াত বলা হতো। তারা এর মধ্যে তাদের অস্ত্রসমূহ লটকিয়ে রাখত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাদের যাতু আনওয়াতের মতো আমাদের জন্য একটা যাতু আনওয়াতের ব্যবস্থা করুণ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! এটা তো মূসা (আঃ) এর উম্মতের কথার মতো হলো। তারা বলেছিল, কাফিরদের যেমন অনেক উপাস্য রয়েছে তদ্রুপ আমাদেরও উপাস্যের ব্যবস্থা করে দিন। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই তোমাদের পুর্ববর্তিগনের নীতি অবলম্বন করবে। (তিরমিজি)

* (أفرأيتم اللات العزى) তোমরা আমাকে সংবাদ দাও এসকল মুর্তির অবস্খ যার তোমরা মহত্ত বর্ননা কর। সেগুলোর কি কোন তুলনা হতে পারে আল্লাহর এই বড় নিদর্শনা গুলোর সাথে, কেননা মুশরিকেরা বিশ্বাস করে যে মুর্তি গুলো তাদের উপকার ও অপকার করে, তাই তাদেও নিকট আসে, তাদেও নিকট দুআ করে, তাদেও জন্য কুরবানি করে, ও তাদেও নৈকট্য লাভ করে।

* (اللات) একজন সত ব্যাি যিনি হাজিদের জন্য ছাতু জাতীয় খাবার তৈরি করতেন।

মাসআলা মাসায়েল:

১. সূরা নাজম এর أفرايتم اللات والعزى এর তাফসীর।

২. সাহাবায়ে কেরামের কাংখিত বিষয়টির পরিচয়।

৩. তারা [সাহাবায়ে কেরাম] শিরক করেননি।

৪. তাঁরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চেয়েছিলেন এ কথা ভেবে যে, আল্লাহ তা [কাংখিত বিষয়টি] পছন্দ করেন।

৫. সাহাবায়ে কেরামই যদি এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকেন তাহলে অন্য লোকেরা তো এ ব্যাপারে আরো বেশী অজ্ঞ থাকবে।

৬. সাহাবায়ে কেরামের জন্য যে অধিক সওয়াব দান ও গুনাহ মাফের ওয়াদা রয়েছে অন্যদের ব্যাপারে তা নেই।

৭. রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের কাছে অপারগতার কথা বলেননি বরং তাঁদের কথার শক্ত জবাব এ কথার মাধ্যমে দিয়েছেন,

ألله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم

আল্লাহু আকবার নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী লোকদের নীতি। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নীতি অনুসরণ করছো। উপরোক্ততিনটি কথার দ্বারা বিষয়টি অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

৮. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে উদ্দেশ্য। এখানে এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের দাবী মূলতঃ মূসা (আঃ) এর কাছে বনী ইসরাইলের মাবুদ বানিয়ে দেয়ার দাবীরই অনুরূপ ছিল।

৯. রাসূল (সাঃ) কর্তৃক না সূচক জবাবের মধ্যেই তাঁদের জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মর্মার্থ অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে নিহিত আছে।

১০. রাসূল (সাঃ) ফতোয়া দানের ব্যাপারে হলফ করেছেন।

১১. শিরকের মধ্যে আকবার ও আসগার রয়েছে। কারণ, তাঁরা এর দ্বারা দীন থেকে বের হয়ে যাননি।

১২. আমরা কুফরী যমানার খুব কাছাকাছি ছিলাম [অর্থাৎ আমরা সবেমাত্র মুসলমান হয়েছি] এ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন না।

১৩. আশ্চর্যজনক ব্যাপারে যারা আল্লাহু আকবার বলা পছন্দ করে না, এটা তাদের বিরুদ্ধে একটা দলীল।

১৪. পাপের পথ বন্ধ করা।

১৫. জাহেলী যুগের লোকদের সাথে নিজেদের সামঞ্জস্যশীল করা নিষেধ।

১৬. শিক্ষাদানের সময় প্রয়োজন বোধে রাগ করা।

১৭. إنها السنن এটা পূর্ববর্তী লোকদের নীতি এ বাণী একটা চিরন্তন নীতি।

১৮. রাসূল (সাঃ) যে সংবাদ বলেছেন, বাস্তবে তাই ঘটেছে। এটা নবুয়তেরই নিদর্শন।

১৯. কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইহুদী ও খৃষ্টানদের চরিত্র সম্পর্কে যে দোষ-ত্রুটির কথা বলেছেন, তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যই বলেছেন।

২০. তাদের [আহলে কিতাবের] কাছে এ কথা স্বীকৃত যে ইবাদতের ভিত্তি হচ্ছে [আল্লাহ কিংবা রাসুলের] নির্দেশ। এখানে কবর সংক্রান্ত বিষয়ে শর্তকতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। من ربك [তোমার রব কে?] দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে তা সুস্পষ্ট। [অর্থাৎ আল্লাহ শিরক করার নির্দেশ না দেয়া সত্বেও তুমি শিরক করেছো। তাহলে তোমার রব কে যার হুকুমে শিরক করেছো?]। من نبيك [তোমার নবী কে] এটা নবী কর্তৃক গায়েবের খবর [অর্থাৎ কবরে কি প্রশ্ন করা হবে এ কথা নবী ছাড়া কেউ বলতে পারেনা। এখানে এ কথার দ্বারা বুঝানো হচ্ছে কে তোমার নবী? তিনি তো শিরক করার কথা বলেননি। তারপর ও তুমি শিরক করেছো। তাহলে তোমার শিরক করার নির্দেশ দাতা নবী কে? ما دينك [তোমার দীন কি] এ কথা তাদের إجعل لنا آلهة [আমাদের জন্যও ইলাহ ঠিক করে দিন) এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করা হবে। [অর্থাৎ তোমার দ্বীনতো শিরক করার নির্দেশ দেয়নি তাহলে তোমাকে শিরকের নির্দেশ দান কারী দ্বীন কি?]

২১. মুশরিকদের রীতি- নীতির মত আহলে কিতাবের [অর্থাৎ আসমানী কিতাব প্রাপ্তদের] রীতি-নীতিও দোষনীয়।

২২. যে বাতিল এক সময় অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো তা পরিবর্তনকারী একজন নওমুসলিমের অন্তর পূর্বের সে অভ্যাস ও স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। ونحن حدثاء عهد بكفر [আমরা কুফরী যুগের খুব নিকটবর্তী ছিলাম বা নতুন মুসলমান ছিলাম] সাহাবীদের এ কথার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

[১০] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করা প্রসঙ্গে

লেখক কেন এ অধ্যায়ে বলেননি: আল্লাহ ব্যতিত অন্যের জন্য ফবেহ করা শিরকে আকবার?

১। যে কেন বিষয়কে দলিল সহ গ্রহন করার উপর অভ্যাস্ত করার জন্য ।

২। কোননা আল্লাহ ব্যাতীত অন্যের জন্য যবেহ করা দুই প্রকার: বৈধ ও শিরকে আকবার ।

প্রথম ও দ্বিতীয় দলীল: মহান আল্লাহর বাণী,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

আপনি বলুন আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। (সূরা আনআম-১৬২)

তিনি বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর। (সূরা কাউসার- ২)

যবেহ এর প্রকারভেদ:

ক. মহান আল্লাহর জন্য যবেহ করা। যেমন, হজ্বে হাদী যবেহ করা, ঈদের কুরবানী, আক্বীক্বা। এগুলো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা বড় শিরক।

খ. বৈধ যবেহ। যেমন, বকরীর গোশত খাওয়ার জন্য, মেহমানের সম্মানার্থে মেহমানদারীর জন্য, ব্যবসার জন্য যবেহ করা।

গ. ভালোবেসে এবং সম্মানার্থে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা। এটা বড় শিরক ।যেমন, কবরবাসীর উদ্দেশ্য এবং জ্বিনের জন্য যবেহ করা।

তৃতীয় দলীল:

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ.

আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) তিনি আমাকে চারটি (বিশেষ শিক্ষণীয়) কথা বলেছেন। ১. যে লোক তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করে, আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেন, ২. যে লোক আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন কারো নামে যাবাহ করে আল্লাহ তার উপরও অভিসম্পাত করেন, ৩. ঐ ব্যক্তির উপরও আল্লাহ অভিসম্পাত করেন, যে কোন বিদআতী লোককে আশ্রয় দেয় এবং ৪. যে ব্যক্তি জমিনের (সীমানার) চিহ্নসমূহ অন্যায়ভাবে পরিবর্তন করে, তার উপরও আল্লাহ অভিসম্পাত করেন। (মুসলিম)

চতুর্থ দলীল:

عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :دخل الجنة رجل في ذباب ، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال :مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا ، فقالوا لأحدهما : قرب ، قال : ليس عندي شيء أقرب، قالوا له : قرب ولو ذبابا ، فقرب ذبابا فخلوا سبيله ، فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب ، قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل ، فضربوا عنقه ، فدخل الجنة.

তারিক বিন শিবাহ (রাঃ) আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ একটি মাছির কারণে একটি লোক বেহেশ্তে প্রবেশ করেছে আর একটি মাছির কারণেই আর একটি লোক জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল এটা কিভাবে সম্ভব? উত্তরে তিনি বললেনঃ দুই ব্যক্তি কোন এক মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে (রাস্তা) অতিক্রম করতেছিলেন, আর যারাই ঐ রাস্তা দিয়ে পথ অতিক্রম করেন তাদেরকেই সেখানে কোন কিছু দান করে যেতে হয়। তাই তারা এই দুইজনের একজনকে বললেনঃ তুমি কিছু দান করো লোকটি বললেন আমার কাছে দান করার মতো কোন কিছু নাই। তখন তারা লোকটি বললেনঃ একটি মাছি হলেও দান করো। তখন লোকটি একটি মাছি দান করেলা এবং তারা তার রাস্তা ছেড়ে দিল, আর এ কারণেই সে ব্যক্তি জাহান্নামে চলে গেল। মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের লোকেরা আবার অপর লোকটিকে বললেনঃ তুমিও কিছু দান করো! তখন লোকটি বলেছিলেনঃ আমি একমাত্র মহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে কোন কিছু দান করি না। তখন তারা (ক্ষিপ্ত হয়ে) তাকে হত্যা করে ফেলল আর একারণেই সে জান্নাতে চলে গেল। (আহমাদ)

মাসআলা মাসায়েল:

১.

قل إن صلاتي ونسكي এর তাফসীর

২. فصل لربك وانحر এর তাফসীর।

৩. প্রথম অভিশপ্ত ব্যক্তি হচ্ছে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহকারী।

৪. যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর লানত। এরমধ্যে এ কথাও নিহিত আছে যে তুমি কোন ব্যক্তির পিতা- মাতাকে অভিশাপ দিলে সেও তোমার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিবে।

৫. যে ব্যক্তি বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহর লানত। বিদআতী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় আবিস্কার বা উদ্ভাবন করে, যাতে আল্লাহর হক ওয়াজিব হয়ে যায়। এর ফলে সে এমন ব্যক্তির আশ্রয় চায় যে তাকে উক্ত বিষয়ের দোষ ত্রুটি বা অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে।

৬. যে ব্যক্তি জমির সীমানা বা চিহ্ন পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহর লানত। এটা এমন চিহ্নিত সীমানা যা তোমার এবং তোমার প্রতিবেশীর জমির অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এটা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে, তার নির্ধারিত স্থান থেকে সীমানা

এগিয়ে আনা অথবা পিছনে নিয়ে যাওয়া।

৭. নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর লানত এবং সাধারণভাবে পাপীদের উপর লানতের মধ্যে পার্থক্য।

৮. এ গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীটি মাছির কাহিনী হিসেবে পরিচিত।

৯. তার জাহান্নামে প্রবেশ করার কারণ হচ্ছে ঐ মাছি, যা নযরানা হিসেবে মূর্তিকে দেয়ার কোন ইচ্ছা না থাকা সত্বেও কওমের অনিষ্টতা হতে বাঁচার উদ্দেশ্যেই সে [মাছিটি নযরানা হিসেবে মূর্তিকে দিয়ে শিরকী] কাজটি করেছে।

১০. মোমিনের অন্তরে শিরকের [মারাত্মক ও ক্ষতিকর] অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। নিহত [জান্নাতী] ব্যক্তি নিহত হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তাদের দাবীর কাছে সে মাথা নত করেনি। অথচ তারা তার কাছে কেলমাত্র বাহ্যিক আমল ছাড়া আর কিছুই দাবী করেনি।

১১. যে ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে সে একজন মুসলমান। কারণ সে যদি কাফের হতো তাহলে এ কথা বলা হতোনা دخل النار فى ذباب একটি মাছির ব্যাপারে সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। [অর্থাৎ মাছি সংক্রান্ত শিরকী ঘটনার পূর্বে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য ছিল]

১২. এতে সেই সহীহ হাদিসের পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে, الجنة اقرب إلى أجدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك

জান্নাত তোমাদের কোন ব্যক্তির কাছে তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী। জাহান্নামও তদ্রুপ নিকটবর্তী।

১৩. এটা জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, অন্তরের আমলই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। এমনকি মূর্তি পূজারীদের কাছেও এ কথা স্বীকৃত।

[১১] যে স্থানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা হয়, সে স্থানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা যাবে না

লেখকের এগুরুত্তপূর্ণ কথার মধে তিন টি হিকমত রয়েছে: ১। কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য

২। একাজ দ্বারা ব্যক্তি ধোকায় পতিত হয়, এবং সে মনে করে মুশরিকদের কাজ টি বৈধ।

৩। মুশরেকরা একাজের প্রতি আরোও শক্তি শালি হবে, তাই এটি নিষিদ্ধ।

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا.

হে নবী, আপনি কখনো সেখানে দাঁড়াবেন না। (সূরা তাওবাহ ১০৮)

দ্বিতীয় দলীল:

عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالو: لا قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالو: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله، ولافيما لا يملك ابن آدم.
رواه أبو داود وإسناده على شرطهما

ছাবিত বিন আদ্দাহহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট কুরবানী করার জন্য মান্নত করলো। তখন রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, সে স্থানে এমন কোন মূর্তি ছিল কি, জাহেলী যুগে যার পূজা করা হতো সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না। তিনি বললেন, সে স্থানে কি তাদের কোন উৎসব বা মেলা অনুষ্ঠিত হতো? তাঁরা বললেন, না [অর্থাৎ এমন কিছু হতোনা] তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি তোমার মান্নত পূর্ণ করো। তিনি আরো বললেন, আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত পূর্ণ করা যাবে না। আদম সন্তান যা করতে সক্ষম নয় তেমন মান্নতও পূরা করা যাবে না। (আবু দাউদ)

মাসআলা মাসায়েলঃ

১.

لا تقم فيه أبداً এর তাফসীর।

২. দুনিয়াতে যেমনি ভাবে পাপের [ক্ষতিকর] প্রভাব পড়তে পারে, তেমনিভাবে [আল্লাহর] আনুগত্যের [কল্যাণময়] প্রভাবও পড়তে পারে।

৩. দুর্বোধ্যতা দূর করার জন্য কঠিন বিষয়কে সুস্পষ্ট ও সহজ বিষয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়।

৪. প্রয়োজন বোধে মুফতী জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ [প্রশ্ন কারীর কাছে] চাইতে পারেন।

৫. মান্নতের মাধ্যমে কোন স্থানকে খাস করা কোন দোষের বিষয় নয়, যদি তাতে শরিয়তের কোন বাধা-বিপত্তি না থাকে।

৬. জাহেলী যুগের মূর্তি থাকলে তা দূর করার পরও সেখানে মান্নত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৭. জাহেলী যুগের কোন উৎসব বা মেলা কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে, তা বন্ধ করার পরও সেখানে মান্নত করা নিষিদ্ধ।

৮. এসব স্থানের মান্নত পূরণ করা জায়েজ নয়। কেননা এটা অপরাধমূলক কাজের মান্নত।

৯. মুশরিকদের উৎসব বা মেলার সাথে কোন কাজ সাদৃশ্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল হওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে।

১০. পাপের কাজে কোন মান্নত করা যাবে না।

১১. যে বিষয়ের উপর আদম সন্তানের কোন হাত নেই সে বিষয়ে মান্নত পূরা করা যাবে না।

[১২] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে মানত করা শিরক

প্রথম ও দ্বিতীয় দলীল:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ,

তারা মান্নত পূরা করে (সুরা ইনসান-৭)

দ্বিতীয় দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُه.

তোমরা যা কিছু খরচ করেছো আর যে মান্নত মেনেছো, তা আল্লাহ জানেন (সূরা বাকারা : ২৭০)

তৃতীয় দলীল:

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه.

সহীহ বুখারীতে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে মান্নত করে সে যেন তা পূরা করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত করে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে। [অথাৎ মান্নত যেন পূরা না করে। (বুখারী)

মাসআলা মাসায়েল:

১. নেক কাজে মান্নত পূরা করা ওয়াজিব।

২. মান্নত যেহেতু আল্লাহর ইবাদত হিসেবে প্রমাণিত, সেহেতু গাইরুল্লাহর জন্য মান্নত করা শিরক।

৩. আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত পূরণ করা জায়েয নয়।

[১২] আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা শিরক

(যে ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ প্রদান করতে সক্ষম নয়)

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا.

মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জ্বিনের কাছে আশ্রয় চাইতেছিল, এর ফলে তাদের [জ্বিনদের] গর্ব ও আহমিকা আরো বেড়ে গিয়েছিল। (সূরা জ্বিন-৬)।

দ্বিতীয় দলীল:

খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (সাঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন মঞ্জিলে অবতীর্ণ হয়ে বললো, আমি আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গ কালামের কাছে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ মঞ্জিল ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। (মুসলিম)

মাসআলা মাসায়েল:

১. সূরা জ্বিনের ৬ নং আয়াতের তাফসীর।

২. গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরকের মধ্যে গণ্য।

৩. হাদিসের মাধ্যমে এ বিষয়ের উপর [অর্থাৎ গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক] দলীল পেশ করা। উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীস দ্বারা এ প্রমাণ পেশ করেন যে, কালিমাতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কালাম মাখলুক [সৃষ্টি] নয়। তাঁরা বলেন মাখলুকের কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক।

৪. সংক্ষিপ্ত হলেও উক্ত দোয়ার ফজিলত।

৫. কোন বস্তু দ্বারা পার্থিক উপকার হাসিল করা অর্থাৎ কোন অনিষ্ট থেকে তা দ্বারা বেঁচে থাকা কিম্বা কোন স্বার্থ লাভ, এ কথা প্রমাণ করে না যে, উহা শেরকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

[১৪] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া অথবা দোয়া করা শিরক

প্রথম থেকে পাঁচটি দলীল:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ.

আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সত্তাকে ডেকোনা, যা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না এবং ক্ষতিও করতে পারবে না। যদি তুমি এমন কারো তাহলে নিশ্চয়ই তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন, তাহলে একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেউ তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। (সূরা ইউনুস-১০৬-১০৭)

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ.

আল্লাহর কাছে রিযিক চাও এবং তাঁরই ইবাদত করো। (আনকাবুত : ১৭)।

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

তার চেয়ে অধিক ভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছাড়া এমন সত্তাকে ডাকে যে সত্তা কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না। (সূরা আহকাফ- ৫)

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.

বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির ডাকে কে সাড়া দেয় যখন সে ডাকে? আর কে তার কষ্ট দূর করে? (সূরা নামল- ৬২)।

ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) এর যুগে এমন একজন মুনাফিক ছিলো, যে মোমিনদেরকে কষ্ট দিতো। তখন মুমিনরা পরস্পর বলতে লাগলো, চলো, আমরা এ মুনাফিকের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য রাসূল (সাঃ) এর সাহায্য চাই। নবী করীম (সাঃ) তখন বললেন,

إنه لا يستغات بي وإنما يستغاث بالله

আমার কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না। একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

রিযিকের প্রকারভেদ:

সাধারণ [আম]: সকল সৃষ্টির জন্য। চাই তা হালাল হৌক কিংবা হারাম হৌক।	শুধু মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট: তা হলো ঈমান, তাক্বওয়া, সৎ আমল।

মাসআলা মাসায়েল:

১. সাহায্য চাওয়ার সাথে দোয়াকে আতফ করার ব্যাপারটি কোন عام বস্তুকে خاص বস্তুর সাথে সংযুক্ত করারই নামান্তর।

২. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ আল্লাহর এ বাণীর তাফসীর।

৩. গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া বা গাইরুল্লাহকে ডাকা শিরকে আকবার।

৪. সব চেয়ে নেককার ব্যক্তিও যদি অন্যের সন্তুষ্টির জন্য গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চায় বা দোয়া করে , তাহলেও সে জালিমদের অন্তর্ভূক্ত।

৫. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ এর তাফসীর।

৬. গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করা কুফরী কাজ হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে এর কোন উপকারিতা নেই। [অর্থাৎ কুফরী কাজে কোন সময় দুনিয়াতে কিছু বৈষয়িক উপকারিতা পাওয়া যায়, কিন্তু গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করার মধ্যে দুনিয়ার উপকারও নেই]

৭. ৩য় আয়াত فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ এর তাফসীর।

৮. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে রিযিক চাওয়া উচিত নয়। যেমনিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে জান্নাত চাওয়া উচিৎ নয়।

৯. ৪র্থ আয়াত অর্থাৎ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ এর তাফসীর।

১০. যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করে, তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কেউ নয়।

১১. যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করে সে গাইরুল্লাহ দোয়াকারী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবচেতন থাকে, অর্থাৎ তার ব্যাপারে গাইরুল্লাহ সম্পূর্ণ অনবহিত থাকে।

১২. مدعو [মাদউ] অর্থাৎ যাকে ডাকা হয় কিংবা যার কাছে দোয়া করা হয়, দোয়াকারীর প্রতি তার রাগ ও শত্রুতার কারণেই হচ্ছে ঐ দোয়া যা তার [গাইরুল্লাহার] কাছে করা হয়। [কারণ প্রকৃত মাদউ] কখনো এরকম শিরকী কাজের অনুমতি কিংবা নির্দেশ দেয়নি]।

১৩. গাইরুল্লাহকে ডাকার অর্থই হচ্ছে তার ইবাদত করা।

১৪. ঐ ইবাদতের মাধ্যমেই কুফরী করা হয়।

১৫। আর এটাই তার [গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া কারীর] জন্য মানুষের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তি হওয়ার একমাত্র কারণ।

১৬. পঞ্চম আয়াত অর্থাৎ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ এর তাফসীর।

১৭. বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মূর্তি পূজারীরাও একথা স্বীকার করে যে, বিপদগ্রস্থ, অস্থির ও ব্যাকুল ব্যক্তির ডাকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাড়া দিতে পারে না। এ কারণেই তারা যখন কঠিন মুসীবতে পতিত হয়, তখন ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে তারা আল্লাহকে ডাকে।

১৮. এর মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক তাওহীদের হেফাযত, সংরক্ষণ এবং আল্লাহ তাআলার সাথে আদব-কায়দা রক্ষা করে চলার বিষয়টি জানা গেলো।

[১৫] প্রথম দলীল,

আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿তারা কি আল্লাহর সাথে এমন সব বস্তুকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা। বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট হয়﴾

দ্বিতীয় দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে [উপকার সাধন অথবা মুসীবত দূর করার জন্য] ডাকো তারা কোন কিছুরই মালিক নয়। (সূরা ফাতের- ১৩)।

তৃতীয় দলীল: সহীহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে নবী (সাঃ) আঘাত প্রাপ্ত হলেন এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেলো। তখন নবী (সাঃ) দুঃখ করে বললেন,

كيف يفلح قوم شجو نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيئ

সে জাতি কেমন করে কল্যাণ লাভ করবে, যারা তাদের নবীকে আঘাত দেয়। তখন ليس لك من الأمر شئ এ আয়াত নাযিল হলো। যার অর্থ হচ্ছে, [আল্লাহর] এ [ফায়সালার] ব্যাপারে আপনার কোন হাত নেই।

চতুর্থ দলীল: আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্নিত, তিনি রাসূল (সাঃ) ফজরের নামাজের শেষ রাকাতে রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد বলার পর এ কথা বলতে শুনেছেন اللهم العن فلانا وفلانا

তুমি অমুক, অমুক, [নাম উল্লেখ করে] ব্যক্তির উপর তোমার লানত নাযিল করো। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ليس لك من الأمر شئ অর্থাৎ এ বিষয়ে তোমার কোন এখতিয়ার নেই। আরেক বর্ণনায় আছে, যখন রাসূল (সাঃ) সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা এবং সোহাইল বিন আমর আল-হারিছ বিন হিশামের উপর বদদোয়া করেন তখন এ আয়াত ليس لك من الأمر شئ নাযিল হয়েছে।

পঞ্চম দলীল: আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) এর উপর যখন وأنذر عشيرتك الأقربين নাযিল হলো তখন আমাদেরকে কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন,

يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني غنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا

হে কুরাইশ বংশের লোকেরা [অথবা এ ধরণেরই কোন কথা বলেছেন] তোমরা তোমাদের জীবনকে খরিদ করে নাও। [শিরকের পথ পরিত্যাগ করতঃ তাওহীদের পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও] আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে আববাস বিন আবদুল মোত্তালিব আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার জন্য কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে রাসূলুল্লাহর ফুফু সাফিয়্যাহ, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে যা খুশী চাও। কিন্তু আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই।

মাসআলা মাসায়েল:

১. এ অধ্যায়ে উল্লেখিত দুটি আয়াতের তাফসীর।

২. উহুদ যুদ্ধের কাহিনী।

৩. নামাজে সাইয়্যেদুল মুরসালীন তথা বিশ্বনবী কর্তৃক দোয়াতে কনুত পাঠ করা এবং নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক আমীন বলা।

৪. যাদের উপর বদ দোয়া করা হয়েছে তারা কাফের।

৫. অধিকাংশ কাফেররা অতীতে যা করেছিলো তারাও তাই করেছে। যেমন, নবীদেরকে আঘাত করা, তাঁদেরকে হত্যা করতে চাওয়া এবং একই বংশের লোক হওয়া সত্ত্বেও মৃত ব্যক্তির নাক, কান কাটা।

৬. এ ব্যাপারে নবী (সাঃ) এর উপর ليس لك من الأمرشي নাযিল হওয়া

৭. أو يتوب عليهم أن يعذبهم এরপর তারা তাওবা করলো। আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন, আর তারাও আল্লাহর উপর ঈমান আনলো।

৮. বালা-মুসীবতের সময় দোয়া-কুনুত পড়া।

৯. যাদের উপর বদ দোয়া করা হয়, নামাজের মধ্যে তাদের নাম এবং তাদের পিতার নাম উল্লেখ করে বদ দোয়া করা।

১০. কুনুতে নাযেলায় নির্দিষ্ট করে অভিসম্পাত করা।

১১. وأنذر عشيرتك الأقربين নাযিল হওয়ার পর পর নবী জীবনের ঘটনা।

১২. ইসলামের দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর অক্লান্ত

১৩. রাসূল (সাঃ) তাঁর দূরবর্তী এবং নিকটাত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে বলেছেন لا أغني عنك من الله شيئا [আল্লাহর কাছে জবাব দিহি করার ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য করতে পারব না] এমনকি তিনি ফাতেমা রা.কেও লক্ষ্য করে

বলেছিলেন,

يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا

হে ফাতেমা, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার আমি করতে সক্ষম হবো না।] তিনি সমস্ত নবীগণের নেতা হওয়া সত্ত্বেও নারীকুল শিরোমণির জন্য কোন উপকার করতে না পারার ঘোষণা দিয়েছেন। আর মানুষ যখন এটা বিশ্বাস করে যে, তিনি সত্য ছাড়া কিছুই বলেন না, তখন সে যদি বর্তমান যুগের কতিপয় খাস ব্যক্তিদের অন্তরে সুপারিশের মাধ্যমে অন্যকে বাঁচানোর ব্যাপারে যে ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে তার কাছে তাওহীদের মর্মকর্থা এবং দ্বীন সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার কথা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

[১৬] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন লোকদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে তখন তারা সুপারিশকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন? তারা বলবে, সঠিক জবাবই পাওয়া গিয়েছে আর তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠ।﴾

দ্বিতীয় দলীল:

সহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، ينفذ هم ذلك (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. قالوا: الحق وهوالعلي الكبير فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بن عيينه بكفه، فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيا إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء.

যখন আল্লাহ তাআলা আকাশে কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন, তখন তাঁর কথার সমর্থনে বিনয়াবনত হয়ে ফিরিস্ড়রা তাদের ডানাগুলো নাড়াতে থাকে। ডানা নাড়ানোর আওয়াজ যেন ঠিক পাথরের উপর শিকলের আওয়াজ। তাদের অবস্থা এভাবেই চলতে থাকে। যখন তাদের অন্তর থেকে এক সময় ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়, তখন তারা বলে, তোমাদের রব তোমাদেরকে কি বলেছেন? তারা জবাবে বলে, আল্লাহ হক কথাই বলেছেন। বস্ত্ততঃ তিনিই হচ্ছেন মহান ও শ্রেষ্ঠ। এমতাবস্থায় চুরি করে কথা শ্রবণকারীরা উক্ত কথা শুনে ফেলে। আর এসব কথা চোরেরা এ ভাবে পর পর অবস্থান করতে থাকে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী সুফইয়ান বিন উয়াইনা চুরি করে কথা শ্রবণকারী [খাত চোর] দের অবস্থা বর্ণ করতে গিয়ে হাতের তালু দ্বারা এর ধরণ বিশ্লেষণ করেছেন এবং হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে তাদের অবস্থা বুঝিয়েছেন। অতঃপর চুপিসারে শ্রবণকারী কথাগুলো শুনে তার নিজের ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। শেষ পর্যন্ত এ কথা একজন যাদুকর কিংবা গণকের ভাষায় দুনিয়াতে প্রকাশ পায়। কোন কোন সময় গণক বা যাদুকরের কাছে উক্ত কথা পৌঁছানোর পূর্বে শ্রবণকারীর উপর আগুনের তীর নিক্ষিপ্ত হয়। আবার কোন কোন সময় আগুণের তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই সে কথা দুনিয়াতে পৌঁছে যায়। ঐ সত্য কথাটির সাথে শত শত মিথ্যা কথা যোগ করে মিথ্যার বেশাতি করা হয়। অতঃপর শত মিথ্যার সাথে মিশ্রিত সত্য কথাটি যখন বাস্তবে রূপ লাভ করে তখন বলা হয়, অমুক-অমুক দিনে এমন এমন কথা কি তোমাদেরকে বলা হয়নি? এমতাবস্থায় আকাশে শ্রুত কথাটিকেই সত্যায়িত করা হয়।

তৃতীয় দলীল:

নাওয়াস বিন সামআন রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر، وتكلم بوحى أخذت السماوات منه رجفة، او قال: رعدة شديدة خوفا من الله عزوجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق، وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.

আল্লাহ তাআলা যখন কোন বিষয়ে অহী করতে চান এবং অহীর মাধ্যমে কথা বলেন তখন আল্লাহ রাববুল ইজ্জতের ভয়ে সমস্ত আকাশ মন্ডলী কেঁপে উঠে অথবা বিকট আওয়াজ করে। আকাশবাসী ফিরিস্তাগণ এ নিকট আওয়াজ শুনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে সর্ব প্রথম যিনি মাথা উঠান, তিনি হচ্ছেন জিবরাঈল তারপর আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন অহীর মাধ্যমে জিবরাঈল এর সাথে কথা বলেন। জিবরাঈল এরপর ফিরিস্তাদের পাশ দিয়ে যেতে থাকেন। যতবারই আকাশ অতিক্রম করতে থাকেন ততবারই উক্ত আকাশের ফিরিস্তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, হে জিবরাঈল, আমাদের রব কি বলেছেন? জিবরাঈল উত্তরে বলেন, আল্লাহ হক কথাই বলেছেন, তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠ। একথা শুনে তারা সবাই জিবরাঈল যা বলেছেন তাই বলে। তারপর আল্লাহ তাআলা জিবরাঈলকে যেখানে অহী নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন সে দিকে চলে যান।

মাসআলা মাসায়েল:

১. সুরা সাবার ২৩ নং আয়াতের তাফসীর।

২. এ আয়াতে রয়েছে শিরক বাতিলের প্রমাণ। বিশেষ করে সালেহীনের সাথে যে শিরককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটিই সে আয়াত, যাকে অন্তর থেকে শিরক বৃক্ষের শিকড় কর্তনকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৩. قال الحق وهو العلي الكبير এ আয়াতের তাফসীর।

৪. হক সম্পর্কে ফিরিস্তাদের জিজ্ঞাসার কারণ।

৫. এমন এমন কথা বলেছেন এ কথার মাধ্যমে জিবরাঈল কর্তৃক জবাব প্রদান।

৬. জিসদারত অবস্থা থেকে সর্ব প্রথম জিবরাইল কর্তৃক মাথা উঠানোর উল্লেখ।

৭. সমস্ত আকাশবাসীর উদ্দেশ্যে জিবরাইল কথা বলবেন। কারণ তাঁর কাছেই তারা কথা জিজ্ঞাসা করে।

৮. বেহুশ হয়ে পড়ার বিষয়টি আকাশবাসী সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

৯. আল্লাহর কালামের প্রভাবে সমস্ত আকাশ প্রকম্পিত হওয়া।

১০. জিবরাঈল আল্লাহর নির্দেশিত পথে অহি সর্ব শেষ গন্তব্যে পৌঁছান।

[১৭] শাফয়াত (সুপারিশ)

প্রথম দলীল:

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ.

তুমি কুরআনের মাধ্যমে সে সব লোকদের ভয় দেখাও, যারা তাদের রবের সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে। সেদিন তাদের অবস্থা এমন হবে যে, আলণ্ঢাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু এবং কোন শাফাআতকারী থাকবে না। (সূরা আনআম-৫১)।

দ্বিতীয় দলীল:

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا.

বলুন, সমস্ত শাফাআত কেবলমাত্র আল্লাহরই ইখতিয়ার ভুক্ত (সূরা ঝুমার-৪৪)।

তৃতীয় দলীল:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

তাঁর [আল্লাহর] অনুমতি ব্যতীত তাঁর দরবারে কে শাফাআত [সুপারিশ] করতে পারে? (সূরা বাকারাহ-২৫৫)।

চতুর্থ দলীল:

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى.

আকাশ মন্ডলে কতইনা ফিরিস্ড়া রয়েছে। তাদের শাফাআত কোন কাজেই আসবে না, তবে হ্যাঁ, তাদের শাফাআত যদি এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে হয় যার আবেদন শুনতে তিনি ইচ্ছা করবেন এবং তা পছন্দ করবেন। (সূরা নাজম-২৬)।

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى.

আকাশ মন্ডলে কতইনা ফিরিস্তা রয়েছে। তাদের শাফাআত কোন কাজেই আসবে না, তবে হ্যাঁ, তাদের শাফাআত যদি এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে হয় যার আবেদন শুনতে তিনি ইচ্ছা করবেন এবং তা পছন্দ করবেন। (সূরা নাজম- ২৬)।

আবুল আববাস ইবনে তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তার সবই আল্লাহ তাআলা অস্বীকার করেছেন। গাইরুল্লাহর জন্য রাজত্ব অথবা আল- াহর ক্ষমতায় গাইরুল্লাহর অংশীদারিত্ব অথবা আল্লাহর জন্য কোন গাইরুল্লাহ সাহায্যকারী হওয়ার বিষয়কে তিনি অস্বীকার করেছেন। বাকী থাকলো শাফাআতের বিষয়। এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা শাফাআত [সুপারিশ] এর জন্য যাকে অনুমতি দিবেন তার ছাড়া আর কারো শাফাআত কোন কাজে আসবে না। মহান আল্লাহর বাণী, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. তিনি [আল্লাহ] যার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে, কেবলমাত্র তার পক্ষেই তারা শাফাআত [সুপারিশ] করবে। (সূরা আম্বিয়াঃ ২৮)।

মুশরিকরা যে শাফাআতের আশা করে, কেয়ামতের দিন তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। কুরআনে কারীমও এধরনের শাফাআতকে অস্বীকার করেছে। নবী করীম (সাঃ) জানিয়েছেন,

إنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك، وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع.

তিনি অর্থাৎ নবী (সাঃ) আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। অতঃপর তাঁর রবের উদ্দেশ্যে তিনি সেজদায় লুটিয়ে পড়বেন এবং আল্লাহর প্রশংসায় মগ্ন হবেন। প্রথমেই তিনি শাফাআত বা সুপারিশ করা শুরু করবেন না। অতঃপর তাঁকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ, তোমার মাথা উঠাও। তুমি তোমার কথা বলতে থাকো, তোমার কথা শ্রবন করা হবে। তুমি চাইতে থাকো, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ করতে থাকো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

আবু হুরাইয়ারা (রাঃ) আনহু রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার শাফাআত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে? নবী (সাঃ) জবাবে বললেন, যে ব্যক্তি খালেস দিলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে।

এ হাদীসে উল্লেখিত শাফাআত [বা সুপারিশ] আল্লাহ তাআলার অনুমতি প্রাপ্ত এবং নেককার মুখলিস বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহর সাথে যে ব্যক্তি কাউকে শরিক করবে তার ভাগ্যে এ শাফাআত জুটবে না।

এ আলোচনার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা মুখলিস বান্দাগণের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং শাফাআতের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রার্থনায় তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শাফাআতকারীকে সম্মানিত করা এবং মাকামে মাহমূদ অর্থাৎ প্রশংসিত স্থান দান করা।

কুরআনে কারীম যে শাফাআতকে অস্বীকার করেছে, তাতে শিরক বিদ্যমান রয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলার অনুমতি সাপেক্ষে শাফাআত এর স্বীকৃতির কথা কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। নবী (সাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, শাফাআত একমাত্র তাওহীদবাদী নিষ্ঠাবানদের জন্যই নির্দিষ্ট।

মাসআলা মাসায়েল:

১. উল্লেখিত আয়াতসমূহের তাফসীর [পাঁচটি আয়াত]।

২. যে শাফাআতকে অস্বীকার করা হয়েছে তার প্রকৃতি। আর এটা সেটাই যাতে শিরক রয়েছে।

৩. স্বীকৃত শাফাআতের গুণ ও বৈশিষ্ট্য।

৪. সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ শাফাআতের উলেণ্ঢখ। আর তা হচ্ছে মাকামে মাহমুদ।

৫ . রাসূল (সাঃ) [শাফাআতের পূর্বে] যা করবেন তার বর্ণনা। অর্থাৎ তিনি প্রথমেই শাফাআতের কথা বলবেন না, বরং তিনি সেজদায় পড়ে যাবেন। তাঁকে অনুমতি প্রদান করা হলেই তিনি শাফাআত করতে পারবেন।

৬. শাফাআতের মাধ্যমে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির উলেণ্ঢখ।

৭. আল্লাহর সাথে শিরককারীর জন্য কোন শাফাআত গৃহীত হবে না।

[১৮] আল্লাহ তায়ালার বানী: ﴿আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়াত করতে পারবেন না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান

দ্বিতীয় দলীল:

সহীহ বুখারীতের ইবনুল মোসাইয়্যাব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন রাসূল (সাঃ) তার কাছে আসলেন। আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়্যাহ এবং আবু জাহল আবু তালিবের পাশেই উপস্থিত ছিলো। রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, চাচা, আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। এ কালিমা দ্বারা আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য কথা বলবো, তখন তারা দুজন [আবদুল্লাহ ও আবু জাহল] তাকে বললো, তুমি আবদুল মোত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে? নবী (সাঃ) তাকে কলেমা পড়ার কথা আরেকবার বললেন। তারা জন আবু তালিবের উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত কথা আরেকবার বললো। আবু তালিবের সর্বশেষ অবস্থা ছিল এই যে, সে আবদুল মাত্তালিবের ধর্মের উপরই অটল ছিলো এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে অস্বীকার করেছিলো। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, আপনার ব্যাপারে যতক্ষন পর্যন্ত আমাকে নিষেধ করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকবো। এরপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন,মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা নবী এবং ইমানদার ব্যক্তিদের জন্য শোভনীয় কাজ নয়। (সূরা তাওবা- ১১৩) ।আল্লাহ তাআলা আবু তালিবের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল করেন,আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়াত করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত করেন। (সূরা আল কাসাস- ৫৬)।

মাসআলা মাসায়েল:

১। أنك لا تهدى من أحببت এ আয়াতের তাফসীর।

২। সুরা তাওবার ১১৩ নং আয়াত অর্থাৎ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ এর তাফসীর।

৩। قل لا إله إلا الله অর্থাৎ আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন রাসূল (সাঃ) এর কথার ব্যাখ্যা। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা এক শ্রেণীর তথা কথিত জ্ঞানের দাবীদারদের বিপরীত।

৪। রাসূল (সাঃ) মৃত্যুপথ যাত্রী আবু তালিবের ঘরে প্রবেশ করে যখন বললেন, চাচা, আপনি লা-ইলাহা ইল্লল্লাহ বলুন, এ কথার দ্বারা নবী (সাঃ) এর কি উদ্দেশ্য ছিল তা আবু জাহল এবং তার সঙ্গীরা বুঝতে পেরেছিল। আল্লাহ আবু জাহেলের ভাগ্য মন্দ করলেন, সে নিজেও পথভ্রষ্ট থেকে গেলো, অপরকেও গোমরাহীর পরামর্শ দিলো। আল্লাহর চেয়ে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে আর কে বেশী জানে?

৫। আপন চাচার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর তীব্র আকাংখ্যা ও প্রাণপন চেষ্টা।

৬। যারা আবদুল মোত্তালিব এবং তার পূর্বসূরীদেরকে মুসলিম হওয়ার দাবী করে, তাদের দাবী খন্ডন।

৭। রাসূল (সাঃ) স্বীয় চাচা আবু তালেবের জন্য মাগফিরাত চাইলেও তার গুনাহ মাফ হয়নি, বরং তার মাগফিরাত চাওয়ার ব্যাপারে নিষেধজ্ঞা এসেছে।

৮। মানুষের উপর খারাপ লোকদের ক্ষতিকর প্রভাব।

৯। পূর্ব পুরুষ এবং পীর-বুজুর্গের প্রতি অন্ধ ভক্তির কুফল।

১০। আবু জাহল কর্তৃক পূর্ব পুরুষদের প্রতি অন্ধ ভক্তির যুক্তি প্রদর্শনের কারণে বাতিল পন্থীর অন্তরে সংশয়।

১১। সর্বশেষ আমলের শুভাশুভ পরিণতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেননা আবু তালিব যদি শেষ মুহূর্তেও কালিমা পড়তো, তাহলে তার বিরাট উপকার হতো।

১২। গোমরাহীতে নিমজ্জিত লোকদের অন্তরে এ সংশয়ের মধ্যে বিরাট চিন্তার বিষয় নিহিত আছে। কেননা উক্ত ঘটনায় রাসূল (সাঃ) ঈমান আনার কথা বারবার বলার পরও তারা [কাফির মুশরিকরা] তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি অন্ধ অনুকরণ ও ভাল বাসাকেই যুক্তি হিসেবে পেশ করেছে। তাদের অন্তরে এর [গোমরাহীর তথা কথিত] সুস্পষ্টতা ও [তথা কথিত] শ্রেষ্ঠত্ব থাকার কারণেই অন্ধ অনুকরণকে যথেষ্ট বলে মনে করেছে।

[১৯] নেককার পীর-বুজুর্গ লোকদের ব্যাপারে সীমা লংঘন করা বনী আদমের কুফুরী ও তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করার অন্যতম কারণ।

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

হে আহলে কিতাব, তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন করো না। (সূরা নিসা- ১৭১)

দ্বিতীয় দলীল:

সহীহ হাদীসে ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.

কাফেররা বললো, তোমরা নিজেদের মাবূদগুলোকে পরিত্যাগ করোনা। বিশেষ করে ওয়াদ, সুআ, ইয়াগুছ, ইয়াঊক এবং নসর কে কখনো পরিত্যাগ করোনা। (নূহঃ ২৩)। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এগুলো হচ্ছে নূহ (আঃ) এর কওমের কতিপয় নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের নাম, তারা যখন মৃত্যু বরণ করলো, তখন শয়তান তাদের কওমকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বললো, যেসব জায়গায় তাদের মজলিস বসতো সে সব জায়গাগুলোতে তাদের [বুজুর্গ ব্যক্তিদের] মূর্তি স্থাপন করো এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই মুর্তিগুলোর নামকরণ করো। তখন তারা তাই করলো। তাদের জীবদ্দশায় মুর্তির পূজা করা হয়নি ঠিকই; কিন্তু মূর্তি স্থাপন কারীরা যখন মৃত্যু বরণ করলো এবং মুর্তি স্থাপনের ইতিকথা ভুলে গেলো, তখনই মুর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হলো।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, একাধিক আলেম ব্যক্তি বলেছেন, যখন নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিগণ মৃত্যু বরণ করলেন, তখন তাঁদের কওমের লোকেরা তাঁদের কবরের পাশে ধ্যান-মগ্ন হয়ে বসে থাকতো। এরপর তারা তাঁদের প্রতিকৃতি তৈরী করলো। এভাবে বহুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা তাঁদের ইবাদতে লেগে গেলো।

তৃতীয় দলীল:

ওমর রা. থেকে বর্নিত হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন,

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله.

তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করোনা যেমনিভাবে প্রশংসা করেছিলো নাসারারা মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ) এর। আমি আল্লাহ তাআলার বান্দা মাত্র। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁরই রাসূল বলবে। (বুখারি ও মুসলিম)

চতুর্থ দলীল:

ওমর আরো বলেন, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو

তোমরা বাড়া-বাড়ি ও সীমা অতিক্রমের ব্যাপারে সাবধান থাকো। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো (দ্বীনের ব্যাপারে) সীমা লংঘন করার ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

পঞ্চম দলীল:

মুসলিম ইবনে মাসউদ থেকে বর্নিত এক হাদীসে, রাসূল এরশাদ করেছেন,

هلك المتنطعون قالها ثلاثا

দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন কারীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। একথা তিনি তিনবার বলেছেন।

মাসআলা মাসায়েল :

১. যে ব্যক্তি এ অধ্যায়টি সহ পরবর্তী দুটি অধ্যায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, ইসলাম সম্পর্কে মানুষ কতটুকু অজ্ঞ, তার কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার কুদরত এবং মানব অন্তরের আশ্চর্য জনক পরিবর্তন ক্ষমতা লক্ষ্য করতে পারবে।

২। পৃথিবীতে সংঘটিত প্রথম শিরকের সূচনা, যা নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের প্রতি সংশয় ও সন্দেহ থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

৩। সর্বপ্রথম যে জিনিসের মাধ্যমে নবীগণের দ্বীনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং এর কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সাথে সাথে একথাও জেনে নেয়া যে, আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে [দ্বীন কায়েমের জন্য] পাঠিয়েছেন।

৪। শরীয়াত ফিতরাত ও বিদআতকে প্রত্যাখ্যান করা সত্তেও বেদআত গ্রহণ করার কারণ সম্পর্কে অবগতি লাভ।

৫। উপরোক্ত সকল গোমরাহীর কারণ হচ্ছে, হকের সাথে বাতেলের সংমিশ্রন, এর প্রথমটি হচ্ছে, সালেহীন বা নেককার ও বুজুর্গ লোকদের প্রতি [মাত্রাতিরিক্ত] ভালবাসা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কতিপয় জ্ঞানী ধার্মিক ব্যক্তিদের এমন কিছু আচরণ, যার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, কিন্তু পরবর্তীতে কিছু লোক উক্ত কাজের উদ্দেশ্য ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে বেদআত ও শিরকে লিপ্ত হয়।

৬। সূরা নূহের ২৩ নং আয়াতের তাফসীর।

৭। মানুষের অন্তরে হকের প্রতি ঝোক প্রবণতার পরিমাণ কম। কিন্তু বাতিলের প্রতি ঝোক প্রবণতার পরিমাণ অপক্ষোকৃত বেশী।

৮। কোন কোন সালাফে-সালেহীন থেকে বর্ণিত আছে যে, বেদআত হচ্ছে কুফরীর কারণ। তাছাড়া ইবলিস অন্যান্য পাপের চেয়ে এটাকেই বেশী পছন্দ করে। কারণ পাপ থেকে তওবা করা সহজ হলেও বেদআত থেকে তওবা করা সহজ নয়। [কারণ বিদয়াত তো সওয়াবের কাজ মনে করে করা হয় বলে পাপের অনুভূতি থাকে না, তাই তাওবারও প্রয়োজন অনুভুত হয় না]

৯। আমলকারীর নিয়ত যত মহৎই হোক না কেন, বিদআতের পরিণতি কি, তা শয়তান ভাল করেই জানে। এ জন্যই শয়তান আমল কারীকে বিদআতের দিকে নিয়ে যায়।

১০। দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন করা না করা এ নীতি সম্পর্কে এবং সীমা লংঘনের পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১১। নেক কাজের নিয়তে কবরের পাশে ধ্যান-মগ্ন হওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হওয়া।

১২। মূর্তি বানানো বা স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা এবং তা অপসারণের কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১৩। উপরোল্লিখিত কিসসার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং এর অতীব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা।

১৪। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, বেদআত পন্থীরা তফসীর হাদিসের কিতাব গুলোতে শিরক বিদআতের কথাগুলো পড়েছে এবং আল্লাহর কালামের অর্থও তারা জানতো, শিরক ও বিদআতের ফলে আল্লাহ তাআলা এবং তাদের অন্তরের মাঝখানে বিরাট প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়েছিল, তারপরও তারা বিশ্বাস করতো যে, নূহ আ. এর কওমের লোকদের কাজই ছিল শ্রেষ্ঠ ইবাদত। তারা আরো বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষেধ করেছিলেন সেটাই ছিল এমন কুফরী যার ফলে জান-মাল পর্যন্ত বৈধ হয়ে যায়। [অর্থাৎ হত্যা করে ধন-সম্পদ দখল করা যায়]।

[১৫। এটা সুস্পষ্ট যে, তারা শিরক ও বেদআত মিশ্রিত কাজ দ্বারা সুপারিশ ছাড়া আর কিছুই চায়নি।

১৬। তাদের ধারণা এটাই ছিল যে, যেসব পন্ডিত ব্যক্তিরা ছবি মুর্তি তৈরী করেছিল তারাও শাফাআত লাভের আশা পোষণ করতো।

১৭। তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করোনা যেমনিভাবে খৃষ্টানরা মরিয়ম তনয়কে করতো। রাসূল (সাঃ) তাঁর এ মহান বাণীর দাওয়াত তিনি পূর্ণাঙ্গ ভাবে পৌঁছিয়েছেন।

১৮। রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘনকারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

১৯। এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইলমে দ্বীন ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত মুর্তি পুজার সূচনা হয়নি। এর দ্বারা ইলমে দ্বীন থাকার মর্যাদা আর না থাকার পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

২০. ইলমে দ্বীন উঠে যাওয়ার কারণ হচ্ছে আলেমগণের মৃত্যু।

[২০] নেককার বুজুর্গ ব্যক্তির কবরের পাশে ইবাদত করার ব্যাপারে যেখানে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেখানে ঐ নেককার ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ইবাদত কিভাবে জায়েয হতে পারে?

প্রথম দলীল:

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, উম্মে সালামা রা. হাবশায় যে গীর্জা দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাতে যে ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা রাসূল (সাঃ) এর কাছে উল্লেখ করলে রাসূল (সাঃ) বললেন,

اولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله.

তাদের মধ্যে কোন নেককার বুজুর্গ ব্যক্তির মৃত্যু বরণ করার পর তার কবরের উপর তারা মসজিদ তৈরী করতো এবং মসজিদে ঐ ছবিগুলো অংকন করতো। [অর্থাৎ তুমি সে জাতীয় ছবিগুলোই দেখেছ]। তারা হচ্ছে আলণ্ঢাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তারা দুটি ফেতনাকে একত্রিত করেছে। একটি হচ্ছে কবর পুজার ফেতনা। অপরটি হচ্ছে মূর্তি পূজার ফেতনা। (বুখারি)।

দ্বিতীয় দলীল:

সহীত বুখারি ও মুসলিমে আয়েশা রা. থেকে আরো একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, যখন রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসলো, তখন তিনি নিজের মুখমন্ডলকে স্বীয় চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলতে লাগলেন। আবার অস্বস্তিবোধ করলে তা চেহারা থেকে সরিয়ে ফেলতেন। এমন অবস্থায়ই তিনি বললেন,

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد

ইয়াহুদী নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন। কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করার আশংকা না থাকলে তাঁর কবরকে উন্মুক্ত রাখা হতো। (বুখারি ও মুসলিম)।

তৃতীয় দলীল:

জুনদুব বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে এ কথা বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে আমার খলীল [বন্ধু] হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি আলণ্ঢাহর কাছে মুক্ত। কেননা আল্লাহ তাআলা আমাকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমনিভাবে তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর আমি যদি আমার উম্মত হতে কাউকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম।

.ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك

সাবধান, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান, তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করছি।রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও এ কাজ [কবরকে মসজিদে পরিণত] করতে নিষেধ করেছেন। আর এ কাজ যারা করেছে (তাঁর কথার ধরন দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে) তাদেরকে তিনি লানত করেছেন। কবরের পাশে মসজিদ নির্মিত না হলেও সেখানে নামায পড়া রাসূল এর এ লানতের অন্তর্ভূক্ত। خشي أن يتخذ مسجدا এ বাণীর দ্বারা এ মর্মার্থই বুঝানো হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম নবীর কবরের পাশে মসজিদ বানানোর মত লোক ছিলেন না। যে স্থানকে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে সে স্থানকেই মসজিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। বরং এমন প্রতিটি স্থানের নামই মসজিদ যেখানে নামায আদায় হয়। যেমন রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا

পৃথিবার সব স্থানকেই আমার জন্য মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম)।

চতুর্থ দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জীবন্ত অবস্থায় যাদের উপর দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে তারাই হচ্ছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। (মুসনাদে আহমাদ, আবু হাতিম এ হাদীসটি তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছে)।

মাসআলা মাসায়েল:

১। যে ব্যক্তি নেককার ও বুজুর্গ লোকের কবরের পাশে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মসজিদ বানায় নিয়ত সহীহ হওয়া সত্বেও তার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর উক্তি।

২। মূর্তির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং কঠোরতা অবলম্বন।

৩। কবরকে মসজিদ না বানানোর বিষয়টি তিনি প্রথমে কিভাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তিনি তা বারবার বলেছেন। তারপর কবর পূজা সম্পর্কিত কথাকে তিনি যথেষ্ট মনে করেননি। [যার ফলে মৃত্যুর পূর্বেও এ ব্যাপারে উম্মতকে সাবধান করে দিয়েছেন] অতএব রাসূল (সাঃ) কর্তৃক এ ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদানের মধ্যেই শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে।

৪। নিজ কবরের অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তাঁর কবরের পাশে এসব কাজ অর্থাৎ কবর পূজাকে নিষেধ করেছেন।

৫। নবীদের কবর পূজা করা বা কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করা ইহুদী নাসারাদের রীতি-নীতি।

৬। এ জাতীয় কাজ যারা করে তাদের উপর রাসূল (সাঃ) এর অভিসম্পাত।

৭। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী (সাঃ) এর কবরের ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান করে দেয়া।

৮। তাঁর কবরকে উন্মুক্ত না রাখার কারণ এ হাদীসে সুস্পষ্ট।

৯। কবরকে মসজিদ বানানোর মর্মার্থ।

১০। যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে এবং যাদের উপর দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে এ দুধনের লোকের কথা একই সাথে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর একজন মানুষ কোন পথ অবলম্বনে শিরকের দিকে ধাবিত হয় এবং এর পরিণতি কি সেটাও উল্লেখ করেছেন।

১১। রাসূল (সাঃ) তাঁর ইন্তেকালের পাঁচ দিন পূর্বে স্বীয় খুতবায় বিদআতী লোকদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুটি দলের জবাব দিয়েছেন। কিছু সংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ বিদআতীদেরকে ৭২ দলের বহির্ভূত বলে মনে করেন। এসব বিদআতীরা হচ্ছে, রাফেজী ও জাহমিয়্যা এ রাফেজী দলের কারণেই শিরক এবং কবর পূজা শুরু হয়েছে। সর্বপ্রথম কবরের উপর তারাই মসজিদ নির্মাণ করেছে।

১২। মৃত্যু যন্ত্রণার মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) কে যে পরীক্ষা করা হয়েছে তা জানা যায়।

১৩। খুল্লাত বা বন্ধুত্বের মর্যাদা ও সম্মান রাসূল (সাঃ) কে দেয়া হয়েছে।

১৪। খুল্লাতই হচ্ছে মুহাববত ও ভালবাসার সর্বোচ্চ স্থান।

১৫। আবু বকর ছিদ্দিক রা. সর্ব শ্রেষ্ঠ সাহাবী হওয়ার ঘোষণা।

১৬। তাঁর [আবুবকর রা.] খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান।

[২১] নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমা লংঘন করলে তা তাকে মূর্তি পূজা তথা গাইরুল্লাহর ইবাদতে পরিণত করে।

প্রথম দলীল:

ইমাম মালেক (রহঃ) মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) দোয়া করেছেন। যথা:

أللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد

হে আল্লাহ আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করো না যার ইবাদত করা হয়। সেই জাতির উপর আল্লাহর কঠিন গজব নাযিল হয়েছে যারা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে।

দ্বিতীয় দলীল:

ইবনে জারীর সুফিয়ান হতে, তিনি মানসূর হতে এবং তিনি মুজাহিদ হতে أفرأيتم اللات والعزى এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, লাত এমন একজন নেককার লোক ছেলেন, যিনি হজ্জ যাত্রীদেরকে ছাতু খাওয়াতেন। তরপর যখন তিনি মৃত্যু বরণ করলেন, তখন লোকেরা তার কবরে ইতেকাফ করতে লাগলো।

তৃতীয় দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে আবুল জাওযা একই কথা বর্ণনা করে বলেন, লাত হাজীদেরকে ছাতু খাওয়াতেন।

চতুর্থ দলীল:

ইবনে আববাস থেকে বর্ণিত আছে,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (رواه أهل السنن)

রাসূল (সাঃ) কবর যিয়ারত কারিনী (মহিলা) দেরকে এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে আর (কবরে) বাতি জ্বালায় তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। [আহলুস সুনানু এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

মাসআলা মাসায়েল:

১. أوثان (মূর্তি ও প্রতিমা) এর তাফসীর।

২। ইবাদত এর তাফসীর।

৩। রাসূল (সাঃ) যা সংঘটিত হওয়ার আশংকা করেছেন একমাত্র তা থেকেই আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন।

৪। নবীদের কবরকে মসজিদ বানানোর বিষয়টিকে মূর্তি পূজার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

৫। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কঠিন গযব নাযিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। এটি এ অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সর্ববৃহৎ মূর্তি লাতের ইবাদতের সূচনা কিভাবে হয়েছে তা জানা গেলো।

৭। নামক মূর্তির স্থানটি মূলতঃ একজন নেককার লোকের কবর।

৮। লাত প্রকৃতপক্ষে কবরস্থ ব্যক্তির নাম। মূর্তির নামকরণের রহস্য ও উলেণ্ঢখ করা হয়েছে।

৯। কবর জিয়ারত কারিনী (মহিলা) দের প্রতি নবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর অভিসম্পাত।

১০। যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি ও রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর অভিসাপ।

[২২] তাওহীদের হেফাযত ও শিরকের সকল পথ বন্ধ করার ক্ষেত্রে নবী মুস্তাফা (সাঃ) এর অবদান।

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল আগমন করেছেন। (তাওবা: ২৮)।

দ্বিতীয় দলীল:

সাহাবী আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبغلني حيث كنتم.

তোমাদের ঘরগুলোকে তোমরা কবর বানিও না, আর আমার কবরকে ঈদে পরিণত করো না। আমার উপর তোমরা দরূদ পড়ো। কারণ তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়। (আবু দাউদ)।

তৃতীয় দলীল:

আলী ইবনুল হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একজন লোককে দেখতে পেলেন যে, রাসূল (সাঃ) এর কবরের পাশেএকটি ছিদ্র পথে প্রবেশ করে সেখানে কিছু দোয়া-খায়ের করে চলে যায়। তখন তিনি ঐ লোকটিকে এধরনের কাজ নিষেধ করে দিলেন। তাকে আরো বললেন, আমি কি তোমার কাছে সে হাদীসটি বর্ণনা করবো না, যা আমি আমর পিতার কাছ থেকে শুনেছি এবং তিনি শুনেছেন আমার দাদার কাছ থেকে, আর আমার দাদা শুনেছেন রাসূল (স:) এর কাছ থেকে? রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. (رواه فى المختارة)

তোমরা আমার কবরকে ঈদে [মেলায়] পরিণত করোনা আর তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করোনা। তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌছে যায়।

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা তাওবার لقد جاءكم رسول من أنفسكم আয়াতের তাফসীর।

২। রাসূল (সাঃ) স্বীয় উম্মতকে কবর পূজা তথা শিরকী গুনাহর সীমারেখা থেকে বহুদূরে রাখতে চেয়েছেন।

৩। আমাদের জন্য রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম এর মমত্ববোধ, দয়া, করুণা এবং আমদের ব্যাপারে তার তীব্র আগ্রহের কথা উলেণ্ঢখ করা হয়েছে।

৪। রাসূল (সাঃ) এর যিয়ারত সর্বোত্তম নেক কাজ হওয়া সত্বেও বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁর কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন।

৫। অধিক যিয়ারত নিষিদ্ধ করেছেন।

৬। ঘরে নফল ইবাদত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

৭। কবরস্থানে নামাজ পড়া যাবে না এটাই সালাফে-সালেহীনের অভিমত।

৮। নবী (সাঃ) এর কবর স্থানে নামায কিংবা দরূদ না পড়ার কারণ হচ্ছে, রাসূল (সাঃ) এর উপর পঠিত দরূদ ও সালাম দূরে অবস্থান করে পড়লেও তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়। তাই নৈকট্য লাভের আশায় কবরস্থানে দরূদ পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

৯। আলমে বারযখে রাসূল (সাঃ) এর কাছে তাঁর উম্মাতের আমল দরূদ ও সালামের মধ্যে পেশ করা হয়।

পঞ্চম: 'নিশ্চয়ই শিরক এই উম্মাহর মাঝে পতিত হবে না অথবা আরব ভূখন্ডে পতিত হবে' যে এই কথা বলবে তার খন্ডন।

[২৩] মুসলিম উম্মাহর কিছু সংখ্যক লোক মূর্তি পুজা করবে।

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা জিবত এবং তাগুতকে বিশ্বাস করে। (নিসাঃ৫১)।

দ্বিতীয় দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ.

বলো, [হে মুহাম্মদ] আমি কি সে সব লোকদের কথা জানিয়ে দেবো? যাদের পরিণতি আল্লাহর কাছে [ফাসেক লোকদের পরিণতি] এর চেয়ে খারাপ। তারা এমন লোক যাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন এবং যাদের উপর আল্লাহর গযব নিপতিত হয়েছে। যাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে তিনি বানর ও শুকর বানিয়ে দিয়েছেন। তারা তাগুতের পূজা করেছে। (মায়েদাঃ ৬০)।

তৃতীয় দলীল: মহান আল্লাহর বাণী,

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا.

যারা তাঁদের ব্যাপারে বিজয়ী হলো তারা বললো, আমরা অবশ্যই তাদের উপর [অর্থাৎ কবরস্থানে] মসজিদ তৈরী করবো। (কাহাফ: ২১)।

চতুর্থ দলীল:

সাহাবী আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوة القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالو يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟

আমি আশংকা করছি তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করবে [যা আদৌ করা উচিৎ নয়] এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তেও ঢুকে যায়, তোমরাও তাতে ঢুকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা কি ইহুদী ও খৃষ্টান? জবাবে তিনি বললেন, তারা ছাড়া আর কে? (বুখারি ও মুসলিম)।

পঞ্চম দলীল:

সহীহ মুসলিমে ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

وأعطيت الكنزين: الأحمر الأبيض وأن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وأن ربي قال : يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة لعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا

আল্লাহ তাআলা গোটা যমীনকে একত্রিত করে আমার সামনে পেশ করলেন। তখন আমি যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত দেখে নিলাম। পৃথিবীর ততটুকু স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে আমার উম্মতের শাসন বা রাজত্ব যতটুকু স্থান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে। লাল ও সাদা দুটি ধন ভান্ডার আমাকে দেয়া হলো আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য এ আরজ করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে গণ দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস না করেন এবং তাদের নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কোন শত্রুকে তাদের উপর বিজয়ী বা ক্ষমতাসীন করে না দেন যার ফলে সে (শত্রু) তাদের সম্পদকে হালাল মনে করবে [লুটে নিবে]। আমার রব আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ আমি যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা নিয়ে ফেলি, তখন তার কোন ব্যতিক্রম হয় না। আমি তোমাকে তোমার উম্মতের জন্য এ অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তাদের গণ দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস করবো না এবং তাদের নিজেদেরকে ছাড়া যদি সারা বিশ্ব ও তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয় তবুও এমন কোন শত্রুকে তাদের উপর ক্ষমতাবান করবো না যা তাদের সম্পদকে বৈধ মনে করে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না তারা একে অপরকে ধ্বংস করবে আর একে অপরকে বন্দী করবে।

বুরক্বানী তাঁর সহীহ হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত বর্ণনায় নিম্নোক্ত কথাগুলো অতিরিক্ত এসেছে,

وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى نعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون فى أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم إنه نبي، وأنا خاتم النبيين لانبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ل يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالنا

আমি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট শাসকদের ব্যাপারে বেশী আশংকা বোধ করছি। একবার যদি তাদের উপর তলোয়ার উঠে তবে সে তলোয়ার কেয়ামত পর্যন্ত আর নামবে না। আর ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমার একদল উম্মত মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং যতক্ষণ না আমার উম্মতের একটি শ্রেণী মূর্তি পূজা করবে। আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী অর্থাৎ ভন্ড নবীর আবির্ভাব হবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। অথচ আমিই হচ্ছি সর্বশেষ নবী।

আমার পর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। কেয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি সাহায্য প্রাপ্ত দলের অস্তিত্ব থাকবে যাদেরকে কোন অপমানকারীর অপমান ক্ষতি করতে পারবে না। [অর্থাৎ সত্য পথ থেকে বিরত রাখতে পারবে না]।

হাদীসে উল্লেখিত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা :

■ এখানে [سنن] তথা, সীন বর্ণে যবর দিয়ে এর অর্থ: পন্থা,রাস্তা । পেশ দিলে হবে: পদ্ধতি,রীতি, । ■ القذة [حذو القذة بالقذة] বলা হয়: তীরের পালক এর উদ্দেশ্য হলো, অনেক মিল বা সাদৃশ্য গ্রহণ করা। অর্থাৎ,পুঙ্খানো পুঙ্খানো ভাবে পূরবর্তীদের পদাংক অনুসরণ করা।

০১: এই উম্মতের কিছু লোক প্রতিমার উপাসনা করবে কেননা এটা হলো পূরবর্তী জাতিদের রীতিনীতি অবশ্যই আমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবো।

০২: আমাদের জন্য আবশ্যক হলো পূরবর্তী জাতিদের রীতিনীতি অবজ্ঞত হওয়া যাতে করে নিষেধাজ্ঞা বস্তু থেকে বিরত থাকতে পারি । আর পূরবর্তীদের অধিকাংশ অভ্যাস কুরআন ও হাদীসে বিদ্যামন রয়েছে।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবে না।

০৩. +++ সঠিক বিধান আসার পরেও সাহাবীদেরকে মহান মনে করাই হলো তাদের রীতি-নীতি অনুসরণ।

[قوله تعالى: "وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون"]

০৪: যখনই মানুষ এবং রিসালাতের বিধানের মাঝে সময় দীর্ঘ আসে তখনই জাতি সঠিক পন্থা থেকে দূরে সরে যায়।

■ এখানে زوى এর অর্থ হলো, একত্রিত করা, মিলিত করা।

■ এখানে [الاحمر والابيض] এর অর্থ হলো, স্বর্ণ এবং র‍ুপা অর্থাৎ,কিসরা ও কায়সারের ধনভা‍ার।

■ এখানে [واني سالت ربي لامتي] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো,নবী (সাঃ) তিনটি বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে আবেদন করেছিলেন ফলে দুটি গ্রহণ করা হয়েছে আর তৃতীয়টি গ্রহণীয় হয়নি।

০১: ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা এই জাতিকে ধ্বংস করা হবে না। অর্থাৎ,সমস্ত জাতির উপর দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি চাপিয়ে দেওয়া হবে না।

০২: কাফেরদেরকে সমস্ত উম্মা ইসলামীর উপর নেতৃত্ব দেওয়া হবে না।

০৩: জাতি নিজেদের মাঝে পর‍স্পর পর‍স্পরের যুদ্ধ-বিগ্রহ না করা । সর্বশেষ দাবিতে গিয়ে নবী (সাঃ) কে নিষেধ করা হয়েছে।

■ এখানে [الأئمة المضلين] তথা, ভয়ের আশঙ্কা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে শুধুমাত্র পথ ভ্রষ্ট নেতাদের মাঝেই। ইমাম কখনো কল্যাণকামীও হয় :

["قوله تعالى: "وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون

কখনো আবার অকল্যাণকামীও হয় :

■ এখানে : [وقع عليه السيف لم يرفع] তথা, তৃতীয় খলিফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হওয়া থেকে বর্তমান পর্যন্ত যা ঘটতেছে।

■ এখানে [وحتى تعبد فئام من امتي الاوثان] তথা, যতক্ষণ না আমার উম্মতের এক সম্প্রদায় মূর্তিসমূহের

■ এখানে [كذابون ثلاثون] তথা, এটা বলা হয়েছে আধিক্যতার জন্য অথবা সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে।

মাসআলা মাসায়েলঃ

১। সূরা নিসার ৫১নং আয়াতের তাফসীর। ২। সূরা মায়েদার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর। ৩। সূরা কাহাফের ২১ নং আয়াতের তাফসীর।

৪। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। [আর তা হচ্ছে] এখানে জিবত] এবং তাগুতের] প্রতি ঈমানের অর্থ কি? এটা কি শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম? নাকি জিবত ও তাগুতের প্রতি ঘৃণা, ক্ষোভ এবং বাতিল বলে জানা সত্বেও এর পূজারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা বুঝায়?

৫। তাগুত পূজারীদের কথা হচ্ছে, কাফেররা তাদের কুফরী সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তারা মোমিনদের চেয়ে অধিক সত্য পথের অধিকারী।

৬। আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে যে ধরনের লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে ধরনের বহু সংখ্যক লোক এ উম্মতের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যাবে। [যারা ইহুদী খৃষ্টানদের হুবহু অনুসারী]।

৭। এ রকম সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম এর সুস্পষ্ট ঘোষণা। অর্থাৎ এ উম্মতে মুসলিমার মধ্যে বহু মূর্তি পূজারী লোক পাওয়া যাবে।

৮। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, মুখতারের মত মিথ্যা এবং ভন্ড নবীর আবির্ভাব। মুখতার নামক এ ভন্ডনবী আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর রিসালতকে স্বীকার করতো। সে নিজেকে উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভূক্ত বলেও ঘোষণা করতো সে আরো ঘোষণা দিতো, রাসূল সত্য, কুরআন সত্য এবং মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ নবী হিসেবে স্বীকৃত। এগুলোর স্বীকৃতি প্রদান সত্বেও তার মধ্যে উপরোক্ত স্বীকৃতির সুস্পষ্ট বিপরীত ও পরিপন্থী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ভন্ড মুর্খও সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে আবির্ভূত হয়েছিল এবং বেশ কিছু লোক তার অনুসারীও হয়েছিল।

৯। সু-সংবাদত হচ্ছে এই যে, অতীতের মতো হক সম্পূর্ণরূপে কখনো বিলুপ্ত হবে না বরং একটি দল হকের উপর চিরদিনই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

১০। এর সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে, তারা [হক পন্থীরা] সংখ্যায় কম হলেও কোন অপমানকারী ও বিরোধীতাকারী তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

১১। কেয়ামত পর্যন্ত উক্ত শর্ত কার্যকর থাকবে। ১২। এ অধ্যায়ে কতগুলো বড় নিদর্শনের উলেণ্ঢখ রয়েছে।

যথাঃ রাসূল (সাঃ) কর্তৃক সংবাদ পরিবেশন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের সবকিছুই একত্রিত করে দেখিয়েছেন। এ সংবাদ দ্বারা যে অর্থ বুঝিয়েছেন বাস্তবে ঠিক তাই সংঘটিত হয়েছে, যা উত্তর ও দক্ষিণের ব্যাপারে ঘটেনি। তাঁকে দুটি ধন-ভান্ডার প্রদান করা হয়েছে এ সংবাদও তিনি দিয়েছেন।তাঁর উম্মতের ব্যাপারে মাত্র দুটি দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদ তিনি দিয়েছেন এবং তৃতীয় দোয়া কবুল না হওয়ার খবরও তিনি জানিয়েছেন।তিনি এ খবরও জানিয়েছেন যে, এ উম্মতের উপরে একবার তলোয়ার উঠলে তা আর খাপে প্রবেশ করবে না। [অর্থাৎ সংঘাত শুরু হলে তা আর থামবে না]।

তিনি আরো জানিয়েছেন যে, উম্মতের লোকেরা একে অপরকে ধ্বংস করবে, একে অপরকে বন্দী করবে। উম্মতের জন্য তিনি ভ্রান্ড় শাসকদের ব্যাপারে শতর্কবাণী উচ্ছারণ করেছেন।এ উম্মতের মধ্য থেকে মিথ্যা ও ভন্ড নবী আবির্ভাবের কথা তিনি জানিয়েছেন। সাহায্য প্রাপ্ত একটি হক পন্থীদল সব সময়ই বিদ্যমান থাকার সংবাদ জানিয়েছেন।উল্লেখিত সব বিষয়ই পরিবেশিত খবর অনুযায়ী হুবহু সংঘটিত হয়েছে। অথচ এমনটি ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি যুক্তি ও বুদ্ধির আওতাধীন নয়।

১৩। একমাত্র পথভ্রষ্ট নেতাদের ব্যাপারেই তিনি শংকিত ছিলেন।

১৪। মূর্তি পূজার মর্মার্থের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর শতর্কবাণী।

ষষ্ঠ: শয়তানের কর্মকান্ডসমূহ (৭টি অধ্যায়)

[২৪] যাদুর বিবরণ

যাদু শিরকী পন্থায় হয়ে থাকে। কেননা শয়তান নিজের স্বার্তে বণী আদমের সেবা করে আর হলো বণী আদম কে পথভ্রষ্ট করা, এবং শিরক ও নাফরমানী কাজে প্রবিষ্ট করা।

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.

তারা অবশ্যই অবগত আছে, যে ব্যক্তি তা [যাদু] ক্রয় করে নিয়েছে, পরকালে তার কোন সুফল পাওনা নেই। (বাকারা: ১০২)।

দ্বিতীয় দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, يؤمنون بالجبت والطاغوت.

তারা জিবত এবং তাগুতকে বিশ্বাস করে। (নিসাঃ ৫১)।

ওমর (রাঃ) আনহু বলেন, জিবত হচ্ছে যাদু আর তাগুত হচ্ছে শয়তান।

জাবির (রাঃ) বলেন, তাগুত হচ্ছে গণক। তাদের উপর শয়তান অবতীর্ণ হতো প্রত্যেক গোত্রের জন্যই একজন করে গণক নির্ধারিত ছিল।

এখানেاشتريه তথা, যাদু শিক্ষা করা।

এখানে الطاغوت তথা, শয়তান, সাদৃশ্য স্বরূপ ব্যাখ্যা করে কেননা তাগুত শয়তান থেকে ব্যাপক।

পরকালে তাদের কি পরিপূর্ণ অংশ নষ্ট হবে নাকি কিছু অংশ? দুটি মত:

০১: কুরআনে বর্ণিত হুমকির আয়াত গুলো যেভাবে আছে সেভাবেই প্রযোজ্য হবে। হুমকির আয়াত গুলো হাল্কা মনে করে এগুলোকে ক্ষমার সাথে মিলানোর আশা করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন :

[وما نرسل بالآيات الإ تخويفا]

কেননা আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন নির্দশন প্রেরণ করেন ভয়ভীতির জন্য বান্দার কর্মকান্ডের কারণে।

০২: হুমকির আয়াত গুলো ভীতিপ্রর্দশনের দিকে সম্পৃক্ত করা হবে এবং পরকালের অংশ বিনষ্ট হবে ব্যাখ্যার দ্বারা।

যদি যাদু পরিচালনা করে শয়তানের মাধ্যমে তাহলে পরকালে তার পূর্ণ অংশ বিনষ্ট হবে

আর যদি যাদু করে বিভিন্ন দোয়া ও প্রতিষেধক দিয়ে তাহলে কিছু অংশ বিনষ্ট হবে।

তৃতীয় দলীল:

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

إجتنبوا السبع الموبقات، قالو: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر،وقتل التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.

তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্নক জিনিস থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ ঐ ধবংসাত্মক জিনিসগুলো কি? তিনি জবাবে বললেন, তা হলো: ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা। ২. যাদু করা। ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আলণ্ঢাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন। ৪. সুদ খাওয়া। ৫. এতিমের সম্পদ আত্নসাৎ করা। ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা। ৭. সতী সাধ্বী মোমিন মহিলাকে অপবাদ দেয়া।

এখানে اجتنبوا তথা, দূরে নিক্ষেপ কর যে, তুমি এক প্রান্তে অবস্থান করবে আর এগুলো অপর প্রান্তে।

এখানে السبع তথা, এটা নির্দিষ্ট কতককে সীমাবদ্ধ করে না। কেননা এখানে আরো অনেক দংশাক্ত বস্তু রয়েছে।

এখানে أكل الربا তথা, সুদ গৰহণ করা। চাই তা খাবারে বা আসবাবপত্রে অথবা অন্য কোন ক্ষেত্রে সুদ প্রয়োগ করা। সুদ হলো কোন লেনদেনে অতিরিক্ত কিছু প্রদান করা যেখানে সমান দেওয়া আবশ্যক ছিল। এবং কোন লেনদেনে বাকি রাখা যেখানে নগতে

দেওয়া আবশ্যক ছিল। তাহলে সুদ দুই প্রকারে বিভক্ত : ০১: কর্মবৃদ্ধি হারে সুদ। ০২: পরিশোধে বিলম্ব হারে সুদ।

এখানে أكل مال اليتيم তথা, ইয়াতীম বলা হয় এমন ছেলে বা মেয়ে বালেগ হওয়ার পূর্বে যার পিতা মৃত্যুবরণ করেছে।

এখানে التولي يوم الزحف তথা, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা সময় ময়দান থেকে পলায়ন করা।

এখানে قذف المحصنات الغافلات المؤمنات তথা, স্বাধীনা রমণী কে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।

এখানে قتل النفس التى حرم الله الإ بالحق তথা, ব্যক্তি চার প্রকার। যথা:

০১: ঈমানদার ব্যক্তি।	০২: যিম্মী এমন ব্যক্তি যার মাঝে এবং আমাদের মাঝে কর দেওয়ার মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ।	০৩: المعاهد তথা, মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি তার মাঝে এবং আমাদের মাঝে এমন চুক্তি যে তারা আমাদের এবং আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত হবো না।	০৪: المستأمن এমন ব্যক্তি যার মাঝে এবং আমাদের মাঝে ব্যবসা বা ইসলাম বুঝার উদ্দেশ্য নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে।

এখানে الإ بالحق তথা, তিনটি কারণ। যথা:

০১: হত্যার বদলে হত্যা।	০২: বিবাহিত ব্যভিচারি।	০৩: ইসলাম র্ধম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাওয়া।

তিন অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা বৈধতা রয়েছে:

এক: قوله تعالى: متحر فا لقتال তথা, যেমন কেউ নিজের শক্তি অর্জন এবং অস্ত্র নবায়ন করার জন্য ফিরে গেল। অথবা অন্য দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য পিছনে ফিরে গেল।

০২: قوله تعالى: متحيزا الى فئه তথা, নিজ দলের ক্ষতি না করে প্রয়োজনবশত অপরের সাথে মিলিত হওয়া।

০৩: যদি মুসলমানদের তুলনায় কাফের দের সৈন্য অধিক পরিমাণে হয় তখন যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা বৈধতা রয়েছে।

চতুর্থ দলীল:

যুনদুব রা. থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে,

حد الساحر ضربة بالسيف.

যাদু করের শাস্তি হচ্ছে তলোয়ারের আঘাতে গর্দান উড়িয়ে দেয়া [মৃত্যু দন্ড]। (তিরমিজি)।

পঞ্চম দলীল:

সহীহ বুখারীতে বাজালা বিন আবাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, ওমর রা. মুসলিম গভর্ণরদের কাছে পাঠানো নির্দেশনামায় লিখেছেন,

أن اقتلو كل ساحر وساحرة

তোমরা প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ এবং যাদুকর নারীকে হত্যা করো। বাজালা বলেন, এ নির্দেশের পর আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করেছি।

ষষ্ঠ দলীল:

হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে আছে, তিনি তাঁর অধীনস্ত একজন বান্দী (ক্রীতদাসী) কে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে দাসী তাঁকে যাদু করেছিলো। অতঃপর উক্ত নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়েছে। একই রকম হাদীস জুনদাব থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ রহ. বলেছেন, নবী (সাঃ) এর তিনজন সাহাবী থেকে একথা সহীহ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

জাদুকরের হুকুম:

০১: মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ) বলেন: জাদু হচ্ছে কুফরী। আর জাদুকরকে সাধারণ ভাবে হত্যা করা হবে তার তাওবা আল্লাহ তায়ালার নিকট।

০২: ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহ বলেন: শেষ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ এই মত কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

জাদুকরের হুকুম অন্যায় ভাবে আক্রমণকারী হুকুমের ন্যায়। সে মুসলিম হওয়ার কারণে হদ হিসেবে তাকে হত্যা করা হবে।

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা বাকারার ১০২ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা নিসার ৫১ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। জিবত ও তাগুত এর ব্যাখ্যা এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।

৪। তাগুত কখনো জিন আবার কখনো মানুষ হতে পারে।

৫। ধ্বংসাত্নক সাতটি এমন বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান যে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

৬। যাদুকরকে কাফের ঘোষণা দিতে হবে।

৭। তাওবার সুযোগ ছাড়াই যাদুকরকে হত্যা করতে হবে।

৮. যদি ওমর রা. এর যুগে যাদু বিদ্যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর পরবর্তী যুগের অবস্থা কি দাঁড়াবে? [অর্থাৎ তাঁর পরবর্তী যুগে যাদু বিদ্যার প্রচলন অবশ্যই আছে।]

[২৫] যাদু এবং যাদুর শ্রেণীভূক্ত বিষয়াবলী।

যাদুর পরিচয় বর্ণনা করার পর তোমার জন্য যাদুর শ্রেণীবিন্যাস বর্ণনা করা হচ্ছে যাতে করে তুমি জানতে পারো জানা জাদুর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে এবং যাতে করে এগুলো থেকে বিরত হতে পারি।

প্রথম দলীল:

কতন বিন ক্বাবীসা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী (সাঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছেন,

أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت

নিশ্চয়ই ইয়াফা, তারক এবং তিয়ারাহ হচ্ছে জিবত এর অন্তর্ভূক্ত।

আউফ বলেছেন, ইয়াফা হচ্ছে পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা। তারক হচ্ছে মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য গণনা করা। হাসান বলেছেন, জিবত হচ্ছে শয়তানের মন্ত্র। এ বর্ণনার সনদ সহীহ (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনু হিববান)।

দ্বিতীয় দলীল:

ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر.

যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ শিখলো সে মূলতঃ যাদুবিদ্যারই কিছু অংশ শিখলো। এ [জ্যোতির্বিদ্যা] যত বাড়বে যাদু বিদ্যাও তত বাড়বে। (আবু দাউদ)।

তৃতীয় দলীল: হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك: ومن تعلق شيئا وكل إليه

যে ব্যক্তি গিরা লাগায় অতঃপর তাতে ফুঁক দেয় সে মূলতঃ যাদু করে। আর যে ব্যক্তি যাদু করে সে মূলতঃ শিরক করে আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস [তাবিজ-কবজ] লটকায় তাকে ঐ জিনিসসের দিকেই সোপর্দ করা হয়। (নাসায়ী)।

চতুর্থ দলীল: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

آلا هل أنبئكم ما العضة؟ هى النميمة ألقالة بين الناس.

আমি কি তোমাদেরকে যাদু কি-এ সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তা হচ্ছে চোগোলখুরী বা কুৎসা রটনা করা অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা-লাগানো বা বদনাম ছড়ানো। (মুসলিম)।

যাদুর শ্রেণীভূক্ত আরেকটি বিষয় অনেক মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়, তা হচ্ছে চোগলখুরী বা কুৎসা রটনা করা। মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, প্রিয়জনদের অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি।

পঞ্চম দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, إن من البيان لسحرا

নিশ্চয়ই কোন কোন কথার মধ্যে যাদু আছে। (বুখারি ও মুসলিম)।

১. এখানে العيافة তথা, কর্মের মাধ্যমে কোন গ্রহণ করা। অর্থাৎ,অশুভ লক্ষণ বা শুভ লক্ষণ জন্য পাখি ওড়ানো।

২. এখানে الطرق তথা, যারা গণক এবং জাদুর পন্থায় বালুর উপর রেখা টানে।

৩. এখানে الطيرة তথা, কোন যুগ অথবা সময়কে কেন্দ্র করে শুনে অথবা দেখার মাধ্যমে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা।

৫. এখানে رنة الشيطان তথা, শয়তানের ওহী, আর এটা হল শয়তানের পক্ষ থেকে ওহী এবং তার শ্রুতলিপি ।

৬. এখানে العضه তথা, কর্তন করা এবং বিচ্ছিন্ন করা। +++ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাদুরি একটি প্রকার? কেননা এটা বরণের জন্য যে বিছিন্ন করাটাই হলো প্রত্যেক জাদুকর এবং চোগলখোরের মূল উদ্দেশ্য। আর চুগলখোর হলো জাদুকরের চেয়েও অধিক মারাত্নক।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রকারভেদ:

০১: পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার বিদ্যা তথা, আকাশ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা জমিনে সংঘটিত হওয়া ঘটনাবলীর উপর প্রমাণ পেশ করা।

০২: পরিচালনা বিদ্যা তথা, এই বিদ্যা দিয়ে বিভিন্ন সময় ও দিক এর উপর প্রমাণ পেশ করা এবং ক্বেবলার দিক। এ বিদ্যার দুটি ক্ষেত্র রয়েছে। যথা:

ক: ছোট শিরিক: যখন এ বিশ্বাস করে যে তারকারাজি মাধ্যম অদৃশ্য সম্পর্কে জানার ব্যাপারে এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার কোন কারণ নির্ধারিত করেননি ।

খ: বড় শিরিক: যদি এ বিষয়ে বিশ্বাস করে যে তারকারাজির সত্তাগতভাবে প্রভাব রয়েছে কল্যাণ টেনে আনার অকল্যাণ দূর করার।

ক: বৈধ: আর তা হলো এর দ্বারা সময় এবং স্থান এর উপর দলিল পেশ করা। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী:

[وعلامات وبالنجم هم يهتدون]

খ: ওয়াজিব: যাবি তো আবশ্যকীয় কর্ম পরিপূর্ণ হয় না সে বিষয়টা জানাও আবশ্যক। যেমন কোন ব্যক্তি যদি মরুভূমিতে অথবা কোন খোলা ময়দানে অবস্থান করে এবং কেবলা জানের জন্য ইচ্ছা করে। তখন তার জন্য এটা ওয়াজিব।

এখানে البيان তথা, অধিকতর বিশুদ্ধ বাচনভঙ্গি যা দিয়ে বিবেক এবং বিভিন্ন চিন্তাভাবনাকে বিকৃতি করা যায়। এটা আবার দুই ভাগে বিভক্ত :

ক. প্রশংসনীয়: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সত্যকে সাব্যস্ত করা এবং বাতিল মিথ্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা।

খ. নিন্দনীয়: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সত্য কে পরিত্যাগ করা এবং বাতিলকে সাব্যস্ত করা।

যাদুর সাথে বক্তৃতার কি সম্পর্ক রয়েছে? কেননা মিথ্যা মাধুর্যপূর্ণ ভাষা এবং জাদু বাস্তবতার অভ্যন্তরে সম্পর্ক রয়েছে।

মাসআলা মাসায়েল:

১. ইয়াফা, তারক এবং তিয়ারাহ জিবতের অন্তর্ভূক্ত।

২। ইয়াফা, তারক, এবং তিয়ারাহ এর তাফসীর।

৩। জ্যোতির্বিদ্যা যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

৪। ফুঁক সহ গিরা লাগানো যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

৫। কুৎসা রটনা করা যাদুর শামিল।

৬। কিছু কিছু বাগ্মীতাও যাদুর অন্তর্ভূক্ত ।

[২৬] গনক ও তদ্বসংশ্লিষ্ট আলোচনা।

এটাই হলো উত্তম শ্রেণীবিন্যাস জাদুর বর্ণনা এবং জাদুর শ্রেণীবিন্যাস উল্লেখ করার পরে তোমার জন্য উল্লেখ করা হচ্ছে গণক, জ্যোতিষী, দাগ টেনে ভাগ্য গণনা করি এবং তাদের নিকট গমন করা হুকুম গমন পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে।

১। কুতুন বিন কুবাইসা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনেছেন,

الجبت من والطيرة والطرق العيافة أن

নিশ্চয়ই ইয়াফা, তারক এবং তিয়ারাহ হচ্ছে জিবত্ব এর অন্তর্ভূক্ত।

আউফ বলেছেন, ইয়াফা হচ্ছে পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা। তারক হচ্ছে মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য গণনা করা। হাসান বলেছেন, জিবত্ব হচ্ছে শয়তানের মন্ত্র। এ বর্ণনার সনদ সহীহ (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনু হিববান)

২। ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

السحر من شعبة اقتبس فقد النجوم من شعبة اقتبس من (أبوداود رواه)

যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ শিখলো সে মূলতঃ যাদুবিদ্যারই কিছু অংশ শিখলো। এ [জ্যোতির্বিদ্যা] যত বাড়বে যাদু বিদ্যাও তত বাড়বে। (আবু দাউদ)

৩। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে

إليه وكل شيئا تعلق ومن :أشرك فقد سحر ومن سحر، فقد فيها نفث ثم عقدة عقد من

যে ব্যক্তি গিরা লাগায় অতঃপর তাতে ফুঁক দেয় সে মূলতঃ যাদু করে। আর যে ব্যক্তি যাদু করে সে মূলতঃ শিরক করে আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস [তাবিজ-কবজ] লটকায় তাকে ঐ জিনিসসের দিকেই সোপর্দ করা হয়। (নাসায়ী)

৪। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

الناس بين ألقالة النميمة هى العضة؟ ما أنبئكم هل آلا (مسلم رواه)

আমি কি তোমাদেরকে যাদু কি-এ সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তা হচ্ছে চোগোলখুরী বা কুৎসা রটনা করা অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা-লাগানো বা বদনাম ছড়ানো। (মুসলিম)

যাদুর শ্রেণীভূক্ত আরেকটি বিষয় অনেক মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়, তা হচ্ছে চোগলখুরী বা কুৎসা রটনা করা। মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, প্রিয়জনদের অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি।

৫। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, لسحرا البيان من إن

নিশ্চয় কোন কোন কথার মধ্যে যাদু আছে। (বুখারি ও মুসলিম)

প্রথম দলীল:

রাসূল (সাঃ) এর এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

من أتى عرافا فسأله عن شيئ فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما

যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল, তারপর তাকে [ভাগ্য সম্পর্কে] কিছু জিজ্ঞাসা করলো, অতঃপর গণকের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবে না। (মুসলিম)।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীল:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

من أتى كاهنا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد.

যে ব্যাক্তি গণকের কাছে আসলো, অতঃপর গণক যা বললো তা সত্য বলে বিশ্বাস করলো, সে মূলতঃ মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করলো। (সহীহ বুখারি ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদীসটি সহীহ। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ী ইবনে মাজা ও হাকিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

চতুর্থ দলীল:

আবু ইয়ালা ইবনে মাসউদ থেকে অনুরূপ মাউকুফ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এখানে من أتى তথা,গণকের নিকট আগমণ করার উদ্দেশ্যে হলো, তাদের সাথে উঠাবসা অথবা তাদের সাথে সম্পর্ক করা অথবা তাদের কাছে বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রেরণ করা অথবা চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা অথবা তাদের বিভিন্ন চ্যানেল প্রত্যক্ষ করা তাদের বিভিন্ন কনফারেন্সে উপস্থিত হওয়া, তাদের পত্রিকা ক্রয় করা বিশেষ করে ঐ পত্রিকাগুলো যেখানে তাদের রাশিচক্র উল্লেখ থাকে, অথবা তারা যা বলে সেগুলো শ্রবণ করা, আর এখানে রয়েছে সবচেয়ে বেশি বিশৃঙ্খলা।

এখানে لم تقبل له صلاة তথা, ব্যক্তির অর্জিত প্রতিদানটা অপরাধে পরিণত হবে । (সত্যায়ন না করে শুধুমাত্র যাওয়ার কারণেই তার সওয়াব রহিত হয়ে যাবে।)

এখানে فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم তথা, আল কুরআন, এবং তাতে রয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী,

[قل لايعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله]

সুতরাং যে ব্যক্তি অদৃশ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে গণকের কথাকে সত্যায়ন করবে অথচ সে জানে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত গায়েবের সম্পর্কে কেউ অবগত নয় তাহলে সে কাফের। আর যদি সে অজ্ঞ হয় এবং বিশ্বাস না করে কোরআনে যা আছে তা মিথ্যা তাহলে সে যেন ছোট কুফরী করল। তখন সে জন্য গণকের কথাকে সত্যায়ন করল না বরং যদি সে গণকের কথা মত চলে তাহলে সে লোকের কথাকে বাস্তবায়ন করল হিসেবে গণ্য হবে।

এখানে [عرافا] [গণক], منجم [জ্যোতির্বিদ], এবং رمال [বালির উপর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী] এবং এ জাতীয় পদ্ধতিতে যারাই গায়েব সম্পর্কে কিছু জানার দাবী করে তাদেরকেই আররাফ [عراف] বলে।

পঞ্চম দলীল:

ইমরান বিন হুসাইন থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে,

ليس منا من تطير أو تطير له، أوتكهن أو تكهن له أو سحر أو سحرله ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. (رواه البزار بإسناد جيد)

যে ব্যক্তি পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করলো, অথবা যার ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করার জন্য পাখি উড়ানো হল, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করলো, অথবা যার ভাগ্য গণনা করা হলো, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করলো অথবা যার জন্য যাদু করা হলো অথবা যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসলো অতঃপর সে [গণক] যা বললো তা বিশ্বাস করলো সে ব্যক্তি মূলতঃ মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা [কুরআন] অস্বীকার করল। (বায্যার)

ষষ্ঠ দলীল:

ইমাম তাবারানীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ومن أتى থেকে হাদিসের শেষ পর্যন্ত ইমাম তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত ইবনে আববাসের হাদীসে উল্লেখ নেই।

ইমাম বাগাবী (রহ:) বলেন عراف [গণক] ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তি চুরি যাওয়া জিনিস এবং কোন জিনিস হারিয়ে যাওয়ার স্থান ইত্যাদি বিষয় অবগত আছে বলে দাবী করে। এক বর্ণনায় আছে যে, এ ধরনের লোককেই গণক বলা হয়। মূলতঃ গণক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে ভবিষ্যতের গায়েবী বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয় [অর্থাৎ যে ভবিষ্যদ্বানী করে]। আবার কারো মতে যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের গোপন খবর বলে দেয়ার দাবী করে তাকেই গণক বলা হয়।কারো মতে যে ব্যক্তি দিলের (গোপন) খবর দেয়ার দাবী করে, সেই গণক।আবুল আববাস ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, كاهن [গণক], منجم [জ্যোতির্বিদ], এবং رمال [বালির উপর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী] এবং এ জাতীয় পদ্ধতিতে যারাই গায়েব সম্পর্কে কিছু জানার দাবী করে তাদেরকেই আররাফ [عراف] বলে।

সপ্তম দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেছেন, এক কওমের কিছু লোক আরবী أباجاد লিখে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তা দ্বারা ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করে। পরকালে তাদের জন্য আলণ্ঢাহর কাছে কোন ভাল ফল আছে বলে আমি মনে করি না।

এ অধ্যায়ে থেকে কিছু মাসআলা:

১। ইয়াস্নু তারক্ব এবং তিয়ারাহ্ জিবতের অন্তর্ভূক্ত।

২। ইয়াস্নু তারক্ব, এবং তিয়ারাহ্ এর তাফসীর।

৩। জ্যোতির্বিদ্যা যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

৪। ফুঁক সহ গিরা লাগানো যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

৫। কুৎসা রটনা করা যাদুর শামিল।

৬। কিছু কিছু বাগ্মীতাও যাদুর অন্তর্ভূক্ত।

ভবিষ্যদ্বক্ত তথা (আররাফ) এবং তার অনুরূপ কাউকে জিজ্ঞাসা করার বিধান:

ক. শুধুমাত্র জিজ্ঞাসা করা কাবীরাহ গুনাহ। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তির ৪০ দিন সালাত কবুল হবে না।	খ. জিজ্ঞাসা করা এবং সত্যায়ন করা বড় কুফরী কেননা তা কারণে কুরআন কে অস্বীকার করা হচ্ছে।	গ. যাচাই স্বরূপ জিজ্ঞাসা বৈধ গণকের মিথ্যা থেকে সত্যটা জানার জন্য। কিন্তু গণকের কথা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য যেন না হয়। যাচাইকারী যেন যাচাইয়ের যুগ্য হয়।	ঘ. গণকের অপরগতা ও মিথ্যা প্রকাশ করার জন্য জিজ্ঞাসা করা কাম্য অথবা ওয়াজিব শর্ত হলো জিজ্ঞাসাকারী যুগ্যতাবান হওয়া।

যাদুকরের নিদর্শনাবলী। যথা:

০১: শরীয় যাড়রফূকের বৈধ শর্তসমূহের বীপরিত হওয়া।

০২: গিট দেওয়ার সময় মূখ থেকে থুথু দেওয়া।

০৩: হরফে মুক্বত্বায়াত এবং অস্পষ্ট বাক্য লিপিবদ্ধ করা।

০৪: শব্দতত্ব এবং সংযোজক অব্যয়।

০৫: তারকারাজির (প্রতিক্রিয়া বিদ্যা) দিকে দৃষ্টি দেওয়া।

০৬: করকোষ্ঠী-গণনা এবং পেয়ালা পড়া।

০৭: উদারহণ স্বরূপ মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করা।

০৮: অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার দাবি করা।

০৯: অসুস্থ ব্যক্তিকে শরীয়ত বিরোধী কাজ করা আদেশ দেওয়া যেমন সালাত পরিত্যাগ করা অথবা যাবেহ করার সময় বিসমিলল্লাহ না বলা।

১০: বিষয়টা অসুস্থ ব্যক্তির দিকে সম্পৃক্ত করে দেওয়া আল্লাহর দিকে নয়।

১১: এটাই হলো শয়তানের অভিভাবক।

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,من أتى عرافا يوما أربعين صلاة له تقبل لم فصدقه شيئ عن فسأله

ওযে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল, তারপর তাকে [ভাগ্য সম্পর্কে] কিছু জিজ্ঞাসা করলো, অতঃপর গণকের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবে না। (মুসলিম)

২। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, من أتى كاهنا فصدقه بما يقول على أنزل بما كفر محمد. (داود ابو رواه)

(যে ব্যাক্তি গণকের কাছে আসলো, অতঃপর গণক যা বললো তা সত্য বলে বিশ্বাস করলো, সে মূলতঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করলো। (সহীহ বুখারি ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদীসটি সহীহ। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ী ইবনে মাজা ও হাকিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

আবু ইয়ালা ইবনে মাসউদ থেকে অনুরূপ মাউকুফ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩। ইমরান বিন হুসাইন থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে,

(رواه .وسلم عليه الله صلى محمد على أنزل بما كفر فقد يقول بما فصدقه كاهنا أتى ومن سحرله أو سحر أو له تكهن أو أوتكهن له، تطير أو تطير من منا ليس جيد بإسناد البزار)

ওযে ব্যক্তি পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করলো, অথবা যার ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করার জন্য পাখি উড়ানো হল, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করলো, অথবা যার ভাগ্য গণনা করা হলো, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করলো অথবা যার জন্য যাদু করা হলো অথবা যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসলো অতঃপর সে [গণক] যা বললো তা বিশ্বাস করলো সে ব্যক্তি মূলতঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা [কুরআন] অস্বীকার করল। (বায্যার)

[ইমাম তাবারানীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ومن أتى থেকে হাদিসের শেষ পর্যন্ত ইমাম তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত ইবনে আববাসের হাদীসে উল্লেখ নেই।

ইমাম বাগাবী (রহঃ) বলেন عراف [গণক] ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তি চুরি যাওয়া জিনিস এবং কোন জিনিস হারিয়ে যাওয়ার স্থান ইত্যাদি বিষয় অবগত আছে বলে দাবী করে। এক বর্ণনায় আছে যে, এ ধরনের লোককেই গণক বলা হয়। মূলতঃ গণক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে ভবিষ্যতের গায়েবী বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয় [অর্থাৎ যে ভবিষ্যদ্বানী করে]। আবার কারো মতে যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের গোপন খবর বলে দেয়ার দাবী করে তাকেই গণক বলা হয়।

কারো মতে যে ব্যক্তি দিলের (গোপন) খবর দেয়ার দাবী করে, সেই গণক।

আবুল আববাস ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন كاهن [গণক], منجم [জ্যোতির্বিদ], এবং رمال [বালির উপর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী] এবং এ জাতীয় পদ্ধতিতে যারাই গায়েব সম্পর্কে কিছু জানার দাবী করে তাদেরকেই আররাফ [عراف] বলে। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেছেন, এক কওমের কিছু লোক আরবী أباجاد লিখে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তা দ্বারা ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করে। পরকালে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন ভাল ফল আছে বলে আমি মনে করি না।

এ অধ্যায়ে থেকে কিছু মাসআলা:

১। গণনাকারীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা, এ দুটি বিষয় একই ব্যক্তির অন্তরে এক সাথে অবস্থান করতে পারে না।

২। ভাগ্য গণনা করা কুফরী হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৩। যার জন্য গণনা করা হয়, তার উল্লেখ।

৪। পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষাকারীর উল্লেখ।

৫। যার জন্য যাদু করা হয়, তার উল্লেখ।

৬। ভাগ্য গণনা করার ব্যাপারে যে ব্যক্তি আবাজাদ শিক্ষা করেছে তার উল্লেখ্য।

৭। কাহেন, [كاهن] এবং আররাফ [عراف] এ মধ্যে পার্থক্য।

[২৭] নুশরাহ তথা প্রতিরোধমূলক যাদু।

সম্মানিত রচয়িতা বইটি সুন্দর স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। যেখানে যাদুর পরিচিতি উল্লেখ করার পর পাঠক শ্রেনীর জন্য যাদুর চিকিৎসার পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। আর কোন সন্দেহ নেই যাদুগস্ড় ব্যক্তিকে যাদুর প্রভাব থেকে শরীয় পদ্ধতিতে মুক্ত করার অনেক মর্যাদা রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা রাখে।

সাহাবী জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাশরাহ বা প্রতিরোধমূলক যাদু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বললেন,

الشيطان عمل من هى. (أبوداود و أحمد رواه)

এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ (আহমাদ, আবু দাউদ)

আবু দাউদ বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে নাশরাহ [প্রতিরোধমূলক যাদু] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বলেছেন ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর [নাশরাহর] সব কিছুই অপছন্দ করতেন।

সহীহ বুখারীতে কাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, আমি ইবনুল মুসাইয়্যিবকে বললাম একজন মানুষের অসুখ হয়েছে অথবা তাকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে, এমতাবস্থায় তার এ সমস্যার সমধান করা কিংবা প্রতিরোধমূলক যাদু [নাশরাহ] এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা যাবে কি? তিনি বললেন এতে কোন দোষ নেই। কারণ তারা এর [নাশরাহ] দ্বারা সংশোধন ও কল্যাণ সাধন করতে চায়। যা দ্বারা মানুষের কল্যাণ ও উপকার সাধিত হয় তা নিষিদ্ধ নয়।

হাসান (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে তিনি বলেন,

لا يحل السحر إلا الساحر একমাত্র যাদুকর ছাড়া অন্য কেউ যাদুকে হালাল মনে করে না।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, النشرة حل السحر عن المسحور

নাশারাহ হচ্ছে যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর থেকে যাদুর প্রভাব দূর করা।

নাশরাহ দুধরনের :

প্রথমটি হচ্ছে, যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর হতে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য অনুরূপ যাদু দ্বারা চিকিৎসা করা। আর এটাই হচ্ছে শয়তানের কাজ। হাসান বসরী (রহঃ) এর বক্তব্য দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে নাশের [যাদুর চিকিৎসক] ও মুনতাশার [যাদুকৃত রোগী] উভয়ই শয়তানের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে শয়তানের নিকটবর্তী হয়। যার ফলে শয়তান যাদুকৃত রোগীর উপর থেকে তার প্রভাব মিটিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ঝাড়-ফুঁক, বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ,ঔষধ-পত্র প্রয়োগ ও শরীয়ত সম্মত দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করা এ ধরনের চিকিৎসা জায়েয।

প্রথম দলীল:

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) নাশরাহ বা প্রতিরোধমূলক যাদু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বললেন,

هى من عمل الشيطان.

এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ। (আহমাদ, আবু দাউদ)।

দ্বিতীয় দলীল:

আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ) কে নুশরাহ [প্রতিরোধমূলক যাদু] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বলেছেন, ইবনে মাসউদ রাযিয়াল- াহু আনহু এর [নুশরাহর] সব কিছুই অপছন্দ করতেন।

এখানে النشرة তথা, জাহিলি যুগের প্রচলিত কুসংস্কার যা তারা নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতো।

এখানে من عمل الشيطان তথা, এই কর্মটাকে শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা নিকৃষ্ট হওয়ার ফলে এবং তা হতে বিরত থাকার জন্য।

এখানে يكره هذا তথা, পূরবর্তীতের নিকট অপছন্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হারাম।

এখানে يكره هذا كله তথা, প্রতিষেধক মূলক যাদু যা শয়তানের কর্মকান্ড। আর এটা হয়ে থাকে যাদুর মাধ্যমে।

তৃতীয় দলীল:

সহীহ বুখারীতে কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আমি ইবনুল মুসাইয়্যিবকে বললাম, একজন মানুষের অসুখ হয়েছে অথবা তাকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে, এমতাবস্থায় তার এ সমস্যার সমধান করা কিংবা প্রতিরোধমূলক যাদু [নুশরাহ] এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা যাবে কি? তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। কারণ তারা এর [নুশরাহ] দ্বারা সংশোধন ও কল্যাণ সাধন করতে চায়। যা দ্বারা মানুষের কল্যাণ ও উপকার সাধিত হয় তা নিষিদ্ধ নয়।

এখানে طب তথা,যাদু এটা জানা বিষয় যাদুও একপ্রকার রোগ নিরাময়। কিন্তু যাদু কেও চিকিৎসা বলা হয় শুভলক্ষণের দিকে লক্ষ্য করে যেমনভাবে দংশিত কে বলা হয় নিরাপদ এবং ব্যর্থকে বলা হয় উদ্ধত।

এখানে ويؤخذ من إمرآته তথা, তাকে আটক রাখা হবে ফলে সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে না। তাতে কোন সমস্য হবে না বরং তা এক প্রকার যাদু।

চতুর্থ দলীল:

হাসান (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে তিনি বলেন, لا يحل السحر إلا الساحر

একমাত্র যাদুকর ছাড়া অন্য কেউ যাদুকে হালাল মনে করে না।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, النشرة حل السحر عن المسحور

নুশারাহ হচ্ছে যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর থেকে যাদুর প্রভাব দূর করা। আর নুশরাহ দুধরনের। যথা:

প্রথমটি হচ্ছে, যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর হতে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য অনুরূপ যাদু দ্বারা চিকিৎসা করা। আর এটাই হচ্ছে শয়তানের কাজ। হাসান বসরী (রহঃ) এর বক্তব্য দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে নাশের [যাদুর চিকিৎসক] ও মুনতাশার [যাদুকৃত রোগী] উভয়ই শয়তানের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে শয়তানের নিকটবর্তী হয়। যার ফলে শয়তান যাদুকৃত রোগীর উপর থেকে তার প্রভাব মিটিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ঝাড়-ফুঁক, বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ,ঔষধ-পত্র প্রয়োগ ও শরীয়ত সম্মত দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করা এ ধরনের চিকিৎসা জায়েয।

যে ব্যক্তি বলে জাদুর মাধ্যমে জাদু কে প্রতিহত করা যাবে তার কথা কে কিভাবে রদ করা হবে?

১. এটা হল কুরআন এবং সুন্নাহর বিরোধী এবং সাহাবী এবং সালাফগণ যার ওপর ছিলেন তা বিরোধী।

২. এটা কোরআন এবং হাদীসে বর্ণিত দোয়া দ্বারা চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

৩. এদে জাদু কে শক্তিশালী করা হচ্ছে এবং জনসাধারণের কাছে জাদুকরদের শক্তির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।

৪. এর কারণে কোরআন এবং হাদিস দ্বারা চিকিৎসা নেওয়ার নিশ্চিত থেকে ধারণার দিকে ফিরে যাওয়া হয় আর সেটা হল জাদু দ্বারা চিকিৎসা করা।

৬. যখন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে নিশ্চয়ই তার জন্য রয়েছে হাদীসে বর্ণিত অনুপাতে জান্নাত।

৭. জাদুর মাধ্যমে জাদু মুক্ত করা হলে অসুস্থ ব্যক্তির অসুস্থ আরো বৃদ্ধি পায়।

৮. নবী (সাঃ) যাদু গ্রস্থ হয়েছিলেন তিনি শরীয় বৈধ যাড়ফূক ছাড়া জাদুর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করেননি।

মাসআলা মাসায়েল:

১. প্রতিশোধমূলক জাদুর প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

২. বৈধতা এবং নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যা সন্দেহ দূরবর্তী করে দেয়। অর্থাৎ, প্রত্যেক ওই ব্যক্তির কথাকে ব্যবহার করা হবে যে বলে শরীয় বর্ণিত দোয়ার মাধ্যমে জাদুর প্রভাব মুক্ত করা বৈধ রয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির কথাকে ব্যবহার করা হবে যে বলে জাদুর মাধ্যমে জাদুর প্রভাব প্রতিহত করা নিষেধকে।

28 কুলক্ষণ সম্পর্কীয় বিবরণ

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ(الاعراف:১৩১)

ওমনে রেখো, আল্লাহর কাছেই রয়েছে তাদের কুলক্ষণসমূহের চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না। (আরাফ: ১৩১)

২। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন .قالو طائركم معكم (يس : ১৯)

ওতারা বললো, তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে। (ইয়াসিন : ১৯)

৩। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، (أخرجاه)

ওদ্বীন ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্য, কথার কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। (বুখারি ও মুসলিম)

[মুসলিমের হাদীসে নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত, রাক্ষস বা দৈত্য বলতে কিছুই নেই এ কথাটুকু অতিরিক্ত আছে]

বুখারি ও মুসলিমে আনাস (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لا عدوى وطيرة ويعجبني الفال قالوا: وما الفال؟ قال الكلمة الطيبة.

ওইসলামে সংক্রামক ব্যাধি আর কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে ফাল আমাকে অবাক করে [অর্থাৎ আমার কাছে ভাল লাগে।] সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ফাল কি জিনিস? জবাবে তিনি বললেন উত্তম কথা। [যে কথা শিরকমুক্ত]

৫। উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুলক্ষণ বা দূর্ভাগ্যের বিষয়টি রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উল্লেখ করা হলো। জবাবে তিনি বললেন, فليقل يكره ما أحدكم رأى فإذا مسلما، ترد ولا الفال، أحسنها:

এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ফাল। কুলক্ষণ কোন মুসলমানকে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কোন কিছু প্রত্যক্ষ করে তখন সে যেন বলে,

اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، السيئات يدفع ولا أنت إلا

হে আল্লাহ তুমি ছাড়া কেউ কল্যাণ দিতে পারে না। তুমি ছাড়া কেউ অকল্যাণ ও দূরাবস্থা দূর করতে পারে না। ক্ষমতা ও শক্তির আধার একমাত্র তুমিই। (আবু দাউদ)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা শেরেকী কাজ, পাখি উড়িয়ে লক্ষণ নির্ধারণ করা শেরেকী কাজ, একাজ আমাদের নয়। আল্লাহ তাআলা তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে মুসলিমের দুশ্চিন্তাকে দূর করে দেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

৭। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখলো, সে মূলতঃ শিরক করলো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এর কাফ্ফারা কি? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা এ দোয়া পড়বে,

اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك (أحمد)

হে আল্লাহ, তোমার মঙ্গল ব্যতীত কোন মঙ্গল নেই। তোমার অকল্যাণ ছাড়া কোন অকল্যাণ নেই। আর তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (আহমদ)

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

মনে রেখো, আল্লাহর কাছেই রয়েছে তাদের কুলক্ষণসমূহের চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না। (আরাফ: ১৩১)

দ্বিতীয় দলীল: মহান আল্লাহর বাণী, قالو طائركم معكم

তারা বললো, তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে। (ইয়াসিন : ১৯)।

ষষ্ঠ দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা শেরেকী কাজ, পাখি উড়িয়ে লক্ষণ নির্ধারণ করা শেরেকী কাজ, একাজ আমাদের নয়। আল্লাহ তাআলা তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে মুসলিমের দুশ্চিন্তাকে দূর করে দেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী)।

সপ্তম দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখলো, সে মূলতঃ শিরক করলো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এর কাফফারা কি? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা এ দোয়া পড়বে,اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك .

হে আল্লাহ, তোমার মঙ্গল ব্যতীত কোন মঙ্গল নেই। তোমার অকল্যাণ ছাড়া কোন অকল্যাণ নেই। আর তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (আহমদ)।

অষ্টম দলীল:

ফজল বিন আববাস থেকে বর্ণিত আছে طيرة [তিয়ারাহ] অর্থাৎ কুলক্ষণ হচ্ছে এমন জিনিস যা তোমাকে কোন অন্যায় কাজের দিকে ধাবিত করে অথবা কোন ন্যায় কাজ থেকে তোমাকে বিরত রাখে। (আহমাদ)।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। ألا إنما طائرهم عند الله [জেনে রেখো তাদের দুর্ভাগ্য আলণ্ডাহর কাছে নিহিত] এবং طائركم معكم [তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে] এ আয়াত দুটির ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

২। সংক্রামক রোগের অস্বীকৃতি।

৩। কুলক্ষণের অস্বীকৃতি।

৪। দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে অস্বীকৃতি [অর্থাৎ দুর্ভাগ্য বলতে ইসলামে কোন কিছু নেই]

৫। কুলক্ষণ সফর এর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন [অর্থাৎ কুলক্ষণে সফর মাস বলতে কিছুই নেই। জাহেলী যুগে সফর মাসকে কুলক্ষুণ মনে করা হতো, ইসলাম এ ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করেছে।]

৬। ফাল উপরোক্ত নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় জিনিসের অন্তর্ভূক্ত নয়। বরং এটা মোস্তাহাব।

৭। ফাল এর ব্যাখ্যা।

[২৯] জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা।

ইমাম বুখারি (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেছেন, কাতাদাহ (রাঃ) বলেছেন,আল্লাহ তাআলা এসব নক্ষত্ররাজিকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, আকাশের সৌন্দর্যের জন্য, আঘাতের মাধ্যমে শয়তান বিতাড়নের জন্য এবং [দিক ভ্রান্ত পথিকদের] নিদর্শন হিসেবে পথের দিশা পাওয়ার জন্য। যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্য ছাড়া এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিবে সে ভুল করবে এবং তার ভাগ্য নষ্ট করবে। আর এমন জটিল কাজ তার ঘাড়ে নিবে যে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকবে না।

কাতাদাহ (রাঃ) চাঁদের কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জন অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা অপছন্দ করতেন। আর উয়াইনা এ বিদ্যার্জনের অনুমতি দেননি। উভয়ের কাছ থেকে হারব (রহঃ) একথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ এবং ইসহাক (রহঃ) [চাদের] কক্ষপথ জানার অনুমতি দিয়েছেন।

আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

الجنة يدخلون لا ثلاثة: مدمن، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. (رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه)

তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না,

১। মাদকাসক্ত ব্যক্তি ২। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এবং ৩। যাদুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। (আহমাদ, ইবনু হিববান)

প্রথম দলীল:

ইমাম বুখারি (রহ:) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেছেন, কাতাদাহ (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এসব নক্ষত্ররাজিকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, আকাশের সৌন্দর্যের জন্য, আঘাতের মাধ্যমে শয়তান বিতাড়নের জন্য এবং [দিক ভ্রান্ত পথিকদের] নিদর্শন হিসেবে পথের দিশা পাওয়ার জন্য। যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্য ছাড়া এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিবে সে ভুল করবে এবং তার ভাগ্য নষ্ট করবে। আর এমন জটিল কাজ তার ঘাড়ে নিবে যে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকবে না।

দ্বিতীয় দলীল:

কাতাদাহ (রাঃ) চাঁদের কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জন অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা অপছন্দ করতেন। আর উয়াইনা এ বিদ্যার্জনের অনুমতি দেননি। উভয়ের কাছ থেকে হারব (রহ:) একথা বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় দলীল:

ইমাম আহমদ এবং ইসহাক (রাঃ) [চাদের] কক্ষপথ জানার অনুমতি দিয়েছেন।

চতুর্থ দলীল:

আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. (رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه)

তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যথা: ১। মাদকাসক্ত ব্যক্তি ২। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এবং ৩। যাদুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। (আহমাদ, ইবনু হিববান)।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। নক্ষত্র সৃষ্টির রহস্য।

২। নক্ষত্র সৃষ্টির ভিন্ন উদ্দেশ্য বর্ণনাকারীর সমুচিত জবাব প্রদান।

৩। কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জনের ব্যাপারে মতভেদের উল্লেখ।

৪। যাদু বাতিল জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যাদুর অন্তর্ভুক্ত সামান্য জিনিসেও বিশ্বাস করবে, তার প্রতি কঠোর হুশিয়ারী।

[৩০] নক্ষত্রের ওসীলায় বৃষ্টি কামনা করা।

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

تُكَذِّبُونَ أَنَّكُمْ رِزْقَكُمْ وَتَجْعَلُونَ. (الواقعة : ٨٢)

‘তোমরা [নক্ষত্রের মধ্যে তোমাদের] রিজিক নিহত আছে মনে করে আল্লাহর নেয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছো।’ (ওয়াকেয়া . ৮২)

২। আবু মালেক আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

تقام موتها قبل تتب لم إذا النائحة :وقال والنياحة بالنجوم، والإستسقاء الأنساب، فى والطعن لأحساب، با الفخر : يتركونهن لا الجاهلية أمر من أمتي في أربع حرب من ودرع قطران من سربال وعليها القيامة يوم. (مسلم رواه)

‘জাহেলী যুগের চারটি কুস্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারবেনা। এক : আভিজাত্যের অহংকার করা। দুই : বংশের বদনাম গাওয়া। তিন : নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি কামনা করা এবং চার : মৃত ব্যাক্তির জন্য বিলাপ করা।

তিনি আরো বলেন‘মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ কারিনী তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবা না করে, তবে কেয়ামতের দিন তেল চিট-চিটে জামা আর মরিচা ধরা বর্ম পরিধান করে উঠবে।’ (মুসলিম)

৩। ইমাম বুখারি ও মুসলিম যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন‘তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ পড়লেন। সে রাতে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিলো। নামাজান্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের দিকে ফিরে বললেন,

كافر بي مؤمن فذلك ورحمته الله بفضل مطرنا : قال من فأما وكافر بي مؤمن عبادي من أصبح :قال أعلم ورسوله الله :قالو ربكم؟ قال ماذا تدرون هل بالكوكب مؤمن بي كافر فذلك وكذا كذا بنوء مطرنا : قال من وأما بالكوكب،.

‘তোমরা কি জানো তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? লোকেরা বললো‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন‘আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমানদার হিসেবে আবার কেউ কাফের হিসেবে সকাল অতিবাহিত করলো। যে ব্যক্তি বলেছে‘আল্লাহর ফজল ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর নক্ষত্রকে অস্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলেছে‘অমুক অমুক নক্ষত্রের ওসীলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে।’

ইমাম বুখারি ও মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হতে এ অর্থেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথা আছে যে, কেউ কেউ বলেছেন, ‘অমুক অমুক নক্ষত্র সত্য প্রমাণিত হয়েছে।’ তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন,

تُكَذِّبُونَ تعالى قوله إلى النُّجُومِ بِمَوَاقِعِ أُقْسِمُ فَلَا

‘আমি নক্ষত্র রাজির [অস্তমিত হওয়ার] স্থানসমূহের কসম করে বলছি, ... তোমরা মিথ্যাচারিতায় মগ্ন রয়েছো।’ (ওয়াকিয়া : ৭৫-৮২)

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ .

তোমরা [নক্ষত্রের মধ্যে তোমাদের] রিজিক নিহত আছে মনে করে আল্লাহর নেয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছো। (ওয়াকেয়া . ৮২)।

দ্বিতীয় দলীল:

আবু মালেক আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر با لأحساب، والطعن فى الأنساب، والإستسقاء بالنجوم، والنياحة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب. (رواه مسلم)

জাহেলী যুগের চারটি কুস্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারবেনা। এক : আভিজাত্যের অহংকার করা। দুই : বংশের বদনাম গাওয়া। তিন : নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি কামনা করা।চার : মৃত ব্যাক্তির জন্য বিলাপ করা।তিনি আরো বলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ কারিনী তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবা না করে, তবে কেয়ামতের দিন তেল চিট-চিটে জামা আর মরিচা ধরা বর্ম পরিধান করে উঠবে। (মুসলিম)।

তৃতীয় দলীল:

ইমাম বুখারি ও মুসলিম যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (সাঃ) হুদাইবিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ পড়লেন। সে রাতে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিলো। নামাজান্তে রাসূল (সাঃ) লোকদের দিকে ফিরে বললেন,

هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالو: الله ورسوله أعلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.

তোমরা কি জানো তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? লোকেরা বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমানদার হিসেবে আবার কেউ কাফের হিসেবে সকাল অতিবাহিত করলো। যে ব্যক্তি বলেছে, আল্লাহর ফজল ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর নক্ষত্রকে অস্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের ওসীলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে।

চতুর্থ দলীল:

ইমাম বুখারি ও মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হতে এ অর্থেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথা আছে যে, কেউ কেউ বলেছেন, অমুক অমুক নক্ষত্র সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إلى قوله تعالى تُكَذِّبُونَ

আমি নক্ষত্র রাজির [অস্তমিত হওয়ার] স্থানসমূহের কসম করে বলছি, ... তোমরা মিথ্যাচারিতায় মগ্ন রয়েছো। (ওয়াকিয়া : ৭৫-৮২)।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা ওয়াকেয়ার উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর। ২। জাহেলী যুগের চারটি স্বভাবের উল্লেখ।

৩। উল্লেখিত স্বভাবগুলোর কোন কোনটির কুফরী হওয়া উল্লেখ।

৪। এমন কিছু কুফরী আছে যা মুসলিম মিল্লাত থেকে একে বারে নিঃশ্চিহ্ন হবে না।

৫। বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী আবার কেউ অবিশ্বাসী হয়েছে এ বাণীর উপলক্ষ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত [বৃষ্টি] নাযিল হওয়া।

৬। এ ব্যাপারে ঈমানের জন্য মেধা ও বিচক্ষণতা প্রয়োজন। ৭। এ ক্ষেত্রে কুফরী থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন।

৮। لقد صدق نوء كذا وكذا [অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে] এর মর্মার্থ বুঝতে হলে জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োজন।

৯। তোমরা জানো কি তোমাদের রব কি বলেছেন? এ কথা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, কোন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন করতে পারেন।

১০। মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিণীর জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ।

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা ওয়াকেয়ার উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর। ২। জাহেলী যুগের চারটি স্বভাবের উল্লেখ।

৩। উল্লেখিত স্বভাবগুলোর কোন কোনটির কুফরী হওয়া উল্লেখ।

৪। এমন কিছু কুফরী আছে যা মুসলিম মিল্লাত থেকে একে বারে নিঃশ্চিহ্ন হবে না।

৫। বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী আবার কেউ অবিশ্বাসী হয়েছে এ বাণীর উপলক্ষ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত [বৃষ্টি] নাযিল হওয়া।

৬। এ ব্যাপারে ঈমানের জন্য মেধা ও বিচক্ষণতা প্রয়োজন।

৭। এ ক্ষেত্রে কুফরী থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন।

৮। لقد صدق نوء كذا وكذا [অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে] এর মর্মার্থ বুঝতে হলে জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োজন।

৯। তোমরা জানো কি তোমাদের রব কি বলেছেন? এ কথা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, কোন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন করতে পারেন।

১০। মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিণীর জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ।

[৩১] আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। আয়াতের তাফসীর। সূরা বাকারা-১৬৫।

প্রথম দলীল: মহান আল্লাহর বাণী,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ.

মানুষের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সদৃশ স্থির করে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে। (বাকারা : ১৬৫)।

দ্বিতীয় দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

হে রাসূল, আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, তোমাদের স্ত্রী, আত্নীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ঐ ব্যবসা যার লোকসান হওয়াকে তোমরা অপছন্দ করো, তোমাদের পছন্দনীয় বাড়ী-ঘর, তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁরই পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।(তাওবা : ২৪)।

তৃতীয় দলীল:

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. (أخرجاه)

তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। (বুখারি ও মুসলিম)।

চতুর্থ দলীল:

আনাস (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

ثلاث من كن فيه وجدبهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار.

যার মধ্যে তিনটি জিনিস বিদ্যমান আছে সে ব্যক্তি এগুলো দ্বারা ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পেরেছে। যথা:

এক : তার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক প্রিয় হওয়া।

দুই : একমাত্র আল্লাহ তাআলার [সন্তুষ্টি লাভের] জন্য কোন ব্যক্তিকে ভালবাসা।

তিন : আল্লাহ তাআলা তাকে কুফরী থেকে উদ্ধার করার পর পূনরায় কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা তার কাছে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতই অপছন্দনীয় হওয়া।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى অর্থাৎ, কেউ ঈমানের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না .... (হাদিসের শেষ পর্যন্ত।]

পঞ্চম দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ঘৃণা করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করে; সে ব্যক্তি এ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করবে। আর এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া ব্যতীত নামায রোজার পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন, কোন বান্দাই ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না।

আর সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে পরস্পারিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্থিব স্বার্থ। এ জাতীয় ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না। (ইবনে জারীর)

ষষ্ঠ দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন وتقطعت بهم الأسباب অর্থাৎ, তাদের সম্পর্ক বিছিন্ন হয়ে যাবে। এ সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক।

ইবাদতের দিক থেকে মুহাব্বাহ তথা ভালোবাসা।

যথা:

মহান আল্লাহর স্বত্বার সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত।

الولاية

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য।

বান্দার পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর জন্য।

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা বাকারার ১৬ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসাকে জীবন, পরিবার ও ধন-সম্পদের উপর অগ্রাধিকার দেয়া ওয়াজিব।

৪। কোন কোন বিষয় এমন আছে যা ঈমানের পরিপন্থী হলেও এর দ্বারা ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া বুঝায় না। [এমতাবস্থায় তাকে অপূর্ণাঙ্গ মোমিন বলা যেতে পারে]।

৫। ঈমানের একটা স্বাদ আছে। মানুষ কখনো এ স্বাদ অনুভব করতেও পারে, আবার কখনো অনুভব নাও করতে পারে।

৬। অন্তরের এমন চারটি আমল আছে যা ছাড়া আল্লাহর বন্ধুত্ব ও নৈকট্য লাভ করা যায় না, ঈমানের স্বাদ ও অনুভব করা যায় না।

৭। একজন প্রখ্যাত সাহাবী দুনিয়ার এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সাধারণত গড়ে উঠে পার্থিব বিষয়ের ভিত্তিতে।

৮। وتقطعت بهم الأسباب এর তাফসীর।

৯। মুশরিকদের মধ্যেও এমন লোক রয়েছে যারা আল্লহকে খুব ভালবাসে [কিন্তু শিরকের কারণে এ ভালবাসা অর্থহীন।]

১০। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে এবং ঐ শরীককে আল্লাহকে ভালবাসার মতই ভালবাসে সে শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় ধরনের শিরক করলো।

[৩২] আল্লাহর ভয়। আয়াতের তাফসীর। ইমরান- ১৭৫।

প্রথম দলীল: মহান আল্লাহর বাণী,

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

এরা হলো শয়তান, যারা তোমাদেরকে তার বন্ধুদের (কাফের বেঈমান) দ্বারা ভয় দেখায়। তোমরা যদি প্রকৃত মোমেন হয়ে থাকো। তাহলে তাদেরকে [শয়তানের সহচারদেরকে] ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো (আল ইমরান . ১৭৫)।

দ্বিতীয় দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ.

আল্লাহর মসজিদগুলোকে একমাত্র তারাই আবাদ করতে পারে যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। (তাওবা : ১৮)।

তৃতীয় দলীল:

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ.

মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা বলে, আমরা আল্লহর উপর ঈমান এনেছি। এরপর যখন আল্লাহর পথে তারা দুঃখ কষ্ট পায় তখন মানুষের চাপানো দুঃখ কষ্টের পরীক্ষাকে তারা আল্লাহর আযাবের সমতূল্য মনে করে।(আনকাবূত : ১০)

চতুর্থ দলীল:

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে মাারফু হাদীসে বর্ণিত আছে, ঈমানের দুর্বলতা হচ্ছে আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করা, আল্লাহর রিযিক ভোগ করে মানুষের গুণগান করা, তোমাকে আল্লাহ যা দান করেননি তার ব্যাপারে মানুষের বদনাম করা। কোন লোভীর লোভ আল্লাহর রিযিক টেনে আনতে পারে না। আবার কোন ঘৃণা কারীর ঘৃণা আল্লাহর রিযিক বন্ধ করতে পারে না।

পঞ্চম দলীল:

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الله عليه وأسخط عليه الناس. (رواه ابن حبان فى صحيحه)

যে ব্যক্তি মানুষকে নারাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহর সন্তুষ্ট থাকেন, আর মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে নারাজ করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন। (ইবনে হিববান)

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা আল-ইমরানের ১৭৫ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার ১৮ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। সূরা আনকাবুতের ১০ নং আয়াতের তাফসীর।

৪। ঈমান শক্তিশালী হওয়া আবার দূর্বল হওয়া সংক্রান্ড় কথা।

১৩৯-১৪১

[৩৩] তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা।

প্রথম দলীল: মহান আল্লাহর বাণী,

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তাহলে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করো। (মায়েদা : ২৩)।

দ্বিতীয় দলীল: মহান আল্লাহর বাণী

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ.

একমাত্র তারাই মোমিন যাদের সামনে আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়। (আনফাল ২)।

চতুর্থ দলীল:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। (সূরা তালাক . ৩)।

পঞ্চম দলীল:

ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, حسبنا الله ونعم الوكيل

এ কথা ইবরাহীম (আঃ) তখন বলেছিলেন, যখন তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। আর মুহাম্মদ (স:) একথা বলেছিলেন তখন, যখন তাঁকে বলা হলো,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا.

লোকেরা আপনাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বাহিনী জড়ো করেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করুন। তখন তাঁদের ঈমান আরো বৃদ্ধি গেলো। (আল-ইমরান: ১৭৩)।

মাসআলা মাসায়েল:

১। আল্লাহর উপর ভরসা ফরজ।

২। আল্লাহর উপর ভরসা করা ঈমানের শর্ত।

৩। সূরা আনফালের ২নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৪। আয়াতটির তাফসীর, শেষাংশেই রয়েছে।

৫। সূরা তালাকের ৩ নং আয়াতের তাফসীর।

৬। حسبنا الله و نعم الوكيل কথাটি ইবরাহীম (আঃ) ও মুহাম্মদ (সাঃ) বিপদের সময় বলার কারণে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা।

[৩৪] সূরা আরাফ ৯৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

প্রথম দলীল : মহান আল্লাহর বাণী,

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.

তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত [নির্ভয়] হয়ে গেছে? বস্ত্ততঃ আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার ব্যাপারে একমাত্র হতভাগ্য ক্ষতিগ্রস্ত ছাড়া অন্য কেউ ভয়-হীন হতে পারে না। (আরাফঃ ৯৯)।

দ্বিতীয় দলীল: মহান আল্লাহর বাণী,

وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ.

একমাত্র পথভ্রষ্ট লোকেরা ছাড়া স্বীয় রবের রহমত থেকে আর কে নিরাশ হতে পারে? (সূরা হিজর : ৫৬)।

তৃতীয় দলীল:

ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) কে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেছেন, কবীরা গুনাহ হচ্ছে .

ألشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله.

আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা।

চতুর্থ দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন,

أكبر الكبائر : الإشراك بالله، والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. (رواه عبد الرزاق)

সবচেয় বড় গুনাহ হচ্ছে : আল্লাহর শাস্তি হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করা, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া এবং আল- াহর করুণা থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করা।

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা আরাফের ৯৯নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা হিজরের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আল্লাহর পাকড়াও থেকে ভয়হীন ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন।

[৩৫] তাকদীরের [ফায়সালার] উপর ধৈর্য ধারণ করা ঈমানের অঙ্গ।

প্রথম দলীল: মহান আল্লাহর বাণী,

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনে, তার অন্তরকে তিনি হেদায়াত দান করেন। তাগাবুনঃ ১১)।

আলকামা (রাঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তিই মোমিন, যে ব্যক্তি বিপদ আসলে মনে করে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এর ফলে সে বিপদগ্রস্থ হয়েও সন্তুষ্ট থাকে এবং বিপদকে খুব সহজেই স্বীকার করে নেয়।

দ্বিতীয় দলীল:

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

মানুষের মধ্যে এমন দুটি [খারাপ] স্বভাব রয়েছে যার দ্বারা তাদের কুফরী প্রকাশ পায়। একটি হচ্ছে, বংশ উল্লেখ করে খোটা দেয়া, আর একটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।

তৃতীয় দলীল:

إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة

আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর কোন বান্দার মঙ্গল করতে চান, তখন তাড়াতাড়িকরে দুনিয়াতেই তার [অপরাধের] শাস্তি দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন তাঁর কোন বান্দার অমঙ্গল করতে চান, তখন দুনিয়াতে তার পাপের শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকনে, যেন কেয়ামতের দিন তাকে পুরো শাস্তি দিতে পারেন।

চতুর্থ দলীল :

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء

পরীক্ষা যত কঠিন হয়, পুরস্কার তত বড় হয। আল্লাহ তাআলা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন সে জাতিকে তিনি পরীক্ষা করেন। এতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্টি থাকে, তার উপর আল্লাহ ও সন্তুষ্ট থাকেন। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার প্রতি আল্লাহও অসন্তুষ্ট থাকেন। (তিরমিজি)

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা তাগাবুন এর ১১ নং আয়াতের তাফসীর। ২। বিপদে ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা ঈমানের অঙ্গ।

৩। কারো বংশের প্রতি অপবাদ দেয়া বা দুর্নাম করা কুফরীর শামিল।

৪। যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে, গাল- চাপড়ায়, জামার আস্তিন ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহেলী যুগের কোন রীতি নীতির প্রতি আহবান জানায়, তার প্রতি কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন। ৫। বান্দার মঙ্গলের প্রতি আল্লাহর ইচ্ছার নিদর্শন।

৬। বান্দার প্রতি আল্লাহর অমঙ্গলেচ্ছার নিদর্শন। ৭। বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালবাসার নিদর্শন। ৮। আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া হারাম।

৯। বিপদে আলণ্ঢাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সওয়াব।

[৩৬] রিয়া (লৌকিকতা) প্রসঙ্গে আলোচনা।

প্রথম দলীল: মহান আল্লাহর বাণী, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ.

[হে মুহাম্মদ], আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট এ মর্মে অহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহই একক ইলাহ। (কাহাফ: ১১০)।

দ্বিতীয় দলীল:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. (رواه مسلم)

আমি অংশীদারদের শিরক (অর্থাৎ অংশিদারিত্ব) থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন কাজ করে ঐ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করে, আমি [ঐ] ব্যক্তিকে এবং শিরককে [অংশীদারকে ও অংশিদারিত্বকে] প্রত্যাখ্যান করি। (মুসলিম)

তৃতীয় দলীল: আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে অন্য এক মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে,

ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى، قال : الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، لما يرى من نظر رجل. (رواه أحمد)

আমি কি তোমাদের এমন বিষয়ে সংবাদ দেব না? যে বিষয়টি আমার কাছে মসীহ দাজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, তা হচ্ছে শিরকে খফী বা গুপ্ত শিরক। । [আর এর উদাহরণ হচ্ছে] একজন মানুষ দাঁড়িয়ে শুধু এ জন্যই তার নামাজকে খুব সুন্দরভাবে আদায় করে যে, কোন মানুষ তার নামাজ দেখছে [বলে সে মনে করছে]। (আহমাদ)

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা কাহাফের ১১০ নং আয়াতের তাফসীর।

২। নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে উক্ত নেক কাজ করতে গিয়ে আল্লাহ ছাড়াও অন্যকে খুশী করার নিয়ত।

৩। এর [অর্থাৎ শিরক মিশ্রিত নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার] অনিবার্য কারণ হচ্ছে, আল্লাহর কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া। [এ জন্য গাইরুল্লাহ মিশ্রিত কোন আমল তাঁর প্রয়োজন নেই।]

৪। আরো একটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার সাথে যাদেরকে শরিক করা হয়, তাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ বহুগুণে উত্তম।

৫। রাসূল (সাঃ) এর অনতরের রিয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের উপর ভয় ও আশংকা।

৬। রাসূল (সাঃ) রিয়ার ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, একজন মানুষ মূলত নামাজ আদায় করবে আল্লাহরই জন্যে। তবে নামাজকে সুন্দরভাবে আদায় করবে শুধু এজন্য যে, সে মনে করে কোন মানুষ তার নামাজ দেখছে।

[৩৭] নিরর্থক দুনিয়াবী স্বার্থে কোন কাজ করা শিরক।

প্রথম দলীল: মহান আল্লাহর বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

যারা শুধু দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদের সব কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে থাকি।

(হুদ : ১৫-১৬)

দ্বিতীয় দলীল:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূল (স:) এরশাদ করেছেন,

تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطى رضي وإن لم يعط سخط، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث راسه، مغبرة قدماه إن كان في الحراسة، كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة, إن استأذن لم يؤذن له, وإن شفع لم يشفع.

দীনার ও দেরহাম অর্থাৎ টাকা-পয়সার পূজারীরা ধ্বংস হোক। রেশম পূজারী [পোষাক- বিলাসী] ধ্বংস হোক। তাকে দিতে পারলেই খুশী হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়। সে ধ্বংস হোক, তার আরো খারাপ হোক, কাঁটা-ফুটলে সে তা খুলতে সক্ষম না হয় [অর্থাৎ সে বিপদ থেকে উদ্ধার না পাক।] সে বান্দা সৌভাগ্যের অধিকারী যে আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে, মাথার চুলগুলোকে এলো-মেলো করেছে আর পদযুগলকে করেছে ধূলিমলিন। তাকে পাহারার দায়িত্ব দিলে সে পাহারাতেই লেগে থাকে। সেনাদলের শেষ ভাগে তাকে নিয়োজিত করলে সে শেষ ভাগেই লেগে থাকে। সে অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। তার ব্যাপারে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গৃহীত হয় না।

মাসআলা মাসায়েল:

১। আখেরাতের আমল দ্বারা মানুষের দুনিয়া হাসিলের ইচ্ছা।

২। সূরা হুদের ১৫ ও ১৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। একজন মুসিলমকে দিনার- দেরহাম ও পোষাকের বিলাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা।

৪। উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা হচ্ছে, বান্দাহকে দিতে পারলেই খুশী হয়, না দিতে পারলে অসন্তুষ্ট হয়। এ ধরনের লোক দুনিয়াদার।

৫। দুনিয়াদারকে আল্লাহর নবী এ বদদোয়া করেছেন, সে ধ্বংস হোক, সে অপমানিত হোক বা অপদস্ত হোক।

৬। দুনিয়াদারকে এ বলেও বদদোয়া করেছেন, তার গায়ে কাঁটা ফুটুক এবং তা সে খুলতে না পারুক

৭। হাদীসে বর্ণিত গুণাবলীতে গুণান্বিত মুজাহিদের প্রশংসা করা হয়েছে। সে সৌভাগ্যের অধিকারী বলে জানান হয়েছে।

৩৮ - যে ব্যাক্তি আল্লাহর হালালকৃত জিনিস হারাম এবং হারামকৃত জিনিসকে হালাল করার ব্যাপারে [অন্ধভাবে], আলেম, বজুর্গ ও নেতাদের আনুগত্য করলো, সে মুলত তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করল

১। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন,

(يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال أبو بكر وعمر)

তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হওয়ার সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। কারণ, আমি বলছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। অথচ তোমরা বলছো, আবুবকর এবং ওমর (রাঃ) বলেছেন।

২। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাঃ) বলেছেন ঐ সব লোকদের ব্যাপারে আমার কাছে খুবই অবাক লাগে, যারা হাদিসের সনদ ও সিহহাত [বিশুদ্ধতা] অর্থাৎ হাদিসের পরম্পরা ও সহীহ হওয়ার বিষয়টি জানার পরও সুফইয়ান সওরীর মতামতকে গ্রহণ করে। অথচ আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور:৬৩)

যারা তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাদের এ ভয় করা উচিৎ যে, তাদের উপর কোন কঠিন পরীক্ষা কিংবা কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এসে পড়ে। (নূর . ৮৩)

তুমি কি জানো ফিতনা কি? ফিতনা হচ্ছে শিরক। সম্ভবত তাঁর কোন কথা অন্তরে বক্রতার সৃষ্টি করলে এর ফলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩। আদী বিন হাতেম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল

(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) التوبة

তারা [ইয়াহুদী ও খৃষ্টান জাতির লোকেরা] আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতদেরকে রব হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল। (তাওবা . ৩১) তখন আমি নবীজিকে বললাম, আমরাতো তাদের ইবাদত করি না। তিন বললেন, আচ্ছা আল্লাহর হালাল ঘোষিত জিনিসকে তারা হারাম বললে, তোমরা কি তা হারাম হিসেবে গ্রহণ করো না? আবার আল্লাহর হারাম ঘোষিত জিনিসকে তারা হালাল বললেন, তোমরা কি তা হালাল হিসেবে গ্রহণ করো না? তখন আমি বললাম, হ্যা, তিনি তখন বললেন, এটাই তাদের ইবাদত (করার মধ্যে গণ্য।) (আহমাদ ও তিরমিজী)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়,

১। সূরা নূরের ৬৩ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আদী বিন হাতেম ইবাদতের যে অর্থ অস্বীকার করেছেন, সে ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

৪। ইবনে আববাস (রাঃ) কর্তৃক আবু বকর এবং ওমর (রাঃ) এর দৃষ্টান্ড় আর ইমাম আহমাদ (রাঃ) কর্তৃক সুফইয়ান সওরীর দৃষ্টান্ড় পেশ করা।

৫। অবস্থার পরিবর্তন মানুষকে এমন [গোমরাহীর] পর্যায়ে উপনীত করে, যার ফলে পন্ডিত ও পীর বুজুর্গের পূজা করাটাই তাদের কাছে সর্বোত্তম ইবাদতে পরিণত হয়। আর এরই নাম দেয়া হয় বেলায়াত। আহবার তথা পন্ডিত ব্যক্তিদের ইবাদত হচ্ছে, তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। অতঃপর অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়ে এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি গাইর ল্লাহর ইবাদত করলো, সে সালেহ বা পূণ্যবান হিসেবে গণ্য হচ্ছে। পক্ষান্ড়রে দ্বিতীয় অর্থে যে ইবাদত করলো অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ইবাদত করলো, সেই জাহেল বা মূর্খ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

৩৯ - সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর এবং তাগুতের মর্মার্থ বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগিতা।

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. (ألنساء: ৬০)

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা আপনার উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে বলে দাবী করে? তারা বিচার ফয়সালার জন্য তাগুত [খোদাদ্রোহী শক্তি] এর কাছে যায়, অথচ তা অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর শয়তান তাদেরকে চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত করতে চায়। (নিসা . ৬০)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . (البقرة: ১১)

তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরাইতে শান্তিকামী। (বাকারা . ১১)

৩। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র এরশাদ করেছেন,

(وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الأعراف: ৫৬)

পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তোমর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। (আরাফ . ৫৬)

৪। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة: ৫০)

তারা কি বর্বর যুগের আইন চায় (মায়েদা . ৫০)

৫। আব্দুল্লাহ বিন ওমর থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

তোমাদের কেউ ঈমানাদর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত আদর্শের অধীন হয়।(ইমাম নববী হাদীসটিকে সহী বলেছেন)

৬। ইমাম শা'বী (রহ:) বলেছেন, একজন মুনাফিক এবং একজন ইহুদীর মধ্যে (একটি ব্যাপারে) ঝগড়া ছিলো। ইহুদী বললো, 'আমরা এর বিচার- ফয়সালার জন্য মুহাম্মদ (স:) এর কাছে যাবো, কেননা মুহাম্মদ (স:) ঘুষ গ্রহণ করেন না, এটা তার জানা ছিলো। আর মুনাফিক বললো, ফায়সালার জন্য আমরা ইহুদী বিচারকের কাছে যাবো, কেননা ইয়াহুদীরা ঘুষ খায়, এ কথা তার জানা ছিলো। পরিশেষে তারা উভয়েই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, তারা এর বিচার ও ফয়সালার জন্য জোহাইনা গোত্রের এক গণকের কাছে যাবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় .

ألم تر إلى الذين يزعمون..... الأية

আরেকটি বর্ণনা মতে জানা যায়, ঝগড়া- বিবাদে লিপ্ত দু'জন লোকের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তাদের একজন বলেছিলো, মীমাংসার জন্য আমরা নবী (স:) এর কাছে যাবো, অপরজন বলেছিলো, কা'ব বিন আশরাফের কাছে যাবো।' পরিশেষে তারা উভয়ে বিষয়টি মীমাংসার জন্য ওমর রা. এর কাছে সোপর্দ করলো। তারপর তাদের একজন ঘটনাটি তাঁর কাছে উল্লেখ করলো। সে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিচার ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারলো না, তাকে লক্ষ্য করে ওমর রা. বললেন, ঘটনাটি কি সত্যিই এরকম? সে বললো, হ্যা, তখন তিনি তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেললেন।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়.

১। সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর এবং তাগুতের মর্মার্থ বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগিতা।

২। সূরা বাকারার ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩। সূরা আরাফের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৪। সূরা মায়েদার (أفحكم الجاهلية يبغون) এর তাফসীর।

৫। এ অধ্যায়ের প্রথম আয়াত

ألم تر إلى الذين يزعمون ..... الأية

নাযিল হওয়ার সম্পর্কে শা'বী রহ. এর বক্তব্য।

৬। সত্যিকারের ঈমান এবং মিথ্যা ঈমানের ব্যাখ্যা।

৭। মুনাফিকের সাথে ওমর রা. এর ব্যবহার সংক্রান্ত ঘটনা।

৮।প্রবৃত্তি যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল স. এর আনীত আদর্শের অনুগত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কারো ঈমান পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার বিষয়।

৪০ আল্লাহর আসমা ও সিফাত' [নাম ও গুণাবলী] অস্বীকারকারীর পরিণামঃ

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

(وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ)

এবং তারা রহমান [আল্লাহর গুণবাচক নাম] কে অস্বীকার করে, (রা'দ: ৩০)

২। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসে আলী রা. বলেন,

حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله

লোকদেরকে এমন কথা বলো, যা দ্বারা তারা [[আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে সঠিক কথা জানতে পারে। তোমরা কি চাও যে, [আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক.

৩। ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে রাসূল (স:) এর থেকে একটি হাদীস শুনে এক ব্যক্তি আল্লাহর গুণকে অস্বীকার করার জন্য একদম ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো তখন

তিনি বললেন, এরা এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি করে করলো? তারা মুহকামের [বা সুস্পষ্ট] আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখালো, আর মুতাশাবাহ [অস্পষ্ট আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে] ধ্বংসাত্মক পথ অবলম্বন করলো।

কুরাইশরা যখন রাসূল (স:) এর কাছে [আল্লাহর গুণবাচক নাম রাহমানের] উল্লেখ করতে শুনতে পেলো, তখন তারা রাহমান' গুণটিকে অস্বীকার করলো এ প্রসঙ্গেই (وهم يكفرون بالرحمن) আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

এ অধ্যায় থেকেনিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১ আল্লাহর কোন নাম ও গুণ অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে ঈমান না থাকা।

২। সূরা রাদের এর তাফসীর।

৩। যে কথা শ্রোতার বোধগম্য নয়, তা পরিহার করা

৪। অস্বীকারকারীর অনিচ্ছা সত্তেও যেসব কথা আল্লাহর ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দিকে নিয়ে যায়, এর কারণ কি? তার উল্লেখ।

৫। ইবনে আববাস (রা.) এর বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর কোন একটি অস্বীকারকারীর ধ্বংস অনিবার্য।

৪১ - আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করার পরিণাম

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (النحل:৮৩)

''তারা আল্লাহর নেয়ামত চিনে, অতঃপর তা অস্বীকার করে।'' (নাহল : ৮৩)

এর মর্মার্থ বুঝাতে মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, কোন মানুষের এ কথা বলা ' এ সম্পদ আমার, যা আমার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।' আ'উন ইবনে আবদিল্লাহ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির এ কথা বলা, অমুক ব্যক্তি না হলে এমনটি হতোনা।' ইবনে কুতাইবা এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুশরিকরা বলে, এটা হয়েছে আমাদের ইলাহদের সুপারিশের বদৌলতে।''

আবু আববাস যায়েদ ইবনে খালেদের হাদীসে- যাতে একথা আছে আল্লাহ বলেন,

أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر

''আমার কোন বান্দার ভোরে নিদ্রা ভঙ্গ হয় মোমিন অবস্থায়, আবার কারো ভোর হয় কাফির অবস্থায়''- উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের অনেক বক্তব্য কুরআন ও সুন্নায় উল্লেখ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি নেয়ামত দানের বিষয়টি গাইরুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে, আল্লাহর তার নিন্দা করেন।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন সালাফে- সালেহীন বলেন, বিষয়টি মুশরিকদের এ কথার মতোই, অঘটন থেকে বাঁচার কারণ হচ্ছে অনুকুল বাতাস, আর মাঝির বিচক্ষণতা' এ ধরনের আরো অনেক কথা রয়েছে যা সাধারণ মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। নেয়ামত সংক্রান্ত জ্ঞান এবং তা অস্বীকার করার ব্যাখ্যা।

২। জেনে- শুনে আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকারের বিষয়টি মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত।

৩। মানুষের মুখে বহুল পরিচলিত এসব কথা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করারই শামিল।

৪। অন্তরে দুটি বিপরীতধর্মী বিষয়ের সমাবেশ।

৪২ - আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরিক না করা

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة:২২)

অতএব জেনে শুনে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না।''

২। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আববাস রা. বলেন أنداد [আন্দাদ] হচ্ছে এমন শিরক যা অন্ধকার রাত্রে নির্মল কাল পাথরের উপর পিপিলিকার পদচারণার চেয়েও সুক্ষ্ম। এর উদাহরণ হচ্ছে, তোমার এ কথা বলা, আল্লাহর কসম এবং হে অমুক, তোমার জীবনের কসম, আমার জীবনের কসম।' যদি ছোট্ট কুকুরটি না থাকতো, তাহলে অবশ্যই আমাদের ঘরে চোর প্রবেশ করতো।' হাঁসটি যদি ঘরে না থাকতো, তাহলে অবশ্যই চোর আসতো।' কোন ব্যক্তি তার সাথীকে এ কথা বলা,

আল্লাহ তাআলা এবং তুমি যা ইচ্ছা করেছো।' কোন ব্যক্তির এ কথা বলা, আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যদি না থাকে, তাহলে অমুক ব্যক্তিকে এ কাজে রেখো না।' এগুলো সবই শিরক। (ইবনে আবি হাতেম)

৩। ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও এরশাদ করেছেন,

(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (رواه الترمذى وحسنه وصححه الحاكم

যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করলো, সে কুফরী অথবা শিরক করলো।" (তিরমিজি)

৪। ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

لأن أخلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا

আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করা আমার কাছে গাইরুল্লাহর নামে সত্য কসম করার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়। হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

(لا تقولوا: ماشاء الله وشاء فلان ولكن قولوأ ماشاء الله ثم شاء فلان (رواه أبوداد

আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছেন' এ কথা তোমরা বলো না। বরং এ কথা বলো, আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে' (আবু দাউদ)

ইবরাহীম নখয়ী থেকে এ কথা বর্নিত আছে যে, أعوذبالله وبك অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ এবং আপনার কাছে আশ্রয় চাই' এ কথা বলা তিনি অপছন্দ করতেন। আর أعوذ بالله ثم بك অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই অতঃপর আপনার কাছে আশ্রয় চাই।' এ কথা বলা তিনি জায়েম মনে করতেন। তিনি আরো বলেন, ' لولا الله ثم فلان যদি আল্লাহ অতঃপর অমুক না হয় একথা বলে, কিন্তু لولا الله وفلان অর্থাৎ যদি আল্লাহ এবং অমুক না হয় এ কথা বলো না।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আল্লাহর সাথে শরিক করা সংক্রান্ড় সূরা বাকারার উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর।

২। শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় শিরকের ব্যাপারে নাযিলকৃত আয়াতকে সাহাবায়ে কেরাম ছোট শিরকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে তাফসীর করেছেন।

৩। গাইরুল্লাহর নামে কসম করা শিরক।

৪। গাইরুল্লাহর নামে সত্য কসম করা, আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করার চেয়েও জঘন্য গুনাহ।

৫। বাক্যস্থিত و এবং ثم এর মধ্যে পার্থক্য।

৪৩ - আল্লাহর নামে কসম করে সন্তুষ্ট না থাকার পরিণাম

১। ইবনে ওমর রা. থেকে বর্নিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له با لله فليرض وم لم يرض فليس من الله. (رواه ابن ماجه بسند حسن)

তোমরা তোমাদের বাপ- দাদার নামে কসম করো না, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে, তার উচিৎ কসমকে বাস্তবায়িত করা। আর যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে কসম করা হলো, তার উচিৎ উক্ত কসমে সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহর কসমে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হলো না, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কল্যাণের কোন আশা নেই।" (ইবনে মাজা)

১। বাপ-দাদার নামে কসম করার উপর নিষেধাজ্ঞা।

২। যার জন্য আল্লাহর নামে কসম করা হলো, তার প্রতি [কসমের বিষয়ে] সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ।

৩। আল্লাহর নামে কসম করার পর, যে উহাতে সন্তুষ্ট থাকে না, তার প্রতি ভয় প্রদর্শন ও হুশিয়ারি উচ্চারণ।

৪৪ আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন' বলা

১- কুতাইলা হতে বর্ণিত আছে, একজন ইহুদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললো, আপনারাও আল্লাহর সাথে শিরক করে থাকেন।কারণ আপনারা বলে থাকেন, ماشاء الله وشئت আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন। আপনারা আরো বলে থাকেন والكعبة অর্থাৎ কাবার কসম। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা কসম বা হলফ করতে চায়, তারা যেন বলে ورب الكعبة ' কাবার রবের কসম আর যেন ماشاء الله ثم شئت আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন একথা বলে। (নাসায়ী)

২। ইবনে আববাস রা. হতে আরো একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্যে বললো, ماشاء الله وشئت [আপনি এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন] তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন

أجعلتنى لله ندا তুমি কি আল্লাহর সাথে আমাকে শরিক করে ফেলেছো আসলে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন, তা একক ভাবেই করেছেন।

৩। আয়েশা রা. এর মায়ের দিক দিয়ে ভাই, তোফায়েল থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি কয়েকজন ইয়াহুদীর কাছে এসেছি। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা অবশ্যই একটা ভাল জাতি, যদি তোমরা ওযাইরকে আল্লাহর পুত্র না বলতে। তারা বললো, তোমরাও অবশ্যই একটি ভাল জাতি যদি তোমরা ما شاء الله وشاء محمد [আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন] এ কথা না বলতে! অতঃপর নাসারাদের কিছু লোকের কাছে আমি গেলাম এবং বললাম, 'ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র এ কথা না বললে তোমরা একটি উত্তম জাতি হতে। তারা বললো, তোমরাও ভাল জাতি হতে, যদি তোমরা এ কথা না বলতে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন ' সকালে এ (স্বপ্নের) খবর যাকে পেলাম তাকে দিলাম। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলাম এবং তাকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, 'এ স্বপ্নের কথা কি আর কাউকে বলেছো? বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং গুণ বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন,তোফায়েল একটা স্বপ্ন দেখেছে, যার খবর তোমাদের মধ্যে যাকে বলার বলেছে। তোমরা এমন কথাই বলেছো, যা বলতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমিও তোমাদেরকে এভাবে বলতে নিষেধ করছি। অতএব তোমরা ما شاء الله وشاء محمد অর্থাৎ 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ স. যা ইচ্ছা করেছেন' একথা বলো না বরং তোমরা বলো, ما شاء الله وحده অর্থাৎ 'একক আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। ছোট শিরক সম্পর্কে ইহুদীরাও অবগত আছে।

২। কুপ্রবৃত্তি সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি থাকা।

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তি أجعلتنى لله ندا 'তুমি কি আমাকে আল্লাহর শরিক বানিয়েছো?' [অর্থাৎ ما شاء الله وشئت এ কথা বললেই যদি শিরক হয়] তাহলে সে ব্যক্তি অবস্থা কি দাঁড়ায়, যে ব্যক্তি বলে, يا أكرم الخلق ما لي من ألوذبه سواك হে সৃষ্টির সেরা, আপনি ছাড়া আমার আশ্রয়দাতা কেউ নেই এবং [এ কবিতাংশের] পরবর্তী দুটি লাইন। [অর্থাৎ উপরোক্ত কথা বললে অবশ্যই বড় ধরনের শিরকী গুনাহ হবে।]

৪। নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী يمنعنى كذا وكذا দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা শিরকে আকবার [বড় শিরক] এর অন্তর্ভূক্ত নয়।

৫। নেক স্বপ্ন অহীর শ্রেণীর্ভূক্ত।

৬। স্বপ্ন শরিয়তের কোন কোন বিধান জারির কারণ হতে পারে।

৪৫ - যে ব্যক্তি যমানাকে গালি দেয় সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

(وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ (الجاثية: ٢٤

''অবিশ্বাসীরা বলে, ' শুধু দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। যমানা ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না।'' (জাসিয়া : ২৪)

২। সহীহ হাদীসে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار.

لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر

তোমরা যমানাকে গালি দিওনা। কারণ, আল্লাহই হচ্ছেন যমানা।''

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়.

১। কাল বা যমানাকে গালি দেয়া নিষেধ।

২। যমানাকে গালি দেয়া আল্লাহকে কষ্ট দেয়ারই নামান্তর।

৩। فإن الله هو الدهر ' আল্লাহই হচ্ছেন যমানা' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর বাণীর মধ্যে গভীর চিন্তার বিষয় নিহিত আছে।

৪। বান্দার অন্তরে আল্লাহকে গালি দেয়ার ইচ্ছা না থাকলেও অসাবধনতা বশতঃ মনের অগোচরে তাঁকে গালি দিয়ে ফেলতে পারে।

৪৬ - কাযীউল কুযাত [মহা বিচারক] প্রভৃতি নামকরণ প্রসংগে

১। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله.

আল্লাহ তাআলার কাছে ঐ ব্যক্তির নাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার নামকরণ করা হয় রাজাধিরাজ বা প্রভূর প্রভূ। আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভূ নেই। (বুখারি)

সুফিয়ান সওরী বলেছেন, 'রাজাধিরাজ কথাটি 'শাহানশাহ এর মতই একটি নাম। আরো একটি বর্ণনা মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছন-

أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبيه

কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং খারাপ ব্যক্তি হচ্ছে [যার নামকরণ করা হচ্ছে রাজাধিরাজ]। উল্লেখিত হাদীসে أخنع শব্দের অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়.

১। 'রাজাধিরাজ নামকরণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

২। রাজাধিরাজ এর অর্থ সুফিয়ান সওরী কর্তৃক বর্ণিত শাহানশাহ এর অর্থের অনুরূপ।

৩। বর্ণিত ব্যাপারে এবং এ জাতীয় বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা। এক্ষেত্রে অন্তরে কি নিয়ত আছে তা বিবেচ্য নয়।

৪। বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সবই আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪৭ - আল্লাহর সম্মানার্থে [শিরকী] নামের পরিবর্তন

১। আবু শুরাইহ হতে বর্ণিত আছে এক সময় তার কুনিয়াত ছিল আবুল হাকাম [জ্ঞানের পিতা] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

إن الله هو الحكم وإليه الحكم

আল্লাহ তাআলাই হচ্ছে জ্ঞান সত্তা এবং তিনিই জ্ঞানের আধার তখন আবু শুরাইহ বললেন, আমার কওমের লোকেরা যখন কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে, তখন ফয়সালার জন্য আমার কাছে চলে আসে। তারপর আমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেই। এতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়ে যায়।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে বললেন, এটা কতইনা ভাল! তোমার কি সন্তানাদি আছে? আমি বললাম, শুরাইহ মুসলিম এবং 'আবদুল্লাহ নামের তিনটি ছেলে আছে। তিনি বললেন, 'তাদের মধ্যে সবার বড় কে? আমি বললাম শুরাইহ। তিনি বললেন অতএব তুমি আবু শুরাইহ [শুরাইহের পিতা] (আবু দাউদ)।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আল্লাহর আসমা ও সিফাত অর্থাৎ নাম ও গুণাবলীর সম্মান করা; যদিও এর অর্থ বান্দার উদ্দেশ্য না হয়।

২। আল্লাহর নাম ও সিফাতের সম্মানার্থে নাম পরিবর্তন করা।

৩। কুনিয়াতের জন্য বড় সন্তানের নাম পছন্দ করা।

৪৮ - আল্লাহর যিকির, কুরআন এবং রাসূল সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে খেল- তামাশা করা প্রসংগে

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ (التوبة: ٦٥

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা খেল- তামাশা করছিলাম।(ফুসসিলাত . ৫০)

২। ইবনে ওমর, মুহাম্মদ বিন কাব, যায়েদ বিন আসলাম এবং কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, [তাদের একের কথা অপরের কথার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে] তাবুক যুদ্ধে একজন লোক বললো, এ ক্বারীদের [কুরআন পাঠকারীর] মত এত অধিক পেটুক, কথায় এত অধিক মিথ্যুক এবং যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাক্ষাতে এত অধিক ভীরু আর কোন লোক দেখিনি। অর্থাৎ লোকটি তার কথা দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর ক্বারী সাহাবায়ে কেরামের দিকে ইঙ্গিত করেছিলো। আওফ বিন মালেক লোকটিকে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলেছো। কারণ, তুমি মুনাফিক।

আমি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ খবর জানাবো। আওফ তখন এ খবর জানানোর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন কুরআন তাঁর চেয়েও অগ্রগামী [অর্থাৎ আওফ পৌছার পূর্বেই অহীর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপারটি জেনে ফেলেছেন] এ ফাঁকে মুনাফিক লোকটি তার উটে চড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে আসলো। তারপর সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, চলার পথে আমরা অন্যান্য পথচারীদের মত পরস্পরের হাসি, রং- তামাশা করছিলাম' যাতে করে আমাদের পথ চলার কষ্ট লাঘব হয়। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এর উটের গদির রশির সাথে লেগে আমি যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। পাথর তার পায়ের উপর পড়ছিলো, আর সে বলছিলো, 'আমরা হাসি ঠাট্টা করছিলাম।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون

তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত [কুরআন] এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে?

তিনি তার দিকে [মুনাফিকের দিকে] দৃষ্টিও দেননি। এর অতিরিক্ত কোন কথাও বলেননি।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একথা অনুধাবন করা যে, আল্লাহ, কুরআন ও রাসূলের সাথে যারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তারা কাফের।

২। এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর ঐ ব্যক্তির জন্য যে, এ ধরনের কাজ করে অর্থাৎ আল্লাহ, কুরআন ও রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে।

৩। চোগলখুরী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে নসীহতের মধ্যে পার্থক্য।

৪। এমন ওযরও রয়েছে যা গ্রহণ করা উচিৎ নয়।

৪৯ - সূরা ফুসসিলাতের ৫০ নং আয়াতের তাফসীর ও আশ্চর্য ধরনের কিসসা এবং তাতে নিহিত উপদেশাবলী

১। আল্লাহ তাআলার বাণী .

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي (فصلت:٥٠)

দুঃখ- দুর্দশার পর যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলে, এ নেয়ামত আমারই জন্য হয়েছে। (ফুসসিলাত . ৫০) বিখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ বলেন, ' ইহা আমরই জন্য এর অর্থ হচ্ছে, আমার নেক আমলের বদৌলতেই এ নেয়ামত দান করা হয়েছে, আমিই এর হকদার ।ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, সে এ কথা বলতে চায়, 'নেয়ামত আমার আমলের কারণেই এসেছে অর্থাৎ এর প্রকৃত হকদার আমিই।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন,

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي (القصص : ٧٨)

''সে বলে, 'নিশ্চয়ই এ নেয়ামত আমার ইলম ও জ্ঞানের জন্য আমাকে দেয়া হয়েছে।'' (কাসাসঃ৭৮)

কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, 'উপার্জনের রকমারী পন্থা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকার কারণে আমি এ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি।' অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন 'আল্লাহ তাআলার ইলম মোতাবেক আমি এর [নেয়ামতের] হকদার। আমার মর্যাদার বদৌলতেই এ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি।'

মুজাহিদের এ কথার অর্থই উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

২। আবু হুরাইয়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছেন,

ثلاثة من بنى إسرائيل : أبرص وأقرع و أعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأرض ... إلى آخر الحديث.

''বর্ণিত ইসরাইল বংশে তিনজন লোক ছিল . যাদের একজন ছিল কুষ্টরোগী, আরেকজন টাক পড়া, অপরজন ছিল অন্ধ। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তখন তাদের কাছে তিনি ফেরেস্তা পাঠালেন। কুষ্টরোগীর কাছে ফেরেস্তা এসে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি? সে বললো, 'সুন্দর চেহারা এবং সুন্দর ত্বক [শরীরের চামড়া]। আর যে রোগের কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে তা থেকে মুক্তি আমার কাম্য। তখন ফেরেস্তা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলো। এতে তার রোগ দূর হয়ে গেলো তাকে সুন্দর রং আর

সুন্দর ত্বক দেয়া হলো। তারপর ফেরেস্তা তাকে জিজ্ঞেস করলো, ''তোমার প্রিয় সম্পদ কি? সে বললো, ''উট অথবা গরু''। [ইসহাক অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারী উট কিংবা গরু এ দু'য়ের মধ্যে সন্দেহ করছেন] তখন তাকে দশটি গর্ভবতী উট দেয়া হলো। ফিরিস্তা তার জন্য দোয়া করে বললো আল্লাহ এ সম্পদে তোমাকে বরকত দান করুন।''

তারপর ফেরেস্তা টাক পড়া লোকটির কাছে গিয়ে বললো, ''তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি?'' লোকটি বললো, ''আমার প্রিয় জিনিস হচ্ছে সুন্দর চুল। আর লোকজন আমাকে যার জন্য ঘৃণা করে তা থেকে মুক্ত হতে চাই।'' ফেরেস্তা তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। এতে তার মাথার টাক দূর হয়ে গেলো। তাকে সুন্দর চুল দেয়া হলো। অতঃপর ফেরেস্তা তাকে জিজ্ঞেস করলো, ''কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়? সে বললো, ''উট অথবা গরু।'' তখন তাকে গর্ভবতী গাভী দেয়া হলো। ফেরেস্তা তার জন্য দোয়া করে বললো আল্লাহ এ সম্পদে তোমাকে বরকত দান করুন। ''

তারপর ফেরেস্তা অন্ধ লোকটির কাছে এসে বললো, ''তোমার কাছে সবচেয় প্রিয় বস্ত্ত কি?'' লোকটি বললো আল্লাহ যেন আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। যার ফলে আমি লোকজনকে দেখতে পাবো, এটাই আমার প্রিয় জিনিস।'' ফেরেস্তা তখন তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলো। এতে লোকটির দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ তাআলা ফিরেয়ে দিলেন। ফেরেস্তা তাকে বললো, ''কি সম্পদ তোমার কাছে প্রিয়? সে বললো, ''ছাগল আমার বেশী প্রিয়।'' তখন তাকে একটি গর্ভবতী

ছাগল দেয়া হলো। তারপর ছাগল বংশ বৃদ্ধি করতে লাগলো। এমনিভাবে উট ও গরু বংশ বৃদ্ধি করতে লাগলো। অবশেষে অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, একজনের উট দ্বারা মাঠ ভরে গেলো, আরেকজনের গরু দ্বারা মাঠ পূর্ণ হয়ে গেলো এবং আরেকজনের ছাগল দ্বারা মাঠ ভর্তি হয়ে গেলো।

এমতাবস্থায় একদিন ফেরেস্তা তার স্বীয় বিশেষ আকৃতিতে কুষ্ঠ রোগীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, ''আমি একজন মিসকিন।'' আমার সফরের সম্বল শেষ হয়ে গেছে [আমি খুবই বিপদগ্রস্ত] আমার গন্তব্যে পৌছার জন্য প্রথমে আল্লাহর তারপর আপনার সাহায্য দরকার। যে আল্লাহ আপনাকে এত সুন্দর রং এবং সুন্দর ত্বক দান করেছেন, তাঁর নামে আমি আপনার কাছে একটা উট সাহায্য চাই, যাতে আমি নিজ গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারি। তখন লোকটি বললো, 'দেখুন, আমার অনেক দায়-দায়িত্ব আছে, হকদার আছে।' ফেরেস্তা বললো, 'আমার মনে হয়, আমি আপনাকে চিনি।' আপনি কি কুষ্ঠ রোগী ছিলেন না? আপনি খুব গরীব ছিলেন? লোকজন আপনাকে খুব ঘৃণা করতো। তারপর আল্লাহ আপনাকে এ সম্পদ দান করেছেন। তখন লোকটি বললো, 'এ সম্পদ আমার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ফেরেস্তা তখন বললো, ''তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দেন।''

তারপর ফেরেস্তা মাথায় টাক- পড়া লোকটির কাছে গেল এবং ইতিপূর্বে কুষ্ঠরোগীর সাথে যে ধরনের কথা বলেছিলো, তার [টাক পড়া লোকটির] সাথেও সে ধরনের কথা বললো। প্রতি উত্তরে কুষ্ঠরোগী যে ধরনের জবাব দিযেছিলে, এ লোকটিও সেই একই ধরনের জবাব দিলো। তখন ফেরেস্তাও আগের মতই বললো, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ তাআলা যেন তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দেন।' অতঃপর ফেরেস্তা স্বীয় আকৃতিতে অন্ধ লোকটির কাছে গিয়ে বললো, 'আমি এক গরীব মুসাফির। আমার পথের সম্বল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। প্রথম আল্লাহর তারপর আপনার সাহায্য কামনা করছি। যিনি আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নামে একটি 'ছাগল' আপনার কাছে সাহায্য চাই, যাতে আমার সফরে নিজ গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারি।' তখন লোকটি বললো, 'আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ তাআলা আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার যা খুশি নিয়ে যান, আর যা খুশি রেখে যান। আল্লাহর কসম, আল্লাহর নামে আপনি আজ যা নিয়ে যাবেন, তার বিন্দুমাত্র আমি বাধা দেব না।' তখন ফেরেস্তা বললো, 'আপনার মাল আপনি রাখুন। আপনাদেরকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করা হলো। আপনার আচরণে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন, আপনার সঙ্গীদ্বয়ের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।'' (বুখারি ও মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। সূরা ফুসসিলাতের ৫০ নং আয়াতের তাফসীর।

২। لیقولن هذا لی এর অর্থ।

৩। أوتیته علی علم عندی এর অর্থ।

৪। আশ্চর্য ধরনের কিসসা এবং তাতে নিহিত উপদেশাবলী।

৫০ - যেসব নামের মধ্যে গাইরুল্লাহর ইবাদতের অর্থ নিহিত রয়েছে সে নাম রাখা হারাম।

১। আল্লাহ তাআলার বাণী .

(فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا (الأعراف: ১৯০

''অতঃপর আল্লাহ যখন উভয়কে একটি সুস্থ ও নিখুঁত সন্তান দান করলেন, তখন তারা তাঁর দানের ব্যাপারে অন্যকে তাঁর শরিক গণ্য করতে শুরু করলো।'' (আ'রাফ . ১৯০)

ইবনে হযম (রহ:) বলেন, উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এমন প্রত্যেক নামই হারাম, যা দ্বারা গাইরুল্লাহর ইবাদত করার অর্থ বুঝায়। যেমন, আবদু ওমর, আবদুল কা'বা এবং এ জাতীয় অন্যান্য নাম। তবে আবদুল মোত্তালিব এর ব্যতিক্রম। ইবনে আববাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আদম আ. যখন বিবি হাওয়ার সাথে মিলিত হলেন, তখন হাওয়া গর্ভবতী হলেন। এমতাবস্থায় শয়তান আদম ও হাওয়ার কাছে এসে বললো, 'আমি তোমাদের সেই বন্ধু ও সাথী, যে নাকী তোমাদের জান্নাত থেকে বের

করেছে। তোমরা অবশ্যই আমার আনুগত্য করো, নতুবা গর্ভস্থ সন্তানের মাথায় উটের শিং গজিয়ে দিবো, তখন সন্ড়ান তোমার পেট কেটে বের করতে হবে। আমি অবশ্যই একাজ করে ছাড়বো।''

শয়তান এভাবে তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছিল। শয়তান বললো, তোমরা তোমাদের সন্তানের নাম 'আব্দুল হারিছ' রেখো। তখন তাঁরা শয়তানের আনুগত্য করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তাদের একটি মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হলো। আবারো বিবি হাওয়া গর্ভবতী হলেন। শয়তানও পুনরায় তাঁদের কাছে এসে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। এর ফলে তাঁদের অন্তরে সন্তানের প্রতি ভালবাসা তীব্র হয়ে দেখা দিলো। তখন তাঁরা সন্তানের নাম 'আবদুল হারিস' রাখলেন। এভাবেই তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের মধ্যে তাঁর সাথে শরিক করে ফেললেন। এটাই হচ্ছে جعلا له شركاء فيما أتاهما এ আয়াতের তাৎপর্য (ইবনে আবি হাতিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

কাতাদাহ থেকে সহীহ সনদে অপর একটি হাদীসে বর্নিত আছে, তিনি বলেন, তাঁরা আল্লাহর সাথে শরিক করেছিলেন আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়।'

মুজাহিদ থেকে সহীহ সনদে لئن أتينا صالحا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্নিত আছে, তিনি বলেন, সন্তানটি মানুষ না হওয়ার আশংকা তাঁরা [পিতা-মাতা] করেছিলেন। '

[হাসান, সাঈদ প্রমুখের কাছ থেকে এর অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে।]

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। যেসব নামের মধ্যে গাইরুল্লাহর ইবাদতের অর্থ নিহিত রয়েছে সে নাম রাখা হারাম।

২। সূরা আ'রাফের ১৯০ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আলোচিত অধ্যায়ে বর্ণিত শিরক হচ্ছে শুধুমাত্র নাম রাখার জন্য। এর দ্বারা হাকীকত [অর্থাৎ শিরক করা] উদ্দেশ্য ছিল না।

৪। আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ কন্যা সন্ড়ান লাভ করা একজন মানুষের জন্য নেয়ামতের বিষয়।

৫। আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে শিরক এবং ইবাদতের মধ্যে শিরকের ব্যাপারে সালাফে-সালেহীন পার্থক্য

নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৫১ - আল্লাহ তাআলার আসমায়ে হুসনা [বা সুন্দরতম নামসমূহ]

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

(وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ (الأعراف: ١٨٠

''আল্লাহর সুন্দর সুন্দর অনেক নাম রয়েছে। তোমরা এসব নামে তাঁকে

ডাকো। আর যারা তাঁর নামগুলোকে বিকৃত করে তাদেরকে পরিহার করে চলো।'' (আ'রাফ . ১৮০)

২। ইবনে আবি হাতিম ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, يلحدون فى أسمائه [তারা তাঁর নামগুলো বিকৃত করে] এর অর্থ হচ্ছে তারা শিরক করে।

৩। ইবনে আববাস রা. থেকে আরো বর্ণিত আছে, মুশরিকরা 'ইলাহ' থেকে 'লাত' আর 'আজীজ' থেকে 'উযযা' নামকরণ করছে।

৪। আ'মাস থেকে বর্ণিত আছে, মুশরিকরা আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে এমন কিছু [শিরকী বিষয়] ঢুকিয়েছে যার অস্তিত্ব আদৌ তাতে নেই।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আল্লাহর নামসমূহ যথাযথ স্বীকৃতি

২। আল্লাহর নামসমূহ সুন্দরতম হওয়া।

৩। সুন্দর ও পবিত্র নামে আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ।

৪। যেসব মূর্খ ও বেইমান লোকেরা আল্লাহর পবিত্র নামের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদেরকে পরিহার করে চলা।

৫। আল্লাহর নামে বিকৃতি ঘটানোর ব্যাখ্যা।

৫২ - ''আসসালামু আলাল্লাহ [আল্লাহর] উপর শান্তি বর্ষিত হোক] বলা যাবে না

১। সহীহ বুখারীতে ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নামাযে মগ্ন ছিলাম। তখন আমরা বললাম,

السلام على الله من عباده، السلام على فلان فلان

''আল্লাহর উপর তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে শান্তি হোক, অমুক অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

لا تقولوا : السلام على الله، فإن الله هو السلام

''আল্লাহর উপর শান্তি হোক, এমন কথা তোমরা বলো না। কেননা আল্লাহ নিজেই 'সালাম' [শান্তি]''

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। 'সালাম' এর ব্যাখ্যা।

২। 'সালাম' হচ্ছে সম্মানজনক সম্ভাষণ।

৩। এ [‘সালাম’] সম্ভাষণ আল্লাহর ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

৪। আল্লাহর ব্যাপারে ‘সালাম’ প্রযোজ্য না হওয়ার কারণ।

৫। বান্দাহগণকে এমন সম্ভাষণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা আল্লাহর জন্য সমীচীন ও শোভনীয়।

৫৩ - ‘হে আল্লাহ তোমার মর্জি হলে আমাকে মাফ করো’ প্রসঙ্গে

১। সহীহ হাদীসে আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ,

اللهم ارحمنى إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره لهوﻻ يقل أحدكم اللهم اغفر لى إن شئت.

‘‘তোমাদের মধ্যে কেউ যেন একথা না বলে, ‘হে আল্লাহ, তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে মাফ করে দাও, ‘হে আল্লাহ, তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে করুণা করো’। বরং দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। কেননা আল্লাহর উপর জবরদস্তী করার মত কেউ নেই।’’ (বুখারি)

২। সহী মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে,

وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيئ أعطاه

‘‘আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার উৎসাহ উদ্দীপনাকে বৃদ্ধি করা উচিৎ। কেননা আল্লাহ বান্দাকে যাই দান করেন না কেন তার কোনটাই তাঁর কাছে বড় কিংবা কঠিন কিছুই নয়।’’

৫৪ - আমার দাস- দাসী বলা নিষিদ্ধ।

১। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (স:) এরশাদ করেছেন,

لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، وليقل: سيدى ومولاى، ولا يقل أحدكم عبدى وأمتى، وليقل : فتاى وفتاتى و غلامى.

‘‘ তোমাদের কেউ যেন না বলে, ‘তোমার প্রভুকে খাইয়ে দাও’ ‘তোমার প্রভুকে অজু করাও’। বরং সে যেন বলে, ‘আমার নেতা’ ‘আমার মনিব’। তোমাদের কেউ যেন না বলে ‘আমার দাস’ ‘আমার দাসী’। বরং সে যেন বলে, ‘আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার চাকর।’’

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আমার দাস- দাসী বলা নিষিদ্ধ।

২। কোন গোলাম যেন তার মনিবকে না বলে, ‘আমার প্রভু’। এ কথাও যেন না বলে, ‘তোমার রবকে আহার করাও’।

৩। প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় হলো, ‘আমার ছেলে’ ‘আমার মেয়ে’ ‘আমার চাকর’ বলতে হবে।

৪। দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হলো, ‘আমার নেতা,’ ‘আমার মনিব’ বলতে হবে।

৫। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি শতর্কতা অবলম্বন। আর তা হচ্ছে, শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োগের মধ্যেও তাওহীদের শিক্ষা বাস্তবায়ন করা।

৫৫ - আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে আশ্রয় দান।

আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চাইলে বিমুখ না করা

১। ইবনে ওমর রা. থেকে বর্নিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছে,

من سأل بالله فأعطوه، ومن أستعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. (رواه أبوداود والنسائى بسند صحيح)

''যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে চায় তাকে দান করো। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে আশ্রয় দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে ডাকে, তার ডাকে সাড়া দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের জন্য ভাল কাজ করে, তার যথোপযুক্ত প্রতিদান দাও। তার প্রতিদানের জন্য যদি তোমরা কিছুই না পাও, তাহলে তার জন্য এমন দোয়া করো, যার ফলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো। '' (আবু দাউদ, নাসায়ী)

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে আশ্রয় দান।

২। আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য প্রার্থনাকারীকে সাহায্য প্রদান।

৩। [নেক কাজের] আহবানে সাড়া দেয়া।

৪। ভাল কাজের প্রতিদান দেয়া।

৫। ভাল কাজের প্রতিদানে অক্ষম হলে উপকার সাধনকারীর জন্য দোয়া করা।

৬। এমন খালেসভাবে উপকার সাধনকারীর জন্য দোয়া করা, যাতে মনে হয়, যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী حتى تروا أنكم قد كافأتموه দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

৫৬ - বিওয়াজহিল্লাহ বলে একমাত্র জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করা যায় না।

১। জাবের রা. থেকে বর্নিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

(لا يسأل بوجه الله إلا الجنة (رواه أبوداؤد

বিওয়াজহিল্লাহ [আল্লাহর চেহারার ওসীলা] দ্বারা একমাত্র জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুই চাওয়া যায় না।'' (আবু দাউদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ জান্নাত ব্যতীত বিওয়াজহিল্লাহ দ্বারা অন্য কিছু চাওয়া যায় না।

২।আল্লাহর চেহারা নামক সিফাত বা গুনের স্বীকৃতি।

৫৭ - [বাক্যের মধ্যে ‘যদি’ ব্যবহার সংক্রান্ড় আলোচনা]

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

(يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا (آل عمران ১৫৪

‘‘তারা বলে, ‘যদি’ এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছু থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না’’ (আল ইমরান . ১৫৪)

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

(الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا (آل عمران: ১৬৮

‘‘যারা ঘরে বসে থেকে [যুদ্ধে না গিয়ে তারেদ [যোদ্ধা] ভাইদেরকে বলে, আমাদের কথা মতো যদি তারা চলতো। তবে তারা নিহত হতো না। (আল-ইমরান . ১৬৮)

৩। সহীহ বুখারীতে আয়েশা রা. হবে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

أحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شئ فلا تقل لو أننى فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان

‘‘যে জিনিস তোমার উপকার সাধন করবে, তার ব্যাপারে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, আর কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করো না। যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তবে এ কথা বলো না, ‘যদি

আমি এরকম করতাম, তাহলে অবশ্যই এমন হতো’। বরং তুমি এ কথা বলো, ‘আল্লাহ যা তাকদীরে রেখেছেন এবং যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা ‘যদি’ কথাটি শয়তানের জন্য কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়।’’ (বুখারি)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। সূরা আল- ইমরানের ১৫৪ নং আয়াত এবং ৬৮ নং আয়াতের উল্লেণ্ঢখিত অংশের তাফসীর।

২। কোন বিপদাপদ হলে ‘যদি’ প্রয়োগ করে কথা বলার উপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা।

৩। শয়তানের [কুমন্ত্রণামূলক] কাজের সুযোগ তৈরীর কারণ।

৪। উত্তম কথার প্রতি দিক নির্দেশনা।]

৫। উপকারী ও কল্যাণজনক বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা।

৬। এর বিপরীত অর্থাৎ ভাল কাজে অপারগতা ও অক্ষমতা প্রদর্শণের উপর নিষেধাজ্ঞা।

৫৮ - বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ

১। উবাই ইবনে কা’ব রা. থেকে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لا تسبوا الريح، فإذا رايتم ما تكرهون فقولوا:

‘‘তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। তোমরা যদি বাতাসের মধ্যে তোমাদের অপছন্দনীয় কিছু প্রত্যক্ষ করো তখন তোমরা বলো,

أللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذبك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. (صحيح الترمذى(

‘‘হে আল্লাহ এ বাতাসের যা কল্যাণকর, এতে যে মঙ্গল নিহিত আছে এবং যতটুকু কল্যাণ করার জন্য সে অদিষ্ট হয়েছে ততটুকু কল্যাণ ও মঙ্গল আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি। আর এ বাতাসের যা অনিষ্টকর, তাতে যে অমঙ্গল লুকায়িত আছে, এবং যতটুকু অনিষ্ট সাধনের ব্যাপারে সে

আদিষ্ট হয়েছে তা [অমঙ্গল ও অনিষ্ঠতা] থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই। [তিরমিজি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ।

২। মানুষ যখন কোন অপছন্দনীয় জিনিস দেখবে তখন কল্যাণকর কথার মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দান করবে।

৩। বাতাস আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট, একথার দিক নির্দেশনা।

৪। বাতাস কখনো কল্যাণ সাধনের জন্য আবার কখনো অকল্যাণ করার জন্য আদিষ্ট হয়।

৫৯ - ১। সূরা আল- ইমরানের ১৫৪ নং আয়াতের তাফসীর ও সূরা ‘‘ফাতাহ’’ এর ৬ নং আয়াতের তাফসীর।

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

(يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ (آل عمران: ١٥٤

‘‘তারা জাহেলী যুগের ধারণার মত আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা পোষণ করে। তারা বলে, ‘আমাদের জন্য কি কিছু করণীয় আছে? [হে রাসূল] আপনি বলে দিন, ‘সব বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভূক্ত।’’ [আল-ইমরান . ১৫৪]

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ (الفتح: ٦)

‘‘তারা [মুনাফিকরা] আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তারা নিজেরাই খারাপ ও দোষের আবর্তে নিপতিত।’’ (আল-ফাতাহ . ৬]

প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন, ظن এর ব্যাখ্যা এটাই করা হয়েছে যে, মুনাফিকদের ধারণা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন না। তাঁর বিষয়টি অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যে সব বিপদাপদ এসেছে তা আদৌ আল্লাহর ফয়সালা, তাকদীর এবং হিকমত মোতাবেক হয়নি।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে যে, মানুফিকরা আল্লাহর হিকমত, তাকদীর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণাঙ্গ রিসালত এবং সকল দ্বীনের উপর আল্লাহর দীন তথা ইসলামের বিজয়কে অস্বীকার করেছে। আর এটাই হচ্ছে সেই খারাপ ধারণা যা সূরা ‘ফাতহে’ উল্লেখিত মুনাফিক ও মুশরিকরা পোষণ করতো। এ ধারণা খারাপ হওয়ার কারণ এটাই যে, আল্লাহ তাআলার সুমহান মর্যাদার জন্য ইহা শোভনীয় ছিল না। তাঁর হিকমত প্রশংসা এবং সত্য ওয়াদার জন্যও উক্ত ধারণা ছিল বেমানান, অসৌজন্যমুলক।

যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা বাতিলকে হকের উপর এতটুকু বিজয় দান করেন, যাতে হক অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালা, তাকদীরের নিয়মকে অস্বীকার করে, অথবা তাকদীর যে আল্লাহর হক মহা কৌশল এবং প্রশংসার দাবীদার এ কথা অস্বীকার করে, সাথে সাথে এ দাবীও করে যে, এসব আল্লাহ তাআলার নিছক অর্থহীন ইচ্ছামাত্র; তার এ ধারণা কাফেরদের ধারণা বৈ কিছু নয়। তাই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি এ সব কাফেরদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।

অধিকাংশ লোকই নিজেদের [সাথে সংশ্লিষ্ট] বিষয়ে এবং অন্যান্য লোকদের বেলায় আল্লাহ তাআলার ফয়সালার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা তাঁর আসমা ও সিফাত [নাম ও গুণাবলী] এবং তাঁর হিকমত ও প্রশংসা সম্পর্কে অবগত রয়েছে, কেবলমাত্র সেই আল্লাহর প্রতি এ খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

যে ব্যক্তি প্রজ্ঞা সম্পন্ন, বুদ্ধিমান এবং নিজের জন্য কল্যাণকামী, তার উচিৎ এ আলোচনা দ্বারা বিষয়টির অপরিসীম গুত্ব অনুধাবন করা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বীয় রব সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে, তার উচিৎ নিজ বদ-ধারণার জন্য আল্লাহর নিকট তওবা করা।

আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণকারী কোন ব্যক্তিকে যদি তুমি পরীক্ষা করো, তাহলে দেখতে পাবে তার মধ্যে রয়েছে তাকদীরের প্রতি হিংসাত্মক বিরোধীতা এবং দোষারোপ করার মানসিকতা। তারা বলে, বিষয়টি এমন হওয়া উচিৎ ছিলো। এ ব্যাপারে কেউ বেশী, কেউ কম বলে থাকে তুমি তোমার নিজেকে পরীক্ষা করে দেখো, তুমি কি এ খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত? কবির ভাষায় .

মুক্ত যদি থাকো তুমি এ খারাবী থেকে,

বেঁচে গেলে তুমি এক মহা বিপদ থেকে।

আর যদি নাহি পারো ত্যাগিতে এ রীতি,

বাঁচার তরে তোমার লাগি নাইকো কোন গতি।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। সূরা আল- ইমরানের ১৫৪ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা ‘‘ফাতাহ’’ এর ৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আলোচিত বিষয়ের প্রকার সীমাবদ্ধ নয়।

৪। যে ব্যক্তি আল্লাহর আসমা ও সিফাত, [নাম ও গুণাবলী] এবং নিজের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত রয়েছে, কেবলমাত্র সেই আল্লাহর প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা থেকে বাঁচতে পারে।

৬০ - তাকদীর অস্বীকারকারীদের পরিণতি

১। ইবনে ওমর রা. বলেছেন,

والذى نفس ابن عمر بيده لوكان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه فى سبيل الله ما قبله الله منه.

‘‘সেই সত্তার কসম, যার হাতে ইবনে ওমরের জীবন, তাদের (তাকদীর অস্বীকারীদের) কারো কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, অতঃপর তা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা উক্ত দান কবুল করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনে’’। অতঃপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী দ্বারা নিজ বক্তব্যের পক্ষে দলীল পেশ করেন,

الإيمان أن نومن بالله وملائكته وكتبه و رسله واليوم الأخر و تؤمن بالقدر خيره وشره. (رواه مسلم(

''ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহ তাআলা, তাঁর সমুদয় ফিরিস্তা, তাঁর যাবতীয় [আসমানী] কিতাব, তাঁর সমস্ত রাসূল এবং আখেরাতের প্রতি

ঈমান আনয়ন করবে সাথে সাথে তাকদীর এবং এর ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে।'' (মুসলিম)

২। উবাদা বিন সামেত রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার ছেলেকে বললেন, ''হে বৎস, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে, 'তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটারই ছিল। আর তোমার জীবনে যা ঘটেনি তা কোনদিন তোমার জীবনে ঘটার ছিলোনা।'' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি,

إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، فقال : رب ماذا اكتب؟ قال : أكتب مقادير كل شئ حتى تقوم الساعة.

''সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা যা সৃষ্টি কলেন তা হচ্ছে 'কলম'। সৃষ্টির পরই তিনি কলমকে বললেন, ''লিখ''। কলম বললো, 'হে আমার রব, 'আমি কি লিখবো?' তিনি বললেন, 'কেয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সব জিনিসের তাকদীর লিপিবদ্ধ করো।'' হে বৎস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি,

من مات على غير هذا فليس منى

''যে ব্যক্তি [তাকদীরের উপর] বিশ্বাস ব্যতীত মৃত্যু বরণ করলো, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।''

অন্য একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে,

إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له أكتب فجرى فى تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة.

''আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে 'কলম'। এরপরই তিনি কলমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'লিখ'। কেয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, সে মুহূর্তে থেকে কলম তা লিখতে শুরু করে দিল। (আহমদ)

৩। ইবনে ওয়াহাবের একটি বর্ণনা মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار

''যে ব্যক্তি তাকদীর এবং তাকদীরের ভাল- মন্দ বিশ্বাস করে না, তাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন করবেন।''

ইবনুদ্দাইলামী থেকে বর্ণিত আছে, কাতাদাহ রা. বলেন, 'আমি ইবনে কা'ব এর কাছে আসলাম। তারপর বললাম, 'তাকদীরের ব্যাপারে আমার মনে কিছু কথা আছে। আপনি আমাকে তাকদীর সম্পর্কে কিছু উপদেশমূলক কথা বলুন। এর ফলে হয়তো আল্লাহ তাআলা আমার অন্তর থেকে উক্ত জমাট বাধা কাদা দূর করে দিবেন। তখন তিনি বললেন, 'তুমি যদি উহুদ [পাহাড়] পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় দান করো, আল্লাহ তোমার এ দান ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীরকে বিশ্বাস করবে। আর এ কথা জেনে রাখো, তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটতে কখনো ব্যতিক্রম হতো না। আর তোমার জীবনে যা সম্পর্কিত এ বিশ্বাস পোষণ না করে মৃত্যু বরণ করো, তা হলে অবশ্যই জাহান্নামী হবে'। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আবদুলণ্ঢাহ ইবনে মাসউদ, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং যায়েদ বিন ছাবিত রা. এর নিকট গেলাম। তাঁদের প্রত্যেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরকম হাদীসই বর্ণনা করেছেন।'' (হাকিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো জানা যায় .

১। তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ফরজ এর বর্ণনা।

২। তাকদীরের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে, এর বর্ণনা।

৩। তাকদীরের প্রতি যার ঈমান নেই তার আমল বাতিল।

৪। যে ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি ঈমান আনেনা সে ঈমানের স্বাদ অনুধাবন করতে অক্ষম।

৫। সর্বাগ্রে যা সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ।

৬। কেয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, সৃষ্টির পর থেকেই কলম তা লিখতে শুরু করেছে।

৭। যে ব্যক্তি তাকদীর বিশ্বাস করে না তার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দায়িত্বমুক্ত।

৮। সালাফে সালেহীনের রীতি ছিল, কোন বিষয়ের সংশয় নিরসনের জন্য জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনকে প্রশ্ন করা।

৯। উলামায়ে কেরাম এমন ভাবে প্রশ্ন কারীকে জবাব দিতেন যা দ্বারা সুন্দেহ দূর হয়ে যেতো। জবাবের নিয়ম এই যে, তাঁরা নিজেদের কথাকে শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর [কথা ও কাজের] দিকে সম্পৃক্ত করতেন।

৬১ - ছবি অঙ্কনকারী বা চিত্র শিল্পীদের পরিণাম

১। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

(قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة، او ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. (أخرجاه

‘‘আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে চায়। তাদের শক্তি থাকলে তারা একটা অনু সৃষ্টি কর‍ুক অথবা একটি খাদ্যের দানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি গমের দানা তৈরী করুক।’’ (বুখারি ও মুসলিম)

২। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

(أشد الناس عذابا يوما القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. (البخارى و مسلم

‘‘কেয়ামতের দিন সবচেয়ে শাস্তি পাবে তারাই যারা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মতো ছবি বা চিত্র অঙ্কন করে।’’ (বুখারি ও মুসলিম)

৩। ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

(كل مصور فى النار يجعل له بكل صورها نفس يعذب بها فى جهنم. (رواه مسلم

‘‘প্রত্যেক চিত্র অঙ্কনকারীই জাহান্নামী। চিত্রকর যতটি [প্রাণীর] চিত্র এঁকেছে ততটি প্রাণ তাকে দেয়া হবে। এর মাধ্যমে তাকে জাহান্নামে শাস্ড়ি দেয়া হবে।’’ (মুসলিম)

৪। ইবনে আববাস রা. থেকে ‘মারফু’ হাদীসে বর্ণিত আছে,

(من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفع فيها الروح وليس ينافخ. (رواه البخارى ومسلم

‘‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন [প্রাণীর] চিত্র অঙ্কন করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ চিত্রে আত্মা দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে আত্মা দিতে সক্ষম হবে না।’’ (বুখারি ও মুসলিম)

৫। আবুল হাইয়াজ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আলী রা. আমাকে বললেন, ‘আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবোনা, যে কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? সে কাজটি হচ্ছে, ‘তুমি কোন চিত্রকে ধ্বংস না করে ছাড়বে না। আর কোন উচু কবরকে [মাটির] সমান না করে ছাড়বে না।, (মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। চিত্রকরদের ব্যাপারে খুব কঠোরতা অবলম্বন।

২। কঠোরতা অবলম্বনের কারণ সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করে দেয়া। এখানে কঠোরতা অবলম্বনের কারণ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে আদব রক্ষা না করা। এর প্রমাণ আল্লাহ বাণীঃ

ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى

৩। সৃষ্টি করার ব্যাপারে আল্লাহর কুদরত বা সৃজনশীল ক্ষমতা। অপরদিকে সৃষ্টির ব্যাপারে বান্দার অক্ষমতা। তাই আল্লাহ চিত্রকরদেরকে বলেছেন, ‘তোমাদের ক্ষমতা থাকলে তোমরা একটা অনু অথবা একটা দানা কিংবা গমের দানা তৈরী করে নিয়ে এসো।’

৪। চিত্রকরের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিহ হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৫। চিত্রকর যতটা [প্রাণীর] ছবি আকবে, শাস্তি ভোগ করার জন্য ততটা প্রাণ তাকে দেয়া হবে। এবং এর দ্বারাই জাহান্নামে তাঁকে শাস্ড়ি দেয়া হবে।

৬। অঙ্কিত ছবিতে রূহ বা আত্মা দেয়ার জন্য চিত্রকরকে বাধ্য করা হবে।

৭। [প্রাণীর] ছবি পাওয়া গেলেই তা ধ্বংস করার নির্দেশ।

৬২ - অধিক কসম সম্পর্কে শরিয়তের বিধান

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ (المائدة: ٨٩)

‘‘তোমাদের শপথসমূহকে তোমরা হেফাজত করো’’। (মায়েদা : ৮৯)

২। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি,

(الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجاه)

‘‘[অধিক] শপথ, সম্পদ বিনষ্ট কারী এবং উর্পন ধ্বংশ কারী।’’ (বুখারি ও মুসলিম)

৩। সালমান রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: اشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته. لايشترى إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه. (رواه الطبرانى بسند صحيح)

''তিন শ্রেণীর লোকদের সাথে আল্লাহ তাআলা [কেয়ামতের দিন] কথা বলবেন না, তাদেরকে [গুনাহ মাফের মাধ্যমে] পবিত্র করবেন না, বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্ড়ি। তারা হচ্ছে, বৃদ্ধ জিনাকারী, অহংকারী গরীব, আর যে ব্যক্তি তার ব্যবসায়ী পণ্যকে খোদা বানিয়েছে অর্থাৎ কসম করা ব্যতী সে পণ্য ক্রয়ও করে না, কসম করা ব্যতীত পণ্য বিক্রয়ও করেনা।'' (তাবরানী)

৩। ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

خير أمتى قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا ادرى أذكر بعد مرتين او ثلاثا؟ ثم أن بعد كم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر منهم السمن.

''আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার যুগ, তারপর উত্তম হচ্ছে তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তারা। তারপর উত্তম হচ্ছে তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তারা। ইমরান বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরে দু'যুগের কথা বলেছেন নাকি তিন যুগের কথা বলেছেন তা আমি বলতে পারছিনা। অতঃপর তিনি [রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেন, 'তোমাদের পরে এমন কওম আসবে যারা সাক্ষ্য দিবে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হবে না। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আমানত রক্ষা করবে না। তারা মান্নত করবে, কিন্তু তা পূর্ণ করবে না। আর তাদের শরীরে চর্বি দেখা দিবে।'' (বুখারি)

৪। ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্নিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এরশাদ করেছেন,

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم يجيئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة.

''সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ। এরপর উত্তম হলো এর পরবর্তীতে আগমনকারী লোকেরা। তারপর উত্তম হলো যারা তাদের পরবর্তীতে আসবে তারা। অতঃপর এমন এক জাতির আগমন ঘটবে যাদের কারো সাক্ষ্য কসমের আগেই হয়ে যাবে, আবার কসম সাক্ষ্যের আগেই হয়ে যাবে।'' [অর্থাৎ কসম ও সাক্ষের মধ্যে কোন মিল থাকবে না। কসম ও সাক্ষ্য উভয়টাই মিথ্যা হবে।]

ইবরাহীম নখয়ী বলেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য আমাদের অভিভাবকগণ শাস্তি দিতেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়

১। ঈমান রক্ষা করার জন্য উপদেশ দান।

২। মিথ্যা কসম বানিজ্যিক পণ্যের ক্ষতি টেনে আনে, কামাই রোজগারের বরকত নষ্ট করে।

৩। যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম ছাড়া ক্রয় বিক্রয় করেনা তার প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ।

৪। স্বল্প কারণেও গুনাহ বিরাট আকার ধারণ করতে পারে, এ ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ।

৫। বিনা প্রয়োজনে কসম কারীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন।

৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তিন অথবা চার যুগ বা কালের লোকদের প্রশংসা জ্ঞাপন এবং এর পরবর্তীতে যা ঘটবে তার উল্লেখ।

৭। মিথ্যা সাক্ষ্য ও ওয়াদার জন্য সালাফে সালেহীন কর্তৃক ছোটদেরকে শাস্তি প্রদান।

৬৩ - আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী সম্পর্কিত বিবরণ

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (النحل: ٩١)

''আল্লাহর নামে যখন তোমরা কোন শক্ত ওয়াদা করো তখন তা পুরা করো এবং দৃঢ়তার সাথে কোন কসম করলে তা ভঙ্গ করোনা। (নাহর: ৯১)

২। বুরাইদাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট হোক, বড়হোক [কোন যুদ্ধে] যখন সেনাবাহিনীতে কাউকে আমীর বা সেনাপতি নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে 'তাকওয়ার' উপদেশ দিতেন এবং তার সাথে যে সব মুসলমান থাকতো তাদেরকেও উত্তম উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন,

أغزوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولاتقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث حضال : أو خلال: فايتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الاسلام، فان أجابوك فاقبل منهم ، ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين... إلى آخر الحديث. (رواه مسلم)

''তোমরা আল্লাহর নামে যুদ্ধ করো। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। তোমরা যুদ্ধ করো, কিন্তু বাড়াবাড়ি করোনা, বিশ্বাস ঘাতকতা করোনা। তোমরা শত্রুর নাক-কান কেটোনা বা অঙ্গ বিকৃত করোনা। তুমি যখন তোমার মুশরিক শত্রুদের মোকাবেলা করবে, তখন তিনিটি বিষয়ের দিকে তাদেরকে আহবান জানাবে। যে কোন একটি বিষয়ে তারা তোমার আহবানে সাড়া দিলে তা গ্রহণ করে নিও, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দিও। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করো। যদি তারা তোমার আহবানে সাড়া দেয়, তাহলে তাদেরকে গ্রহণ করে নিও। এরপর তাদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর ছেড়ে দারুল মুহাজিরীনে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য হিজরত করার জন্য আহবান জানাও। হিজরত করলে তাদেরকে একথা জানিয়ে দাও, 'মুহাজিরদের জন্য যে অধিকার রয়েছে, তাদেরও সে অধিকার আছে, সাথে সাথে মোহাজিরদের যা করণীয় তাদেরও তাই করণীয়। আর যদি তারা হিজরতের মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে বলে দিও যে, তারা গ্রাম্য সাধারণ মুসলিম বেদুঈনদের মর্যাদা পাবে। তাদের উপর আল্লাহর হুকুম আহকাম [বিধি- নিষেধ] জারি হবে। তবে 'গনিমত' বা যুদ্ধ-লব্ধ অতিরিক্ত সম্পদের ভাগ তারা মুসলমানদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ ব্যতীত পাবে না। এটাও যদি তারা অস্বীকার করে তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, 'তারা কর দিতে সম্মত কিনা। যদি কর দিতে সম্মত হয়, তবে তা গ্রহণ করো, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করো। কিন্তু যদি কর দিতে তারা অস্বীকার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

তুমি যদি কোন দুর্গের লোকদেরকে অবরোধ করো, আর দূর্গের লোকেরা যদি তখন চায় যে, তুমি তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় রেখে দাও, তবে তুমি কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় রেখোনা বরং তোমার এবং তোমার সঙ্গী সাথীদের জিম্মায় রেখে দিও। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী রক্ষা করার চেয়ে তোমার এবং তোমার- সাথীদের জিম্মাদারী রক্ষা করা অনেক সহজ। তুমি যদি কোন দূর্গের অধিবাসীদেরকে অবরোধ করো। আর তুমি আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে তাদের কথায় সম্মতি দিওনা। বরং তোমার নিজের ফয়সালাতে দিও। কারণ তুমি জাননা তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালার ক্ষেত্রে তুমি সঠিক ভূমিকা নিতে পারবে কিনা।'' (মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আল্লাহর জিম্মা, নবীর জিম্মা এবং মোমিনদের জিম্মার মধ্যে পার্থক্য।

২। দু'টি বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বিপদজনক বিষয়টি গ্রহণ করার প্রতি দিক নির্দেশনা।

৩। আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা।

৪। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

৬। আল্লাহর হুকুম এবং আলেমদের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য।

৭। সাহাবী কর্তৃক প্রয়োজনের সময় এমন বিচার ফয়সালা হয়ে যাওয়া যা আল্লাহর সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা তাও তিনি জানেন না।

৬৪ - আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম করার পরিণতি

১। জুনদুব বিন আব্দুলাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

قال رجل والله لايغفر الله لفلان وقال الله عزوجل من ذا الدى يتألى على أن لا أغفر لفلان؟ إنى قد غفرت له وأحبطت عملك. (رواه مسلم)

''এক ব্যক্তি বললো, ''আল্লাহর কসম, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহর তাআলা বললেন, 'আমি অমুককে ক্ষমা করবোনা' একথা বলে দেয়ার আস্পর্ধা কার আছে? আমি তাকেই ক্ষমা করে দিলাম। আর তোমার [কসম কারীর] আমল বাতিল করে দিলাম।'' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, ''যে ব্যক্তি কসম করে উল্লেখিত কথা বলেছিলো, সে ছিলো একজন আবেদ। আবু হুরায়রা বলেন ঐ ব্যক্তি একটি মাত্র কথার মাধ্যমে তাঁর দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়টাই বরবাদ করে ফেলেছে।

আলোচিত অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে মাতববরী করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা। [অর্থাৎ মাতববরী না করা]

২। আমাদের কারো জাহান্নাম তার জুতায় ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।

৩। জান্নাতও অনুরূপ নিকটবর্তী।

৪। এ অধ্যায়ে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, একজন লোক মাত্র একটি কথার মাধ্যমে তার দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করে ফেলেছে।

৫। কোন কোন সময় মানুষকে এমন সামান্য কারণেও মাফ করে দেয়া হয়, যা তার কাছে সবচেয়ে অপছন্দের বিষয়।

৬৫ - সৃষ্টির কাছে আল্লাহর সুপারিশ করা যায় না

১। জুবাইর বিন মুতয়িম রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আরব বেদুঈন এসে বললো, ' হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত, পরিবার পরিজন ক্ষুধার্ত, সম্পদ ধ্বংস প্রাপ্ত। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করুন। আমরা আপনার কাছে আল্লাহর সুপারিশ করছি, আর আল্লাহর কাছে আপনার সুপারিশ করছি'। এভাবে তিনি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করতে লাগলেন যে তাঁর এবং সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় রাগতবাব প্রতিভাত হচ্ছিল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ডাম বললেন,

ويحك أتدرى ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذالك أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه.

''তোমার ধ্বংস হোক, আল্লাহর মর্যাদা কত বড়, তা কি তুমি জানো? তুমি যা মনে করছো আল্লাহর মর্যাদা ও শান এর চেয়ে অনেক বেশী। কোন সৃষ্টির কাছেই আল্লাহর সুপারিশ করা যায় না।'' (আবু দাউদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়

১। 'আপনার কাছে আল্লাহর সুপারিশ করছি' نستشفع بالله عليك

এ কথা যে ব্যক্তি বলেছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

২। সৃষ্টির কাছে আল্লাহর সুপারিশের কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় লক্ষণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল।

৩। نستشفع بك على الله [আমরা আল্লাহর কাছে আপনার সুপারিশ কামনা করছি] এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যাখ্যান করেননি।

৪। ''সুবহানাল্লাহ' এর তাফসীরের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন।

৫। মুসলমানগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চাওয়ার জন্য আবেদন করতেন।

৬৬ - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ এবং শিরকের মূলোৎপাটন

১। আবদুল- াহ বিন আশশিখখির রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বনী আমেরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গেলাম। আমরা তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, أنت سيدنا [আপনি আমাদের প্রভু] তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ألسيد الله [আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন প্রভু]। আমরা বললাম, 'আমাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল ও ধৈর্যশীল।' এরপর তিনি বললেন,

قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان

''তোমরা তোমাদের বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদের উপর সওয়ার না হতে পারে।'' (আবু দাওদ)

২। আনাস রা. থেকে বর্ণিতহেছ, কতিপয় লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বললো, ''হে আল্লাহর রাসূল, কে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, এবং আমাদের প্রভূ তনয়'' তখন তিনি বললেন,

يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان- أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفقونى فوق منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل

হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের কথা বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ড় ও প্রতারিত করতে না পারে। আমি হচ্ছি মুহাম্মদ, আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল। আল্লাহ তাআলা আমাকে যে মর্যাদার স্থানে অধিষ্টিত করেছেন, তোমরা এর উর্ধ্বে আমাকে স্থান দিবে এটা আমি পছন্দ করি না। (নাসায়ী)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন না করার জন্য মানুষের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ।

২। 'আপনি আমাদের প্রভূ বা মনিব' বলে সম্বোধন করা হলে জবাবে তার কি বলা উচিৎ, এ ব্যাপারে জ্ঞান লাভ।

৩। লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে কিছু কথা বলার পর তিনি বলেছিলেন, ''শয়তান যে তোমাদের উপর চড়াও না হয়।'' অথচ তারা তাঁর ব্যাপারে হক কথাই বলেছিল। এর তাৎপর্য অনুধান করা।

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী ما أحب أن ترفعونى فوق منـزلتى অর্থাৎ তোমরা আমাকে স্বীয় মর্যাদার উপরে স্থান দাও এটা আমি পছন্দ করিনা। একথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

৬৭ - মানুষ আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা নিরূপনে অক্ষম

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (الزمر: ৬৮

''তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরুপন করতে পারেনি। কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোতে থাকবে।'' (ঝুমার : ৬৭)

২। ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একজন ইহুদী পন্ডিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, 'হে মুহাম্মদ, আমরা [তাওরাত কিতাবে] দেখতে পাই যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ড় আকাশ মন্ডলীকে এক আঙ্গুলে, সমস্ড় যমীনকে এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে, পানি এক আঙ্গুলে ভূতলের সমস্ত জিনিসকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতকে এক আঙ্গুলে রেখে বলবেন, আমিই সম্রাট।'

এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী পন্ডিতের কথার সমর্থনে এমন ভাবে হেসে দিলেন যে তাঁর দন্ত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। অতপর তিনি

وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة

এ আয়াতটুকু পড়লেন।

সহীহ মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, পাহাড়- পর্বত এবং বৃক্ষরাজি এক হাতে থাকবে তারপর এগুলোকে ঝাকুনি দিয়ে তিনি বলবেন, 'আমি রাজাধিরাজ, আমিই আল্লাহ।'

সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, সমস্ড় আকাশ মন্ডলীকে এক আঙ্গুলে রাখবেন। পানি এবং ভূতলে যা কিছু আছে তা এক আঙ্গুলে রাখবেন। আরেক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ড় সৃষ্টি। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত মারফু হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সমস্ড় আকাশমন্ডলীকে ভাঁজ করবেন। অতঃপর সাত তবক যমীনকে ভাঁজ করবেন এবং এগুলোকে বাম হাতে নিবেন। তারপর বলবেন, ''আমি হচ্ছি রাজাধিরাজ। অত্যাচারীরা কোথায়? অংহকারীরা কোথায়? (মুসলিম)

৩। ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাত তবক আসমান ও যমীন আল্লাহ তাআলার হাতের তালুতে ঠিক যেন তোমাদের কারো হাতে এটা সরিষার দানার মত।

৪। ইবনে যায়েদ বলেন, ''আমার পিতা আমাকে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

ما السموات السبع فى الكرسى إلا كدراهم سبعة القيت فى ترس

''কুরসীর মধ্যে সপ্তাকাশের অবস্থান ঠিক যেন, একটি ঢালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের [মুদ্রার] মত।'' তিনি বলেন, 'আবুযর রা. বলেছেন, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি,

ما الكرسى فى العرش إلا كحلقه من حديد القيت بين ظهرى فلاة من الأرض. ''আরশের মধ্যে কুরসীর অবস্থান হচ্ছে ঠিক ভূপৃষ্ঠের কোন উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকা একটি আংটির মত।

৫। ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'দুনিয়ার আকাশ এবং এর পরবর্তী আকামের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। আর এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের। এমনিভাবে সপ্তমাকাশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। একই ভাবে কুরসী এবং পানির মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের। আরশ হচ্ছে পানির উপরে। আর আল্লাহ তাআলা সমাসীন রয়েছেন আরশের উপর। তোমাদের আমলের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। (ইবনে মাহদী হাম্মাদ বিন সালামা হতে তিনি আসেম হতে, তিনি যিরর হ'তে, এবং যিরর আবদুল্লাহ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

(অনুরূপ হাদীস মাসউদী আসেম হতে তিনি আবি ওয়ায়েল হতে, এবং তিনি আবদুলণ্ঢাহ হতে বর্ণনা করেছেন।)

৬। আববাস বিন আবদুল মোত্তালিব রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

هل تدرون كم بين السماء والارض.؟ قلنا : الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة، من كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة، وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين اسفله والله تعالى فوق ذالك، وليس يخفى عليه شيئ من أعمال بتى آدم. (أخرجه وأعلاه كما بين السماء والارض (أبوداود وغيره

''তোমরা কি জানো, আসমান ও যমীনের মধ্যে দূরত্ব কত?'' আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন, ''আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। প্রতিটি আকাশের ঘনত্বও (পুরু ও মোটা) পাঁচশ' বছরের পথ। সপ্তমাকাশ ও আরশের মধ্যখানে রয়েছে একটি সাগর। যার উপরিভাগ ও তলদেশের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে আকাশ ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আল্লাহ তাআলা এর উপরে সমাসীন রয়েছেন। আদম সন্ড়নের কোন কর্মকান্ডই তাঁর অজানা নয়।'' (আবু দাউদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। والارض جميعا قبضته এর তাফসীর

২। এ অধ্যায়ে আলোচিত জ্ঞান ও এতদসংশিণ্ঢষ্ট জ্ঞানের চর্চা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের ইহুদীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলো। তারা এ জ্ঞানকে অস্বীকার ও করতোনা।

৩। ইহুদী পন্ডিত ব্যক্তি যখন কেয়ামতের দিনে আল্লাহর ক্ষমতা সংক্রান্ড় কথা বললো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথাকে সত্যায়িত করলেন এবং এর সমর্থনে কোরআনের আয়াতও নাযিল হলো।

৪। ইহুদী পন্ডিত কর্তৃক আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কিত মহাজ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাসির উদ্রেক হওয়ার রহস্য।

৫। আল্লাহ তাআলার দু'হস্ড় মোবারকের সুস্পষ্ট উল্লেখ্য। আকাশ মন্ডলী তাঁর ডান হাতে, আর সমগ্র যমীন তাঁর অপর হাতে নিবদ্ধ থাকবে।

৬। অপর হাতকে বাম হাত বলে নাম করণ করার সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৭। কেয়ামতের দিন অত্যাচারী এবং অহংকারীদের প্রতি আল্লাহর শাস্তির উল্লেখ।

৮। আকাশের তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেণ্ঢখ।

৯। ''তোমাদের কারো হাতে একটা সরিষা দানার মত'' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ কথার তাৎপর্য।

১০। কুরসীর তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেখ।

১১। কুরসী এবং পানি থেকে আরশ সম্পূর্ণ আলাদা।

১২। প্রতিটি আকাশের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধানের উল্লেখ।

১৩। সপ্তমাকাশ ও কুরসীর মধ্যে ব্যবধান।

১৪। কুরসী এবং পানির মধ্যে দূরত্ব।

১৫। আরশের অবস্থান পানির উপর।

১৬। আল্লাহ তাআলা আরশের উপরে সমাসীন।

১৭। আকাশ ও যমীনের দূরত্বের উল্লেখ।

১৮। প্রতিটি আকাশের ঘনত্ব (পুরো) পাঁচশ বছরের পথ।

১৯। আকাশ মন্ডলীর উপরে যে সমুদ্র রয়েছে তার উর্ধ্ব দেশ ও তলদেশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ।

والحمد لله رب العلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

৫। উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয় ঈমানের দুর্বলতার আলামত।

৬। এখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা ফরজের অন্তর্ভুক্ত।

৭। অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় পরিত্যাগকারীর জন্য শাস্তির উল্লেখ।

৮। আল্লাহকে যে ভয় করে তার জন্য সওয়াবের উল্লেখ।

التقسيم والتقعيد
للقول المفيد

بقلم الفقير إلى عفو ربه

هيثم بن محمد سرحان

المدرس بمعهد الحرم بالمسجد النبوي الشريف سابقًا

والمشرف على موقع التأصيل العلمي

http//attasseel-alelmi.net

http//sarhaan.net

غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب

وقف لله تعالى

مشروع طباعة الكتب السلفية (١٠٠)

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন সুলাইমান আত্ তামিমি (রহিমাহুল্লাহ) রচিত

“ছয়টি মূলনীতি”র ব্যাখ্যা

হাইছাম বিন মুহাম্মাদ সারহান

প্রাক্তন শিক্ষক : মা’হাদ , মাসজিদে নববী

তত্ত্বাবধায়ক: মা’হাদুস্ সুন্নাহ

https://www.alsarhaan.com

আল্লাহ তায়ালা তাকে, তার পিতা-মাতাকে ও যারা এই কিতাব লিখতে সহযোগিতা করেছেন সকলকে ক্ষমা করুন।

প্রথম সংস্করণ

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তবে বিনামূল্যে বিতরনের জন্য মূদ্রণ ও অনুবাদ

লেখকের পুনর্মূল্যায়ন শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদিত

যোগাযোগ:

islamtorrent@gmail.com

সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়পত্রপ্রাপ্ত

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকটে সাহায্য চাই, তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের নাফসের অনিষ্ট এবং মন্দ কর্মসমূহ থেকে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে হেদায়াত দেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হেদায়াত দানকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতিত কোন সত্য মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:(হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।) {আলে ইমরান: ১০২}, (হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাক্বওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন; আর তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক্ব দাবী করো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।) {আন-নিসা:১} , (হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা বলো* তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে) {আহযাব: ৭০, ৭১}

অত:পর, নিশ্চয়ই শারীয়াতে বর্ণিত কায়েদা ও মূলনীতি সমূহ আয়ত্ব করা প্রত্যেক ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আবশ্যক। আর এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা সমূহের মধ্য হতে অন্যতম একটি হচ্ছে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন সুলাইমান আত্ তামীমী (রহিমাহুল্লাহ) রচিত মূল্যবান গ্রন্থ "أصول الستة " বা "ছয়টি মূলনীতি"। আলেমগন এই পুস্তিকাটিকে অনেক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। পুস্তিকাটিতে লেখক এমন ছয়টি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন যেগুলি আল্লাহ তা'য়ালা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতৃক খুবই স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হওয়ার পরও অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়গুলিতে ভুল করে থাকে এবং পথভ্রষ্ঠ হয়। পুস্তিকাটি সহজ করনার্থে আমরা এটিকে "তালিকা পদ্ধতি"তে ব্যাখ্যার পথ অনুসরণ করেছি। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমিন (রহিমাহুল্লাহ) এর ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেছি। তবে কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সামান্য কিছু সংযোজন করেছি।

মহান আল্লাহ যেন আমাদের এই কাজকে একনিষ্টভাবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করার তাওফীক দান করেন, এর মাধ্যমে লেখক ও পাঠককে কল্যান দান করেন।

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর, তাঁর পরিবার বর্গ, সকল সাহাবা ও কিয়ামাত পর্যন্ত আগমনকারী তাদের সকল অনুসারীদের উপর। সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালার জন্য।

কিতাবের ভূমিকা:

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহিম

সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় এবং পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার কুদরতকে নির্দেশকারী মহা নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে এই 'ছয়টি মূলনীতি', যা আল্লাহ তা'য়ালা সাধারন মানুষের জন্য কল্পনাতীত স্পষ্টভাবে বর্ননা করেছেন , অথচ খুবই সামান্য সংখ্যক ব্যতীত সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমানেরা এবং আদম সন্তানের সর্বোচ্চ বিদ্যানবর্গও এ ব্যপারে ভুলের মধ্যে পতিত হয়েছে।

ছয়টি মূলনীতির সংক্ষিপ্তরূপ:

প্রথম মূলনীতি:
একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত এবং এর বিপরীত বিষয়ের বর্ণনা, আর তা হচ্ছে শিরক।

দ্বিতীয় মূলনীতি:
দ্বীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ থাকা, দলে দলে বিভক্ত না হওয়া।

তৃতীয় মূলনীতি:
শাসকের আনুগত্য করা, এর বিপরীত হচ্ছে তার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং অবাধ্য হওয়া।

চতুর্থ মূলনীতি:
ইলম ও আলেমগণ, ফিক্‌হ ও ফকিহগণের বর্ণনা, এবং যারা তাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের বর্ণনা।

পঞ্চম মূলনীতি:
আল্লাহর ওলীগণের বর্ণনা, এর বিপরীত হচ্ছে শয়তানের ওলী।

ষষ্ঠ মূলনীতি:
কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সঠিক পথের অনুসন্ধান করা, এর বিপরীত হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ ত্যাগ করা।

কেন আমরা 'ছয়টি মূলনীতি ' পড়বো ?

[১] এ ব্যাপারে আলেমগণের উপদেশের কারণে।

[২] ইসলামের মূলনীতি জানা, বিশ্বাস করা এবং আমল করার জন্য।

লেখক ‘বিস্‌মিল্লাহ’ দ্বারা কিতাব শুরু করেছেন, আলেমগণ এই পদ্ধতি অনুসরন করেন, কারণ:

[১]কুরআনুল কারীম ও নবী-রসূলগণের অনুসরণে।

[২]{{**প্রত্যেক এমন কাজ যার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া হয়নি তা অসম্পূর্ণ**}} হাদীস অনুসরণে। যদিও হাদীসটি দূর্বল।

[৩] সালাফগণের অনুসরণে।

[৪]আল্লাহ তা’য়ালার নাম দিয়ে শুরু করার মাধ্যমে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে।

বিস্‌মিল্লাহ এর অর্থ?

[১](بسم) অর্থাৎ (আল্লাহর নাম নিয়ে লিখছি।) আল্লাহর নাম শুরুতে আনা হয়েছে বরকত লাভ ও সীমাবদ্ধতা বোঝানোর জন্য।

[২] (الله) এটি পরাক্রমশালী আল্লাহ তা’য়ালার নাম। তাঁর অন্যান্য সকল নাম এই নামেরই অনুসরণ করে।

[৩] (الرَّحمن) তিনি প্রশস্ত রহমতের গুনে গুনান্বিত, যে রহমত সমস্ত সৃষ্টিজগৎ কে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়।

[৪] (الرَّحيم) এমন রহমতের গুণে গুণান্বিত যে রহমত তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবলমাত্র যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।

‘ছয়টি মূলনীতি’ দ্বারা লেখক কি সীমাবদ্ধতা বুঝিয়েছেন?

নিয়ম হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ ও আলেমগনের কথার মধ্যে যখন কোন সংখ্যা উল্লেখ থাকে এমতাবস্থায়:

[১] যদি ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের মধ্যে অন্যস্থানে এর চেয়ে বেশি সংখ্যা উল্লেখ না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ঐ সংখ্যাটিই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ তার চেয়ে বেশি বুঝাবেনা। যেমন: ইসলামের রুকন সমূহ, ঈমানের রুকন সমূহ; যেমনটি হাদীসে জিবরীলের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে।

[২] আর যদি ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের মধ্যে অন্যস্থানে এর চেয়ে বেশি সংখ্যা উল্লেখ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কম সংখ্যাটি উদ্দেশ্য নয়, বরং বেশি সংখ্যাটিই উদ্দেশ্য হবে । যেমন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: {পাঁচটি জিনিষ ফিতরাতের অন্তর্ভূক্ত.....} , অন্যত্র তিনি বলেন:{তোমরা ছয়টি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকো.....}

কেন কখনো কখনো এমন সংখ্যা উল্লেখ করা হয় যা উদ্দেশ্য নয়?

এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা প্রদানের সুন্দর পদ্ধতি সমূহের মধ্যে একটি; কেননা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতা যেন মজলিসে উপস্থাপিত বিষয় সমূহ ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করতে পারে, ফলে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও তারা বিষয়গুলি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে। যেমন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:((আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করছি এবং সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি, তোমরা এগুলো মনে রাখবে: দান করলে কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না.....)) {তিরমিযি} লেখক রহিমাহুল্লাহ এই পথই অনুসরণ করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়:

[১] ছয়টি মূলনীতির ব্যাপারে কি সালাফগণ ঐক্যমত?
হ্যা; এটি কুরআন - সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরাম, সালফে সালেহীন ও ইমামগণের মতামত দ্বারা সাব্যস্ত।

[২] ছয়টি মূলনীতির ব্যাপারে কে সর্ব প্রথম কিতাব রচনা করেন?
গ্রহনযোগ্য সকল কিতাবেই এই মূলনীতি গুলি বিদ্যমান; তবে সর্ব প্রথম এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন: শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব আত্ তামীমী (রহিমাহুল্লাহ)।

[৩] কিভাবে আমরা ছয়টি মূলনীতি আয়ত্ত্ব করবো?
প্রত্যেকটি মূলনীতি ও তার বিপরীত বিষয়গুলি ভালোভাবে জানার মাধ্যমে।

প্রথম মূলনীতি:

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:
ধর্মীয় ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার জন্য একনিষ্ঠতা, যিনি এক, যার কোন শরীক নেই এবং এর বিপরীত বিষয়ের বর্ণনা, আর তা হচ্ছে শিরক। কুরআনুল কারীমের অধিকাংশ স্থানে বিভিন্ন ভাবে এই মূলনীতির আলোচনা এমন সহজ ভাষায় করা হয়েছে যা সাধারন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক নির্বোধ ব্যক্তিটিও সহজে বুঝতে সক্ষম। অত:পর যখন অধিকাংশ উম্মাতের উপর যা হওয়ার তা হলো তখন শয়তান তাদের সামনে সৎকর্মশীলদের নিন্দা করা ও তাদের অধিকার হ্রাস করাকেই 'ইখলাস' বা একনিষ্ঠতা হিসেবে উপস্থাপন করলো, সেই সাথে সৎকর্মশীলদের ভালোবাসা ও তাদের অনুসরন করাকে শিরক হিসেবে উপস্থাপন করলো।

আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা:

মানুষ তার ইবাদাত দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য অর্জন ও জান্নাত লাভের উদ্দেশ্য করবে; অর্থাৎ

[১] তার উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'য়ালার জন্য একনিষ্ঠ হবে।	[২] তার ভালোবাসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য একনিষ্ঠ হবে।	[৩] তার সম্মান প্রদর্শন আল্লাহ তা'য়ালার জন্য একনিষ্ঠ হবে।	[৪] তার ইবাদাতের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়সমূহ আল্লাহ তা'য়ালার জন্য একনিষ্ঠ হবে।	[৫] তার ইবাদাতটি কেবলমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভের জন্যই হবে।

কুরআনুল কারীমে 'ইখলাস' সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় আয়াত:

[১] {আপনি বলুন নিশ্চয়ই আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।} [আল-আন্‌আম:১৬২]	[২] {আর তাদেরকে কেবলমাত্র একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।} [আল-বায়্যিনাহ: ৫]	[৩] {তোমার পূর্বে যখনই কোন রসূল প্রেরণ করেছি, তাকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ প্রদান করেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, সুতরাং আমারই ইবাদাত করো।} {আল-আম্বিয়া: ২৫]

‘ইখলাস’ সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় হাদিস:

[১] একজন ব্যক্তি বললেন: ‘যদি আল্লাহ ও আপনি ইচ্ছা করেন।’ তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক করলে? বরং বলো: শুধুমাত্র আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। {আহমাদ}

[২] নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতিত অন্যের নামে শপথ করলো, সে শিরক্ বা কুফরী করলো। {আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযি}

[৩] নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের কথা বলো, তবে লক্ষ্য রেখো যে, শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, আমি মুহাম্মাদ, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, পরাক্রমশালী আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তোমরা আমাকে তার থেকে বেশি মর্যাদা দাও তা আমি পছন্দ করিনা। {আহমাদ}

ইখলাসের বিপরীত হচ্ছে শিরক্:

[১] আল্লাহ তায়ালা বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না, এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। {আন-নিসা: ৪৬}

[২] তিনি বলেন: আর আমি প্রত্যেক জাতির নিকটে এই নির্দেশ দিয়ে রাসূল পাঠিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো ও তাগুত কে পরিত্যাগ করো। {আন-নাহল:৩৬}

[৩] তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক্ না করে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক্ করে সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। {মুসলিম}

শিরক্ দুই প্রকার:

[১] বড় শিরক্, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়: আর তা হচ্ছে ঐ শিরক্ যাকে আল্লাহ তা’য়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরক্ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন, এটা সার্বিকভাবে তাওহিদের বিপরীত। যেমন: কবরবাসীর কাছে দু’আ করা, অনুপস্থিত কারো নিকটে এমন কিছু চাওয়া যেটা উপস্থিত কেউ ব্যতিত বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

[২] ছোট শিরক্, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না: আর তা হচ্ছে প্রত্যেক ঐ সকল কথা ও কাজ যাকে আল্লাহ তা’য়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরকের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন (সরাসরি শিরক্ বলেননি), এটা সার্বিকভাবে তাওহিদের বিপরীত নয়। যেমন: আল্লাহ ব্যতিত অন্যের নামে শপথ করা, ছোট রিয়া বা লৌকিকতা।

ছোট ও বড় শির্কের মধ্যে পার্থক্য:

[১] বড় শিরক্:	[২] ছোট শিরক্:
-ইসলাম থেকে বের করে দেয়। -সকল আমল বাতিল করে দেয়। -চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। -শাসক কতৃক তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা ও তাকে হত্যা করা বৈধ। -সে বিশ্বাস করে যে প্রতিটি ঘটনা একটি নির্দিষ্ট কারনেই ঘটে থাকে, আল্লাহর হুকুমে নয়। - এই শিরকের উপর মৃত্যু বরন করলে তাকে ক্ষমা করা হবে না। - দলিল দ্বারা সাব্যস্ত যে এটি একটি বড় শিরক্। - সে বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীর যে কোনো ঘটনা আল্লাহ ব্যতিত অন্যের নির্দেশেই ঘটে থাকে, এমন কি কল্যাণ দেয়া ও অকল্যাণ প্রতিরোধের ক্ষমতাও তার হাতে।	-ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। -নির্দিষ্ট আমল বাতিল করে দেয়। -চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। -শাসক কতৃক তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা ও তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। -আল্লাহ তা'য়ালা যাকে কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারন হিসাবে নির্ধারণ করেননি তাকে ঐ ঘটনার কারন হিসাবে নির্ধারণ করে। - এই শিরকের উপর মৃত্যু বরন করলে তাকে ক্ষমা করা হবে কিনা এ ব্যপারে মতানৈক্য আছে। - দলিল দ্বারা সাব্যস্ত যে এটি একটি ছোট শিরক্। - বড় শিরকে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যম, এমন প্রতিটি কাজই ছোট শিরকের অন্তর্ভূক্ত। - শরীয়তে যে সকল কাজকে শিরক্ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে কিন্তু (ال) ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়নি, সে সকল কাজ সাধারণত ছোট শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

শিরক থেকে ভয় করা:

কিছু শিরক খুবই গোপনীয়, এজন্য আল্লাহর খলীল ও একনিষ্ঠ মুসলিমদের ইমাম ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামও শিরককে খুবই ভয় পেতেন, আল্লাহ তা'য়ালা তার দু'আ উদ্বৃতি করে বলেন: (আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন) {ইবরাহীম: ৩৫}, ইবনু আবি মুলাইকা রহিমাহুল্লাহ বলেন: ((আমি ত্রিশজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছি, প্রত্যেকেই নিজের উপর নিফাকির ভয় পেতেন।)) সুতরাং মুনাফিক ব্যতিত কেউ নিফাক থেকে নিরাপদ নয়, এবং মুমিন ব্যতিত কেউ নিফাকিকে ভয় পায়না। নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি সম্পাদন করার মাধ্যমে শিরককে ভয় করা উচিৎ:

[১] তাওহীদ শিক্ষা করা, এর দাবী অনুযায়ী আমল করা, এর উপর মানুষকে দাওয়াত দেয়া, এর উপর ধৈর্য্য ধারন করা।	[২] শিরক্ সম্পর্কে অধ্যয়ন করা , শিরক্ থেকে বেঁচে থাকার জন্য এর কারনগুলি জানা।	[৩] আল্লাহর নিকটে বেশি বেশি দু'আ করা ও সাহায্য প্রার্থনা করা।	[৪] শিরক্ ও মুশরিকদের থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষনা করা, তাদের থেকে দূরে থাকা; যেন সে নিজেই তাদের একজন হয়ে না যায়।

দ্বিতীয় মূলনীতি:

লেখক রহিমাহুল্লাহ বলেন:

আল্লাহ তা'য়ালা দ্বীনের ব্যপারে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং দলে দলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন।

এই মূলনীতিটি আল্লাহ তা'য়ালা এমন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যা একজন সাধারণ মানুষের ও বোধগম্য; পাশাপাশি তিনি আমাদেরকে পূর্ববর্তীদের ন্যায় দলে দলে বিভক্ত হয়ে ধ্বংস হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন, এবং তিনি রাসূলদেরকে তাদেও উম্মাত কে দ্বীনের ব্যপারে ঐক্যবদ্ধ করার ও দলে দলে বিভক্ত হওয়া থেকে নিষেধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ ব্যপারে সুন্নাহ তে অতি আশ্চর্যজনক ভাবে যা বর্ণিত হয়েছে তা এই বিষয়টিকে আরো বেশি স্পষ্ট করেছে।

অথচ পরবর্তীতে বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে, দ্বীনের মূল ও শাখাগত বিষয়ে বিভক্তিই ইলম ও দ্বীনের ফিকহ্ হিসেবে গন্য হতে থাকলো, এবং পাগল ও নাস্তিকরাই দ্বীনের ব্যপারে ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা বলতে থাকলো।

কুরআনুল কারীমে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় আয়াত:

[১]((আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু অত:পর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিগর্তের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।)) {আলে-ইমরান :১০৩}

[২] ((তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকটে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে।আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।)) {আলে-ইমরান: ১০৫}

[৩]((নিশ্চয়ই যারা তাদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন দায়িত্ব আপনার নয়;)) {আল-আনআম: ১৫৯}

[৪]((এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না ; করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে।))

{আল-আনফাল:৪৬}

ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় হাদিস:

[১]((একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য ইমারতস্বরূপ, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে।)) {বুখারী ও মুসলিম}

[২]((তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরকে ঘৃণা করো না,গোয়েন্দাগিরি করো না, ছিদ্রান্বেষণ করো না, একে অপরকে ধোঁকায় ফেলবে না, আর তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকো।)) {বুখারী ও মুসলিম}

[৩]((এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই,সে তার উপর জুলুম করবে না, তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে না, তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে না, তাক্বওয়ার স্থান এখানে, তাক্বওয়ার স্থান এখানে, -তিনি বুকের দিকে ইশারা করলেন- কেউ মন্দ বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলিম ভাই কে তুচ্ছ জ্ঞান করে, প্রত্যেক মুসলিমের মান-সন্মান, ধন-সম্পদ ও রক্তের উপর হস্তক্ষেপ করা অপর মুসলিমের উপর হারাম।)) { বুখারী ও মুসলিম }

অপর দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ঐ সকল কথা ও কাজ থেকে নিষেধ করেছেন যা মানুষের মাঝে দূরত্ব ও বিভেদ সৃষ্টি করে, এবং প্রত্যেক ঐ সকল কথা ও কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন যা মানুষের মাঝে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে।

সাহাবীগণের আমল:

তাদের মাঝে বিভিন্ন মাসআলায় মতানৈক্য তৈরী হয়েছে তবে এই মতানৈক্য তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করেনি, তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব বা শত্রুতা সৃষ্টি করেনি, যেমন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আহযাবের যুদ্ধে সাহাবীদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় যখন তিনি তাদের বলেন যে, ((তোমাদের কেউ যেন বানী কুরায়যায় না পৌঁছে আসরের সলাত আদায় না করে।)){বুখারী ও মুসলিম}, অত:পর পথিমধ্যে যখন আসরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার উপক্রম হলো তখন কেউ কেউ বললেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার আনুগত্য করবো, আরেক দল বললেন: আমরা আসরের ওয়াক্তেই আসরের সলাত আদায় করবো, কেননা তিনি আমাদের কে এজন্যই এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন দ্রুত বের হই। এই মতানৈক্যের কারনে তারা একে অপরকে ভর্ৎসনা করেনি।

সালাফগণের আমল:

মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মূলনীতি হচ্ছে: যে সকল মাসআলায় ইজতিহাদ বৈধ, সে সকল মাসআলায় যদি ইজতিহাদের কারনে মতানৈক্য হয় তাহলে একদল অপর দলের ওজর গ্রহন করে নিতেন, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করতেন না।

ইসলামী শরঈয়তে ঐক্যবদ্ধতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে এক আল্লাহর ইবাদাত করবো।	আমরা এক নবীর অনুসরন করবো।	আমরা এক শরীয়তের উপর আমল করবো।	আমাদের ক্বিবলা এক।	আমাদের খলিফা এক।

বিভিন্ন অঞ্চল, দেশের মানুষেরা আরাফার ময়দানে একত্রিত হবে।	প্রতি ঈদে আমরা সকলে একত্রিত হবো, এমনকি পর্দার বিধান পালন সাপেক্ষে মহিলা ও বাচ্চারাও একত্রিত হবে।	শহরবাসীরা প্রতি জুমুআর সলাতে একত্রিত হবে।	প্রতিটি এলাকায় আমরা দৈনিক পাঁচবার ফরজ সলাত আদায়ের জন্য একত্রিত হবো।

তৃতীয় মূলনীতি:

লেখক রহিমাহুল্লাহ বলেন:

নিশ্চয় পরিপূর্ণ ঐক্যবদ্ধতার স্বরূপ হচ্ছে: যিনি আমাদের উপরে শাসক হিসেবে নিযুক্ত হবেন পরিপূর্ণরূপে তার আনুগত্য করা, যদিও তিনি হাবশি গোলাম হন।

শরীয়ত ও মর্যাদা উভয়দৃষ্টিকোন থেকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করার দ্বারা মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই মূলনীতিটি পরিপূর্ণ স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। এরপরও বিষয়টি এমন হয়ে গেছে যে, নিজেকে আলেম দাবী করা অধিকাংশ লোকই এই মূলনীতির ব্যাপারে অজ্ঞ, তাহলে কিভাবে এর উপর আমল করা হবে?!

নেতার আনুগত্য হবে:

[১] তার নির্দেশ পালন করার মাধ্যমে।	[২] তার নিষেধকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

নেতার আনুগত্য আবশ্যক হওয়া বিষয়ে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত কতিপয় আয়াত:

[১](হে ইমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো,এবং রাসূলের আনুগত্য করো, এবং তোমাদের শাসকদের){আন-নিসা:৫৯}	[২](তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না; করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে।){আল-আনফাল:৪৬}	[৩](আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।) {আলে-ইমরান:১০৩}

নেতার আনুগত্য আবশ্যক হওয়া বিষয়ে বর্ণিত কতিপয় হাদিস:

[১] আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এই মর্মে বাইয়াত করেছি যে, আমরা আমাদের সুখে-দু:খে, আনন্দে-বেদনায় ও আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিলেও আমরা তাঁর আনুগত্য করবো, এবং ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সাথে বিবাদ করবো না। তিনি বলেন: তবে যদি তোমরা এমন বিষয়ে স্পষ্ট কুফরী দেখ যে বিষয়ে তোমাদের নিকটে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমান রয়েছে, তাহলে সেটি ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম)	[২] যে ব্যক্তি তার নেতার মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখে সে যেন ধৈর্য্য ধারণ করে, কেননা যে ব্যক্তি জামাত থেকে এক বিঘত পরিমানও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো, সে জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করলো। (বুখারী ও মুসলিম)	[৩] যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিলো সে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সাথে এমন ভাবে সাক্ষাৎ করবে যে, তার কোন দলীল থাকবে না। (মুসলিম)

ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির অবস্থা পর্যবেক্ষনকারী দেখতে পাবে যে:

[১] যে জাতি তাদের দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেছে, দ্বীনের উপর ঐক্যবদ্ধ থেকেছে, নেতাদের সম্মান করেছে, সৎকাজে তাদের আনুগত্য করেছে, পৃথিবীতে তারাই বিজয়ী হয়েছে এবং তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

[২] আর যখন তাদের মাঝে মতানৈক্য তৈরী হয়েছে, দ্বীনের ব্যপারে দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে,নেতার আনুগত্য থেকে বের হয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়েছে, তখনই তাদের শত্রুদের মন থেকে তাদের ভয় দূর হয়ে গেছে, তারা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়েছে ফলে তারা ব্যর্থ হয়েছে ও তাদের ক্ষমতা চলে গেছে, অন্যান্য জাতি তাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে এবং তারা স্রোতে প্রবাহমান জঞ্জালের ন্যায় জঞ্জালে পরিনত হয়েছে।

একজন অভিভাবক ও নাগরিক হিসেবে আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে:

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের উপরে যে তাক্বওয়া ও কল্যাণকর কাজের প্রতি ভালোবাসা, সহযোগীতা ও ঐক্যবদ্ধতা ওয়াজীব করেছেন আমরা তা পালন করবো, হক্বের উপর একতাবদ্ধ থাকবো, পরস্পরকে সহযোগীতা করবো, সকল কাজ ইখলাসের সাথে করবো, আমরা সকলেই একই উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো কাজ করবো আর তা হচ্ছে এই উম্মাতের দ্বীনী ও দুনিয়াবী সংশোধন, আর এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ঐক্যবদ্ধ হবো এবং আমাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বিভেদ পরিত্যাগ করবো।

চতুর্থ মূলনীতি:

লেখক রহিমাহুল্লাহ বলেন:

ইলম ও আলেমগণের বর্ণনা, ফিকহ্ ও ফকিহগণের বর্ণনা, এবং যারা তাদের সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার পরও তাদের অন্তর্ভূক্ত নয় তাদের বর্ণনা।

এই মূলনীতিটি আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বাকারাহ এর শুরুতে (হে বানী ইসরাইলগণ! তোমরা আমার সেই নেয়ামাতের কথা স্বরণ করো যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছিলাম) {আয়াত:৪০} এখান থেকে (হে বানী ইসরাইলগণ!){আয়াত: ১২২} এই পর্যন্ত এর ভিতরে আলোচনা করেছেন।

সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়ার জন্য সুন্নাহ তে মূলনীতিটি যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা এটি আরো বেশি স্পষ্ট হয়।

অথচ পরবর্তীতে এটি সর্বাধিক আশ্চর্যের বিষয়ে পরিনত হয়েছে! ইলম ও ফিকহ্ হয়ে গেছে বিদআত ও পথভ্রষ্টতা, এবং হক্ব কে বাতিলের সাথে সংমিশ্রণ করাটাই তাদের নিকটে পছন্দনীয় হয়ে গেছে! আর আল্লাহ তা'য়ালা যেই ইলম অর্জন করা ফরজ করেছেন ও যেই ইলমের প্রশংসা করেছেন সেই ইলমের কথা নাস্তিক ও পাগল ব্যতিত কেউ উচ্চারন করে না! আর যারা এই ইলমের বিরোধিতা করেছে, এর সাথে শত্রুতা করেছে, এর থেকে ভীতিপ্রদর্শন করেছে, এটি অর্জন করতে নিষেধ করেছে, তারা হয়ে গেছে ফকীহ্, আলেম!

ইলম দুই প্রকার:

[১] শরীয়ত ও তারসাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষা:	[২] দুনিয়াবী শিক্ষা: যেমন:চিকিৎসা বিদ্যা,প্রকৌশল বিদ্যা, ইত্যাদি, এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে:		
আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলের উপর যে সুস্পষ্ট দলীল ও হেদায়াত অবতীর্ণ করেছেন সে সম্পর্কিত ইলম কে শরয়ী ইলম বলা হয়। এই প্রকারের ইলম সার্বিকভাবে প্রশংসনীয় ও কল্যাণকর, কুরআন ও সুন্নাহ তে বর্ণিত ইলম দ্বারা মুলত: এই প্রকারের ইলমই উদ্দেশ্য।	[ক] এই প্রকারের ইলম যদি কল্যাণের মাধ্যম হয় তাহলে তা অর্জন কল্যাণকর।	[খ] এই প্রকারের ইলম যদি অকল্যাণের মাধ্যম হয় তাহলে তা অর্জন অকল্যাণকর।	[গ] এই প্রকারের ইলম যদি কল্যাণ বা অকল্যাণ কোন কিছুরই মাধ্যম না হয় তাহলে তা অর্জন অনর্থক ও সময়ের অপচয় ব্যতিত কিছু নয়।

ইলমের প্রশংসায় বর্ণিত কতিপয় আয়াত ও হাদিস:

[১] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: (বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে) {আয-যুমার:৯}

[২] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: নিশ্চয় নবীগণ কাউকে দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী করেন না, তারা কেবলমাত্র ইলমের উত্তরাধিকারী করেন, সুতরাং যে এটা অর্জন করলো সে পূর্ণ অংশই অর্জন করলো। (আহমাদ)

[৩] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আল্লাহ যার কল্যাণ ইচ্ছা করেন তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। (বুখারী ও মুসলিম

ইলমের কতিপয় ফযিলাত:

[১] নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়াতে তাঁর বান্দাদের মাঝে আলেমদের মর্যাদা তাদের আমল অনুযায়ী বৃদ্ধি করেন, এবং পরকালে জান্নাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

[২] এটি এমন একটি ইবাদাত যার প্রতিদান মৃত্যুর পরও চলমান থাকে;(মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতিত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়: সাদকায়ে জারিয়া, এমন ইলম যার দ্বারা উপকার লাভ হয়,.....){মুসলিম}

[৩]এ ব্যাপারে হিংসা করা বৈধ; (দুই ধরনের ব্যক্তির সাথে হিংসা বৈধ: ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'য়ালা সম্পদ দান করেছেন এবং সে এই সম্পদ হক্বের পথে খরচ করে, আর ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'য়ালা জ্ঞান দান করেছেন এবং সে এই জ্ঞান দ্বারা ফায়সালা করে ও অন্যকে তা শিক্ষা দান করে।) {বুখারী ও মুসলিম}

[৪] এটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার সম্পদ, কেননা তিনি বলেন: ((নিশ্চয় তারা ইলমের উত্তরাধিকার বানান))

[৫] এটি এমন আলো যার দ্বারা বান্দা আলোকিত হয়; সে জানতে পারে কিভাবে সে তার রবের ইবাদাত করবে, কিভাবে অন্যের সাথে আচরণ করবে।

[৬] নিশ্চয় আলেম ব্যক্তি আলোর ন্যায়, যার দ্বারা মানুষ তাদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী বিষয়ে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে।

আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে:

প্রকৃত আলেম চেনা, তারা এমন আল্লাহ ওয়ালা যারা মানুষদেরকে তাদের রবের শরীয়ত শিক্ষা দিয়ে থাকে।

পঞ্চম মূলনীতি:

লেখক রহিমাহুল্লাহ বলেন:

আল্লাহ তা'য়ালা কতৃক তাঁর ওলীদের বর্ণনা এবং তাদের মাঝে ও আল্লাহর শত্রু মুনাফিক ও পাপীদের মধ্য হতে যারা তাদের সাদৃশ্যপূর্ণ তাদের মধ্যকার পার্থক্যের বর্ণনা।

এ মূলনীতিটি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নিম্নের কয়েকটি আয়াতই যথেষ্ট।

সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াত ((আপনি বলুন: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরন করো, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের কে ভালোবাসবেন)){আয়াত:৩১}

সূরা মায়েদাহ এর একটি আয়াত ((হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে;)) {আয়াত:৫৪}

সূরা ইউনুস এর দুটি আয়াত ((জেনে রাখো! আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত ইমান আনয়ন করেছে।)) {আয়াত: ৬২,৬৩}

বিষয়টি এত স্পষ্ট হওয়ার পরও শরীয়তের হিফাজতকারী, সৃষ্টিজীবের পথ প্রদর্শনকারী ও ইলমের দাবীদ্বার অধিকাংশ লোকদের নিকটে বিষয়টি এমন হয়ে গেছে যে, ওলী হওয়ার জন্য রাসূলের অনুসরন পরিত্যাগ করা আবশ্যক, যে তাঁর অনুসরন করবে সে ওলীদের অন্তর্ভূক্ত নয়! তাদের জন্য জিহাদ পরিত্যাগ করা আবশ্যক, যে জিহাদ করবে সে ওলীদের অন্তর্ভূক্ত নয়! তাদের কে ইমান ও তাক্বওয়া পরিত্যাগ করা আবশ্যক, যে ইমান ও তাক্বওয়ার উপরে চলবে সে ওলীদের অন্তর্ভূক্ত নয়! হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের দু'আ শোনেন।

কিভাবে আমরা আল্লাহর ওলীদের চিনবো:

যারা আল্লাহর উপর ইমান এনেছে, তাঁকে ভয় করেছে, তাঁর দ্বীনের উপর অবিচল থেকেছে তারাই আল্লাহর ওলী; আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: ((জেনে রাখো! আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত ইমান আনয়ন করেছে।)) {ইউনুস:৬২,৬৩}

নিজেকে আল্লাহর ওলী হিসেবে দাবী করার অর্থ হলো নিজের প্রশংসা করা, এটা তাক্বওয়ার পরিপন্থি।আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: ((অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনিই সম্যক অবগত তার সম্পর্কে যে তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে।)){আন-নাজম:৩২}

লেখক রহিমাহুল্লাহ তিনটি আয়াত উল্লেখ করেছেন:

[১]((যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরন করো, তিনি তোমাদেরকে ভালোবাসবেন)) {আলে-ইমরান:৩১}

এই আয়াতকে 'আয়াতুল মিহনা' বা যাচাই-বাছাইয়ের আয়াত বলা হয়। হাসান বাসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে লোকেরা বলতো:হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের পরাক্রমশালী প্রতিপালককে খুবই ভালোবাসি। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে ভালোবাসার একটি মানদন্ড স্থাপন করে দেয়ার ইচ্ছা করলেন, অত:পর এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

[২] ((হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে;)) {আল-মায়েদাহ:৫৪}

আল্লাহ তা'য়ালা তাদের গুন বর্ণনা করেছেন যে, তারা হবে:

[১] মুমিনদের প্রতি কোমল, ফলে তাদের সাথে লড়াই করবে না, তাদের প্রতিপক্ষ হবে না, তাদের বিরোধিতা করবে না।

[২] কাফেরদের উপর কঠোর, অর্থাৎ তাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করবে ও প্রভাব বিস্তার করবে।

[৩] আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করবে।

[৪] আল্লাহর রাস্তায় চলার ক্ষেত্রে নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না।

[৩] : ((জেনে রাখো! আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত ইমান আনয়ন করেছে।)) {ইউনুস:৬২,৬৩}

আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর ওলীগণ তারাই যারা তাদের অন্তরে ইমানকে ধারন করেছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন:

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কিতাবে ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ তে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় মানুষের মধ্যে তাঁর কিছু ওলী রয়েছে, এবং শয়তানেরও কিছু ওলী রয়েছে। অত:পর তিনি রহমানের ওলী ও শয়তানের ওলীদের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন:

[১] আল্লাহর ওলী:

তাদের ব্যাপারে তিনি বলেন: ((জেনে রাখো! আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত ইমান আনয়ন করেছে।)) {ইউনুস:৬২,৬৩}

[২] শয়তানের ওলী:

তাদের ব্যাপারে তিনি বলেন: ((নিশ্চয়ই তার আধিপত্য (অর্থাৎ শয়তানের) তো শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহন করে, এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে।)) {আন-নাহল:১০০}

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন:

একাধিক বিদ্বানগণ বলেন যে, (যদি তোমরা কোন ব্যক্তিকে হাওয়ায় উড়তে দেখো এবং পানির উপরে হাটতে দেখো, তাহলে যেন তোমরা তার দ্বারা ধোঁকায় পতিত হয়ো না বরং শরীয়তের নির্দেশিত বিষয় পালনে ও নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ থেকে বিরত থাকার ব্যপারে তার অবস্থান লক্ষ্য করো।)

আল্লাহর ওলীগণ দুই স্তরের:

[১] অগ্রবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্ত	[২] ডান দিকের দল-মধ্যমপন্থী

উভয় দলের ব্যপারে আল্লাহ তা'য়ালা তার মহা গ্রন্থের কয়েকটি স্থানে আলোচনা করেছেন: সূরা ওয়াক্বিয়াহ এর শুরুতে ও শেষে, সূরা ইনসান (দাহর) এ, সূরা মুতফ্ফিফিনে, সূরা ফাতিরে। জান্নাতের অনেকগুলি স্তর রয়েছে, এই স্তরগুলির মাঝে শ্রেষ্ঠত্যের বড় পার্থক্য বিদ্যমান, আল্লাহর মুমিন-মুত্তাক্বী ওলীগণ তাদের ইমান ও তাক্বওয়া অনুযায়ী এই স্তর সমূহে অবস্থান করবেন।

আল্লাহর ওলীদের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে মানুষের প্রকারভেদ:

[১] সীমালংঘনকারী: এই প্রকারের ব্যক্তি যখন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর ওলী হিসেবে বিশ্বাস করে: সে ধারনা করে যে আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহ প্রদত্ত সংবাদের ভিত্তিতেই সমস্ত কাজ করে থাকেন, সকল কাজ তার উপরই সোপর্দ করে।	[২] অবহেলাকারী: যখন সে আল্লাহর ওলীকে শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজ করতে বা কথা বলতে দেখে, তখন তাকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ওলীদের থেকে বের করে দেয়, যদিও সে একজন ভুলকারী মুজতাহিদ হয়ে থাকে না কেনো!	[৩] মধ্যমপন্থী: যারা আল্লাহর ওলীদের নিষ্পাপও মনে করে না, আবার যদি তিনি ভুলকারী মুজতাহিদ হয়ে থাকেন তাহলে তাকে পাপীও মনে করে না, এজন্য এরা সকল বিষয়ে তার অনুসরন করে না এবং যদি তিনি ইজতিহাদ করে কোন ভুল সিদ্ধান্ত নেন তাহলেও তার উপর কাফের বা ফাসেক হুকুম আরোপ করে না।

আল্লাহর ওলীগণের কারামত:

[১] প্রমাণিত: তাদের কারামত বিদ্যমান, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মুত্তাক্বী ওলীগণকে সন্মানিত করেন। আল্লাহর ওলীগণকে কারামত দেয়া হয় দ্বীনের হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য অথবা মুসলিমদের প্রয়োজন অনুসারে।

[২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদর্শন: কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরনের দ্বারাই মূলত: কারামত অর্জিত হয়, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এটি তাঁর নিদর্শন সমূহেরই অন্তর্ভূক্ত।

[৩] আল্লাহর ওলীদের জন্য কারামত আবশ্যক নয়: কারামতগুলি সাধারনত: ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী হয়ে থাকে, সুতরাং যখন ইমানের দুর্বলতার কারনে কারামত প্রয়োজন হয় তখন তাকে এমন কারামত দেয়া হয় যার দ্বারা ইমান শক্তিশালী হয় এবং প্রয়োজন পূরণ হয়। অপরদিকে আল্লাহর পরিপূর্ণ ওলীদের জন্য কারামতের প্রয়োজন হয় না, ফলে তিনি তাদের কারামত প্রদান করেন না, এই কারনে কারামতের বিষয়টি সাহাবীদের থেকে তাবেঈদের মাঝে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

অলৌকিক অভ্যাসসমূহ:

আর তা হচ্ছে এমন কোন কাজ করা যা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার পরিপন্থি; যেমন: বাতাসে উড়ে বেড়ানো, পানির উপরে হাটা, ইত্যাদি। এগুলি চার প্রকার:

[১] আয়াত বা নিদর্শন: যা নবীদের জন্য হয়ে থাকে, এটাকে মু'জিযা বলা হয় না; কেননা কুরআনে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে, আর মু'জিযা কিছু মানুষ করতে অপারগ হয় ঠিকই তবে এটি নবীগণ ব্যতিত অন্যদের দ্বারাও হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে কেউ আয়াত বা নিদর্শনের দাবী করতে পারে না।

[২] কারামত: এটি আল্লাহর ওলীদের জন্য হয়ে থাকে; যারা নিজেদের মাঝে ইমান ও তাক্বওয়া এর সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আসহাবে কাহাফের ঘটনাটি কারামতের একটি উদাহরন।

[৩] মু'জিযা বা ফিতনা: যেটা শয়তানের ওলীদের জন্য হয়ে থাকে, ব্যক্তির অবস্থা দেখেই আমরা এটি চিনতে পারবো, নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাঝে ইমান ও তাক্বওয়া থাকবে না, দাজ্জালের ফিতনা এই প্রকারের একটি উদাহরন।

[৪] লজ্জা জনক কাজ (লাঞ্ছনা): যারাই আল্লাহ তা'য়ালার উপর মিথ্যারোপ করে, কিয়ামাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন, এই প্রকারের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুসাইলামাতুল কাজ্জাব, সে একজন অসুস্থ ব্যক্তির চোখে ফুঁ দেয়ায় তার চোখ অন্ধ হয়ে যায়।

“অলৌকিক অভ্যাস” বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষের প্রকারভেদ:

[১] মিথ্যা প্রতিপন্নকারী বা অবিশ্বাসকারী: এরা নাবীগণ ব্যতিত অন্যদের ক্ষেত্রে এটি বিশ্বাস করেন না, যদিও সামগ্রিকভাবে এর অস্তিত্ব বিশ্বাস করলেও তাদের মাঝে ওলী না থাকায় তারা এটিকে অস্বীকার করেন।	[২] সীমালঙ্ঘনকারী: এই প্রকারের ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে যে, অলৌকিক অভ্যাসে সক্ষম সকল ব্যক্তিই আল্লাহর ওলী।	[৩] মধ্যমপন্থী: এই প্রকারের ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা তাকে অলৌকিক অভ্যাসের আকৃতিতে যে কোন কারামত প্রদান করেন, তবে সকল অলৌকিক অভ্যাসই কারামত নয়, বরং যাদু ও প্রতারনার মাধ্যমেও অনেক অলৌকিক কর্মকান্ড হয়ে থাকে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রচিত “ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم” গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে আল্লাহর ওলী ও শয়তানের ওলীদের মাঝে পার্থক্য:

আল্লাহর ওলী:	শয়তানের ওলী:
- কুরআন ও সুন্নাহ এর অনুসরন করে। - তাক্বওয়া ও ইমানের গুনে গুণান্বিত। (মানুষ ধাতুর ন্যায়, তাদের মাঝে পার্থক্য হয় তাক্বওয়ার দ্বারা।) - নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অনুসরন করে, তাঁর শরীয়ত থেকে বের হয়ে যায় না। - মানুষকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরন, ফরজ আদায় ও দু'আ করার প্রতি উৎসাহিত করে। - বিশ্বাস করে যে, নাবীগণ ওলীদের থেকে উত্তম, এবং ওলীগণ সামগ্রিকভাবে নিস্পাপ নন। - তাদের কারামত লাভের কারনই হচ্ছে ইমান ও তাক্বওয়া।(কর্মের প্রতিদান) - আল্লাহর জন্য তাদের কে ভালোবাসা ও তাদের সমর্থন করা বা তাদের বন্ধু হওয়া উচিৎ।	- কুরআন ও সুন্নাহ এর বিরোধিতা করে। - কুফরী, পাপাচার, ভাগ্য গণনা, যাদু, পাগলামী, কাশফ ইত্যাদি দোষে দুষ্ট। - নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করে, তাঁর শরীয়ত থেকে বের হয়ে যায়। - মানুষকে তাদের অনুসরনের প্রতি আহবান করে, ফরজ আদায় ও দু'আ করার প্রতি উৎসাহিত করে না। - বিশ্বাস করে যে, ওলীগণ নবীগণ থেকে উত্তম, এবং ওলীগণ সামগ্রিকভাবে নিস্পাপ ও তারা ইজমার বিরোধিতা করতে পারে। - তারা মু'জিযা অথবা ফিতনা অথবা লাঞ্ছনা লাভ করে, কাফের বা মুনাফিকের জন্য ওলী হওয়া সম্ভব নয়, এবং কাফেরদের প্রশংসা করাও উচিৎ নয়।

আল্লাহর ওলী:	শয়তানের ওলী:
- নেফাক থেকে ভয় পায়, তাদের অবস্থা দিয়ে কাউকে ধোঁকা দেয় না। - অন্যান্য মানুষের মাঝে নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে উপস্থাপন করে না, বরং তাদের মাঝে সুন্নাতের প্রকাশ ঘটে। - তাদের মাঝে বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা নেই। - তারা প্রকাশ্য ও গোপন উভয় দিক দিয়েই ইমানের গুনে গুণান্বিত। - যে ব্যক্তি ধারনা করে যে, নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কেই অবগত, গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত নন; সে কাফের। - নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো কোন ওলী নেই। - পাপ কাজে লিপ্ত থাকে না, আর এটা বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসার একটি আলামত। - বিপদে পতিত হলে সেটাকে তাক্বদীর ও আল্লাহর ফায়সালা হিসেবে মেনে নেয়, তবে কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে তাক্বদীর বা আল্লাহর ফায়সালা কে যুক্তি হিসেবে পেশ করে না। - তাদের জন্য ইবাদাতের জায়গা হচ্ছে মাসজিদ। - তাদের নিকটে কারামতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে সঠিক পথের উপর অবিচল থাকা।	- আল্লাহর জন্য তাদের কে ঘৃণা করা উচিৎ। - নেফাক থেকে ভয় পায় না, তাদের অবস্থা দিয়ে অন্যদের ধোঁকা দেয় । - অন্যান্য মানুষের মাঝে পোশাক, চুল মুণ্ডন ইত্যাদি দ্বারা নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে উপস্থাপন করে, তারা কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। - তাদের মাঝে বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা আছে। - তাদের প্রকাশ্য ও গোপন ইমানের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। - তাদের অনুসারীগণ বিশ্বাস করে যে, ওলীগণ গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত। - তাদের অনুসারীগণ বিশ্বাস করে যে, নাবীগণ ও ওলীগণ একই স্তরের। - শয়তান তাদের মাঝে অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে, ফলে তারা শয়তানকে ফিরিশতা মনে করে। - আনুগত্যের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারীগণ 'ক্বাদারীয়্যাহ', ও পাপকাজে সীমালঙ্ঘনকারীগণ 'জাবারীয়্যাহ'। -তাদের অনুসারীগণ বিশ্বাস করে যে, ওলীগণ নাবুওয়াত ও ফেরেশতাদের গুণে গুণান্বিত। - তারা 'হুলুল' ও 'অহদাতুল উজুদ' আক্বীদায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করে যে, সব কিছুর ভিতরে ও সকল স্থানে আল্লাহ তা'য়ালা বিদ্যমান। - তারা কবর কে মাসজিদ হিসেবে গ্রহণ করে। - তারা এমন কাজ করে যার দ্বারা শয়তানি চরিত্র শক্তিশালী হয়, যেমন: গান বাজনা, শীস দেয়া, হাততালি দেয়া ইত্যাদি।

ষষ্ঠ মূলনীতি:

লেখক রহিমাহুল্লাহ বলেন:

কুরআন ও সুন্নাহ কে ত্যাগ করা এবং বিচ্ছিন্ন-ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি ও মতাদর্শের অনুসরন করার উপরে প্রলুব্ধ করার জন্য শয়তান যে সকল সন্দেহ সৃষ্টি করে সেগুলিকে খণ্ডন করা; আর সে সন্দেহ গুলি হচ্ছে:'মুজতাহিদ মুতলাক্ব ব্যতিত কেউ কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে পারে না'; আর মুজতাহিদ হচ্ছে যিনি এই এই গুণে গুণান্বিত!

এমন সব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয় যেগুলি সম্ভবত আবু বকর ও ওমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এর মধ্যেও পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যাবে না!! সুতরাং কোন মানুষ যদি এই পর্যায়ের না হয় তাহলে তার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি বুঝ গ্রহণ না করা আবশ্যক, এ ব্যপারে কোন সন্দেহ নেই; আর এই অবস্থায় যে এখান থেকে হেদায়াত অনুসন্ধান করে সে হয়তো নাস্তিক নয়তো পাগল, কেননা কুরআন ও সুন্নাহ বুঝা অত্যন্ত কঠিন!!

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্‌দিহি: অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা শারঈ, তাক্বদিরী, সৃষ্টিগত ও আদেশগত সকল ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ভাবে এই অভিশপ্ত সন্দেহটিকে এমন স্পষ্টভাবে খণ্ডন করেছেন, যা মেনে নেয়া একটি সার্বজনীন প্রয়োজনের পর্যায়ে উন্নিত হয়েছে:(কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না){আল-আ'রাফ: ১৮৭}, (অবশ্যই তাদের অধিকাংশের উপর সে বাণী অবধারিত হয়েছে; কাজেই তারা ঈমান আনবে না* নিশ্চয় আমরা তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি,ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে* আর আমরা তাদের সামনে প্রাচীর ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি তারপর তাদেরকে আবৃত করেছি; ফলে তারা দেখতে পায় না* আর আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ইমান আনবে না* আপনি শুধু তাকেই সতর্ক করতে পারেন যে 'যিকর' এর অনুসরন করে এবং গায়েবের সাথে রহমানকে ভয় করে। আতএব তাকে আপনি ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরষ্কারের সুসংবাদ দিন।){ ইয়াসিন:৭-১১}

ইজতিহাদ:

[১] শাব্দিক অর্থ:	[২] পারিভাষিক অর্থ:
কঠিন কোন কিছু অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করা।	শরীয়তের কোন বিষয়ের হুকুম অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করা।

ইজতিহাদের কতিপয় শর্ত:

[১] মুজতাহিদকে তার ইজতিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় শারঈ দলিল সমূহ জানা থাকতে হবে; যেমন: বিভিন্ন হুকুম সংবলিত আয়াত ও হাদিস।	[২] হাদিস সহিহ বা যঈফ হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে; যেমন সনদ , রিজাল শাস্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।	[৩] নাসেখ, মানসুখ, ইজমা ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হতে হবে, যেন এমন হুকুম না দেয় যা মানসুখ হয়ে গেছে বা ইজমার বিপরিত হুকুম না দেয়।	[৪] ঐ সমস্ত দলিল সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে যার কারনে হুকুমের ভিতরে বৈপরীত্য আসতে পারে, যেমন: তাখসীস-তাক্বইইদ ইত্যাদি, যেন সে এর বিপরীত কোন হুকুম না দেয়।	[৫] ভাষা ও উসুলে ফিকহের মধ্যে দালালাতুল আলফায্ (বিভিন্ন শব্দের নির্দেশনা) এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে; যেমন: আম-খাস ইত্যাদি, যেন এর চাহিদা অনুযায়ী হুকুম প্রদান করতে পারে।	[৬] তার মাঝে এমন ক্ষমতা থাকতে হবে যার দ্বারা সে বিভিন্ন দলিল-আদিল্লাহ থেকে হুকুম সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয়।

ইজতিহাদ কি আংশিক হতে পারে?

হ্যা, হতে পারে, কোন একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ে ইজতিহাদ হতে পারে, আবার কোন একটি নির্দিষ্ট মাসয়ালার ক্ষেত্রেও ইজতিহাদ হতে পারে।

মুজতাহিদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করা, অত:পর যদি:

[১] হুকুম স্পষ্ট হয় , তাহলে সেই হুকুম প্রদান করবে; অত:পর যদি:

[ক] হুকুমটি সঠিক হয় তাহলে তার জন্য দুটি সাওয়াব: ইজতিহাদের সাওয়াব ও সঠিক হুকুমে উপনিত হওয়ার সাওয়াব, কেননা হক্বে উপনিত হওয়ার দ্বারা হক্বকে প্রকাশ করা ও তার উপর আমল করা সম্ভব হয়।

[খ] আর যদি হুকুমটি ভুল হয়, তাহলে তার জন্য একটি সাওয়াব এবং তার ভুলটি ক্ষমা করা হবে।

[২] আর যদি তার নিকটে কোন হুকুমই স্পষ্ট না হয় : তাহলে তার জন্য এ বিষয়ে হুকুম দেয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব, এমতাবস্থায় প্রয়োজনে তাক্বলিদ করা বৈধ।

দুই ক্ষেত্রে তাক্বলিদ বৈধ:

[১] মুক্বাল্লিদ যদি একজন সাধারন ব্যক্তি হন, যিনি নিজে নিজে হুকুম জানতে সক্ষম নন: তার জন্য তাক্বলীদ করা আবশ্যক; কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:(যদি তোমরা না জানো তাহলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো।){আন-নাহল:৪৩}

[২] মুজতাহিদ ব্যক্তির সামনে এমন কোন নতুন বিষয় উপস্তিত হলো যে বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত জানানো প্রয়োজন, ইজতিহাদ করার মতো প্রয়োজনীয় সময় নেই; এমতাবস্থায় তার জন্য তাক্বলীদ বৈধ।

তাক্বলিদ দুই প্রকার:

[১] আম:
নির্দিষ্ট কোন একটি মাযহাবকে অত্যাবশ্যকীয় ভাবে ধারন করবে, দ্বীনের সকল বিষয়ে উক্ত মাযহাবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
এ বিষয়ে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন, কেউ কেউ বলেছেন এটি হারাম; কেননা এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতিত অন্য কাউকে সার্বিকভাবে মেনে চলা বাধ্য হয়ে যায়।

[২] খাস:
নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট কারো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে; যখন হক্ব জানতে অপারগ হবে তখন এই ধরনের তাক্বলীদ বৈধ, চাই:

[ক] প্রকৃতই অপারগ হোক।

[খ] অথবা অনেক কষ্ট সাপেক্ষে সেটি করতে সক্ষম হোক।

লেখক রহিমাহুল্লাহ বলেন:

পরিশেষে, সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, কিয়ামাত পর্যন্ত দরূদ ও অসংখ্য সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের উপর।

আমরা আল্লাহর নিকটে দু'আ করি তিনি যেন লেখককে উত্তম প্রতিদান দান করেন, তিনি যেন তাঁকে এবং আমাদেরকে জান্নাতে একত্রিত করেন, নিশ্চয় তিনি দানশীল ও দাতা, সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য,দরূদ ও অসংখ্য সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

পরীক্ষা

নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

কেন আমরা উসুলুস সিত্তাহ বা ছয়টি মূলনীতি পড়বো?	[১] ..... [২] .....
ছয়টি মূলনীতি ও তার বিপরীত বিষয়সমূহ উল্লেখ করো:	[১] ..... [২] ..... [৩] ..... [৪] ..... [৫] ..... [৬] .....

আল্লাহর ওলী ও শয়তানের ওলীদের মাঝে পাঁচটি পার্থক্য উল্লেখ করো	[১] ..... [২] ..... [৩] ..... [৪] ..... [৫] .....

[২] সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:

ছয়টি মূলনীতির ব্যাপারে: ☐ সকলে ঐক্যমত ☐ এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে
কুরআন ও সুন্নাহতে যে সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে: ☐তার মাফহুম আছে ☐তার মাফহুম নেই ☐ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ
দলিল ও বুঝের মূল : ☐ তিনটি ☐ চারটি ☐ পাঁচটি

[৩] 'সঠিক' অথবা 'ভুল' নির্ধারনের মাধ্যমে উত্তর দাও:

প্রশ্ন	সঠিক	ভুল
কখনো কখনো সংখ্যা উল্লেখ থাকে তবে নির্দিষ্টভাবে ঐ সংখ্যাই বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; যেমন: জান্নাতের দরজাসমূহ	☐	☐
কখনো কখনো সংখ্যা উল্লেখ থাকে এবং নির্দিষ্টভাবে ঐ সংখ্যাই বুঝানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে; যেমন: জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ১০ জন	☐	☐
মজলিসে কোন সংখ্যা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো মাসআলাটি সঠিকভাবে আয়ত্ব করা ও যথাযথরূপে উপস্থাপন করতে সক্ষম হওয়া	☐	☐
মাসআলাগুলি গণনা করে একত্রিত করায় আল্লাহ তা'য়ালা লেখককে কল্যাণ দান করুন	☐	☐

[৪] নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে যে সংখ্যাটি নির্দিষ্ট বুঝানো উদ্দেশ্য তার পাশে গোল চিহ্ন দাও:

ইমানের রুকনসমূহ	তিনটি মূলনীতি	সাতটি ধ্বংসাত্বক বিষয়	(পাঁচটি জিনিষ ফিতরাতের অন্তর্ভূক্ত)
পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করা	অচিরেই আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে	মানুষের মাঝে দুটি জিনিষ আছে যার দ্বারা সে কুফরী করে	ফরজ সলাতের পর পঠিতব্য দু'আ সমূহ

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রহিমাহুল্লাহ রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্য হতে কোনটির সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ হওয়া উদ্দেশ্য এবং কোনটির সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ হওয়া উদ্দেশ্য নয় তা বর্ণনা করো:

চারটি কায়েদা	তিনটি মূলনীতি	ইসলাম ভঙ্গের দশটি কারন	ছয়টি মূলনীতি
.....	.....	.....	.....